বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস

গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য

এম. এ (ট্রিপল), কাব্যতীর্থ

পরিবেশক

ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী

কলিকাতা : গৌহাটী : শিলচর

মুখবন্ধ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবিদাস ভট্টাচার্য সংস্কৃত প্রাকৃত ও বাংলায় নিষ্ণাত পণ্ডিত ও প্রবীণ বিদ্যাদাতা। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও চিন্তা করেছেন। ধর্মশাস্ত্র ও রসশাস্ত্রের দৃষ্টি নিরাবিল রেখে তিনি কৃষ্ণের ব্রজলীলা-রহস্য, সাহিত্যের ক্ষেত্র নিরীক্ষণ করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করেছেন অনেকেই, তবুও আরও আলোচনার স্থান রয়েছে। এই অনালোচিত ক্ষেত্রের বেশ কিছু অংশ দেবিবাবুর এই গ্রন্থে মিলবে। আলোচিতপূর্ব ক্ষেত্রেও ইনি নূতন শস্যকণা আহরণ করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে যাঁদের আগ্রহ এমন অভিজ্ঞ পাঠক এবং বৈষ্ণব সাহিত্য যাঁরা প্রাণের দায়ে পড়তে বাধ্য এমন কৌতূহলী ছাত্রছাত্রীরা বইটি পড়ে জ্ঞান ও জ্ঞানজাত উপকার পাবেন।

দীর্ঘসাধনার জ্ঞানবৃক্ষের এই সুপক্ব ফলটির জন্য গ্রন্থকার আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বর্ধমান

শ্রীসুকুমার সেন

ভূমিকা

ছেলেবেলায় পল্লীগ্রামে 'অষ্ট-প্রহর' বা 'চব্বিশ-প্রহরে'র আসরে কীর্তনীয়াদের পদাবলী-কীর্তন শুনিয়া বেশ ভাল লাগিত। একটু বড় হইয়া কলেজে পড়িবার সময় বৈষ্ণব কবিদের লেখা দুই চারিটি কবিতা পড়ি। তখন কবিতাগুলির কাব্যোৎকর্ষের দিকেই নজর ছিল। শিক্ষকতা করিবার সময় ভাল করিয়া পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম, এগুলি কেবল কবিতা নয়, বৈষ্ণব-কবিতা—মহাজন-পদাবলী। এইসূত্রে বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শন সম্পর্কেও কিছু পড়াশুনা করি। তারপর হালের 'গাথাসপ্তশতী' (গাহাসত্তসঈ) সম্পাদনাকালে দেখিতে পাইলাম, ইহার কোন কোন প্রেম-কবিতার সহিত বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার বেশ সাদৃশ্য আছে। বইটিতে বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা ও সংস্কৃত প্রেম-কবিতা হইতে সাদৃশ্যমূলক পদ চয়ন করিয়া উদ্ধৃতি দিয়াছি। কিছু কিছু নোট্ করিয়া রাখি। ক্লাসে পড়াইবার সময়ও কিছু সংগ্রহ করি। গাথাসপ্তশতীতে রাধিকা-কৃষ্ণ, গোপী-কৃষ্ণ সম্পর্কে সাধারণ মানবীয় প্রেম-কবিতাও রচিত হইয়াছে দেখিতে পাই। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কবিতা বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। সংস্কৃত-প্রাকৃতে রসসমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট প্রেম-কবিতারও অসদ্ভাব নাই। ভক্ত বৈষ্ণবকবিগণ এইগুলি হইতেই যেন প্রেরণা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হইল। দেখিয়া মনে হয় বৈষ্ণব কবিদের অমানুষী রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলার কবিতার প্রেক্ষাপটে রহিয়াছে মানুষী প্রেমলীলার কবিতা। গ্রন্থমধ্যে এই জিনিসটি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বস্তুদর্শক সাহিত্য-রসিকের দৃষ্টিকোণ হইতে জিনিষটিকে দেখা হইয়াছে,—তত্ত্বরসিক ভাবুক মহাজনদের দৃক্‌কোণ হইতে নয়। কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথই প্রথম এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (দ্র. 'বৈষ্ণব কবিতা')। আশা করি ভাবরসিক বৈষ্ণবগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না। 'বৈষ্ণব পদাবলী' স্বর্গীয় বস্তু, রাধাকৃষ্ণ এবং তাঁহাদের প্রেমলীলা মানুষের মত হইলেও মানবিকতার ঊর্ধ্বে।

পূর্বসূরিদের নিকট বহু সাহায্য পাইয়াছি। গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে কৃতজ্ঞতা-সহকারে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অপক্ষপাতভাবে 'সহজ বস্তু' (স্বাভাবিক বস্তু) আপন ক্ষুদ্রশক্তিতে বিবেচনা করিয়াছি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় বলা চলে—

'নাহি কাঁহাসো বিরোধ নাহি কাঁহা অনুরোধ
সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগ দ্বেষ, তাঁহা হয় আবেশ
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥'

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ]

আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় গ্রন্থটির একটি মহামূল্য মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। ইহা গ্রন্থ ও গ্রন্থকার দুয়েরই গৌরব। আমার ভূতপূর্ব ছাত্র, অধুনা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগে সহকর্মী শ্রীমান্ উষারঞ্জন ভট্টাচার্য বইটির সূচীপত্র ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং নানাভাবে সহায়তা করিয়া গ্রন্থটি প্রকাশে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার যে সম্পর্ক তাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নাই।

কলিকাতার 'ওরিয়েণ্টাল বুক কোং'-এর শ্রীহিতেন্দু ভট্টাচার্য এবং 'শ্রীসারদা প্রিণ্টিং'-এর শ্রীভৈরব নন্দীর অকৃত্রিম সাহায্য না পাইলে বইখানি প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ। তজ্জন্য উভয়কেই ধন্যবাদ।

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য

সূচী

বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস

প্রথম অধ্যায়

বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য পাঠ করিয়া কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিকে মুগ্ধ চিত্তে প্রশ্ন করিয়াছেন—'কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি'। বৈষ্ণব কবিগণ ব্রজের অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণপ্রেমের কথা বলিতে গিয়া 'প্রাকৃত' নর-নারীর প্রেমকে উপেক্ষা করেন নাই। রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমের যে বিকাশ-ধারা বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাহার হুবহু চিত্র বাস্তব জীবনেও পাওয়া যায়। পদাবলী-সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, মান, অভিমান, বিরহ প্রভৃতি পর্যায়গুলি প্রাচীন ভারতীয় প্রেমসাহিত্যের সহিত একই সুরে বাঁধা। বৈষ্ণব পদাবলীর অপ্রাকৃত প্রেমের পশ্চাৎপটে রহিয়াছে পূর্বযুগের প্রাকৃত প্রেম—যাহা সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালি-অবহট্‌ঠ সাহিত্য হইতে রসধারা লাভ করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলা প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র, কাব্য-সাহিত্য ও কামশাস্ত্রে বর্ণিত পার্থিব প্রেমের আদর্শকেই হুবহু অনুসরণ করিয়াছে। এই গবেষণামূলক নিবন্ধের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখিব যে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের পটভূমিতে রহিয়াছে—পার্থিব প্রেম—যাহা প্রাচীন ভারতীয় কবিগণ তাঁহাদের কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেম-ভক্তিবাদ বা তত্ত্বদৃষ্টিও তাহার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় প্রেমগীতিকায় বিরহের বা দেহাতীত বা অমূর্ত প্রেমের সূক্ষ্মরূপের বর্ণনা থাকিলেও কবিগণ সম্ভোগ বা প্রেমের স্থূলরূপের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ প্রবাস বা বিরহের উপরই অধিক জোর দিয়াছেন এবং প্রেমের এই সূক্ষ্মমূর্তি বা উচ্চগ্রাম (অমূর্তভাব) হইতে অতি সহজেই তাঁহারা আধ্যাত্মিকতার স্তরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বৈষ্ণব-পদাবলী একাধারে সাহিত্য এবং সঙ্গীত। প্রাচীন ভারতীয় গীতিকবিতার বিশেষত সংস্কৃত গীতিকবিতার ধারাই বৈষ্ণব-কবিতাতে অনুস্যূত হইতে দেখা যায়।

পদাবলী-সাহিত্য শুধুমাত্র রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলা-গাথা নহে, কেবলমাত্র 'দেবতার সঙ্গীত' বা 'দৈবী-লীলা' নহে, ইহা যে পার্থিব নর-নারীরও প্রেমের ছবি। বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত পদাবলীতে মানবজীবন-রহস্য ও নিখিল নরনারীর প্রণয়লীলা যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা কোথা হইতে এই ছবি পাইলেন? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা চলে—'কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান/বিরহ তাপিত।'

অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইলাম—কোন কোন গ্রন্থকার এই বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন, কেহ বা কেবলমাত্র ইঙ্গিতই দিয়াছেন। কবিগুরু প্রশ্ন করিয়াছেন—

—'হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?

* * *

এত প্রেম কথা,—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে'?[১]

এই প্রশ্নের কোনো উত্তরই কোনো পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় নাই। বর্তমান গবেষণামূলক নিবন্ধে উক্ত বস্তুটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

বর্তমান গবেষণামূলক নিবন্ধে "বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস" বিষয়টির বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। বিশাল সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্য হইতে ভাবধারা, কাব্যরীতি ও পদ চয়ন করিয়া বৈষ্ণব-পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণ-গোপী-প্রেমের পর্যায়ক্রমে সাজান হইয়াছে। বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের 'অপ্রাকৃত' প্রেমের যে ছবি আমরা পাই, তাহার অনুরূপ চিত্র আমরা নর-নারীর বাস্তব জীবন এবং

১ 'বৈষ্ণব কবিতা'—সোনার তরী

পূর্বতন ভারতীয় সাহিত্যেও লক্ষ্য করি। সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ (লৌকিক) কবিতার সরণি ধরিয়াই জয়দেবের গানে (অর্থাৎ, গীত-গোবিন্দে) রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এক কথায়, বৈষ্ণব-পদাবলীর অপ্রাকৃত প্রেমের পশ্চাৎপটে রহিয়াছে প্রাকৃত প্রেম। আমার বিশ্বাসমতে—উক্ত বিষয়বস্তুটির কোন গ্রন্থেই পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক আলোচনা করা হয় নাই (তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে)। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র ও কাব্যধারার দৃষ্টিকোণ হইতে বৈষ্ণব-পদাবলীকে দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে উহার বৈষ্ণবতা, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও প্রেমভক্তি আলোচনা করা হইয়াছে।

বর্তমান নিবন্ধটি লিখিবার সময়ে বহু গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি। যে সমস্ত গ্রন্থকারের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের সকলের নিকটই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। যে সব গ্রন্থ হইতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য পাইয়াছি, শুধুমাত্র তাহাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

॥ গ্রন্থ তালিকা ॥

অবস্কিওর্ রিলিজিয়াস্ কাল্টস্ এ্যাজ্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড অব্ বেঙ্গলী লিটারেচর —এস্. বি. দাশগুপ্ত

(Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature)

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—কালিদাস

অমরু-শতক

আরলি হিস্ট্রি অব্ বৈষ্ণবিজম্ ইন্ সাউথ ইণ্ডিয়া—এস্. কে. আয়েঙ্গার

(Early History of Vaisnavism in South India)

আর্যাসপ্তশতী—গোবর্ধনাচার্য (পণ্ডিত রামকান্ত ত্রিপাঠী সম্পাদিত)

ইণ্ট্রোডাক্‌সান্ টু তান্ত্রিক বুদ্ধিজ্‌ম্—এস্. বি. দাশগুপ্ত

(Introduction to Tantric Buddhism)

উত্তররামচরিত—ভবভূতি (হরিদাস ভট্টাচার্য সম্পাদিত)

উজ্জ্বল-নীলমণি— রূপগোস্বামী

এ হিস্ট্রি অব ব্রজবুলি লিটেরেচর—ডঃ সুকুমার সেন

(A History of Vrajabuli Literature)

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়—টমাস্ সম্পাদিত

কর্পূরমঞ্জরী—রাজশেখর

কাব্য-প্রকাশ—মম্মটভট্ট

কাব্যানুশাসন —হেমচন্দ্র

কুমার-সম্ভব—কালিদাস

কৃষ্ণ-কর্ণামৃত—বিল্বমঙ্গল

খিল-হরিবংশ —বঙ্গবাসী সংস্করণ

গাহাসত্তসঈ—হাল (রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত)

গীত-গোবিন্দ—জয়দেব

গোবিন্দ-লীলামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ

চর্যাগীতিপদাবলী—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত

চণ্ডীমঙ্গল—মুকুন্দরাম

চৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস-কবিরাজ (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুব৹
মিত্র সম্পাদিত)

চৈতন্যচরিতের উপাদান—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার

চৈতন্যভাগবত —বৃন্দাবন দাস

জগন্নাথবল্লভ নাটক—রায় রামানন্দ

দানকেলিকৌমুদী—রূপ গোস্বামী

ধ্বন্যালোক—আনন্দবর্ধন

নারদীয় ভক্তিসূত্র

পদকল্পতরু—সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত

পদাবলী-পরিচয়—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পদ্মপুরাণ—

পদ্যাবলী—রূপগোস্বামী (সুশীলকুমার দে সম্পাদিত)

প্রাকৃত-পৈঙ্গল—চন্দ্রমোহন ঘোষ সম্পাদিত

প্রীতি-সন্দর্ভ—জীবগোস্বামী

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড পূর্বার্ধ ও পরার্ধ)—ডঃ সুকুমার

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার লোক-সাহিত্য—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

বিক্রমোর্বশীয়—কালিদাস

বিষ্ণুপুরাণ—বঙ্গবাসী সংস্করণ

বিদগ্ধমাধব—রূপগোস্বামী

বেণীসংহার—ভট্টনারায়ণ

বৈষ্ণব-পদাবলী—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

বৈষ্ণব-পদাবলী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

বৈষ্ণব-সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

বৈষ্ণব ফেথ্ এণ্ড মুভমেণ্ট—সুশীলকুমার দে
(Vaisnava Faith and Movement)

বৈষ্ণবিজম্ শৈবিজম্ এ্যাণ্ড আদার মাইনর্ রিলিজিয়াস্ সেক্ট্স্—
আর. জি. ভাণ্ডারকর
(Vaisnavism Saivism and other minor Religious Sects)

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু—রূপ গোস্বামী

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন

মহাভারত—বঙ্গবাসী সংস্করণ

মালতীমাধব—ভবভূতি

মার্কণ্ডেয়-পুরাণ

মেঘদূত—কালিদাস

মৈমনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকা—দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ও
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

যজুর্বেদ

রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান—বিমানবিহারী মজুমদার

রবীন্দ্র রচনাবলী—বিশ্বভারতী সংস্করণ

রঘুবংশ—কালিদাস

রাধাতন্ত্র

রামায়ণ

ললিত-মাধব—রূপগোস্বামী

শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি— পিটার পিয়ারসন্ সম্পাদিত
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বড়ু চণ্ডীদাস (বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত)
শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়—মালাধর বসু
শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—জীবগোস্বামী
শ্রীশ্রীপদামৃত-মাধুরী—খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী সম্পাদিত
শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতা
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে—শশিভূষণ দাশগুপ্ত
ষোড়শ-শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য—বিমানবিহারী মজুমদার
সদুক্তিকর্ণামৃত—শ্রীধর দাস (সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)
সরহের দোহাকোষ—প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত
সাধনমালা
সাহিত্য-দর্পণ—বিশ্বনাথ কবিরাজ (গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত)
সিলেক্‌ট ভার্সেস অব গাহাসত্তসঈ অব হাল—দেবিদাস ভট্টাচার্য
(Select Verses of Gahasattasai of Hala)
সূক্তিমুক্তাবলী
হিম্‌স্ টু দি আল্‌বারস্—জে. এস্. এম্. হুপার
(Hymns to the Alvars)

অজ্ঞাতসারে অনেকের নিকট হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছি, তাহার উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই, তাঁহাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকার করিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেমের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

প্রাচীন ভারতীয় কবি প্রেমের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—'অণ্ণোণ্ণ-মিলিদস্‌স মিধুণস্‌স মঅরদ্ধঅসাসণেণ পরূঢ়ং পণঅ-গণ্ঠিং পেম্মং তি ছইল্লা ভণংতি'।[১]—'মদনের আদেশক্রমে পরস্পর মিলিত নরনারীর (যুবক-যুবতীর) মধ্যে যে প্রণয়গ্রন্থি নিবন্ধ হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই প্রেম বলে।'

প্রেমের উদ্ভব ও তাহার কারণ ও বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রেমের তিনটি স্তরকে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত করা হয়—প্রণয়, প্রেমগ্রন্থি ও অনুরাগ। যুবক-যুবতী পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিলে প্রণয় বলা হয়। এই আকর্ষণ নরনারীর বাহ্যিক রূপ-লাবণ্য দেখিয়া জন্মিতে পারে বা পূর্বজন্মের সংস্কারবশে সংঘটিত হইতে পারে।

তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি।[২]

—'(যে উৎকণ্ঠা) তাহা প্রকৃতপক্ষে জন্মান্তরের জন্য অনুভূত অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ কিন্তু স্পষ্টরূপে অপ্রতীয়মান প্রীতিবিশেষের স্মৃতিমাত্র।'
এই আকর্ষণ মূলত দৈহিক; সাধারণত নায়িকার অপরূপ দেহ-সৌষ্ঠব বা তাহার পঞ্চ সুন্দর অঙ্গের সম্মিলিত প্রভাবেই প্রণয়ের জন্ম হয়। তাহার পর যুবক বা যুবতী মুগ্ধ হইয়া নির্জনে অবস্থান করে ও পরস্পরের রূপ-গুণ লইয়া চিন্তা করিতে থাকে। তখন তাহারা নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া গিয়া তাহাদের প্রথম দর্শন হইতে সমস্ত ব্যাপার আলোচনা করিতে করিতে মনে করে যেন প্রিয়তমা বা প্রিয়তম তাহাদের চিত্তে লীন, লিখিত বা প্রতিবিম্বিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা তখন সর্বত্রই তাহাদের উপস্থিতি দর্শন করে, অনুভব বা স্পর্শ করে। 'দুহু অংগ একই পরাণ' এই অনুভূতিই তখন কার্যকর। এই অবস্থার প্রেমকে প্রেমগ্রন্থি বলে। পূর্বাবস্থার সকল সংশয়-সন্দেহ, কলঙ্কের অবলুপ্তি ঘটিয়া থাকে।

১ রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী', ৩য় জবনিকা।
২ কালিদাস, 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্', ৫ম অঙ্ক ২য় শ্লোক।

কবি ভবভূতি বলেন—

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমংগে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব, শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ ॥[১]

—'তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি আমার নয়ন-যুগলের জ্যোৎস্না এবং তুমি আমার অংগে অমৃত, ইত্যাদি শত শত প্রিয়োক্তি দ্বারা সরলাকে (সরলবুদ্ধি সীতাকে) সন্তুষ্ট করিয়া, তাহাকেই—অথবা থাক, আপনার নিকট ইহার পর বলিয়া আর ফল কি।'

এই মন্মথরস ক্রমে ক্রমে বিবর্ধিত হইয়া উভয়ের মনোভাব প্রকটিত করে। এই অবস্থায় নানাবিধ বিলাস-বিভ্রম দেখা দেয়। অন্তরের কামনা-বাসনা তাহাদের দৃষ্টিতে, ব্যবহারে ধরা পড়ে, দুর্লক্ষ্য হইলেও প্রকাশিত হইয়া পড়ে তাহাদের হৃদয়ের 'তপ্ততৃষা'। চিত্তগত প্রেমেই অনুরাগের উৎপত্তি। রমণীর দেহ-সৌভাগ্যই প্রেমের প্রকৃত হেতু, অলংকারাদির শোভা নিতান্ত গৌণ। রাজরাণী, গৃহস্থ রমণী ও সাধারণ নারীর প্রেমের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই, যেহেতু বহুমূল্য অলংকারের উপর প্রেম নির্ভর করে না।

কোনো কালে, কাহারও সহিত যদি প্রেমের বন্ধন হয় তবে তাহার কারণ কিন্তু সকল সময় 'রূপ' নয়, কেননা প্রেমই নিজের স্বভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া লয়। প্রেমের গতি দুর্জ্ঞেয়, বক্র—বোঝা বড়ই শক্ত। আবার প্রেম-সংঘটনের সংগত কারণও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতু-
র্ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।[২]

—'আভ্যন্তরিক কোন কারণ পদার্থকে পরস্পর সম্মিলিত করে, কিন্তু ভালবাসাটা বাহিরের কোন সম্পর্ককে অবলম্বন করে না।'

আবার কাহারও প্রতি কাহারও অনুরাগাত্মক প্রণয় জন্মে, যে প্রণয়কে লোকে 'তারামৈত্রক' বলে, সেই প্রণয়কে লোকে 'ইয়ত্তাবিহীন' ও 'অকারণজন্য' বলিয়া থাকে।

আবার, অকিঞ্চিদপি কুর্বানঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ।[৩]

---

১ ভবভূতি, 'উত্তররামচরিত'। ২ ভবভূতি, উত্তররামচরিত ৬।১২। ৩ ভবভূতি।

—‘(প্রিয়জন) কিছু না করিয়াও সুখ দ্বারাই দুঃখ নাশ করে, কারণ যে যাহার প্রিয়জন সে তাহার নিকট কোন অনির্বচনীয় দ্রব্য।’ দাম্পত্য প্রেমের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া ভবভূতি একটি অপূর্ব কথা বলিয়াছেন। রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রেম প্রসঙ্গে কবি কথাটি বলিয়াছেন—

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং তস্য সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে॥[১]

—‘যে বস্তু সুখ ও দুঃখের অভিন্ন আশ্রয় এবং সকল অবস্থাতেই অনুকূল, যেখানে পরিশ্রান্ত হৃদয়ের বিশ্রাম হয়, যাহার প্রতি অনুরাগকে বার্ধক্যও হরণ করিতে পারে না এবং কালে লজ্জার আবরণের অভাব হইলে, যাহা অনুরাগের পরিপক্ক উৎকৃষ্ট অংশে অবস্থান করে, সেই সজ্জনের নিরবচ্ছিন্ন সেই মঙ্গলটি অতিকষ্টেই পাওয়া যায়।’

ভারতীয় কবিগণ প্রেমের মিলন বিরহ প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। বেশীর ভাগ কবিই দেহজ প্রেমের বা প্রেমের স্থূলরূপের বর্ণনাই করিয়াছেন। তাহাদিগকে ‘ভোগের কবি’ বলা যাইতে পারে। মহাকবি কালিদাস ইহাকে ‘ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ’ বলিয়াছেন।[২] এই কামনা-বাসনা বা ইন্দ্রিয়জ প্রেমের ভস্মাধারেই বিশুদ্ধ বা প্রকৃত প্রেমের জন্ম। দেহের অন্তরায় দূরে সরিয়া গেলেই আত্মায় আত্মায় মিলন হয়, এই মিলনই কালিদাসের কাব্যে দেখা যায়। ‘ভোগের দ্বারা ভোগের নিবৃত্তি হয় না, অগ্নিতে আহুতি দিলে যেমন তাহার তেজ আরও বাড়িয়া যায়, সেইরূপ কামনার সেবা করিলে কামনা বাড়িয়াই চলে’।[৩] ভোগসর্বস্ব রূপজ প্রেম ‘কুমার-সম্ভবে’ মহাদেবের তৃতীয় নয়ন-বহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, ‘শকুন্তলা’য় ঋষি-শাপবিদ্ধ হইয়া বিরহতাপে বিশীর্ণ হইয়াছে।

কালিদাস, ভবভূতির মত কবি প্রেমের দেহাতীত অবস্থা বা বিরহের উপরই জোর দিয়াছেন বেশী। সাধারণত সংস্কৃতকাব্যে ‘দেহমুখ্য’ ও ‘দেহাতীত’ বলিয়া প্রেমকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয় নাই। বৈষ্ণবেরাই এই ভেদ প্রথমে

---

১ উত্তররামচরিত ১।৩৯

২ ‘অথেন্দ্রিয়ক্ষোভ-মযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্‌বলবন্নিগৃহ্য’—কুমারসম্ভব ৩।৬৯

৩ ন যাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ মনু ২।৯৪

নিরূপিত করেন। তবে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে সৌন্দর্য-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ প্রেমকে স্পষ্টত বড়ো করিয়া দেখান হইয়াছে।

মদনভস্মের পরে পার্বতী—

ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ।
সখ্যোঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাতলজ্জা
শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ ॥[১]

'নিজের অনিন্দ্যসুন্দর দেহ, বিশেষ করিয়া সখী দুইজনের সমক্ষে, ব্যর্থ হইল দেখিয়া গাঢ়তর লজ্জায় মুখ নত করিয়া কোনক্রমে গৃহাভিমুখে চলিলেন।' তারপরে 'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী,' (সমস্ত হৃদয় দিয়া রূপকে পার্ব্বতী নিন্দা করিলেন।) এবং 'ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাং সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ'—'একাগ্রতার সহিত তপস্যা অবলম্বন-পূর্বক নিজের বিফল সৌন্দর্যকে সার্থক করিয়া তুলিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।' কারণ 'অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ'—'অন্যথা তেমন প্রেম এবং তেমন স্বামী আর কেমন করিয়া লাভ করা যায়।'[২]

বিরহের দহনেই প্রেমের দীপ্তি। প্রেমের এই অতি সূক্ষ্মভাব হইতে অতি সহজেই আধ্যাত্মিকতায় পৌছান যায়। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের বিরহের উপরই জোর দিয়াছেন, তাহা হইতে ধাপে ধাপে অলৌকিক স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং প্রেমকে পূজার সামগ্রী করিয়াছেন—'যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।'[৩]

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—দেহজ কামনা হইতেই বিশুদ্ধ প্রেমের উদ্ভব হইয়াছে। যেমন পঙ্ক হইতেই 'পঙ্কজে'র জন্ম, তেমনি দেহজ প্রেম হইতেই বিশুদ্ধ প্রেমের উদ্ভব। এই কাম ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কাম ও বিশুদ্ধ প্রেমের প্রভেদ বৈষ্ণবেরাই স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। প্রেমের দুই রূপ—জৈব প্রেম (বা দেহজ প্রেম) ও স্বর্গীয় প্রেম।

বৈষ্ণবাচার্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখান হইয়াছে—

কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥

১ কুমারসম্ভব ৩।৭৫। ২ কুমারসম্ভব ৫।২। ৩ চৈতালি—রবীন্দ্রনাথ।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা—তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম॥[১]

বিশুদ্ধ প্রেমের স্বভাব হইল প্রেমাস্পদের জন্য আত্মত্যাগ, নিজের বলিতে যাহা কিছু আছে, সবই প্রেমের জন্য ত্যাগ করিলে, তবেই প্রেম সার্থকতা লাভ করে। নিজের সম্পদ, লোক-লাজ, লোক-ভয়, যশ, মান, এমন কি, জীবন পর্যন্ত প্রেমের জন্য উপেক্ষা করা যায়। প্রেমকে প্রেমিকেরা নিত্য নূতন করিয়া আস্বাদ করিয়া থাকে। প্রেমের আবেগ এতদূর বাড়িয়া যায় যে বিরহে তাহারা মৃত্যুতুল্য বেদনা অনুভব করিয়া থাকে। সীতা-বিরহে রামের অনুরূপ অবস্থা ভবভূতি বর্ণনা করিয়াছেন—

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগো দ্বিধা ন তু ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনুমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥[২]

—'গাঢ় শোকাবেগ হৃদয়কে দলিত করিতেছে, কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে না, বিকল দেহ মোহ বহন করিতেছে, কিন্তু একেবারে চৈতন্য ত্যাগ করিতেছে না, অন্তরের দাহ দেহকে জ্বালাইতেছে, কিন্তু একেবারে ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে না, এবং মর্মচ্ছেদী বিধাতা প্রহার করিতেছেন বটে, কিন্তু একেবারে জীবন নষ্ট করিতেছেন না।'

প্রেমের শক্তিতে তাহারা মৃত্যুকেও জয় করিতে পারে, মৃত ব্যক্তিকে জীবনদান করিতে পারে। মহাভারতের সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীতে পাই, সাবিত্রী প্রেমের বলে মৃত স্বামীর জীবন দান করিয়াছিল। চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদেও এই ধরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মরমে মরমে, জীবনে মরণে
জীয়ন্তে মরিল যারা।
নিতুই নূতন পীরিতি রতন
যতনে রাখিল তারা॥

---

১ চৈতন্য চরিতামৃত, আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ
২ উত্তররামচরিত ৩।১২ ; মালতীমাধব ৩।৩১

তৃতীয় অধ্যায়

প্রেম-গীতির উদ্ভব ও বিকাশ

প্রেমের উপর দৈবীভাব আরোপ করার পূর্বে সাধারণ নরনারীকে ঘিরিয়াই প্রেমের উদ্ভব হয় ও তাহা বিকাশ লাভ করে।

বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতিতে যে প্রেমের কথা বা যে প্রেম-সংগীত আমরা পাই—তা একান্তভাবেই বাস্তব জগতের বস্তু।

প্রেম বস্তুটি বড় কঠিন, গতিপথও তার বিচিত্র। নদী যেমন উৎসমুখ হইতে বাহির হইয়া বিচিত্রধারায় বিচিত্র গতিতে প্রবাহিত হইয়া শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি করে ঠিক তেমনি হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রেম বিচিত্র পথে বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

ঋগ্‌বেদের অনেকস্থানে নরনারীর প্রেমের কথা আছে, এই গাথাগুলিকে অনেকে গান বলিয়াছেন। যমযমী-সংবাদটিকে প্রেমগাথা বলা যাইতে পারে। যমী বিবাহের জন্য যমকে বলিল, যম ভগিনীসম্পর্ক হেতু বিবাহ করিতে অস্বীকার করিল। তাহার উত্তরে যমী বলিল—বিধাতা গর্ভমধ্যেই আমাদিগকে স্বামী-স্ত্রী করিয়াছেন। অথর্ববেদে ভগিনী সম্পর্কেও বিবাহ হইতে দেখা যায়। ঋগ্‌বেদের পুরূরবা-উর্বশীর সূক্তকে প্রেমের কবিতা বলা যাইতে পারে। "ঋগ্‌বেদের এই উর্বশী-পুরূরবার সূক্তটি কবিতা হিসাবে অত্যন্ত জোরালো, বাস্তব, হৃদয়োষ্ণ, উজ্জ্বল প্রেমের কবিতা...বৈদিক ভাষার কঠিন শুক্তিপুটে আধৃত একটি চিরন্তন কবিতা।"[১] এই গাথাগুলিতে মিলন বিরহ সব কিছুই দেখা যায়। ঋগ্‌বেদের এই নাট্যরসময় গাথাটি (১০·৯৫) আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে—ব্রাহ্মণে, মহাভারতে ও কালিদাসে এবং শেষে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছিয়াছে।

অথর্ববেদে দেখিতে পাই—"লতা যেমন বৃক্ষকে সর্বাংশে জড়াইয়া ধরে, তুমিও সেইরূপ আমার শরীর আশ্রয় করিতে ইচ্ছা কর, আমার পদ, আমার চক্ষু পাইতে ইচ্ছা কর, তোমার কামনাপূর্ণ নয়ন প্রেমে উচ্ছলিত হউক, তুমি আমার বাহুতে লীন হও, আমার হৃদয়ে লাগিয়া থাকো, তুমি আমার নিজের

---

১ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন।

হও।” নারীকে জয় করার জন্য এই সূক্তটি উল্লিখিত। এই জাতীয় সূক্ত আরও আছে,—(যেমন, সূক্ত ৮, ৯, ১০২, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২)। ঋগ্‌বেদের উষাসূক্তে ও অন্যত্র এই ধরণের চিত্র পাওয়া যায়, তবে প্রসঙ্গটা অন্যরূপ।

আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে “ধ্রুবা” নামে যে গানের উল্লেখ রহিয়াছে, সেগুলিকে প্রাকৃত গীতিকবিতার আদিরূপ বলিয়া গণ্য করা চলে, (ধ্রুবা<ধ্রুপদ)। এই ধরণের গানের মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার মনোভাবের প্রকাশ পাইত।

সসিকিরণ-লম্বহারা উড়ুগণ-কিদাবতংসা।
গহগণ-কিদঙ্গ-সোভা জুবদি বিঅ ভাদি রাঈ॥

—‘চন্দ্র কিরণের হার লম্বিত করিয়া, তারার শিরোভূষণ পরিধান করিয়া এবং গ্রহগণের অলঙ্কার অঙ্গে সজ্জিত করিয়া রাত্রি যেন যুবতীর মত শোভা পাইতেছে।’

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত “শিলপ্পাদিকারম্” বা নূপুরের কাব্য নামক তামিল সাহিত্যে বৈষ্ণব-পদাবলীর অনুরূপ ‘রাসলীলা’ ও বস্ত্রহরণ লীলার গান পাওয়া যায়।

রাসলীলা বা গোপীগীত—

‘সখি, যে মায়বন বিস্তৃত ব্রজে কুরুন্ত (যমলার্জুন) বৃক্ষ ভঙ্গ করিয়াছিলেন তিনি যদি দিনের বেলায় আমাদের গাভীদের মধ্যে আসেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার ‘মুল্লই’ বেণু শুনিতে পাইব কি?

‘আমরা সেই মনোরমা সুন্দরী পিন্নয়ইয়ের লাবণ্যর কথা গান করিব, যিনি যমুনার তীরে তীরে স্বামীর সঙ্গে নাচিয়াছিলেন।’[১]

বস্ত্রহরণলীলা গান—

‘আমরা কেমন করিয়া তাঁহার রূপ বর্ণনা করিব, যিনি সুমধ্যমা প্রিয়ার বস্ত্র লুকাইয়া ফেলায় সেই দয়িতা একেবারে মাথা হেঁট করিয়া রহিয়াছিলেন? আর সেই সুন্দরীর মুখের শোভাই বা কিরূপে বলিব যিনি তাঁহার প্রিয়তমকে কাপড় লুকাইয়া ফেলার জন্য অনুতপ্ত দেখিয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিলেন।’[২]

---

১ শিলপ্পাদিকারম্। পৃঃ ২৩২-২৩৩
২ ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার। পৃঃ ১৫৬-১৫৭

প্রাচীন গীতিকবিতার বেশীর ভাগই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। নিছক লোকরঞ্জনের জন্যও প্রেমগীতি দেখা যায় বিশেষ করিয়া সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতায়।

কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকে প্রাচীন অপভ্রংশে রচিত কয়েকটি গান আছে। এখানে একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

চিন্তা-দুম্মিয়মাণসিআ।
সহঅরি-দংসণ-লালসিআ॥
বিঅসিঅ-কমল-মণোহরএ।
বিহরই হংসী সরোবরএ॥[১]

—'সহচরীর দর্শনোৎসুক হংসী চিন্তাভারগ্রস্ত মনে প্রফুল্লকমলযুক্ত মনোহর সরোবরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।' সংস্কৃত ভাষায় প্রথম পদ রচনা পাই কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকে। পদটির ভাষা সংস্কৃত হইলেও ছন্দ সংস্কৃতের নয়—মিলহীন এবং বিষম মাত্রিক,—

অভিনব-কুসুমস্তবকিততরুবরস্য পরিসরে
মদকল-কোকিল-কূজিত-রবঝঙ্কারমনোহরে।
নন্দনবিপিনে নিজকরিণীবিরহানলসন্তপ্তো
বিচরতি গজাধিপ ঐরাবতনামা॥

নাটকখানিতে পুরূরবার বিরহই লক্ষণীয়, (উর্বশীর নহে)। রামায়ণে ও উত্তররামচরিতে রামেরই বিরহ-প্রকাশক শ্লোক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভবভূতির উত্তররামচরিতের তৃতীয়াঙ্কে রামের হৃদয়-বেদনাই প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন,

হা হা দেবি! স্ফুটতি হৃদয়ং, স্রংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিশ্বঙ্‌মোহঃ স্থগয়তি, কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি॥[২]

—'হায়! হায়! দেবি! হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দেহের সন্ধিবন্ধন সকল খুলিয়া যাইতেছে, জগৎটাকে শূন্য এবং অবিশ্রান্ত জ্বালাময় মনে করিতেছি,

---

১ কালিদাস, বিক্রমোর্বশীয়, ৪র্থ অঙ্কে।
২ ভবভূতি, উত্তররামচরিতে, ৩য় অঙ্কে।

ভিতরে দগ্ধ হইতেছি, বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া প্রগাঢ় অন্ধকারে যেন মগ্ন হইতেছে এবং মূর্চ্ছা সকল দিক্ আবৃত করিতেছে। হায়! মন্দভাগ্য আমি এখন কি করি।'

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' হংসপদিকার গানেও অনুরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

অহিণবমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তনিব্বুদো মহুঅর বিস্মরিদোসি ণং কহং ॥[১]

—'ওগো অভিনবমধুলোভভাবনামগ্ন মধুকর, তেমন করিয়া আম্রমঞ্জরী চুম্বন করিয়া আসিয়া, এখন পদ্মবনে বসিবামাত্রই শান্ত হইয়া তাহাকে কেন ভুলিয়া গেলে।'

শকুন্তলা নাটকের প্রস্তাবনায় নটীর গানটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

খণচুম্বিআই ভমরেহিঁ উঅহ সুউমার-কেসর-সিহাই।
অবঅংসঅন্তি সদঅং সিরীসকুসুমাই পমআও ॥

—'দেখ, ভ্রমরের দ্বারা মুহূর্তকালমাত্র চুম্বিত পেলবকেশরশিখাবিশিষ্ট শিরীষ ফুলগুলি মেয়েরা সন্তর্পণে কানে পরিতেছে।'

মেঘদূত তো বর্ষার প্রেমসংগীত—যক্ষের বিরহগান। 'নরনারীর প্রেম সম্পর্কে শুধু বিরহ লইয়া বিরচিত ইহাই প্রথম কাব্য, এমন কি মূল কবিতা। মেঘদূতে যাহার প্রথম পদক্ষেপ ভারতীয় সাহিত্যের সেই প্রেম-কবিতা বৈষ্ণব-পদাবলীতে বিচরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মেঘদূতে প্রিয়াবিরহ, বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রিয়বিরহ, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে নিখিলবিরহ। এই ত্রিবিক্রম বর্ষাকে লইয়াই।

'শুধু বিরহের ব্যাপারেই নয়, বৈষ্ণব-পদাবলীর বিষয়ব্যবস্থারও কিছু কিছু মেঘদূতে পূর্বাভাসিত। যেমন, অভিসার, সঙ্কেত স্থানে মিলন, মান, স্বপ্ন-সমাগম ইত্যাদি।'[২]

যেমন, যক্ষ মেঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং, বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা।

---

১ শকুন্তলে ৫।১

২ ডঃ সুকুমার সেন—ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস। পৃঃ ২৮২

তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথংচিৎ
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্ছনাং বিস্মরন্তী॥ (মেঘদূত)

—'হে প্রিয়দর্শন, হয়ত মলিনবসনা সে কোলের উপর বীণাখানি টানিয়া আমার ভনিতা-দেওয়া কথায়-গাঁথা গান গাহিতে গিয়া চোখের জলে ভিজা বীণাতন্ত্রী কোনো রকমে বাঁধিয়া লইয়া নিজের উদ্ভাবিত মূর্ছনা বারবার নিজেই ভুলিয়া যাইতেছে।'

'রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর প্রধান সুর বিরহের। বিরহ-সুরের রণনেই বাৎসল্যের, অনুরাগের এবং মিলনের শ্রেষ্ঠ পদগুলির উৎকর্ষ। সংস্কৃত সাহিত্যে বিরহ প্রধানত পুরুষের তরফে। যেমন, ঋগ্বেদে পুরূরবার বিরহ, রামায়ণে রামের বিরহ, মেঘদূতে যক্ষের বিরহ। নবীন আর্যভাষার সাহিত্যে তথা বৈষ্ণব-গীতিকাব্যে বিরহ একান্তভাবে নারীরই। ইহার কারণ দুইটি। এক, ইতিমধ্যে সংসারে নারীর মর্যাদা হ্রাস পাইয়াছে। দুই, প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রধান বিষয়গুলি মেয়েলি ছড়া-গান হইতে গৃহীত।'[১]

অমরুশতকের এক একটি কবিতা প্রেমের এক একটি নিখুঁত চিত্র। এগুলিকে প্রেম-সঙ্গীত বলা যাইতে পারে। যেমন—

গতে বাল্যে চেতঃ কুসুমধনুষা সায়কহতং
ভয়াদ্বীক্ষ্যেবাস্যাঃ স্তনযুগমভূন্নির্জিগমিষু।
সকম্পা ভ্রূবল্লী চলতি নয়নং কর্ণকুহরং
কৃশং মধ্যং ভুগ্না বলিরলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ॥[২]

—'শৈশব অতিক্রান্ত হইলে চিত্ত মদনের কুসুমধনু দ্বারা আহত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া তাহার স্তনযুগল যেন ভয়েই নিষ্ক্রান্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে। ভ্রূযুগল কম্পিত হইতেছে, লোচন কর্ণকুহরের দিকে চলিয়াছে; (শরীরের) মধ্যপ্রদেশ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, বলি বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে, নিতম্বযুগল অলস হইয়া পড়িয়াছে।'

সংস্কৃত নাটকের প্রেমের কবিতাগুলি গান আকারেই সুর সংযোগে গাওয়া হইত। এই যুগের কবিতাগুলিকে গীতি-কবিতাই বলা যাইতে পারে।

সংস্কৃতে গাথা মানে গান, সেইদিক দিয়া বিচার করিলে বৌদ্ধ সূত্রপিটকের

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম পর্ব, পূর্বার্ধ—ডঃ সুকুমার সেন
২ অমরু শতক (সদুক্তিকর্ণামৃতে ২।২।৫ উদ্ধৃত)

অন্তর্গত 'থেরীগাথা'-গুলিকেও সঙ্গীত বলা যায়। এগুলিতে থেরীদের (সন্ন্যাসিনী) পূর্বজীবনের প্রেমের কথাও পাওয়া যায়।

অশোকের অনুশাসনের সমকালে একটি গুহালিপিতে একটি পদ্যে নিরাশ প্রণয়ীর উচ্ছ্বাসের বাণী বিধৃত হইয়াছে—

শুতনুক নম দেবদশিক্যি
তং কময়িথ বলনশেয়ে
দেবদিনে নম লুপদখে।[১]
—'সুতনুকা নামে দেবদাসিকা
তাহাকে ভালোবাসিয়াছে বারাণসেয়
দেবদিন্ন নামে রূপদক্ষ।'

গাহাসত্তসঈ (গাথাসপ্তশতী) শৃঙ্গাররসাত্মক কোশগ্রন্থ। বহু প্রেম-কবিতা গ্রন্থখানিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

পাঅ-পডিও ণ গণিও পিও ভণন্তো বি পি অপ্পিঅং ভণিও।
বচ্চন্তো বি ণ রুদ্ধো ভণ কস্স কএ কও মাণো।[২]

—'নায়ক পাদপতিত হইলেও তুমি তাহাকে গণ্য কর নাই, সে প্রিয় কথা বলিলেও তুমি অপ্রিয় কথা শুনাইয়াছ, সে চলিয়া গেলেও তুমি তাহাকে রোধ কর নাই,—বলত, কাহার জন্য মান করিয়াছ?'

অচ্ছীইং তা থইস্সং দোহিং বি হত্থেহিং বি তস্সিং দিট্ঠে।
অঙ্গং কলম্বকুসুমং ব পুলইঅং কহং ণু ঢক্কিস্সং॥[৩]

—'তিনি (প্রিয়) দৃষ্ট হইলে, আমি না হয় দুই হস্ত দ্বারা দুই নেত্র ঢাকিয়া ফেলিতাম, কিন্তু কদম্বকুসুমের ন্যায় পুলকিত সমগ্র শরীর কেমন করিয়া ঢাকিব?'

অবহট্ঠ-সাহিত্যেও বহু প্রেমের কবিতা পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণকে লইয়া নিছক প্রাকৃত প্রেমের কবিতা 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলে' সংগৃহীত হইতে দেখা যায়।

নবি মঞ্জরি লিজ্জিঅ চুঅই গাচ্ছে
পরিফুল্লিঅ কেসু-লআ বণ আচ্ছে।
জই ইত্থি দিগন্তর জাইহ কন্তা
কিঅ বম্মহ নত্থি কি নত্থি বসন্তা॥

১ Jogimara Cave Inscription. T. Bloch. "Caves and Inscription in Ramgarh Hill."

২ গাহাসত্তসঈ, ৪।৯০। ৩ গাহাসত্তসঈ, ৪।১৪।

—'নবমঞ্জরী ধরিয়াছে চুত গাছে, কিংশুক লতাবন পরিফুল্লিত হইয়াছে। যদি এতেও, হে কান্ত, দিগন্তর যাও তবে কি মন্মথ নাই, বসন্তও কি নাই।'

কৃষ্ণলীলা অবহট্‌ঠ (লৌকিক) কবিতার একটি বিশিষ্ট বিষয়। অবহট্‌ঠের সরণি ধরিয়াই জয়দেবের গান এবং তৎপরে বৈষ্ণব-পদাবলীর অগ্রগতি।

নীচের পুরাণো অবহট্‌ঠ কবিতাটি কৃষ্ণের ব্রজ-প্রেমলীলা ঘটিত—

রাহী দোহড়ি পঢ়ণ সুণি
হসিউ কণ্‌হ গোআল।
বৃন্দাবণ-ঘণ-কুঞ্জঘর
চলিউ কমণ রসাল ॥[১]

—'রাধিকার দোহাটি পড়া শুনিয়া কৃষ্ণগোপাল হাসিল, আর বৃন্দাবনের নিবিড় কুঞ্জগৃহে কেমন রসাল মনে চলিল।'

রামতর্কবাগীশ সঙ্কলিত "প্রাকৃত-কল্পতরুর" একটি কবিতাতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার আভাস দেখি—

রাহীউ বালাউ জুআণু কণ্‌হ।
কীলন্ত আলিঙ্গই কণ্‌হ গোবী।

—'রাধিকা নবযুবতী, কৃষ্ণ নবযুবক, কৃষ্ণ ও গোপী (রাধা) আলিঙ্গনাদি দ্বারা কেলি করিতেছেন।'

চর্যাপদে রূপকের ছলে "প্রেমসংগীত" দেখা যায় অনেকস্থলে। কাহ্‌ণুপাদের কয়েকটি প্রেমলীলা-রূপক-মণ্ডিত চর্যাকে সেকালের প্রেমের কবিতার নিদর্শন মনে করা যাইতে পারে। এগুলিকে স্বর-সংযোগে গাওয়া হইত।

তিনি ভুবন মই বাহিঅ হেলেঁ
হাউ সুতেলি মহাসুহলীডেঁ।
কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরীআলি
অন্তে কুলীনজন মাঝেঁ কাবালী।
তই লো ডোম্বী সঅল বিটলিউ
কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ।
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ।

১ গদাদাসের ছন্দোমঞ্জরীতে উদ্ধৃত।

কাহ্ন গাইউ কামচণ্ডালী
ডোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী ॥ (চর্যা ১৮)[১]

—'তিন ভুবন আমার দ্বারা হেলায় বাহিত হইল। আমি মহাসুখলীলায় (অথবা মহাসুখনীড়ে) শুইলাম। ওলো ডোমনী, তোর ভাবনাপনা কি রকম? এক পাশে কুলীন ব্যক্তি আর মাঝখানে কাবাড়ি। ওগো ডোমনী, তুই সকল নষ্ট করিলি। কাজ নাই, কারণ নাই, শশধর টলাইলি। কেহ কেহ তোকে বিরূপ বলে, (অথচ) বিদ্বজ্জনেরা তোকে কণ্ঠ থেকে ছাড়ে না। কাহ্ন গাহিতেছে কামচণ্ডালী (গীতি), ডোমিনীর আগে (অর্থাৎ বাড়া) ছিনাল নাই।'

চর্যাগীতির অনুরূপ ছিল 'বজ্রগীতি'। বজ্রগীতি গাওয়া হইত গুহ্য যৌগিক ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, "মণ্ডলচক্র"-এ। এই যোগিনী-চক্র-অনুষ্ঠানে হেরুককে জাগানো হইত বজ্রগীতি গাহিয়া। বজ্রগীতি গান, ভাষা বাঙ্গালা নয়, অবহট্‌ঠ। একটি বজ্রগীতির নমুনা দিতেছি—চারি যোগিনী অনুনয় করিতেছে উদাসীন-প্রণয়ী প্রভুকে প্রসন্ন করিবার জন্য, (যেন রাসে অন্তর্হিত কৃষ্ণকে গোপীরা ব্যাকুলভাবে ডাকিতেছে)।

কিচ্চে ণিচ্চঅ বিসাঅ গউ
লোঅ ণিমন্তিঅ কাই,
তহ বত্তা ণ জই সন্তরসি
উট্‌ঠহি সঅল বিসাই।
কজ্‌জ অপ্‌পাণ বি করিঅ পিঅ
মা কর সুণ্ণ বিচ্ছিত্ত,
ভব-ভঅ পড়িআ সঅল জণু
উট্‌ঠহি জোইণি-মিত্ত।
পুব্ব পইজ্জহ সন্তরসি
মা কর কাজ্জ-বিসাউ,
তইঅথ মিল্ল সঅল জণু
পতিঅউ জগ অবসাউ।

---

১ 'চর্যাগীতিপদাবলী', শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত

মিচ্ছেঁ মাণ বি মা করেহি পিঅ
উট্‌ঠহ সুন্নসহাব
কামহি জোইণি-বিন্দ তুই
ফিট্‌টউ অহবা ভাব।[১]

—'কাজ নিশ্চিত করিয়া লোক নিমন্ত্রণ করিয়া কেন বিষাদগত হইলে? তাহার বার্তা না যদি স্মরণ কর সকলে বিষাদে উঠিবে। নিজের কাজও করা হইবে। প্রিয়, শূন্য বিক্ষিপ্ত করিও না। ভবভয়ে পড়িয়াছে সকল জন, উঠেছে যোগিনী-মিত্র। পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ কর, কার্যবিষাদ করিও না, তোমার অর্থে মিলিয়াছে সকলজন। জগতের অবসাদ দূর হোক। মিছাই মান করিও না, প্রিয়। শূন্যস্বভাব তুমি উঠ। যোগিনীবৃন্দকে কামনা কর, অভব্যভাব দূর হোক।'[২]

জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ'কে একদিক হইতে বিচার করিলে প্রেমসংগীত বলা চলে। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় ও গঠন রীতি জয়দেবের গানের মতই। সঙ্গীত বা গান বলিতে যে ধরণের রচনাছাঁদ বুঝি তা সংস্কৃত সাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। ইহা প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকেই আগত। অবশ্য প্রয়োজনমত সংস্কৃত শ্লোকগুলি গাওয়া হইত। জয়দেবের আগে দুই এক ছত্রের 'ধুয়া' পদ দেখিতে পাই। জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যের গানগুলিই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃত গান। গানগুলির ভাষা সংস্কৃত হইলেও ছন্দ 'অবহট্‌ঠ' হইতে লওয়া। গীত-গোবিন্দই সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আর তাহার গানগুলিই সংস্কৃত ভাষার প্রকৃত গান। বলিতে গেলে জয়দেবের গান লইয়াই আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যের সূচনা।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ

॥ শ্রীরাধার প্রতি সখী ॥

(দেশবরাড়ী রাগ, রূপক তাল)

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়-দলনায় ॥
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ ধ্রু ॥[৩]

---

১ সাধনমালা ২৫৪। ২ চর্যাগীতি-পদাবলী, শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত; পৃষ্ঠা ২২-২৩
৩ বৈ. প. পৃষ্ঠা ১১

—'এখন মদনোদ্দীপক মলয়সমীর প্রবাহিত হইতেছে, বিরহিগণের বেদনাদায়ক কুসুমসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সখী, তোমার বিরহে 'বনমালী' অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।'

জয়দেবের সমকালীন অনেক সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা-সংগ্রহে রাধাকৃষ্ণের প্রেমসংগীত ও অন্যান্য প্রাকৃত প্রেমের কবিতা দেখা যায়।

চতুর্দশ শতাব্দের প্রথম পাদে মিথিলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা হরিহর সিংহের মন্ত্রী উমাপতি উপাধ্যায় সংস্কৃতে 'পারিজাতহরণ' নাটক রচনা করেন। তাহাতে প্রাচীন মৈথিল ভাষায় রচিত একুশটি গান আছে। মৈথিল ও বাঙ্গালা ভাষায়—বিশেষ করিয়া ব্রজবুলিতে—পদাবলী রচনার প্রথম নির্দেশ এইখানেই পাইতেছি। দূতী আসিয়া কৃষ্ণের কাছে নায়িকার বিরহদশার ছলে রূপ বর্ণনা করিতেছে।

(নটরাগেন গীতম্)

কি কহব মাধব তনিক বিশেষে
অপনহু তনু ধনি পাব কলেশে।
অপনুক আনন আরসি হেরি
চাদক ভরম কোপ কত বেরি।
ভরমহু নিঅ কর উর পর আনী
পরশ তরশ সরসীরুহ জানী।
চিকুরনিকর নিঅ নয়ন নিহারী
জলধর ধার জানী হিঅহারী।
আপন বচন পিকরব অনুমানে
হরি হরি তেহু পরিতেজয় পরাণে।
মাধব অবহু করিঅ সমধানে
সুপুরুষ নিঠুর না রহয় নিদানে।
সুমতি উমাপতি ভণ পরিমাণে
মাহেশরিদেই হিন্দুপতি জানে।

—'মাধব, তাহার অবস্থা কি বলিব।
ধনী আপনার দেহ লইয়া ক্লেশ পাইতেছে।

আরসিতে আপন মুখ দেখিয়া চাঁদ মনে করিয়া
কতবার রাগ করে।
ভ্রমবশে নিজ হাত বুকে তুলিয়া পদ্ম মনে করিয়া সে
স্পর্শে ত্রাস পায়। নিজের কেশপাশ চোখে পড়িলে
মেঘজাল মনে করিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠে।
আপন বচন কুহুধ্বনি বলিয়া অনুমান করে আর
হরি হরি, তখনি যেন প্রাণ বাহির হইতে চায়।
মাধব, এখনই সমাধান করিতে হইবে।
সুপুরুষ কখনো শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর রহিতে পারেনা।
সুমন্ত্রী উমাপতি যথার্থ বলিয়াছেন
মাহেশ্বরী দেবীর পতি হিন্দুপতি (ইহার মর্ম) জানেন।'[১]

বড়ু চণ্ডীদাসের কবিতাগুলিও তান-লয়-স্বর সংযোগে গাওয়া হইত। বাঁশীর ধ্বনি শুনিয়া রাধার মর্মস্পর্শী ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে এই পদটিতে—

(কেদাররাগ, রূপক)

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।…
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে।
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী।…
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্নু অভিলাসে।
বাসলী-শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥[২]

১ ডঃ সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্দ্ধ পৃ. ৮৮।
১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বংশীখণ্ড। বৈ. প. পৃ-৩২।

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সংগীত ও চণ্ডীদাসের পদাবলীও রাধাকৃষ্ণের প্রেমসংগীত বলা যায়।

বিদ্যাপতির ভাবোল্লাসের এই পদটি সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ একটি প্রেম-গীতি হিসাবে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিস ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল
টুটল সবঁহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পঁচবান অব লাখবান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অবহণ জবহুঁ মোহে পরি হোয়ল
তবহি মানঁভু নিজ দেহা
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা।[১]

—'আমার ভাগ্যে আজ রাত্রি প্রভাত হইল। প্রিয়তমের চান্দমুখ দেখিলাম। জীবন যৌবন সফল করিয়া মানিলাম। দশদিক্ নির্দ্বন্দ্ব হইল। আজ আমার গৃহকে গৃহ বলিয়া দেহকে দেহ বলিয়া মানিয়া লইলাম। আজ বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হইল, সমস্ত সন্দেহ মিটিল। সেই কোকিল এখন লাখে লাখে ডাকুক, লক্ষ চন্দ্র উদিত হউক, পঞ্চবাণ এখন লক্ষবাণ হউক, মন্দ মলয় পবন প্রবাহিত হউক। এখন যখন আমার পক্ষে এইরূপ হইল, তখন নিজ দেহকে সার্থক মানিলাম। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—অল্প ভাগ্য নহ, ধন্য ধন্য তোমার নতুন প্রেম।'

১ পদকল্পতরু ১১৯৬।

আবার চণ্ডীদাসের পদে——

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥

চৈতন্য-পরবর্তী কালে মধুক্ষরা কাব্য-প্রবাহ গভীর খাতে বহমান। শ্রীচৈতন্যদেবের অলোকসামান্য জীবনলীলা ভক্ত ও কবিদের অন্তরে জাগাইয়াছিল সীমাহীন আবেগ ও প্রেরণা। বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার মূল্য অপরিসীম।

প্রাচীন লিরিক বা গীতিকবিতা ধর্মের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়াছিল। অনেক ধর্মসম্প্রদায় গীতিকবিতার মাধ্যমে নিজেদের সাধন-ভজনের বা ধর্মতত্ত্বের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতেও বৈষ্ণব ধর্মমত ও ব্যক্তিগত সগুণ ঈশ্বরের কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে।

॥ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রেমকবিতা ॥

সমাজস্থ নরনারীর মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর প্রেমসম্পর্ক বিদ্যমান। এই প্রেম-সম্পর্ককে মোটামুটি দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দাম্পত্য প্রেম অর্থাৎ বিবাহিত নরনারীর বৈধ প্রেম-সম্পর্ক ও অদাম্পত্য প্রেম অর্থাৎ নরনারীর অবৈধ প্রেম-সম্পর্ক। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সব রকমের প্রেম-সম্পর্কের উল্লেখ আছে। এই সূত্র ধরিয়াই সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রেও নায়িকাকে 'স্বকীয়া' 'পরকীয়া' ও 'সাধারণী' এই তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

দাম্পত্যপ্রেম

বৈদিক সাহিত্যে দেখি স্ত্রী স্বামীর 'ধর্মপত্নী', সংসারের কর্ত্রী, সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী। সুখী গার্হস্থ্যজীবনই সেকালের সংসার জীবনের আদর্শ ছিল।

গৃহে বিবাহিতা নারীর স্থান ছিল সকলের ঊর্ধ্বে। সমাজের ছোটবড় সকল কাজেই তার অধিকার ছিল। ধর্মশাস্ত্রেও বিবাহিত নারীর মর্যাদা স্বীকৃত, স্ত্রীর পাতিব্রত্য ও সতীত্বের উপর জোর দেওয়া হইত। ব্যভিচারিণী নারীর কঠোর শাস্তির বিধান করা হইত।

রামায়ণে সীতা চরিত্রের মধ্য দিয়া দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। স্বামী রামচন্দ্র বিনা দোষে সীতাকে বিসর্জন দিলেন। সীতা কিন্তু নিজের ভাগ্যের উপরই দোষারোপ করিলেন। তিনি রামের দোষ একটুও দিলেন না। কালিদাসের রঘুবংশে দেখি বাল্মিকী সীতাদেবীকে বলিতেছেন—

"ধুরি স্থিতা ত্বং পতিদেবতানাং কিং তন্ন যেনাসি মমানুকম্প্যা।"

—'তুমি পতিব্রতাদের শিরোমণি। আর কি চাই, যাহাতে তোমার উপর আমার অনুকম্পা হয়।'

ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'ও অনুরূপ ভাব লক্ষ্য করি।

প্রকৃত্যৈব প্রিয়া সীতা রামস্যাসীন্মহাত্মনঃ।
প্রিয়ভাবঃ স তু তয়া স্বগুণৈরেব বর্দ্ধিতঃ॥
তথৈব রামঃ সীতায়াঃ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়োঽভবৎ।
হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরম্।

—'সীতাদেবী, স্বভাবতই রামচন্দ্রের প্রিয়তমা ছিলেন, কিন্তু সীতাদেবী সেই প্রিয়ভাবটা নিজ গুণেই বাড়াইয়াছিলেন। সেইরূপ রামও সীতার প্রাণ হইতেও প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ই পরস্পরের প্রণয় জানিত।'

মহাভারতের 'সাবিত্রী উপাখ্যানে' সাবিত্রীর সতীত্ব ও ত্যাগ দেখানো হইয়াছে। 'দময়ন্তী' আখ্যানও পাতিব্রত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত দক্ষকন্যা সতীর কাহিনী উল্লেখ করা উচিত। সতীর মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। দক্ষ প্রজাপতি শিব-নিন্দা করিলেন। স্বামীর নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষোভে ও রোষে সতী যজ্ঞাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। হিন্দুসমাজে সতীসাধ্বী নারীর আদর্শ হিসাবে এখনো তিনি পূজিতা হইয়া আসিতেছেন।

মহাভারতের শকুন্তলা-কাহিনী অবলম্বন করিয়া মহাকবি কালিদাস শকুন্তলা নাটক লিখিয়াছিলেন—ইহাতে দাম্পত্য প্রেমের পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। যেমন, মহর্ষি কণ্বের উপদেশ (শকুন্তলার প্রতি)—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখী-বৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মা স্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্টং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামা কুলস্যাধয়ঃ॥[১]

—'গুরুজনদিগের সেবা করিয়া সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীর মতো আচরণ করিও। খারাপ ব্যবহার পাইলেও ক্রোধবশে স্বামীর প্রতিকূল আচরণ করিও না। পরিজনদের প্রতি অত্যন্ত মুক্তহস্ত হইও, নানাবিধ ভোগের মধ্যে থাকিলেও গর্ববোধ করিও না। এইভাবে চলিলে অল্পবয়সী মেয়েরাও গৃহিণীর গৌরব লাভ করে। যাহারা বিপরীত আচরণ করে তাহারা সংসারে ব্যাধির মত।'

কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' কাব্যেও দাম্পত্য-প্রেমের নিখুঁত আদর্শ দেখা যায়—

বধূং দ্বিজঃ প্রাহ তবৈষ বৎসে বহ্নির্বিবাহং প্রতি কর্মসাক্ষী।
শিবেন ভর্ত্রা সহ ধর্মচর্যা কার্য্যা ত্বয়া মুক্তবিচারয়েতি॥[২]

—'পুরোহিত ব্রাহ্মণ বধূ উমাকে বলিল, 'বৎসে, তোমার বিবাহে অগ্নি কর্মসাক্ষী রহিলেন। দ্বিধা ছাড়িয়া শিবের সহিত ধর্মচর্য্যা তোমার কর্তব্য।'

গাথাসপ্তশতীতেও নরনারীর দাম্পত্য-প্রেমের চিত্র মেলে। যেমন,

পাঅপডিঅস্স পইণো পুট্‌ঠিং পুত্তে সমারুহন্তম্মি।
দড়মণ্ণুদূণ্ণিআএ বি হাসো ঘরিণীএ ণেক্কন্তো॥[৩]

—'পাদপতিত পতির পৃষ্ঠে পুত্রকে আরোহণ করিতে দেখিয়া কোপবশত অত্যন্ত দুঃখিতা গৃহিণীরও হাসি নিষ্ক্রান্ত হইল।'

অপর একটি কবিতায় দেখি—

সন্তমসন্তং দুক্খং সুহং চ ঘরস্স জাণন্তি।
তা পুত্তঅ মহিলাও সেসাওঁ জরা মণুস্সাণং।[৪]

—'হে পুত্রক, যে বধূরা বাড়ীর সকলের সদসৎ সুখ-দুঃখের বিচার করিয়া চলিতে জানে—তাহারাই মহিলাপদবাচ্য, অন্যান্য রমণীরা কেবল মানুষের জরাসদৃশী (কুলক্ষয়কারিণী)।'

১ শকুন্তলে ৪।২০ ২ কুমার-৭।৮২
৩ গাহাসত্তসঈ ১।১১ ৪ গাহাসত্তসঈ ৬।১২

মহাকবি ভবভূতি তাঁহার "উত্তররামচরিত" নাটকে দাম্পত্য-প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সীতাকে বিসর্জন দিলেও পত্নী সীতার প্রতি রামের ভালবাসা একটুকুও ক্ষুন্ন হয় নাই। সব রকম অবস্থাতেই এক রকম ছিল।

অন্যত্র শ্লোকটি একবার উদ্ধৃত হইয়াছে।

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং তস্য সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে॥[১]

—'যে বস্তু সুখ ও দুঃখের অভিন্ন আশ্রয় এবং সকল অবস্থাতেই অনুকূল, যেখানে পরিশ্রান্ত হৃদয়ের বিশ্রাম হয়, যাহার প্রতি অনুরাগকে বার্ধক্যও হরণ করিতে পারেনা এবং কালে লজ্জার আবরণের অভাব হইলে যাহা অনুরাগের পরিপক্ক উৎকৃষ্ট অংশে অবস্থান করে, সেই সজ্জনের নিরবচ্ছিন্ন সেই মঙ্গলটি অতিকষ্টেই পাওয়া যায়।'

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বিবাহিত নারীকে 'স্বীয়া' বা 'স্বস্ত্রী' বলা হইয়াছে—

'লজ্জাপজ্জত্তপসাহণাইং পরভত্তিণিপ্পিবাসাইং।
অবিণঅদুম্মেহাইং ধণ্ণাণ ঘরে কলত্তাইং॥[২]

রূপ গোস্বামীর বৈষ্ণবরসশাস্ত্র 'উজ্জ্বলনীলমণিতে' রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি বিবাহিতা কৃষ্ণবল্লভাদেব 'স্বকীয়া' বলা হইয়াছে—

স্বকীয়াঃ পরকীয়াশ্চ দ্বিধা তাঃ পরিকীর্তিতাঃ॥
করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইব॥[৩]

অদাম্পত্য প্রেম

অদাম্পত্য প্রেম বলিতে বুঝি অবিবাহিতা নারীর—১। গর্হিত সম্পর্ক; ২। অন্যান্য সম্পর্কের পুরুষের সহিত প্রেম। রমণীর পরপুরুষের সহিত প্রেম,

১ উত্তররামচরিতের প্রথমাঙ্কে

২ লজ্জা যাহার পর্যাপ্ত ভূষণ, পরপুরুষের আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অবিনয়ে যিনি অনভিজ্ঞা, এইরূপ সৌভাগ্যবতী রমণী ভাগ্যবানের ঘরে থাকেন।

৩ শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণ দ্বিবিধা—স্বকীয়া ও পরকীয়া। যাঁহারা পাণিগ্রহণের রীতি অনুসারে প্রাপ্তা, পতির আজ্ঞানুবর্তিনী এবং পাতিব্রত্য ধর্ম হইতে কিছুতেই বিচলিত হন না, রসশাস্ত্রে তাহাদিগকে স্বকীয়া নায়িকা বলে।

উজ্জ্বলনীলমণি—হরিপ্রিয়া প্রঃ ৩।৩-৪।

ব্যভিচারী প্রেম, অবিবাহিতা কুমারীর প্রেম, বারবণিতার প্রেম। এই সমস্ত প্রেম সম্পর্ক লইয়া প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বহু প্রেমগীতি রচিত হইয়াছে, নব্য ভারতীয় ভাষাতেও ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

প্রথমেই নিষিদ্ধ সম্পর্কের কথা বলি। বৈদিক সাহিত্য মূলতঃ ধর্মগ্রন্থ, তবু দুই-একটি আখ্যানে প্রেম-সম্পর্কের কথা আছে, ঋগ্‌বেদের যম-যমী সংবাদে দেখা যায় যম ও যমী হইতেছে ভ্রাতা ও ভগিনী, যমী যমকে বিবাহ করিতে বলিতেছে আর যম ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক তুলিয়া বিবাহে অসম্মত হইতেছে।

প্রাকৃত প্রেম-কবিতার কোশকাব্য হালের 'গাথাসপ্তশতী' হইতে দেবর-ভ্রাতৃজায়ার নিষিদ্ধ প্রেম-সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি—

দিঅরস্‌স অসুদ্ধমণস্‌স কুলবহু নিঅঅকুড্ডলিহিআইং।
দিঅহং কহেই রামাণুলগ্‌গসোমিত্তিচরিআইং ॥[১]

—দূষিতচিত্ত দেবরের নিকট কুলবধূ নিজের (গৃহ) কুড্যে চিত্রিত বা লিখিত রামানুরক্ত লক্ষণের চরিতগুলি দিবস ব্যাপিয়া বর্ণনা করিতেছে।'

অপর একটি গাথায় দেখি—

পুটি ঠং পুসসু কিসোঅরি পডোহরঙ্কোল্লপত্তচিত্তলিঅং।
ছেআহিং দিঅরজাআহিং উজ্জুএ মা কলিজ্জিহিসি ॥[২]

—'হে কৃশোদরি, বাড়ীর পশ্চাদ্‌গৃহের সন্নিহিত অঙ্কোটবৃক্ষের পত্রদ্বারা চিত্রিত তোমার পৃষ্ঠদেশ পুছিয়া ফেল—নচেৎ হে সরলে, তোমার চতুর দেবরপত্নীরা তোমাকে বুঝিয়া ফেলিবে।'

আর্য্যাসপ্তশতীতে দেবর-ভ্রাতৃবধূর অবৈধ সম্পর্ক লইয়া কয়েকটি কবিতা আছে, এখানে একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

দলিতে পলালপুঞ্জে বৃষভং পরিভবতি গৃহপতৌ কুপিতে।
নিভৃতনিভালিতবদনৌ হলিকবধূদেবরৌ হসতঃ ॥[৩]

—'খড়ের গাদাটি বিদলিত দেখিয়া কুপিত গৃহপতি বৃষভকে মারিতে থাকিলে হলিকবধূ ও তাহার দেবর পরস্পর মুখ চাহিয়া হাসিতে লাগিল।'

চর্যাগীতিকায় নিষিদ্ধ প্রেমের উল্লেখ দেখা যায়—

আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ ॥[৪]

১ গাহাসত্তসঈ ১।৩৫ ২ গাহাসত্তসঈ ৪।১৩
৩ আর্য্যাসপ্তশতী ৩২০ ৪ ১০ সংখ্যক চর্যা।

'ওলো ডোমনী, তোর সঙ্গে করিব আমি সাঙ্গা। (আমি) কাহ্ন কাবাড়ি যোগী লাঙ্গা।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা মাতুলানী সম্পর্কের বা অগম্যাগমন দোষের কথা উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিতেছে।' কৃষ্ণের সহিত রাধার মাতুলানী সম্পর্ক সত্ত্বেও প্রথমত কৃষ্ণের আগ্রহে ও পরে রাধার প্রার্থনায় উভয়ের দৈহিক সম্ভোগ ঘটে। অগম্যাগমনের এই অবৈধ কাহিনীর কথা কবি বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। শুধুমাত্র দানখণ্ডেই অন্তত চৌদ্দবার ইহার উল্লেখ আছে। যেমন:

লাজ না বাসসি তোএঁ গোকুলকাহ্ন।
সোদর মাউলানীত সাধ মহাদান॥
হেনক বচন, না বোলকাহ্নাঞি, তোর বাপে নাহিঁ লাজ।
সোদর মাউলানীত, ভোলে পড়িলাহা, দেখিআঁ রূপঙ্গ কাজ॥[১]

দুর্লভ মল্লিক রচিত গোবিন্দচন্দ্র গীতে আছে—

সং মাএ ভজিব তোরে দেখিয়া জোয়ান।
তাহার কারণে তোহ্মি পাইবা অপমান॥

দেবী গৌরীর রূপে মুগ্ধ হইলে হাড়িপার পুত্র গাভুর সিদ্ধা এইভাবে অভিশপ্ত হইয়াছিল।

বিজয়গুপ্তের ('পদ্মাপুরাণ') 'মনসামঙ্গলে' নিজ মানসকন্যা মনসাকে দেখিয়া শিবের উত্তেজনা—

কামভাবে মহাদেব বলে অনুচিত।
লজ্জায় বিকল পদ্মা শুনিতে কুৎসিত॥
নাকে হাত দিয়া পদ্মা বলে রাম রাম।
শিবের চরণে পড়ি করিল প্রণাম॥
পদ্মা বলে বাপ তুমি পরম কারণ।
না বুঝিয়া বল কেন কুৎসিত বচন॥[২]

---

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, দানখণ্ড ৪৮, ৯৭

২ প্যারীমোহন দাসগুপ্ত সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

বিবাহিতা রমণীর পরপুরুষের সহিত প্রেম

অথর্ববেদের একটি সূক্তে বিবাহিতা রমণীর পতি বাঁচিয়া থাকিলেও ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে অন্য পতি-গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারতে অসতী নারীর বহু কাহিনীর সন্ধান মেলে। বাৎসায়নের কামসূত্রে 'অসতী' নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন প্রাকৃত কোষকাব্য গাথা-সপ্তশতীতেও ব্যভিচারিণীর প্রেমের গাথা পাওয়া যায়।

পই-পুরও ব্বিঅ ণিজ্‌জই বিচ্ছুদট্‌ঠোত্তি জারবেজ্জঘরং।
ণিউণ-সহী-কর-ধারিঅ-ভুঅ-জুঅলন্দোলিণী বালা ॥[১]

—'বৃশ্চিকদংশনে কাতর হইয়াছে এই ছলে সেই বালা পতিসমীপেই চতুর সখীগণ দ্বারা ধৃত অবস্থায় ভুজযুগল আন্দোলিত করিতে করিতে জার-বৈদ্যের গৃহে নীত হইতেছে।'

গহবই গওম্হ সরণং রক্‌খসু এঅংতি অডঅণা ভণিরী
সহসাগঅস্স তুরিঅং পইণো ব্বিঅ জারমপ্পেই ॥[২]

—'হে গৃহস্বামিন্, এই পুরুষটি আমাদের শরণাগত হইয়াছে, তাহাকে রক্ষা কর, এইরূপ বলিয়া অসতী (পত্নী) সহসাগত পতির নিকট সত্বর জারকে সমর্পণ করিল।'

সদুক্তি-কর্ণামৃতে পরপুরুষের সহিত বিবাহিতা রমণীর প্রেমের দৃষ্টান্ত মেলে। পদটি 'সাহিত্য-দর্পণে' উদ্ধৃত।

দৃষ্টিং হে প্রতিবেশিনি ক্ষণমিহাপ্যস্মদ্‌গৃহে দাস্যসি
প্রায়েণাস্য শিশোঃ পিতা ন বিরসাঃ কৌপীরপঃ পাস্যতি।
একাকিন্যপি যামি সত্বরমিতঃ স্রোতস্তমালাকুলং
নীরন্ধ্রাস্তনুমালিখন্তু জরঠচ্ছেদা নলগ্রন্থয়ঃ ॥[৩]

—'হে প্রতিবেশিনী, কিছু সময় আমাদের ঘরের দিকে দৃষ্টি দিও, এই শিশুর পিতা কূপের জল পান করিতে পারে না। একাকিনী আমি তমাল-বৃক্ষপূর্ণ স্রোতস্বিনীতীরে শীঘ্রই যাইব। নিশ্ছিদ্র কঠিন নল খাগড়ার গ্রন্থিগুলি শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিবে।'

১ গাহাসত্তসঈ ৩।৩৭। ২ গাহাসত্তসঈ ৩।৯৭।
৩ সা. দ. ৪র্থ পরিচ্ছেদ (৪।৯); সদুক্তিক ২।১৪।১।

চর্যাগীতি পদাবলীতে পরনারীর সহিত প্রেমলীলার রূপকে অধ্যাত্ম সাধনার কথা বলা হইয়াছে। যেমন,

'সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেম্ম রাতি পোহাইলী।'

—'শবর নাগর, নৈরামণি নাগরী, প্রেমে রাতি পোহাইল'।[১]

অবিবাহিতা যুবতী কুমারীর প্রেম

মহাভারতের কর্ণকুন্তী সংবাদে কন্যার প্রেমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকে দেখা যায়, নায়ক রাজার পরিণীতা ও ভোগ্যা স্ত্রী ছিল। যাহার অবিবাহিতা যুবতী ভগ্নীকে রাজা ভোগ্যা পত্নীরূপে গ্রহণ করিত, তাহাকেই 'শকার' বলিত, সেই হইত নগর-কোটাল। এই সম্বন্ধে গাথাসপ্তশতী হইতে দুইটি গাথা উদ্ধৃত করিলাম—

কারিমমাণন্দবড়ং ভামিজ্জন্তং বহুঅ সহিআহিং।

পেচ্ছই কুমারীজারো হাসুম্মিসেস্হিঁ অচ্ছিহিং॥[২]

—'কুমারীর জার সখীগণ দ্বারা ঘূর্ণ্যমান বধূর কৃত্রিম আনন্দপট হাসোন্মিশ্র নয়নে দেখিতেছে।'

মণ্ণে আঅণ্ণন্তা আসণ্ণবিআহমঙ্গলুগ্গাইং

তেহিং জুআণেহিং সমং হসন্তি মং বেঅসকুডঙ্গা॥[৩]

—'আমার মনে হয় যে, সেই যুবকগণের সঙ্গে বেতসনিকুঞ্জসমূহও আমার আসন্ন বিবাহের মঙ্গলগীতি শ্রবণ করিয়া আমাকে উপহাস করিতেছে।'

চর্যাগীতিতে বালিকার প্রেমের রূপকে অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিঁএ কুরাড়ী

কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে সুঘাড়ী॥

ছাড় ছাড় মাআ-মোহা বিষমে দুন্দোলী।

মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী॥[৪]

—'গগণে গগণে তৃতীয় বৃক্ষ বাটিকা হৃদয়ে কুঠার,

কণ্ঠে লগ্ন নৈরামণি বালিকা, জাগিয়া থাকিলে মঙ্গল।

ছাড় ছাড় মায়া-মোহ (রূপ) বিষম গ্রন্থি।

মহাসুখে বিলাস করেন শবর শূন্য (অবরোধ বা মেয়েকে) লইয়া।'

---

১ ২৮নং চর্যা ২ গাহাসত্তসঈ ৫।৫৭

৩ গাহাসত্তসঈ ৭।৪৩ ৪ ৫০ নং চর্যা

বারবণিতার প্রেম

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বহুভোগ্যা কলানিপুণা বারাঙ্গনার উল্লেখ আছে। পালি সাহিত্যেও বাসবদত্তা শ্রীমতী প্রভৃতি রাজনটীর পরিচয় মিলে, সমাজে তাহাদের ঘৃণা করা হইত না, তাহাদের সহানুভূতির চক্ষে দেখা হইত। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে বহুগুণান্বিতা বেশ্যা বসন্তসেনা ও ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। শেষে তাহাকে "বধূর" সম্মান দেওয়া হইয়াছে। বহুনায়কনিষ্ঠা বারবণিতা দুইপ্রকার—অনুরক্তা ও বিরক্তা। মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রতি অনুরক্তা। 'লটক-মেলকে' মদনমঞ্জরী বিরক্তা।

'গাহাসত্তসঈ'তে বারবণিতার উল্লেখ দেখা যায়। যেমন,

ণন্দন্তু সুরঅসুহরসতহ্ণাবহ রাইং সঅললোঅস্স
বহুকেঅবমগ্গবিণিম্মিআইং বেসাণং পেম্মাইং ॥[১]

—'সকল লোকের সুরতসুখরসের তৃষ্ণাপহারক এবং বহু প্রকার কৈতবমার্গ দ্বারা রচিত বেশ্যাজনদের প্রেম রসিকজনের অভিনন্দনীয় হোক।'

কে উব্বরিআ কে ইহ ণ খণ্ডিয়া কে ণ লুত্ত-গুরু-বিহবা।
ণহরাইং বেসিণিও গণনা-রেহা উব বহন্তি ॥[২]

—'কত (পুরুষ) অত্যন্ত আকৃষ্ট না হইয়াছে, কত পুরুষ খণ্ডিত ভগ্নব্রত না হইয়াছে, আবার কত পুরুষ বিপুল বিভবের লোপ না করিয়াছে—'বারবণিতা যে গণনা-রেখার মত নখ (ক্ষত) গুলি বহন করিতেছে।'

সদুক্তি-কর্ণামৃতে বেশ্যাপ্রেমের বর্ণনা করা হইয়াছে—

সমুদ্রবীচীব চলস্বভাবা
সন্ধ্যাভ্রলেখেব মুহূর্তরাগা।
বেশ্যা কৃতার্থা পুরুষং হৃতস্বং
নিষ্পীড়িতালক্তকবদ্ জহাতি ॥[৩]

'সমুদ্রতরঙ্গের মত চঞ্চলস্বভাবা, সান্ধ্যমেঘের মত ক্ষণমাত্র রাগ-প্রদর্শনকারিণী কৃতার্থা বেশ্যা নিঙড়ান আল্তার মত পুরুষের ধন হরণ করিয়া পরিত্যাগ করে।'

১ গাহাসত্তসঈ ২।৫৩
২ গাহাসত্তসঈ ৫।৭৪
৩ সদুক্তি-কর্ণামৃত ২।১৭।৫

দাসী-সখী-দূতী প্রভৃতির প্রেম

বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে নায়িকাদের দাসীর প্রেমকাহিনীও দেখা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবালা-সত্যকামের কাহিনীতে দেখি—ভর্তৃহীনা জাবালা বহুজনের পরিচর্যা করিয়া সত্যকামকে লাভ করিয়াছেন। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকে বসন্তসেনার দাসী মদনিকার সহিত শর্বিলকের প্রেমকাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। সখী ও দূতীরা নায়িকাকে সাহায্য করিতে গিয়া নিজেরাই প্রেমের পাত্রী হইয়া পড়িত। সদুক্তি-কর্ণামৃতের একটি শ্লোকে এই ভাবের একটি কবিতা দেখি, নায়িকা দূতীকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে—

নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং নির্মৃষ্টরাগোঽধরো
নেত্রে দূরমঞ্জনে পুলকিতা তন্বী তবেয়ং তনুঃ।
মিথ্যাবাদিনি দূতি বান্ধবজনস্যাজ্ঞাতপীড়াগমে
বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি স পুনস্তস্যাধমস্যান্তিকম্॥[১]

—'তোমার স্তনতট হইতে চন্দন মুছিয়া গিয়াছে, অধরের রাগ চলিয়া গিয়াছে, নেত্র হইতে অঞ্জন দূরীভূত হইয়াছে, তোমার এই তন্বী তনু পুলকিত হইয়াছে; হে মিথ্যাবাদিনী দূতী, তুমি বন্ধুজনের দুঃখ বোঝ না, তুমি বাপীতে স্নান করিতে গিয়াছিলে, সেই অধমের (নায়কের) নিকট যাও নাই (অর্থাৎ তুমি সেই নায়কের নিকট গিয়াছিলে, তাই তোমার এই দশা)।'

রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বল-নীলমণি'তে দেখি শ্রীরাধা তাঁহার সখীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য পাঠাইতেছেন। শ্রীরাধার কোন সখী বলিতেছে—

'প্রবিশতি হরিরেষ প্রেক্ষ্য নৌ হৃষ্টচেতাঃ সখি, সপদি মুধা ত্বং সম্ভ্রমাৎ প্রযাসীঃ। পৃথুভুজপরিঘাভ্যাং স্কন্ধয়োরপিতাভ্যাং। তটভুবি সুখমাবাং মণ্ডিতে পর্য্যটাবঃ।'[২]

'হে সখি, আমাদের দুইজনকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হরি এই দিকে আসিতেছেন, তুমি বৃথা সাধ্বস করিয়া চলিয়া যাইও না, উঁহার পরিঘতুল্য বিশাল বাহুদ্বয় স্কন্দদেশে অর্পণ করিয়া আমরা সুখে যমুনাপুলিনে পর্যটন করিব।'

কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখি শ্রীরাধা তাঁহার সখী-দিগকে কৃষ্ণসমীপে পাঠাইতেছেন।

১ সদুক্তিকর্ণামৃত ২।১১৩।১   ২ উজ্জ্বল-নীলমণি, সখীভেদপ্রকরণ ৮।২৩

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মসুখসঙ্গম হইতে কোটি সুখ পায়॥[১]

প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের রীতি অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণবরসশাস্ত্র-প্রণেতা রূপগোস্বামী কৃষ্ণপ্রেয়সী নায়িকাদের 'স্বকীয়া' ও 'পরকীয়া' ভেদে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। 'সৈরিন্ধ্রী' বা সাধারণী নায়িকাতেও কৃষ্ণরতি থাকায় "পরকীয়াবৎ" বলিয়া তাহাকে পরকীয়া শ্রেণীতে ধরিয়াছেন। কৃষ্ণরতির প্রকর্ষের দিক হইতে বল্লভাগণকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—সাধারণী, সমর্থা ও সমঞ্জসা।

ঐশ্বরিক প্রেম

ভারতীয় ভাবনায় যুবক-যুবতী পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ বা প্রেম অনুভব করে, আর কোন ভক্ত ভগবানের প্রতি যে প্রেম অনুভব করে—এই দুইটির মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। যা কিছু পার্থক্য আছে, তাহা হইতেছে আবেগের সামগ্রী লইয়া। প্রেমের মধ্যে কোন ভোগেচ্ছা বা ইন্দ্রিয়সুখের বাঞ্ছা নাই, ইহা হইতেছে মানসিক আবেগের আনন্দোল্লাস। সৌন্দর্য হইতেই প্রেমের সৃষ্টি হয়। একক্ষেত্রে মানবের সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠব আবার অন্যদিকে ভগবানের মূর্তির সুষমা, যাহা ভক্তজনের মনে প্রেমানুভূতির সৃষ্টি করে। তথাপি আমরা আবেগের বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য করিয়া পার্থক্য নির্ণয় করি।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর নানা দেশে মানবীয় আকাঙ্ক্ষাকেই একটু অদলবদল করিয়া ধর্ম-সাধনায় প্রয়োগ করা হইত। খ্রীষ্টান সাধু-সন্তগণ নিজেদের খ্রীষ্টের দয়িতা কল্পনা করিয়া আদিরসের মধ্যেই সাধনার সফলতা খুঁজিয়া পাইতেন। সেণ্ট জন্ (St. John) এইরূপ আবেগ ও আর্তির বশে বলিয়াছিলেন—

'It may please Thee to unite me to Thyself making my soul Thy bride. I will rejoice in nothing till I am in Thine arms.'[২]

---

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ। ২ St. John of the Cross.

সেণ্ট থেরেসা, সেণ্ট ক্যাথারিন প্রভৃতি ভক্তিমতী প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলারাও আদিরসের মধ্যে খ্রীষ্টকে পতিভাবে ভজনা করিতেন। খ্রীষ্টপূর্ব যুগের একজন তত্ত্বরসিক ছিলেন প্লাটিনাস; তিনি বলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষ প্রেমের যোগে যুক্ত হইতে পারে। প্রেমের দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়, চিন্তার দ্বারা নহে। বাইবেলের "সলোমন-গীতিকা" (The Song of Solomon, Old Testament) কি আদিরসার্দ্র নহে? 'By night on my bed I sought him whom my soul loveth : I sought him but I found him not.' ইহা তো চিরন্তনী মর্মস্পর্শিণী বিরহ-গীতি, ইহা তো মর্ত্যপ্রেমের বাসনা-রঞ্জিত। তাঁহারা মধুরভাবে ভগবানের আরাধনা করিতেন।

'In the growing intensity of these solitary meditations she thought and spoke of Christ as her heavenly lover, she exchanged hearts with Him, saw herself in vision, married to Him.'[১]

আলোয়ার-সম্প্রদায়

দক্ষিণভারত বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভক্তি-সাধনার কেন্দ্র, ভক্তিদর্শনের উৎসভূমি। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতেই এই অঞ্চলে তামিলভাষী আলোয়ার নামক ভক্ত-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। তামিল ভাষায় রচিত ইহাদের প্রেমভক্তি-বিষয়ক অতি উৎকৃষ্ট ভজন-গীতিকা আছে, যাহার ভক্তির গভীরতা, প্রেমের আর্তি, শিল্পসৃষ্টির অপূর্ব নিপুণতা বাঙ্গালার মহাজন পদাবলীর (বৈষ্ণব পদাবলীর) সহিত তুলনীয়। আলোয়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা যেমন কৃষ্ণের গোপীলীলা স্মরণ মনন কীর্তন করিতেন, তেমনি আবার কৃষ্ণকে পরম দয়িত-রূপে এবং আপনাদিগকে কৃষ্ণ-প্রেয়সীরূপে কল্পনা করিয়া অনেক উৎকৃষ্ট গান লিখিয়াছিলেন। এইরূপ সাধনার ইঙ্গিত মধ্য-যুগের সাধিকা মীরাবাঈএর বহু ভজনে পাওয়া যায়। মীরাও রাধার মত "সব তেয়াগিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী" এই ধরনের বহু উক্তি করিয়াছেন। "মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর"—এইরূপ ভণিতা দিয়া মীরাবাঈ প্রায় পদেই কৃষ্ণের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন—যেখানে তিনি ও রাধা এক হইয়া গিয়াছেন।

১ Will Durant—The Renaissance, P. 63

সুফী-সম্প্রদায়

ইরানের সুফীসাধকগণও স্বর্গ কামনা করেন নাই, মুক্তি চাহেন নাই, শুধু ভগবানকে ভালবাসার মধ্য দিয়া পাইতে চাহিয়াছিলেন। ইহারাও ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কটি মর্ত্য প্রেমিক-প্রেমিকার (মাশুক-আসিক) উত্তপ্ত কামনারাগের মধ্য দিয়াই পাইতে চাহিয়াছিলেন। স্মরণ-কীর্ত্তন-নর্তনের মধ্য দিয়া সুফীগণ ভগবানের প্রেমগান করিতেন; কেহ কেহ আবেগের অতিরেকে 'দশা' পাইতেন। তখন তাঁহাদের বাহ্যিক চেতনা থাকিত না। রাগানুগা বৈষ্ণবদের মতো ইহারাও গ্রন্থ অপেক্ষা অন্তরের অনুরাগের অধিকতর মূল্য দিতেন। ইহাদের বহু কবিতায় তীব্র মর্ত্যবাসনাই ভগবৎপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা-রূপে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। সুফী কবি বলেন:

'About God's Love I hover
while I have breath
to be His perfect lover
until my death' (সুফী কবি য়াহ্যা মুআধ)[১]

সুফী ভক্তগণ নিজেদের প্রেমিক বা আসিক এবং ভগবানকে 'মাশুক' বা প্রেমিকা বলিয়াছেন। বৈষ্ণবদের প্রেমভক্তি ও সুফী সাধকগণের প্রেমের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলায় বৈষ্ণব কবিগণ 'সখী' বা মঞ্জরীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া লীলা দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেরা কখন ভগবানের প্রেমিকা হইবার বাসনা করেন না।

রূপকাশ্রিত প্রেম

বৌদ্ধ সহজিয়া

বৌদ্ধ মহাযান সাধকদের মধ্যে একদল ছিলেন 'সহজিয়া-পন্থী'। দেহের সহজাত বৃত্তিগুলির চরিতার্থতা বিধান করাকেই যাঁরা ধর্মসাধনার উপায় বলিয়া মনে করেন, তাঁদের সহজিয়া সাধক বলা হয়। এই দিক হইতে কেবল বৌদ্ধ নয়, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও সহজ সাধক রহিয়াছেন, মধুর মরমীয়া সঙ্গীতের আকর বাউলরাও সহজ-সাধন-পন্থী। বৌদ্ধ সহজ সাধক বজ্রযাণী সম্প্রদায়ের গোপন সাধনার ইঙ্গিত লুকানো রহিয়াছে চর্যা-পদাবলীর অন্তরালে।

১ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৫

শবর-শবরীর প্রেম-লীলার রূপকে সাধন-তত্ত্ব বর্ণিত হইতেছে—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গ পিচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।
উমত সবরো পাগল শবরো, মা কর গুলী, গুহাড়া তোহৌরি।
ণিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী ॥[১] (২৮ চর্যা)

—'উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বলিকা, ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করিও না,— তোমার দোহাই, (তোমার) 'আপন গৃহিণী' (ও), নামে সহজ সুন্দরী।'

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য রাধা ও কৃষ্ণের সযুজ অবতার এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। হয়ত এই তত্ত্বের বীজ আসিয়াছিল তান্ত্রিক মহাযানের যুগনদ্ধ 'হেরুক-নৈরাত্মার', (বাউলদের 'নিরঞ্জন-নৈরামণি') উপাসনা রীতি হইতে। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরামানন্দের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন: 'উপাস্যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান।

শ্রেষ্ঠ-উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম।'[১]

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় অধ্যায়

লোকসাহিত্য

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সমাজের জীবন ও সংস্কৃতি উচ্চ নীচ দুইটি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত না হইয়া পড়ে, ততক্ষণ সেখানে লোকসাহিত্যের উদ্ভব হয় না। ইহা আবার বিশেষ স্তরেরই সংহত শক্তির সৃষ্টি, ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নয়। যে সমাজে সাংস্কৃতিক উপকরণ যত বেশি তাহার সামাজিক সংহতিও তত দৃঢ়। সমগ্র সমাজের সুখ-দুঃখই একই সুরে উচ্চারিত, আনন্দে সমস্ত সমাজ একই সঙ্গে উদ্বেলিত। আধুনিক উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের তফাৎ এইখানেই। ব্যক্তিপ্রতিভার আত্মকেন্দ্রিক সাধনা লোকসাহিত্যের বহির্ভূত। ইহা স্পষ্টত সমগ্র সমাজেরই রচনা। একের রচনাই দশের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়, আবার দশের চিন্তাধারার সমভাগী কবির গীতি সমষ্টিরই কথা বহন করে, লোকসাহিত্য তাই সার্বজনীন। লোকসাহিত্যের খ্যাতনামা তাত্ত্বিক **M. Harmon** বলেন, লোকসাহিত্য **'is something which the individual has in common with his fellows, just as all have eyes and hands and speech. It is not contrary to himself as an individual but a part of his equipment. It makes possible—perhaps it might be defined as that which constitutes—his rapport with his particular segment of mankind'.**[১]

লোকসাহিত্যকে স্পষ্টতঃ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলা লোকসাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, আমরাও মোটামুটি সেই বিভাজনকেই মানিয়া লইতেছি। পরে আলোচনার জন্য আমরা বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীকেই গ্রহণ করিব।

১। ছড়া

২। গীতি

৩। গীতিকা

---

১ **M. Harmon, SDFML,** পৃঃ ৪০০।

৪। কথা
(ক) রূপকথা
(খ) উপকথা
(গ) ব্রতকথা
৫। ধাঁধা
৬। প্রবাদ
৭। পুরাকাহিনী
৮। ইতিকথা।

বাংলা লোকসাহিত্যে ছড়ারই উদ্ভব ঘটে প্রথম। সহজেই ইহাকে লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয় হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করা যায়। সাধারণ লোকসংগীতের সহিত ছড়ার পার্থক্য নির্দেশ করিতে গেলে বলিতে হয়, ছড়া মৌখিক আবৃত্তির সামগ্রী, আর লোকসংগীত সুর, তাল-সহ গান করা হয়। ছড়ার সুরে যেখানে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব, সেখানে সঙ্গীতের কত রাগ কত রাগিনী। "মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশুহৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুপম ভাষায় ছেলেভুলানো ছড়া প্রবন্ধে উপযুক্ত কথা কয়টি বলিয়াছেন। শিশুর সংগে শিশুর জননীও ছড়ার সংগে জড়াইয়া আছেন। এই জননীই শিশুকে ভুলাইয়া রাখেন। অজস্র ছড়ার বর্ষণে আর্দ্র করিয়া রাখেন শিশুমন। বাল্যক্রীড়া অবলম্বন করিয়া এই ছড়া জন্ম নেয়। দোলনায় শিশুকে শোয়াইয়া জননী মৃদুকণ্ঠে ঘুমপাড়ানী গান করেন, (ইংরেজীতে ইহাকে বলে **Cradle Song**) যেমন—

দোল্ দোল্ দোল্ দোলন্ হরি ;
কে দেখেছে হরি।
ঝুলনাতে ঝুলছে আমার ঐ গিরিধারী॥

জননীর নিকট শিশু সাত রাজার ধন মাণিক, সে ভগবানের অংশ নতুবা সে তাঁরই রক্তমাংসের গড়া পুতুল। যে রূপেই হোক না কেন প্রত্যেক জননী তার সন্তানের মধ্যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ একটি পরিচয় আরোপ করেন, তাই একই ছড়া সহস্র কুটিরে সমান দরদে গাওয়া হয়। শিশুকে ঘুম পাড়ানোতে সাহায্য করিবার জন্য কখনও অভ্যর্থিত হন ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী, কখনো ঘুম-মাঝি আবার কখনো বা নিদ্রালী দেবী। ভাবহীন, বিষয়হীন, বন্ধনহীন লঘু

ছড়াগুলিই শিশুমনের কল্পনার সঞ্জীবনী-মন্ত্র। দিবসের ক্রীড়া-ক্লান্ত দামাল শিশু যখন মধ্যাহ্নের অলস-আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্রাম করিতে চায় তখন—

খোকন গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে।

কোন বৈষয়িক আকর্ষণ কিংবা ভাবের গাম্ভীর্য নেই, শুধু কল্পনায় ভাসে ক্ষীর নদীর কূল আর কোলা ব্যাঙের ছিপ নেবার দৃশ্য—ইহাতেই তাহার লঘু হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। লোকশ্রুতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা দেশের শিশুবিষয়ক ছড়াকে তেরোটি বিষয়ে বিভক্ত করিয়াছেন—

১। ঘুমপাড়ানি ছড়া
 (ক) দোলার ছড়া
 (খ) কোলের ছড়া
২। খেলার ছড়া
 (ক) ছেলেদের খেলার ছড়া
 (খ) মেয়েদের খেলার ছড়া
 (গ) ছেলেমেয়েদের খেলার ছড়া
৩। শিশুর অভিমানের ছড়া
৪। শিশুর কান্নার ছড়া
৫। শিশুর খাওয়ার ছড়া
৬। নাচের ছড়া
৭। শিশু ও জননী সম্পর্কিত ছড়া
৮। খোকা ও চাঁদ সম্পর্কিত ছড়া
৯। খোকার কৃষ্ণরূপের ছড়া
১০। বিয়ের ছড়া
১১। মামাবাড়ীর ছড়া
১২। শিশু ও পশুপক্ষী বিষয়ক ছড়া
১৩। বিবিধ।

শিশু-বিষয়ক ছাড়াও বাঙ্গলা সাহিত্যে আরো কতো ধরণের ছড়া পাওয়া যায় তাহার সংখ্যাও কম নয়। সদুক্তি ছড়া, হেঁয়ালি ছড়া, ব্রতের ছড়া প্রভৃতির ভিতর দিয়াও বাঙ্গালা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উৎস ও অভিপ্রায়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

"যাহা একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোকসমাজ কর্তৃক মৌখিক প্রচারিত হয়, তাহাকেই লোক-গীতি বলে।"[১] লোকগীতি মৌখিক প্রচারিত হইলেও, ইহা যে কেবলমাত্র মৌখিকই রচিত হইবে, য়ুরোপীয় সমালোচকরা এই কথা স্বীকার করেন না। উচ্চতর সঙ্গীতের রাজ্যে সঙ্গীত-রচয়িতা, ইহার সুরকার ও ইহার গায়ক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু লোকসঙ্গীতে বিশিষ্ট কাহারও অবদান বলিয়া কোন চিহ্ন থাকে না, অজ্ঞাতকুলশীল সেই কবি, তিনি জনারণ্যে নিজের সকল পরিচয় হারাইয়া ফেলিয়াছেন। অনেকে এই কথা বলিতে চাহেন, উচ্চতর সঙ্গীতের পশ্চাতে আছে শুধু অহেতুক আনন্দ, লোকসঙ্গীতের পশ্চাতে আছে প্রয়োজন। প্রেম-গীতির মধ্যে যত সাত্ত্বিক ভাবই থাকুক না কেন, আদিম সমাজে ইহারও প্রয়োজনীয়তা ছিল। ইহাদের আশ্রয়েই নরনারী পরস্পরের প্রতি মিলনের অভিলাষ ব্যক্ত করিত। বিবাহ-গীতিও ত প্রয়োজন হইতেই জাত হইয়াছে।

লোকগীতি কাহিনীমুক্ত। ভাবই গীতির প্রাণ—সুর ইহার অঙ্গমাত্র। লোকগীতি সাধারণতঃ আকারে ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে। যেগুলি একটু দীর্ঘ, সেগুলি আসলে পুনরুক্তিজনিতমাত্র, বিষয়-জনিত নহে। অনেক সময় ধুয়া (<ধ্রুবপদ) অংশ দ্বারাও লোকগীতি অনাবশ্যক দীর্ঘীকৃত হইয়া থাকে। বাংলার লোকগীতি এত বিস্তৃত যে ইহা জীবনের সকল অবস্থাকেই স্পর্শ করিয়াছে। গর্ভবাস হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি অবস্থাই ইহার ভিতর দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। বাঙ্গালা লোকগীতিকে প্রধানত দুইটি বিভাগে ভাগ করা যায়, যেমন তালযুক্ত ও তালহীন। তালযুক্ত সঙ্গীতকে 'সক্রিয় সঙ্গীত' বলা হইয়াছে, তালহীন গীতকে "ভাটিয়ালি" নামে পরিচালিত করা হয়। বৃহৎবঙ্গের অঞ্চলে অঞ্চলে নিজস্ব বা আঞ্চলিক সঙ্গীতের অভাব নাই। পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া, ভাদু, ঝুমুর, উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়া, পূর্ববঙ্গের জারি, ঘাটু ইত্যাদি। পটুয়া সঙ্গীতে কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও মনসামঙ্গল; ভাদুগানের বিষয়বস্তু প্রকৃতি-বন্দনা; গম্ভীরার বিষয়বস্তু শিব; ভাওয়াইয়ার বিষয়বস্তু প্রেম। এসব আঞ্চলিক গীতি ছাড়াও আলাদাভাবে প্রেম-সঙ্গীত বাঙ্গালা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারকে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছে।

---

১ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০৬।

প্রেম মানবজীবনের সমস্ত কামনা-বাসনার মানসলক্ষ্মী। বৃহৎবঙ্গের লৌকিক জনজীবনেও এই প্রেমের ধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবহমান। তাই রাধাকৃষ্ণের নাম লইয়াই হউক অথবা .যে কোন প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার নাম লইয়াই হউক, বাঙ্গালীর জীবনের উষ্ণ অনুরাগটি ঠিকই তাহার মধ্যে ধরা পড়ে। প্রেমসংগীতকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিতে পারি—

১। ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীত

২। বর্ণনামূলক প্রেম-সঙ্গীত

ভাবমূলক প্রেমসঙ্গীতকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—

ক। লৌকিক

খ। পৌরাণিক

পৌরাণিক প্রেমগীতিতে ভাগবতের আদর্শ রাধাকৃষ্ণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত নয়; বরং মাটির স্পর্শজাত অতিপরিচিত সত্যকেই এই সব প্রেমগীতি তুলিয়া ধরিয়াছে। যেমন,

ওগো, কালার পিরীতে কুলমান হারাইলাম সই, আর যাব কই!
না জাইলে কঠিনের সনে কেন প্রাণ সঁপিলাম, আর যাব কই!
যার জন্য পাগলী হইলেম সে বা কই আর আমি কই
পান খাইয়া চুণে মইলেম, মনে ছিল কাঁচা দই![১]

এইভাবেই পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণ বাঁধা পড়িয়াছে জন-জীবনের স্তরে স্তরে। এদের মান-অভিমান, বিরহ মিলন আবর্তিত হইয়াছে রাধাকৃষ্ণের মধ্য দিয়া।

বৈষ্ণবপদাবলী লৌকিক প্রেমগীতির অন্তর্ভুক্ত না হইলেও, রাধাকৃষ্ণের নামের সহিত যুক্ত বাংলার বহুগীতিই লৌকিক প্রেম-গীতি। সেখানে তাত্ত্বিকদের শাসন নাই, পল্লী-কবিরা নিজের অনুভূতিতেই রাধাকৃষ্ণের অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারাই প্রাচীনতর, কারণ লৌকিক প্রেম-গীতির উপরই ভিত্তি করিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর উদ্ভব—বৈষ্ণবপদাবলীর অনুকরণে লৌকিক প্রেমগীতি প্রথমত রচিত হয় নাই। এখনও লৌকিক প্রেমের বহু লোকগীতি বাংলাদেশে গাওয়া হয়, যাহাদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নাম যুক্ত নয়। যেমন,

ওহে ও বিদেশী, এবার আমার করতে হবে মন খুসী॥
তোমার আগমনে আমি আনন্দেতে ভাসি।

১ শ্রীসুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য, পৃ. ২২৬

আমায় দিতে হবে জোড়া খাড়ু
শেমিজ আর তেলের শিশি।
গত বৎসর পাই না কিছু তারে দুঃখ প্রকাশি।
আমার কেঁদে কেঁদে দিন গিয়েছে,
জানে সব দেখনহাসি, ওহে, ও বিদেশী।

বাংলার লোকগীতির একটি প্রধান অংশ পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত (funotional song) বলিয়া নির্দেশ করা হয়। গর্ভাধান, বিবাহ, পঞ্চামৃত, সপ্তামৃত, সীমান্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ উপলক্ষ্যে যে সকল নির্দিষ্ট মেয়েলীগীতি গাওয়া হয়, তাহাই পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত। বৎসরে বৎসরে নির্দিষ্ট দিবসে অনুষ্ঠিত পার্বণ উপলক্ষ্যে যে সকল গীত গাওয়া হয়, তাহাকে আনুষ্ঠানিক বা পার্বণসঙ্গীত বলা হয়। বাংলার পল্লীতে "বারমাসে তের পার্বণ" যে লাগিয়াই ছিল, তাহাদের প্রত্যেকটি উপলক্ষ্যেই এই সকল গীত একদিন গাওয়া হইত—উৎসবের আনন্দ সঙ্গীতের ধারায় ইহাদের ভিতর দিয়া স্বতঃ উৎসারিত হইত।

বাংলার সুবিপুল লোকগীতির ভাণ্ডারে পূর্বকথিত প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। লোকসঙ্গীতের মধ্যে ইহারই আবেদন সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। বাংলার প্রেমসঙ্গীত সাধারণত একক গীতি। প্রেম-গীতির শ্রেষ্ঠ অংশ বিরহ। বেদনাই ভাবমূলক সঙ্গীতের জননী। প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যেও বেদনা যেখানে সুগভীর বাজিয়াছে, সেখানেই সুর মধুরতম হইয়াছে। বাংলার লৌকিক বিরহ-সঙ্গীতগুলিই তাহার প্রমাণ। বারমাসী সঙ্গীত বিরহ-সঙ্গীতেরই একটি বিশিষ্ট অংশ। পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পট-ভূমিকার উপর বিরহিনী নারীর সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাংলার সকল অঞ্চলেই ইহা প্রচলিত আছে। লোকসাহিত্যের ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই মধ্যযুগের বিস্তৃত উচ্চতর সাহিত্যেও বারমাসীর বর্ণনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই সূত্রেই সীতার বারমাসী, রাধার বারমাসী, ফুল্লরার বারমাসী ইত্যাদি রচিত। মনসামঙ্গলেও আছে বেহুলার অষ্টমাসী।

প্রেমসঙ্গীতে যেমন রাধাকৃষ্ণ অনুপ্রবেশ করিয়াছেন, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গকেও নায়ক হিসাবে পাই। তিনি শুধু একান্ত ভক্তিরই আধার নন, তিনি যেন লৌকিক প্রেমেরও নায়ক।

ইংরেজি ব্যালাড্ কথাটিই বাংলাতে গীতিকা। ইহা একটি বিশিষ্ট

কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত, সে কাহিনী দৃঢ়বদ্ধ। ইহা কাহিনী-প্রধান রচনা, চিত্র-প্রধান নহে। গীতিকা নিতান্ত সাধারণ বা আদিবাসীর সমাজে উদ্ভূত হইতে পারে না। যে সমাজ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এক সমৃদ্ধ জনশ্রুতিমূলক সংস্কৃতির অধিকারী, ইহা কেবল তাহা দ্বারাই সৃষ্ট হইতে পারে, এই বিশ্বাস মোটেই অযৌক্তিক নহে।[১]

বাংলাদেশে সংগৃহীত গীতিকা-সাহিত্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,

১। নাথ-গীতিকা

২। মৈমনসিংহ-গীতিকা

৩। পূর্ববঙ্গ-গীতিকা।

নাথ-গীতিকা বাকী দুইটি হইতে একটু স্বতন্ত্র ধরণের। একটিমাত্র ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া সমস্ত নাথ-গীতিকা রচিত, তাই সব রচনাতেই বিষয়-গত ঐক্য মোটামুটি রক্ষিত। ইতিহাসের কোন বিস্মৃতযুগে এক রাজপুত্র মাতার নির্দেশে যৌবনেই দুই নব পরিণীতা বধূ প্রাসাদে রাখিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র নাথ-গীতিকা। মৈমনসিংহ বা পূর্ববঙ্গগীতিকাতে ঐতিহাসিক উপাদান থাকিলেও চরিত্রগুলি সাধারণ জনসমাজের মধ্যে একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়াছে—ইহাদের ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। নাথ-গীতিকার দুইটি প্রধান বিভাগ---একটি নাথগুরুদের অলৌকিক সাধন-ভজনের কাহিনী আর একটি তরুণ রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কাহিনী। নাথ-গীতিকাগুলি প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গেই প্রচার লাভ করিয়াছিল, সেখানে ইহাদের নাম 'যুগীযাত্রা'।

মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা ধর্মসমাজ-নিরপেক্ষ। যদি কোন ধর্ম ইহার মধ্যে স্বীকৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা মানবিকতার ধর্ম। ব্যর্থ বা অভিশপ্ত প্রেমই গীতিকাগুলির প্রধান উপজীব্য; প্রেমের গতি যে কত বিচিত্র ও জটিল, অন্তঃপ্রবৃত্তির সঙ্গে বহিঃ-সংস্কারের সংঘাত কত যে প্রবল, তাহাই ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

১ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মসাধনায় নারী-সঙ্গিনী

নরনারীর মিলিত ভাবে ধর্মসাধনার ঘটনা বহু পূর্বকাল হইতে প্রচলিত আছে। বৈদিকযুগে ধর্মসাধনা বলিতে বিশেষভাবে যাগযজ্ঞ করা বুঝাইত। এই সমস্ত যজ্ঞকার্যে বিবাহিত পত্নীরই অধিকার ছিল। কোন কোন সময় নারীরা স্বাধীনভাবেও যজ্ঞ করিতে পারিত। বৈদিক সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি নর-নারী উভয়ে মিলিত হইয়া স্বর্গাদির জন্য যজ্ঞ করিত। হিন্দুশাস্ত্রে কোন কোন যজ্ঞে বিপত্নীকের অধিকার ছিল না। ঋগ্‌বেদের সপ্তম মণ্ডলে (৭/৩) দেখি স্বামী ও স্ত্রী মিলিত ভাবে সোম-যজ্ঞের ব্যবস্থা করিতেছেন। অথর্ববেদে দেখি—নারীর (পত্নীর) যজ্ঞ করিবার অধিকার ছিল, সে স্বামীর সহিত যজ্ঞে আহুতি দিত এবং ধর্মাচরণে তাহাকে সাহায্য করিত। সে ছিল ধর্মপত্নী। আবার, কোন স্ত্রীর স্বামী থাকা সত্বেও দ্বিতীয়বার স্বামীগ্রহণ করিয়া ধর্মাচরণ করিলে উভয়ে স্বর্গে যাইত। কিন্তু তৃতীয়বার স্বামী গ্রহণের নিষেধ ছিল। পরকীয়া নারী (পরোঢ়া) গ্রহণ করিয়া ধর্মসাধনার মূল এইখানেই পাইতেছি।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে উল্লিখিত আছে—রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজার প্রধানা মহিষী আগাগোড়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। বিপত্নীক হইয়া যজ্ঞ করা চলিত না। রামায়ণে রামের 'স্বর্ণসীতা' গ্রহণ এই প্রসংগে স্মরণীয়।

উপনিষদেও স্ত্রীকে "সহধর্মিনী" বলা হইয়াছে। সূত্র গ্রন্থগুলিতেও এই আদর্শ অনুসরণ করা হইয়াছে। পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রেও বৈদিক আদর্শ দেখা যায়।

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহেও নারীর ধর্মসাধনায় অধিকার দেখা যায়। কোন কোন বৌদ্ধশাস্ত্রে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর মিলিতভাবে ধর্মালোচনার কথা দেখা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দে বৌদ্ধ বিহারের একদল সমভাবের ভাবুক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী একত্র বসিয়া ধর্মালোচনা করিতেন এবং এজন্য ভিক্ষুসমাজে তাঁহারা নিন্দনীয়

হইয়াছিলেন। ইহারা বৌদ্ধ সমভিপ্রায়ীর সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 'সমভিপ্রায়ী' হইতে 'সমভিগ্নায়ী' হইয়াছে। পরবর্তী কালের 'সহজিয়া' মতের আদি প্রবর্তক বলিয়া মনে করা হয় এই সম্প্রদায়কে। কালিদাসের রঘুবংশে সস্ত্রীক দিলীপের ধর্মসাধনা দেখিতে পাওয়া যায়

নর-নারীর পরস্পর মিলিতভাবে একটি গুহ্য ধর্ম সাধনার ধারা ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে বহুদিন পূর্ব হইতেই প্রচলিত আছে।[১] এই সাধনার বিভিন্ন পরিণতিতেই বামাচারী তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা প্রভৃতির উদ্ভব ঘটিয়াছে।

হিন্দু তান্ত্রিক সাধনা

তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে যুগলতত্ত্বই হইল কেবলানন্দতত্ত্ব আর এই অদ্বয়তত্ত্বের হইল দুইটি ধারা—একটি শিব, অপরটি শক্তি। তান্ত্রিকমতে এই শিবশক্তির মিলনজনিত কেবলানন্দই হইল পরম সাধ্য। এই শিব-শক্তি-তত্ত্ব লইয়া বহু প্রকারের সাধনার ভিতরে একটি বিশেষ প্রকারের সাধনা হইল নর-নারীর মিলিত সাধনা।

বিনা শক্তিং ন পূজাস্তি মৎস্যমাংসং বিনা প্রিয়ে।
বিনা পরক্রিয়াং দেবি জপেৎ যদি তু সাধকঃ।
শতকোটিজপেনৈব তস্য সিদ্ধি র্ন জায়তে॥

তুলনীয় মঞ্জরী অনুগা বিনে বিষয়ের জ্ঞানে।
না পাইবে ভজিয়া সে শ্রীরাধার মনে॥[২]

বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা

নারী-পুরুষের মিলিত এই গুহ্য সাধন প্রণালী বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়া যোগ-সাধনাকে অবলম্বন করিয়াই প্রেম ধর্মে রূপান্তর লাভ করিল। রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া যে বৈষ্ণবধর্ম তাহা হইল প্রেমধর্ম। বৈষ্ণব সহজিয়াতে আমরা পূর্ববর্তী শিবশক্তি বা প্রজ্ঞা-উপায়ের স্থানে পাইলাম রাধাকৃষ্ণকে। শিবশক্তির মিলন-জনিত সামরস্য ছিল শুধু আনন্দস্বরূপ, বৈষ্ণব সহজিয়ারা রাধাকৃষ্ণের মিলন-জনিত আনন্দকে প্রেম ছাড়া আর কিছুই

১ 'এই মত সাধন ভজন পূর্ব হইতে আছে'—প্রেমদাস। ২ রাগময়ী কণা

বলিতে পারেন না, যদিও এখানেও চরমাবস্থায় প্রেমই হইল আনন্দ, আর আনন্দই হইল প্রেম। বৈষ্ণব সহজিয়া মতে যুগলতত্ত্ব পরমতত্ত্ব। চণ্ডীদাসের একটি গানে দেখিতে পাই—

প্রেম সরোবরে দুইটি ধারা।
আস্বাদন করে রসিক যারা।
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিক যুগল দেখে॥

পঞ্চম অধ্যায়

ভক্তিবাদ

মানবমেলায় যখন হইতে দেবতাদের স্থান স্থিরীকৃত এবং মাহাত্ম্য প্রচারিত হইতে সুরু করে তখনই সাধারণ মানুষের অন্তরে জাগিয়া উঠে ভয় ও একটি সম্ভ্রমভাব। এই ভয় ও সম্ভ্রম হইতেই উদ্ভূত হয় ভক্তি।

ভক্তিবাদ বা **Bhakti Cult** প্রচলিত হইবার পূর্বে আরও বহুবিধ **Cult**-এর প্রচলন হইয়াছিল—**Siju Cult, Manasa Cult, Whirling Water Cult, Boar Cult, Horse Cult, Tiger Cult** প্রভৃতি।

প্রতিটি **Cult**-এর একটি নিজস্ব গতিবিধি এবং একটি নিজস্ব গণ্ডী ছিল। কিন্তু মূলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রতিটি **Cult**-এর পশ্চাদ্‌দেশে মানুষের ভিতরে রহিয়াছে ভয় ও সম্ভ্রমভাব। এই **Cult**গুলির পরিকল্পনা একক আর্যদের দ্বারা হয় নাই, আর্যেতর জাতির সহিত আর্য জাতির সংমিশ্রণের ফলেই গঠিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভজ্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন ভক্তি শব্দের অর্থ আনুগত্য বা সেবা। শ্রীভগবানের প্রতি সেবানুগতিই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সেবাই প্রকৃত সেবা—"সা চ কায়িক-বাচিক-মানসিকাত্মিকা ত্রিবিধেবানু-গতিরুচ্যতে"। ভক্তির উদ্রেকের দিক হইতে দেখিলে তিনটি স্তর দেখা যায়—আরোপ-সিদ্ধা, সঙ্গ-সিদ্ধা, ও স্বরূপ-সিদ্ধা। এইগুলিই আবার 'সকৈতবা' ও 'অকৈতবা' ভেদে দ্বিবিধ। 'আরোপসিদ্ধা' ও 'সঙ্গ-সিদ্ধা' ভক্তিকে 'সকৈতবা' বলা হয় যখন ইহাকে অন্য কোন স্বার্থ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করা হয়। অন্য কোন স্বার্থে জ্ঞান ও কর্মের অধীন হইলে স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি 'সকৈতবা' হয় আর মনে ভালোমন্দ কোন মতলব ইহলোক-পরলোকের কোন স্বার্থ না রাখিয়া ভগবানের প্রীতিজনন বা সুখ বিধানই যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাই 'অকৈতবা' স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি বা 'অকিঞ্চনা' ভক্তি।

'ভক্তি' পদটি বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামানুজ ভক্তি, জ্ঞান, ধ্যান ও উপাসনাকে সমপর্য্যায়ভুক্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

নারদের ভক্তিসূত্রে ভক্তিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—

'সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা'[১] বলিয়া। ইহা (এই ভক্তি) পরমেশ্বরের প্রতি সর্বোচ্চ অনুরাগ এবং অমৃতময় বলিয়া বর্ণিত, 'অমৃতস্বরূপা চ'। 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'। শাণ্ডিল্যসূত্রে পাই—নারদ বলিয়াছেন ভক্তি ঈশ্বরে সর্বকর্মার্পণরূপ এবং তাঁহার লাভের নির্মিত্ত মনের একান্ত ব্যাকুলতা।[১] কর্ম ও জ্ঞানযোগ হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ—"সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপি অধিকতরা।[২] ভাগবতেও অনুরূপ মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়—"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্"। (ভাঃ ১।২।৭)

"এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ। ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে।" (ভা ১।২।২০)। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভাগবতটীকায় 'সাধনলক্ষণা'[১] ভক্তি ও 'সাধ্যলক্ষণা' ভক্তি নামে ভক্তির দুই প্রকার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন—"শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপো যো ধর্মঃ সা ভক্তিরেব সাধননাম্নী, সৈব পাকদশায়াং প্রেমনাম্নী, তে দ্বে অপি ভক্তিশব্দেনৈবোচ্যতে (ভাঃ ১।২।৬)। —শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি যে ধর্ম তাহাই সাধন-ভক্তি এবং তাহাই পরিণত অবস্থায় প্রেমভক্তি, —এই দুইটিকেই 'ভক্তি' বলা যায়। শঙ্করাচার্য জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় দেখাইয়াছেন—"পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং ভক্তিম্"।

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে ভক্তির দ্বারা ভজনা করাই শ্রেয়ঃ, ভগবানে অনন্যরূপে আত্মসমর্পণই ভক্তিযোগ, ইহাই পরব্রহ্মের চিন্ময় রূপকে সাক্ষাৎ করিবার একমাত্র উপায়। এজন্য বলা হইয়াছে—"স্ব-স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।"

নারদীয় ভক্তিসূত্রে বার বার বলা হইয়াছে—'তদেব সাধ্যতাং তদেব সাধ্যতাম্'—তাহাই সাধনা কর, তাহাই সাধনা কর। সেই সাধনার বস্তুটি কি? তাহা 'অনির্বচনীয়ং প্রেম-স্বরূপম্' তাহা মূকাস্বাদনবৎ', তাহা 'নিজকান্তাভজনাত্মকম্ বা প্রেম এব কার্যমিতি', এই যে কান্তাপ্রেম, নারদীয়সূত্রে বার বার ইহার গুণকীর্তন করা হইয়াছে।

---

১ 'নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি"।
"অতএব তদভাবাদ্ বল্লবীনাম্"। সুতরাং তাহার অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব হইলে বল্লবী-যুবতীরা ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছিল)—"শাণ্ডিল্যসূত্র।"

২ প্রভু কহে কর্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন—(চৈঃ চঃ মধ্য ২।৯)
জ্ঞান কর্ম উপেক্ষিলে কৃষ্ণপ্রেম হয়। ইহা জানি জ্ঞান কর্ম না কর আশ্রয়॥ চৈঃ চঃ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রেমিক-প্রেমিকার রূপকে ভগবদ্‌ভক্তি ব্যাখ্যার সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত মিলিবে। উপনিষদে বলা হইয়াছে, প্রেমিক পত্নী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া মানুষ যেমন আপন ভুলিয়া যায়, সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক'।[১]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪।৮) বলা হইয়াছে—

তৎ এতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ প্রেয়ঃ

অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ, অন্তরতরং যৎ অয়ম্ আত্মা—

আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাসীত"—'সেই এই (আত্মা) পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত কিছু হইতেও প্রিয়, এই আত্মা অন্তরতর, প্রিয় সেই আত্মাকে উপাসনা করিবে।" এখানে প্রিয়তমকেই কান্তভাবে ভজনার কথা বলা হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেরও মূলকথা শ্রীকৃষ্ণকে কান্তভাবে ভজনা করা।

নারদীয় ভক্তি-সূত্রে যে ভক্তিধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেখানেও ব্রজগোপীদের মত ভগবানকে ভালবাসার কথা বলা হইয়াছে—"যথা ব্রজগোপীনাম্"। শাণ্ডিল্যসূত্রেও বল্লভী যুবতীদের প্রেমের সঙ্গে ভক্তের আকর্ষণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। এই ভক্তি কিরূপ? "সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা"। নারদীয় ভক্তির অর্থ ভগবানের প্রতি পরম প্রেম।

চৈতন্যদেব বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলিয়াছিলেন—

"ভগবান্ সম্বন্ধ,' ভক্তি 'অভিধেয়' হয়।
'প্রেম' প্রয়োজন', বেদে তিন বস্তু কয়॥[২]

"সম্বন্ধ হইলেন ভগবান, সাধন ভক্তি হইল অভিধেয়, প্রয়োজন হইল ভগবৎ প্রেম—ইহাই পুরুষার্থ।"

"প্রভু কহে ভট্টাচার্য, না কর বিস্ময়
ভগবানে ভক্তি,—পরম পুরুষার্থ হয়।[৩]

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে কর্মযোগের প্রাধান্য দেখা যায়। কর্মকাণ্ড বা শাস্ত্রবিহিত যাগ-যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গাদি পরমার্থ লাভ করা যাইবে বলিয়া বিবেচিত হইত। পরে জ্ঞানমার্গের উদ্ভব হইলে আত্মজ্ঞানই মোক্ষাদি

১ "প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদো নান্তরম্"—বৃহদরণ্যক
২ চৈঃ চঃ (২।৬) ৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২।৬)

লাভের হেতু বলিয়া বিহিত হইল। পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের জন্য আত্মজ্ঞান ও কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। সেই সঙ্গে পরব্রহ্মের সগুণ উপাসনার কথা অর্থাৎ ভক্তিপথেরও উল্লেখ দেখা যায়।

বৈদিক সাহিত্যে ভক্তিধর্মের স্পষ্ট রূপ দেখা যায় না। মহাভারতে বিষ্ণুর ও নারায়ণের উপাসনার কথা পাওয়া যায়। তাহার পর শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভাগবত ধর্ম ও কৃষ্ণ-বাসুদেব পূজা প্রবর্তিত হইতে দেখা যায়। তাহার পর নারদীয় ভক্তিগ্রন্থে ও শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তি-দর্শন একটি স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে শঙ্করাচার্য বিশেষভাবে দ্বৈত ভক্তিবাদকে দুর্বল করিয়া দেন।

নারদীয় সংহিতায় ও শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সমন্বয় দেখা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত তো একটি শ্রেষ্ঠ ভক্তিশাস্ত্র। "পুরাণগুলির মধ্যে ভাগবত পুরাণের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে যে ভক্তিস্রোত বাংলাদেশ হইতে উৎসারিত হইয়া ভারতভূমি প্লাবিত করিয়াছিল তাহার প্রধান শাস্ত্রভিত্তি গীতা এবং ভাগবত।" সংস্কৃত-প্রকীর্ণ-কবিতাসংগ্রহে ও 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলে' সংগৃহীত কোন কোন কবিতায় ভক্তিরসের সুর পাওয়া যায়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে ভক্তিরসের সুর শোনা যায়। লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও শ্রীচৈতন্য কর্তৃক দাক্ষিণাত্য হইতে সংগৃহীত "ব্রহ্ম-সংহিতায়" হরিভক্তি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসাদির কাব্যে (পদাবলী-সাহিত্যে) রাধা-কৃষ্ণলীলা বা ভক্তিরসের সন্ধান পাওয়া যায়। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় (১৪৭৩ খ্রীঃ) কাব্যখানিও ভক্তিরসের কাব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ জনের সহিত জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও মালাধর বসুর গ্রন্থ ভক্তিরসের কাব্য বলিয়া আস্বাদ করিতেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙ্গালা পদাবলী-সাহিত্যে ভক্তির বন্যা প্রবাহিত হইতে থাকে। তাঁহার আদেশে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সংস্কৃতভাষায় ভক্তিশাস্ত্র, বৈষ্ণব-ভক্তিতত্ত্ব ও দর্শনগ্রন্থ প্রচার করেন। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি প্রচারিত হইবার পর 'ভাগবত' ও 'ভগবদ্‌গীতা' ছাড়া আর কোন গ্রন্থেরই বিশেষ মূল্য রহিল না।

এখানে শ্রীধরস্বামীর শ্রীভাগবতের টীকা ভাবার্থদীপিকার উল্লেখ করিতে হয়।

শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের ও ভগবদ্গীতার ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা ভক্তিরস সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছিল। শ্রীধরস্বামীর মতবাদ অনুসরণ করিয়া তীরভুক্তির শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরী ভাগবতের ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। শ্রীভাগবত হইতে ভক্তিমূলক শ্লোক সংগ্রহ করিয়া 'ভাগবত-ভক্তি-রত্নাবলী' প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—'বিষ্ণুপুরী ভক্তিধর্ম প্রচারে অন্যতম মুখ্য'। অদ্বৈত আচার্যের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রীচৈতন্যের পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির ক্ষেত্র তিনি প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

ভক্তশ্রেষ্ঠ মাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্ণ-মিলনের আকুলতায় মৃত্যুর প্রাক্কালে মথুরানাথকে আহ্বান করিতেছেন—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥
পদ্যাবলী ১৩৩৪[১]

—ওগো দীনদয়াল স্বামী, মথুরানাথ, কবে দেখা দিবে?
প্রিয়, তোমার অদর্শনে কাতর হৃদয় মথিত হইতেছে। কি করিব!"

শ্রীচৈতন্যের পূর্বে বাংলাদেশে শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রপুরীই অনুরাগমূলক কৃষ্ণভক্তির প্রথম প্রচারক; তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন শুনিলে মূর্চ্ছা যাইতেন। নবদ্বীপে গোপীনাথ-গৃহে অবস্থান-কালে তিনি সংস্কৃতে 'কৃষ্ণলীলামৃত' লিখেন। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগুরু কাটোয়ার কেশবভারতীও ভক্তিধর্ম প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্য প্রথমে শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও পরে নিজের পথে প্রেমভক্তি প্রবর্তন করেন।

শ্রীভাগবতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মুখ্য শাস্ত্র বলিয়া মনে করেন। পঞ্চদশ শতাব্দের শেষার্ধে গৌড় দরবারের কর্মচারীদের দ্বারা ভাগবত পুরাণের আলোচনা চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিরসের ভূমিকা রচনা করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচিত হয়, ইহাতেও নামাশ্রয়ী রাম-ভক্তিবাদের উল্লেখ রহিয়াছে।

---

১ চৈঃ চঃ মধ্য চর্থ-পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত।

ভক্তির শ্রেণীবিভাগ

"ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু" গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী চারি প্রকারের ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন :—১। সামান্যভক্তি ২। সাধনভক্তি ৩। ভাবভক্তি এবং ৪। প্রেমভক্তি। শেষোক্ত তিনটিকে "উত্তমা ভক্তি" বলিয়াছেন। এই উত্তমা ভক্তি কর্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যের উপর নির্ভর করে না।

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥[১]

অনাসক্তভাবে কৃষ্ণ সম্বন্ধে নিবন্ধই প্রকৃত বৈরাগ্য। অকৈতবা ঈশ্বরানুভূতিই প্রকৃষ্ট ভক্তি। এই সাধন-ভক্তি আবার দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা।[২] শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পরমেশ্বরের ভজনা করিলে যে ভক্তি উৎপন্ন হয় তাহাই বৈধী ভক্তি। "শাস্ত্রোক্ত-বিধিনা প্রবর্ত্তিতা বৈধী"—'শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ দ্বারা প্রবর্তিত ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে'।[৩]

এই শাস্ত্রীয় বিধি আবার দুই প্রকার—প্রথম, যে সমস্ত বিধি ভক্তির প্রবৃত্তি বা অনুকূলতার সৃষ্টি করে, দ্বিতীয়, যাহা প্রবৃত্তির স্থায়িত্বের জন্য কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞান দান করে।[৪]

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্॥
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥[৪]

অতি প্রাচীন যুগ হইতে ভগবানের নাম বা গুণকীর্তন করিয়া ভক্তি নিবেদনের নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

রাগানুগা ভক্তি মানসিক ভাবাবেগের সহজ পন্থাই অনুসরণ করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবির্ভূত হয়, ইহা সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয় বিধি-শাসন বহির্ভূত

---

১ চৈ, চ, মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ

২ এইত সাধন ভক্তি দুইত প্রকার। এক বৈধীভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, অধ্যায় ২২
"বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১-২-৪

৩ রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সব শাস্ত্রে গায়॥ চৈ. চ. মধ্যলীলা, ২২

৪ (শ্রীমদ্ভাগবত) ৭।৫।২৩-২৪

ও তাহা হইতে মুক্ত। প্রেমের দ্বারা বা অনুরাগের দ্বারা ঈশ্বর-আরাধনার নাম রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির পথ অনুসরণ করে।

রাগাত্মিকা ভক্তির অর্থ—যাহাতে চিত্তের অনুরাগ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ভগবানের পরিকরের বা শক্তির অনুরাগমূলক ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। জীব যখন সেই আদর্শ অনুসরণ করে তখন সেই ভক্তির নাম রাগানুগা ভক্তি। অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি বল্লবী যুবতীদের অনুরাগ রাগাত্মিকা ভক্তি এবং মর্ত্যের বৈষ্ণব ভক্তদের কৃষ্ণানুরাগ রাগানুগা ভক্তি।[১] বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনাকে মহা-অনুরাগের পদ্ধতি বা 'মহারাগনয়চর্যা' বলা যায়। বৈষ্ণব সাধনার 'রাগানুগা পদ্ধতি' মহারাগনয়েরই প্রতিশব্দ।

রূপ গোস্বামী রাগাত্মিকা ভক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'ইষ্টে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ, তন্ময়ী' অর্থাৎ সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাই হইল রাগাত্মিকা ভক্তি। আর ব্রজবাসিজনের ভিতরে অভিব্যক্তরূপে বিরাজমানা যে রাগাত্মিকা ভক্তি তাহার অনুসৃতা ভক্তিই রাগানুগা নামে খ্যাত।[২] বৈধী ভক্তিতে বিধি, শাস্ত্র ও আচারের প্রাধান্য।

কিন্তু রাগানুগা ভক্তিতে শুধু স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগের প্রাধান্য। ইহা কখনও কখনও "পুষ্টিমার্গ" নামেও অভিহিত হয়।

রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকারের—(ক) কামরূপা (ব্রজগোপীদের প্রেম), কৃষ্ণসুখ বাঞ্ছাই একমাত্র ইচ্ছা। কুব্জার প্রেম—যাহা নিজের ও কৃষ্ণের সুখ কামনা করে ইহাকে "কামপ্রায়া" বলা যায়। (খ) সম্বন্ধরূপা—কৃষ্ণের সহিত

---

১ "ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১-২-১৩১
"বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১৩০)
"ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ—এই স্বরূপ-লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা এই তটস্থ লক্ষণ"॥
রাগময়ী ভক্তির হয় "রাগাত্মিকা" নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
"রাগাত্মিকা ভক্তিমুখ্যা ব্রজবাসিজনে।"
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে॥ (চৈ. চ. মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ।)

২ রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ লঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥ চৈ. চ. মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।

সম্বন্ধের অভিমান যাহা নন্দ, যশোদা ও ব্রজগোপদের মধ্যে দেখা যায়। এই দুইটির অনুসরণ করিয়া যে সাধনা তাহাকে কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা বলা হয়।

"সামান্যভক্তি" বা সাধারণ ভক্তি অর্থে—আচরণীয় ধর্ম হইতে যে ভক্তির উদয় হয়। ভাবভক্তিতে অন্তরের ভাবেরই প্রাধান্য। ইহাতে ভাব রসে পরিণত হয় না। প্রেমভক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বলা হইয়াছে। ইহাতে ভাবভক্তি প্রেমভক্তিতে পরিণতি লাভ করে। ভক্তিকে রস পর্যায়ে উন্নীত করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য ছিলেন রাধা-ভাবের সাধক অর্থাৎ তাঁহার ভক্তি রাধাভাবের আনুগত্যময়ী কিন্তু সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তের সাধনা প্রকৃতপক্ষে গোপীভাবের। গোপীভাবে ভজনার অর্থ শ্রীরাধার সখী ললিতা, বিশাখা, প্রভৃতির আনুগত্যময়ী রাধাকৃষ্ণের সেবারূপা।

ও

ষষ্ঠ অধ্যায়

রসতত্ত্ব

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন—

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্[১]—রসাত্মক বাক্যই কাব্য।

কাব্যের রস কি? রসের সংজ্ঞা দিতে গিয়া তিনি 'সাহিত্য-দর্পণে' বলেন—

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদি স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্॥[২]

—'বিভাব অনুভাব (সাত্ত্বিক) এবং সঞ্চারিভাবের দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত ললনাবিষয়ক প্রীত্যাদি রূপ যে রত্যাদি স্থায়িভাব তাহাই রসের স্বরূপ।' (অর্থাৎ অম্লবস্তু সংযোগে দুগ্ধ যেমন রূপান্তরিত হইয়া দধিপদবাচ্য হয়, সেইরূপ রত্যাদিরূপ স্থায়ী ভাব কাব্যোপস্থাপিত বিভাবাদির সম্বন্ধ-নিবন্ধন অন্যরূপে পরিণত হইয়া চিদানন্দস্বরূপ রসপদবাচ্য হয়।

"নাট্যশাস্ত্রকার" ভরতমুনি রসের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন,—"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ" অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সম্বন্ধের ফলেই রসের প্রকাশ হয়। আচার্য বিশ্বনাথ রসের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'উহা (কাব্যের রস) বেদ্যান্তর-সম্পর্কশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদসহোদর, স্বপ্রকাশ, অখণ্ড, চিন্ময়ানন্দ এবং লোকোত্তর-চমৎকার প্রাণ।[১] রস ও রসের আস্বাদন ভিন্ন পদার্থ নহে, উহা একই পদার্থ। রসাস্বাদে বাসনা থাকায় সেই বাসনাংশে লৌকিক এবং রত্যংশে রতি না থাকায় ঔপনায়িক বা অলৌকিক। যেমন, শুক্তিতে রজতজ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা শুক্তিকে শুক্তি বলিয়াই জানা যায় তাহাকে বলে লৌকিক এবং যে জ্ঞানে শুক্তিকে রৌপ্য বলিয়া মনে হয় তাহা অলৌকিক বা ঔপনায়িক। রত্যাদি বাসনা না থাকিলে রসাস্বাদ হয় না। আলঙ্কারিকগণের মতে 'রস অপরিমিত, অলৌকিক এবং কাব্য ও নাট্য, শ্রবণ ও দর্শনের জন্য।' অর্থাৎ রাম সীতাদি প্রভৃতি আলম্বন, উদ্দীপন বিভাব ও কটাক্ষ প্রভৃতি অনুভাব—

---

১ সা. দ. ১।৫ ২ (স. দ ৩।১)

এই লৌকিক ব্যাপারগুলি কাব্যে প্রযুক্ত হইলে পর বিভাবনাদি অলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত হয় এবং এই অলৌকিক ব্যাপারের সহিত যুক্ত হওয়ায়, বিভাবাদিও অলৌকিক হয়, সুতরাং এই অলৌকিক বিভাবাদি পদার্থ হইতে অলৌকিক রসোৎপত্তি হইতে বাধা নাই।'

'রস্যতে' 'আস্বাদ্যতে' ইতি রসঃ স্বাদনাখ্যঃ কশ্চিদ্ ব্যাপারঃ—অর্থাৎ আস্বাদনযোগ্য যা তাহাই রস। কেবলমাত্র আস্বাদনই রসের সার, আস্বাদনের অতিরিক্ত রসের অন্য কোনও বাস্তবিক সত্তা নাই। রসই একমাত্র কাব্যের জীবন, রসপূর্ণ প্রবন্ধই কাব্য, রসহীন অংশও ঐ প্রবন্ধ রসের সাহায্যেই রসবান্ হয়, তাহা হইলে ঐ নীরস অংশকেও কাব্য বলিয়া ধরিতে হইবে, রসাভাস থাকিলেও প্রকৃত কাব্য হইবে। রস, রসাভাস, ভাব ও ভাবাভাস প্রভৃতি কাব্যের আত্মা বা জীবন।

বিভাব—'রত্যাদ্যুদ্‌বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্য-নাট্যয়োঃ'—লৌকিকস্থানে যাহা রত্যাদির আবির্ভাবক, কাব্যে ও নাট্যে নিবেশিত হইলে তাহাই বিভাব বলিয়া কথিত হয়। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহাকে আশ্রয় করিয়া রসের আবির্ভাব হয়, সেই নায়ক এবং নায়িকাদি পদার্থই আলম্বন বিভাব বলিয়া কথিত হয়। যে পদার্থ আলম্বন বিভাব দ্বারা অঙ্কুরিত রসকে পরিস্ফুট করে তাহা উদ্দীপন বিভাব, যেমন, চন্দ্র, চন্দন ইত্যাদি।

অনুভাব—যাহা নিজ নিজ কারণ দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ রত্যাদিস্থায়িভাবকে সামাজিকের বোধগম্য করাইয়া দেয়। লৌকিক অবস্থাতে যে রত্যাদিস্থায়িভাবের কার্য তাহাই কাব্য অথবা নাট্যে নিবেশিত হইলে আলংকারিকদের মতে অনুভাব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেমন কটাক্ষাদি। সাত্ত্বিক ভাবকে ইহার মধ্যে ধরিতে হইবে।

ব্যভিচারিভাব—বিভাব ও অনুভাব হইতে বিশেষভাবে যাহা রসের পুষ্টিসাধন এবং স্থায়িভাবে যাহা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় এক একবার আবির্ভূত ও বিলীন হয় তাহাই ব্যভিচারিভাব। যেমন আবেগ, দৈন্য, নির্বেদ ইত্যাদি। ইহারই অপর নাম সঞ্চারিভাব।

স্থায়িভাব—অনুকূল হউক অথবা প্রতিকূল হউক, ভাবগুলি নিজেদের উপলব্ধির সময়, যে ভাবের বিলোপসাধন করিতে সক্ষম হয় না, সেই মূলীভূত

ভাবকে স্থায়িভাব বলা হয়। যেমন রত্যাদি। স্থায়িভাব সূক্ষ্মভাবে রসোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে।

নায়ক-ভেদ—ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত ও ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত। ইহাদের প্রত্যেকে আবার দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকূল ও শঠভেদে চারি প্রকার।

নায়কের সহায়াদি—চেট, বিট, বিদূষক, সখা, দূত ইত্যাদি।

প্রতিনায়ক—নায়কের চেয়ে নিকৃষ্ট গুণের হইবে প্রতিনায়ক।

নায়িকা-ভেদ—স্বীয়া স্ত্রী, পরস্ত্রী ও বহুভোগ্যা ভেদে তিন প্রকারের নায়িকা। পরকীয়া নায়িকা দুই প্রকারের—অপরের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা (কন্যা); যাত্রা প্রভৃতি মহোৎসবে নৃত্যগীতে আসক্তা বা ব্যভিচারিণী ও নির্লজ্জা বিবাহিতা পরকীয়া নায়িকা।

কন্যা—নবযৌবনা, লজ্জাশীলা এবং অবিবাহিতা যে স্ত্রী তিনিই কন্যা।

বহুভোগ্যা—সাধারণস্ত্রীরূপ নায়িকা অর্থাৎ গণিকারূপ নায়িকা।

ঐ সমস্ত নায়িকা আবার মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা ভেদে তিন প্রকার। প্রেমের অবস্থাভেদে এইসব নায়িকাদের আবার আটভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। স্বাধীনভর্তৃকা ২। খণ্ডিতা ৩। অভিসারিকা ৪। কলহান্তরিতা ৫। বিপ্রলব্ধা ৬। প্রোষিতভর্তৃকা ৭। বাসকসজ্জা ৮। উৎকণ্ঠিতা। তবে পরকীয়া নায়িকার অভিসারিকা, বিরহোৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা অবস্থা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অবস্থা দেখা যায় না।

প্রতি-নায়িকা—নায়িকা হইতে নিকৃষ্ট গুণশালিনী প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে প্রতিনায়িকা বলা যায়।

রসের শ্রেণী বিভাগ

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে রস দশ প্রকার, কাব্য-প্রকাশ-কার মম্মটভট্ট, অমর প্রভৃতির মতে রস আট প্রকার। 'সাহিত্য-দর্পণকার' বিশ্বনাথের স্বমতে রস আট প্রকার, তবে তিনি সর্ববাদিসম্মত বলিয়া ভরতমুনি প্রদর্শিত 'শান্ত' ও 'বাৎসল্য' রসকেও স্বীকার করিয়াছেন। অধিকাংশ আলংকারিকদের মতে রস দশ প্রকার। বিশ্বনাথের মতেও তাহা হইলে রস দশ প্রকার। প্রত্যেক রসেরই একটি করিয়া স্থায়িভাব আছে।

স্থায়িভাব—

> রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
> জুগুপ্‌সা বিস্ময়শ্চেত্যষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপি চ॥[১]

—'রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্‌সা, এবং বিস্ময় এই আটটি স্থায়িভাব এবং 'শম' এবং 'বাৎসল্য' নামে আরও দুইটি স্থায়িভাব ভরতমুনি বলিয়াছেন।

তারপর রসের কথা বলিতেছি—

> শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
> বীভৎসোঽদ্‌ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ॥[২]

অথ মুনীন্দ্রসম্মতো বৎসলঃ—

> "বৎসলশ্চ রস ইতি তেন স দশমো রসঃ।
> স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ॥"[৩]

—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত ও বাৎসল্য—এই দশ প্রকার রস, ইহাদের স্থায়িভাবও দশ প্রকার।

আলংকারিকগণের মতে কামোদ্রেকরূপ অর্থে 'শৃঙ্গ' শব্দ রূঢ়। শৃঙ্গের আবির্ভাব যে কারণে হয় এইরূপ যে রস তাহাই শৃঙ্গার, (শৃঙ্গ 'ঋ' ধাতু অন্) সম্ভোগেচ্ছা বিষয়ে জ্ঞানের প্রাপ্তি হইলে কাব্য দর্শন-শ্রবণের পর সামাজিকের হৃদয়ে যে রসের উৎপত্তি হয় তাহাই 'শৃঙ্গার' রস নামে অভিহিত হয়।

শৃঙ্গার রস দুই প্রকারের—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের মতে প্রথমে স্ত্রীলোকের অনুরাগের বর্ণনা করিয়া পরে সেই অনুরক্ত স্ত্রীর ইঙ্গিত প্রভৃতি দ্বারা জাত পুরুষের অনুরাগের বর্ণনা করা উচিত। বস্তুত পূর্বে পুরুষের অনুরাগ উপস্থিত হইলেও কাব্যে প্রথমে নায়িকার অনুরাগ দেখাইয়া পরে পুরুষের অনুরাগের বর্ণনা করা হয়। ইহাতে অনুরাগবর্ণনা অধিক মনোহারিণী হয়। স্ত্রীলোকের অনুরাগই সর্বত্র প্রথম হইবে এই মত ঠিক নয়।

সংস্কৃত আলংকারিকগণ বলিয়াছেন—দেবাদি-বিষয়া 'রতি' ভাবমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে, রস-পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে না।

---

১ সা. দ. ৩।১৭৯ ২ সা. দ. ৩।১৮১ ৩ সা. দ. ৩।২১৬

গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও তাহার প্রকারভেদ

চৈতন্যদেব গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রীসনাতনকে আদেশ দিলেন আচার, দর্শন ও ভক্তিস্মৃতি রচনা করিবার জন্য, আর শ্রীরূপকে নির্দেশ দিলেন বৈষ্ণবভক্তি ও বৈষ্ণব রস-শাস্ত্র প্রণয়ণ করিবার জন্য। রূপ গোস্বামী ভক্তি ও শৃঙ্গার রসকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে চৈতন্যদেব রূপের দ্বারা ইহাই করাইতে চাহিয়াছিলেন—"শ্রীরূপ দ্বারায় ব্রজে প্রেম-রসলীলা"। (চৈঃ চঃ)। তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে তত্ত্বদর্শনের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিলেন। বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীদের মধ্যে ইহাদের তিনজনের দানই সর্বাধিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে। রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'[১] নামক দুইটি গ্রন্থে ভক্তিরস ও বৈষ্ণব মতানুসারী অলংকারতত্ত্ব ও কাব্যদর্শন বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাহিত্য ও রসতত্ত্ব তাঁহার প্রবর্তিত ভাবাদর্শকে হুবহু অনুসরণ করিয়াছে। এই বই দুই-খানিতে শ্রীরূপ কৃষ্ণলীলা-ভাবনাকে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের রসাভিব্যক্তির পথে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। পরবর্তীকালে যাঁহারা গীতিকবিতায় অথবা গেয় ও পাঠ্য কবিতায় কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই বিশেষ করিয়া উজ্জ্বলনীলমণির অনুশীলন করিয়াছিলেন[২]। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচারের জন্য রূপ গোস্বামী গ্রন্থ দুইটি সংস্কৃত-ভাষায় লিখিয়াছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' বই দুইটিতে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা-ভাবনার যে দিশা দেওয়া হইয়াছে তাহা অনুসরণ করিয়াই কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'গোবিন্দলীলামৃত'[৩] কাব্যে নিত্যবৃন্দাবনে অর্থাৎ গোলকে রাধাকৃষ্ণের আট প্রহরিয়া নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন রাগমার্গের সাধকদের মানস অনুশীলনের জন্য।

শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থটি চারিটি বিভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বিভাগে আবার কয়েকটি করিয়া উপবিভাগ (লহরী) আছে। সাধারণ অলংকারশাস্ত্রের রীতি অনুসরণ করিয়াই শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন—"বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।

---

১ বহরমপুর, বোম্বাই ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে বিবিধসংস্করণে প্রকাশিত।

২ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

৩ বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপ হইতে (চৈতন্যাব্দ ৪৬৩) প্রকাশিত।

স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তি-রসো ভবেৎ।" অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ ইত্যাদি দ্বারা জাত স্থায়ী ভাব "কৃষ্ণরতি" বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা ভক্ত-হৃদয়ে (অলংকারশাস্ত্রের সহৃদয় বা সামাজিক) আস্বাদ্য অবস্থায় আনীত হইলে তাহা "ভক্তিরসে" পরিণত হয়[১]। কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই মত অনুসরণ করিয়াছেন—

প্রেমাদিক স্থায়ী ভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ পায় পরিণামে॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ী ভাব রস হয় মিলে এই চারি॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্বাস্বাদনে॥[২]

এই স্থায়ী ভাব "কৃষ্ণরতি" পরিকল্পনায় বৈষ্ণব আলংকারিকদের মৌলিকত্ব দেখা যায়। সাধারণ অলংকারশাস্ত্রে রত্যাদি স্থায়িভাবের আস্বাদনীয় বিপরিণাম শৃঙ্গারাদি রস। বৈষ্ণবেরা এই লৌকিক রতির অর্থকে অলৌকিক 'কৃষ্ণরতির' পক্ষে সম্প্রসারিত করিয়া তাহার রস-পরিণতি দেখাইয়াছেন। ১। লৌকিক অলংকার শাস্ত্রের মতে দেবাদিবিষয়া রতি 'ভাবে' পরিণত হইতে পারে কিন্তু আস্বাদনীয় রসে পরিণত হয় না। কিন্তু শ্রীরূপ অপূর্ব মনীষাবলে 'কৃষ্ণরতি'কে অলৌকিক ভক্তিরসে পরিণত করিয়াছেন। ভক্ত-হৃদয়ে সদ্‌ভক্তি-বাসনা অতিসূক্ষ্মভাবে বর্তমান থাকে, উদ্বোধনের কারণ ঘটিলে তাহা ভক্তিরসে পরিণত হয়। কৃষ্ণ-রতির বাসনা না থাকিলে ভক্তিরস সম্ভব নয়। যে ভাব বা বৃত্তি মানুষের হৃদয়ে চিরন্তন, যাহার ধ্বংস নাই, তাহাই স্থায়ী ভাব। ভক্ত-হৃদয়ে সদ্‌ভক্তির বাসনা স্বাভাবিক বৃত্তি। ইহা ইহজন্মার্জিত বা পূর্বজন্মার্জিত হইতে পারে।

পরমারাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব ভক্তের সব চেয়ে প্রিয়বস্তু। তাই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহাদের হৃদয়ের অনুরাগ স্বতঃ-প্রণোদিত এবং রতিরও সহজ প্রবণতা। পূর্ববর্তী আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ সাধারণ বা লৌকিক নায়ক-নায়িকার রতির সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন 'রতির্মনোঽনুকূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্[৩]—

১ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ২।৫।১৩২
২ চৈ. চ. মধ্যলীলা, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ
৩ সাহিত্য-দর্পণ, ৩।১৮০

'মনের সুখকর প্রিয় বস্তুতে চিত্তের যে অনুরাগ তাহাই রতি'। রূপ গোস্বামী সাধারণ রতির অর্থ সম্প্রসারিত করিয়া 'কৃষ্ণরতি'তে পরিণত করিয়াছেন। বৈষ্ণব আলংকারিকদের এই 'কৃষ্ণরতি' কিন্তু প্রাকৃত নহে, ইহা অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত ভাববৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা প্রকাশ করিবার জন্য বৈষ্ণব কবি ও আলংকারিককে মানুষী ভাষা ও সাধারণ অলংকার-শাস্ত্রের রীতিকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যে যে রসেরই বর্ণনা থাকুক না কেন, তাহার মূল সুর ভক্তিরসের। তাই এই কৃষ্ণ-রতির মুখ্য রসরূপ পাঁচটি হইলেও স্বরূপে রস একটিমাত্র—ভক্তিরস। রসৈকসিন্ধু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তমনের রতি প্রধানত পাঁচভাবে দেখা দেয়। তাই এই পাচ প্রকার রতির আস্বাদ্য বিপরিণাম পাঁচ প্রকার রসে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার। এই পাঁচটি রসের মধ্যে শ্রীরূপ প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্গার বা মধুর রসকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। লৌকিক অলংকার-শাস্ত্রের শৃঙ্গার রসকে ভোজদেব প্রাধান্য দিয়াছেন তবে রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব ভক্তির দিক হইতে 'নীলমণির' (শ্রীকৃষ্ণের) উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার রসকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। ইহাকে 'ভক্তিরসরাট্' বলা হইয়াছে।

বৈষ্ণব আলংকারিকদের 'ভক্তিরস' বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই—ইহার স্থায়িভাব 'কৃষ্ণরতি' (কৃষ্ণবিষয়া রতিঃ)। স্থায়িভাবের ব্যাখ্যা আগেই দেওয়া হইয়াছে। বিভাব দুইপ্রকারের—আলম্বন ও উদ্দীপন। কৃষ্ণরতির আলম্বন বিভাব শ্রীকৃষ্ণভাবের (বিষয়রূপে) নিজে আবৃত বা প্রকট ভাবে অথবা অন্যরূপে (বালকরূপ) এবং কৃষ্ণ-ভক্ত, "কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ। রত্যাদেঃ বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ"—। (ভাবের আধাররূপে) সাধক, সিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ ও সংপ্রাপ্তসিদ্ধ। কৃষ্ণরতির উদ্দীপন বিভাব—কৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, বংশী, ক্ষেত্রাদি। ("তত্রজ্ঞেয়া বিভাবাস্ত রত্যাস্বাদনহেতবঃতে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরাঃ) (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—২।১।১৪)। কৃষ্ণ রতির অনুভাব নৃত্য-গীত-বিলুণ্ঠিতাদি। সাত্ত্বিকভাব—স্নিগ্ধ-দিগ্ধাদি যাহা অন্তরের ভাবকে বাহিরে প্রকটিত করে।

সাধারণ অলংকারশাস্ত্রে স্তম্ভস্বেদাদি সাত্ত্বিক ভাবকে অনুভাবের মধ্যেই ধরা হইয়াছে কিন্তু এখানে আলাদা করিয়া দেখান হইয়াছে। 'সাত্ত্বিক ভাবাভাস' বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন রত্যাভাসভাব (বৈয়াকরণ, মীমাংসক) নিঃসত্ত্ব ও প্রতীপ (কংসাদি)।

কৃষ্ণরতি সম্বন্ধীয় ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব—নির্বেদ-বিষাদ-দৈন্যাদি।

ইহার পর ভাবের প্রাতিকূল্য, অনৌচিত্য, ভাবোৎপত্তি, ভাবসন্ধি, ভাবশবলতা ও ভাবশান্তি দেখান হইয়াছে। উল্লিখিত সমস্ত প্রকার ভাবেরই কৃষ্ণরতির দিক হইতে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রের আটটি মুখ্য ও দুইটি গৌণ রসের স্থায়ী ভাবকেই রূপ গোস্বামী স্বীকার করিয়া অন্যভাবে তাহার বিভাগ দেখাইয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণের প্রতি ভক্ত মনের রতি মুখ্যভাবে পাঁচ প্রকারে হইতে পারে। সুতরাং মুখ্যকৃষ্ণরতি পাঁচ প্রকার এবং মুখ্য রসও পাঁচ প্রকার[১], "শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর নাম। কৃষ্ণভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।" (চৈ. চ—মধ্য ১৯ পরিচ্ছেদ)। যেমন শান্তরসে স্থায়ী ভাব শম নামে কৃষ্ণরতি, দাস্যরসে স্থায়ী ভাব সেবা নামে কৃষ্ণরতি, সখ্যরসে স্থায়ী ভাব বিশ্রম্ভ নামে কৃষ্ণরতি এবং মধুর রসে স্থায়ী ভাব মধুর বা প্রিয়তা নামে কৃষ্ণরতি। শ্রীরূপ আরও সাতটি গৌণ রসের উল্লেখ করিয়াছেন।

১। শান্তরস

পরোক্ষ ও সাক্ষাৎকার ভেদে শান্তরস দ্বিবিধ; ইহাতে স্থায়ী ভাব হইতেছে 'শম' বা সান্দ্র নামে রতি বা শুদ্ধা 'কৃষ্ণবিষয়া রতি'। আলম্বন বিভাব-চতুর্ভুজ নারায়ণ কৃষ্ণ এবং সনকাদি ঋষি ও সাধারণ তাপস; উদ্দীপন বিভাব—ভাগবত, উপনিষদাদি শ্রবণ, সাধুসঙ্গ, নির্জনাবাস ইত্যাদি। অনুভাব—অবধূত বা সন্ন্যাসীর কার্য্যাদি। সাত্ত্বিকভাব—রোমাঞ্চ, স্বেদ, মূর্চ্ছাদি।

শান্তরসে ভক্ত-ভগবানে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে না। ভক্ত সর্বৈশ্বর্যশালী শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যবস্তু জানিয়া একান্ত নিষ্ঠায় তাঁহার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেন। বিষয়বাসনা অনিত্য ও তুচ্ছ মনে করেন ভক্ত। শান্তরসে ভগবানকে ভালবাসার কথা উঠে না। চৈতন্যোত্তর যুগে বিশুদ্ধ শান্তরসের বৈষ্ণব কবিতা তেমন রচিত হয় নাই। 'মোক্ষ' বা মুক্তিলাভ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শের অনুকূল নয়। বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, নরোত্তম প্রভৃতির প্রার্থনা-পদগুলিতে শান্তরস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১ রূপ গোস্বামী—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ২।১।১৬

বিদ্যাপতির প্রার্থনা-বিষয়ক পদ—

জতনে জতেক ধণ পাপে বটোরলুঁ
মেলি পরিজনে খায়।
মরণকে বেরি কোঈ ন পুছত
করম সঙ্গ চলি জায়॥
এ হরি বন্দোঁ তুঅ পদ নায়।
তুঅ পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥[১]

নরোত্তম দাসের প্রার্থনা-বিষয়ক পদ—

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর
হরি হরি বলিতে নয়নে ঝরে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥[২]

২। দাস্যরস বা প্রীত—

দাসত্ব (সংভ্রমপ্রীত) ও লালনীয়ত্ব (গৌরব প্রীত) ভেদে দাস্যরস দুই প্রকারের। ইহাতে স্থায়ী ভাব হইতেছে 'প্রীতি' বা আদর বা 'সেবা' নামে কৃষ্ণরতি। ভগবান্ প্রভু, ভক্ত তাঁহার সেবক বা ভৃত্য।

ইহাতে আলম্বন বিভাব—শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সেবকবৃন্দ—ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, উদ্ধব, দারুক, ব্রজের ও দ্বারকার ভৃত্যবৃন্দ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পুত্র।

উদ্দীপন বিভাব—শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, প্রসাদ ভক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের স্নেহাদি।

অনুভাব—আদেশ পালন, প্রণাম, ঈর্ষা-হীনতা, দীনতা ইত্যাদি।

সাত্ত্বিকভাব—স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব।

ব্যভিচারী ভাব—আলস্য,মদ, উগ্রতা ইত্যাদি ছাড়া সমস্ত কিছু।

এই 'দাস্যরতি' অবস্থাবিশেষে প্রেম, স্নেহ ও রাগে পরিণত হইতে পারে। শ্রীজীব গোস্বামী এই প্রীতিরসকে আশ্রয়ভক্তি, দাস্যভক্তি ও প্রশ্রয়ভক্তি এই

১ (বৈ. প., পৃ. ১৩১)   ২ বৈ. প. পৃ. ৫৪৩

তিন প্রকারে ভাগ করিয়াছেন। দাস্যরসে ভক্ত-ভগবানে ঈষৎ মমতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ভালবাসার সূচনা এইখান হইতে। ইহাতে পূর্ববর্তী রস শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা থাকিবে আর থাকিবে কৃষ্ণসেবা, শ্রীকৃষ্ণের অতুল বৈভব ভক্ত মনকে আকৃষ্ট করে। নরোত্তমের "সেবা দিয়া কর অনুচর"—পদখানিতে দাস্যের ভাব আছে। চৈতন্যোত্তর যুগে শুদ্ধ দাস্যরসের ভাল পদ পাওয়া যায় না।

নরোত্তম দাসের দাস্যভাবের পদ—

শ্রীরূপ মঞ্জরী দয়া করহ আমারে।
মিছা মায়াজালে পড়ি গেনু ছারে খারে॥
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনের ফুল গাঁথি দোঁহারে পরাব॥
সমুখে রহিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু চন্দন গন্ধ দুঁহু অঙ্গে দিব॥[১]

৩। সখ্যভক্তিরস (প্রেয়ঃ)

ইহাতে স্থায়ী ভাব বিস্রম্ভাত্মা কৃষ্ণবিষয়া সখ্যরতি।

বিভাব ('ক')—আলম্বন বিভাব—শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বয়স্য শ্রীদাম, অর্জুন প্রভৃতি। এই সখারা আবার সুহৃদ্, সখি, প্রিয়সখি, প্রিয়নর্মসখি পদবাচ্য হইতে পারেন। ('খ') উদ্দীপন—বয়স, বেণু ইত্যাদি। অনুভাব—ক্রীড়াদি। সাত্ত্বিক ভাব—স্তম্ভাদি।

ব্যভিচারী ভাব—আলস্য, উগ্রতা ছাড়া অন্য বত্রিশটি।

এই প্রেয়ঃ (সখ্যরস) প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগে পরিণত হইতে পারে। এখানে ভক্ত-ভগবানের মাঝে সমপ্রাণতা বিদ্যমান্, "সমপ্রাণঃ সখা মতঃ"। ভক্তের ও ভগবানের উভয়েরই ভালবাসা দেখা দেয় অর্থাৎ কেবল যে ভক্তই ভগবানের সেবা করেন তাই নয়, ভগবান্-ও ভক্তের সেবা করেন। ভক্তের মনে ভগবানের ঐশ্বর্যবোধ জাগ্রত থাকে না, থাকে পারস্পরিক বিশ্বাস। ইহাতে শান্তের কৃষ্ণ-নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা এবং সমপ্রাণতা বিদ্যমান্।

১ বৈ. প. পূ. ৫৪৩

বলরাম দাসের সখ্যভাবের পদ—

ধানশী

আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়।
শ্রীদামে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে লইয়া যায়॥
সুবল বলাই লইয়া চলিতে না পারে ধাইয়া
শ্রমজলধারা বহে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানুর সঙ্গে॥
কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তভু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাই কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম॥
মত্ত বলাইচাঁদে কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেডুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে
বলরাম দাস দেখি কয়॥[১]

উদ্ধবদাস—

"তোর এঁটো বড় মিঠে লাগে
খাইতে বড় সুখ পাই তেঞি তোর এঁটো খাই।
খেতে খেতে খেতে (মুখ) হৈতে
দিতে হইল ভাই রে॥[২]

৪। বাৎসল্য ভক্তিরস

ইহাতে স্থায়ী ভাব 'অনুকম্পারূপা' কৃষ্ণবিষয়া বৎসলরতি।
বিভাব ('ক') আলম্বন—কৃষ্ণ ও নন্দ, যশোদা, বসুদেব প্রভৃতি গুরুজন।
(খ) উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের বয়স, আকৃতি, বাল্যক্রীড়া ইত্যাদি।
অনুভাব—মস্তকাদি শরীর স্পর্শ, আশীর্বাদ ইত্যাদি।

১ পদকল্পতরু, ১১৯৭ ; বৈ. প. পৃ. ৭২৮) ২ (পদকল্পতরু, ১২৩০)

সাত্ত্বিকভাব—স্তম্ভস্বেদাদি, স্তনস্রবাদি।

ব্যভিচারিভাব—(সখ্যরসের মত), অপস্মার।

ইহা প্রেমবৎ ও রাগবৎ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। এখানে ভগবান্ সন্তান, ভক্ত পিতা বা মাতার মত তাঁহাকে মমতাবোধে লালন-পালন করিতেছেন। কখনও বা তাড়ন-ভর্ৎসনা করিতেছেন। ভগবানের ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ভক্তের মনে একেবারে থাকে না। ইহাতে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্রম্ভ আর থাকে লালন-পালনের মমত্ববোধ।

ভাটিয়ারী

বলরাম দাস—

হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে।
দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে॥
আর এক কথা বলি শুন হলধর।
যশোদা-নন্দন বলি না ভাবিহ পর॥
দূরে না লইহ ধেনু চরাইয় বাছুরি।
জোরে শিঙ্গা রব দিহ পরাণে না মরি॥
দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা।
নবনী লোভিত গোপাল পাছে আইসে একা॥
বলরাম দাসে কয় রাম সঙ্গে যাবে।
নয়ান গোচরে বাছায় সদাই রাখিবে॥[১]

৫। মধুর ভক্তিরস উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার রস

ইহাতে স্থায়িভাব মধুরা নামে 'কৃষ্ণরতি' বা প্রিয়তা (যাহা কৃষ্ণ ও গোপীদের মাঝে পরস্পর মিলন সংঘটন করাইয়া দেয়)।[২]

বিভাব (ক)—আলম্বন—কৃষ্ণ ও তাঁহার বল্লভা গোপীরা, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা, এখানে ভগবান্ (কান্ত), ভক্ত (কান্তা)। ভগবানকে কান্তভাবে ভজনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা।

---

১ (বৈ. প. পৃ. ৭২৭)

২ ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে এই রসের স্থায়ী ভাবকে মধুরা রতি বলা হইয়াছে।

(খ) উদ্দীপন—বংশীধ্বনি ইত্যাদি।

সাত্ত্বিকভাব—স্তম্ভাদি

ব্যভিচারিভাব—উগ্রতা আলস্য ছাড়া বাকি বত্রিশটি।

ভালবাসার প্রথম সূচনা দাস্যে, তারপর সখ্য-বাৎসল্যের মধ্য দিয়া ভালবাসা মধুররসে চরম পরিণতি লাভ করে। এখানে ভগবান্ কান্ত, ভক্ত নিজেকে কান্তা বলিয়া মনে করেন। ইহাতে শান্তের কৃষ্ণ-নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্রম্ভ, বাৎসল্যের লালন-পালন ও মধুরের কান্তভাব, এই পাঁচটির মিলনে গভীর ও আতিশয্যময় মধুর রস। মধুর রসে সকল রসের গুণ বর্ত্তমান্। এই মধুর রসই বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দের আলোচনায় মধুর রসকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সেই জন্যই মধুররস বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ মুখ্যরস।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে ভক্তিরসের অবস্থান কাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়? সেই সঙ্গে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বিভাবাদি অলৌকিক কিনা? এ সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামী 'প্রীতি-সন্দর্ভে' বলিয়াছেন—কৃষ্ণরতির বিভাবাদি ও স্থায়িভাব প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক, লৌকিক কাব্যের বিভাবাদি ও স্থায়িভাব হইতেছে লৌকিক, কেননা সাধারণ কাব্যে লৌকিক নায়ক-নায়িকার কথা বলা হইয়াছে, লৌকিক কাব্যের বিভাবাদি অলৌকিক বলিয়া প্রতিভাত হইলেও ইহা স্বাভাবিক নয়, কবির রচনা-চাতুর্য্যের জন্য উহারা অলৌকিক বলিয়া মনে হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন—'কৃষ্ণরতিতে (ভক্তিরসে) রসের অবস্থান কেবল যে সামাজিকে (এখানে 'ভক্তে') সম্ভব তাহা নয়। ইহা অনুকর্ত্তৃতেও (কখনও ভক্ত নিজে) সম্ভব হইতে পারে।[১]

---

১ "Jiva Goswami in his Priti-Samdarbha introduces further refinement into the accepted theory regarding the Origin and development of Rasa. He maintains, for instance that the alaukikatva of vibhāvas etc and of the Sthāyin is possible only in krṣṇ-rati, and not in the laukika kavyas which deal with love of ordinary heroes and heroins. If the vibhāvas etc appear as alaukika in an ordinary kāvyas, it is not natural, but is only due to the cleverness of the poet's composition. He also maintains that in krṣṇ-rati, the locus of the Rasa is not only in the audience (Sāmājika, here the Bhakta) but also in the alankārya, (the deity represented, viz. krṣṇa) and in the anukartṛ, who may sometimes be the Bhakta himself."
(Vaiṣṇava Faith and Movement—S. K. De)

মধুর ভক্তিরস বা শৃঙ্গার বা উজ্জ্বলরস

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ নানা জাতীয় ভক্তেরই অনুশীলীয়। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে কিন্তু রাগমার্গেই সংসক্তচিত্ত এবং মধুররসের ভক্তগণেরই আস্বাদনোপযোগী করিয়া মধুররস পৃথগ্‌ভাবে বিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা ও মাধুর্য্যলীলার মধ্যে মাধুর্য্যলীলারই শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীজীব গোস্বামী 'প্রীতিসন্দর্ভে' স্বীকার করিয়াছেন। অতএব মুখ্য রসগুলির মধ্যে মধুর ভক্তিরসই শ্রেষ্ঠ ও 'ভক্তিরসরাজ'। মধুর ভক্তিরসের এই গুরুত্বের জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী একটি পৃথক্ গ্রন্থে ইহার আলোচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের শৃঙ্গার রসের আদর্শেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের মধুর বা শৃঙ্গার ভক্তিরসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 'উজ্জ্বল' রসের নামটি ভরতের কাছ হইতে প্রাপ্ত। লৌকিক অলংকারশাস্ত্রের আদিরসকেই অপ্রাকৃত পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া রূপ গোস্বামী নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে সমগ্র অলংকারশাস্ত্রকে এক নূতন ব্যঞ্জনায় ভূষিত করিয়াছেন। অলংকারশাস্ত্রের আদিরসের সমস্ত ক্লেদকে দূরীভূত করিয়া 'কৃষ্ণরতির' অপ্রাকৃত বিভাবনার সাহায্যে অলৌকিক মধুর ভক্তিরস উপস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীরূপের ভক্তিতত্ত্ব (শৃঙ্গার-ভক্তিরস) আদিরসেরই নির্য্যাসমাত্র। ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় এই শৃঙ্গারভক্তিরসেরই প্রাধান্য। শ্রদ্ধাভক্তিহীন পাঠক বা শ্রোতার নিকট ইহা ইন্দ্রিয়-পারবশ্য বলিয়া মনে হইতে পারে।

"এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে। কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে।"[১]

পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অবনতির বীজ ইহার মধ্যে ছিল।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

'বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যতাং মধুরা রতিঃ।
নীতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তো মধুরাখ্যো মনীষিভিঃ।[২]

"(বক্ষ্যমান) বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচার প্রভৃতি ভাব দ্বারা মধুরা রতি আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইলে মনীষিগণ তাহাকে মধুরভক্তিরস বলেন।"

এই উজ্জ্বলরসের স্থায়িভাব 'মধুরা' বা 'প্রিয়তা' নামে 'কৃষ্ণরতি'। "মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগাদিকারণম্। মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা

১ (চৈ চ)

২ নায়ক ভেদ প্রকরণ ১।৩ উজ্জ্বলনীলমণিঃ

রতিঃ"—(জীব গোস্বামী)। কৃষ্ণের এই স্বানুভবরতি বিভাবাদির সাহায্যে ভক্তহৃদয়ে মধুরভক্তিরসের প্রতীতি সৃষ্টি করে। কৃষ্ণ-গোপীর প্রেমলীলায় এই রসের পূর্ণতম পরিপুষ্টি। উহার বিভাব দ্বিবিধ—আলম্বন ও উদ্দীপন। রতি-বিষয়ক আস্বাদনের হেতুর নাম বিভাব। আলম্বন বিভাব আবার দুই প্রকারের—বিষয় ও আশ্রয়। এই মধুর রসে কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীগণই ক্রমশঃ বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন, অর্থাৎ শক্তিমান্ ও শক্তি। রূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ নায়ক ও শ্রীরাধাকে আদর্শ নায়িকারূপে স্বীকার করিয়া উজ্জলরস বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রতি-নায়কের উপস্থিতি রসবিরোধী।

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥[১]
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী।[২]
অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকান ॥[৩]

অশেষ-কল্যাণ-গুণগণরত্নাকর শ্রীকৃষ্ণ এই মধুর রসের নায়ক। তিনি ধীরোত্তাদি ভেদে চতুর্বিধ। এই চতুর্বিধ নায়কও আবার মধুর রসে পতি ও উপপতি ভেদে দ্বিবিধ। বিপ্রাগ্নি সাক্ষী করিয়া যিনি বেদোক্ত বিধিমতে, কন্যার পাণিগ্রহণ করেন তিনি সেই কন্যার 'পতি'। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনী, সত্যভামাকে বিধিমতে বিবাহ করেন। যে সকল গোপ-কুমারীর শ্রীকৃষ্ণে পতিভাব হইয়াছিল তাহারাও পরিণীতা।

যিনি পরকীয়া নায়িকার প্রতি আসক্তিবশতঃ ধর্ম উল্লঙ্ঘন করেন এবং পরকীয়া রমণীগণের প্রেমের আশ্রয় হন তিনি উপপতি।

এই উপপতিভাবেই শৃঙ্গাররসের পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি বলিয়াছেন—'বহুবার্যতে খলু, যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ। যা চ মিথো দুর্লভতা, সা মন্মথস্য পরমা গতিঃ' —'যে রতির জন্য লোকতঃ ও ধর্মতঃ বহু নিবারণ, যে রতিতে পরস্পরের প্রচ্ছন্নকামুকতা এবং পরস্পরের দর্শন-স্পর্শন ও সম্ভাষণাদি বিষয়ে দুর্লভতা থাকে—তাহাকেই

---

১ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ২।১৭ শ্লোক
২ চৈ. চ. মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদ
৩ চৈ. চ. মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদ

কামের শ্রেষ্ঠা বা পরমশোভাময়ী রতি জানিবে।' কৃষ্ণদাস কবিরাজও পরকীয়া রসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।[১] সংস্কৃত রসশাস্ত্রে ঔপপত্যের লঘুতাই শুনা যায় কিন্তু রসনির্য্যাসের আস্বাদনহেতু অবতারী কৃষ্ণ ও গোপীগণে কখনই তাহা প্রযোজ্য নহে।[২]

মধুর রসে নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সহায় চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দক, প্রিয়নর্মসখ, দূতী, স্বয়ংদূতী, কটাক্ষ, আপ্তদূতী, বংশী। শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভাগণ কৃষ্ণতুল্য সুরম্যাঙ্গ, সর্বসুলক্ষণান্বিতা এবং মহাপ্রেম, মহামাধুরী ও বৈদগ্ধ্যাদির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। ইঁহারা দ্বিবিধা—স্বীয়া ও পরকীয়া। শ্রীকৃষ্ণের একশ আট মহিষী আছেন দ্বারকায়, তাঁহাদের মধ্যে রুক্মিনী ঐশ্বর্যে এবং সত্যভামা সৌভাগ্যে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছেন। কন্যকা ও পরোঢ়া ভেদে পরকীয়া দ্বিবিধা। গোপগণের বিবাহিতা হইয়াও যাঁহারা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সংযোগে লালসান্বিতা থাকেন এবং যাঁহাদের গর্ভে সন্তান হয়না—এই সকল ব্রজনারীকেই পরোঢ়া বলে। ধন্যা প্রভৃতি গোপকুমারীরাও শ্রীকৃষ্ণবল্লভা। ষোল হাজার গোপসুন্দরীর মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী শ্রেষ্ঠ, আবার এই দুইজনের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বাংশে উত্তমা।[৩] ইহারা সকলে নিত্যপ্রিয়া। শ্রীরাধা আয়ানের এবং চন্দ্রাবলী গোবর্ধন মল্লের স্ত্রী, অতএব কৃষ্ণের পরকীয়া। সংস্কৃত রস-শাস্ত্রে সাধারণী নায়িকা স্বীকার করা হইয়াছে। প্রাচীন আলংকারিকদের মতে সাধারণী (গণিকা) নায়িকাতে 'রসাভাস' হয় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে সাধারণী কুব্‌জাকে স্বীকার করিয়াছেন। ঐ ত্রিবক্রা কুব্‌জা সাধারণী হইলেও শ্রীকৃষ্ণে ভাবের সদ্‌ভাব নিবন্ধন 'কৃষ্ণবল্লভা' এবং 'পরকীয়াবৎ' বলিয়াই সম্মত। 'ভাবযোগাত্তু সৈরন্ধ্রী পরকীয়ৈব সম্মতা'—(রূপ গোস্বামী)। প্রাচীন সংস্কৃত অলংকারসম্মত নায়িকার নানা প্রকার সূক্ষ্ম বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে।

মধুর রসে নায়িকার সহায় সখী, দাসী, দূতী প্রভৃতি। শ্রীরাধার সখীরা —সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী। দূতী—স্বয়ংদূতী,

১ পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥ চৈ. চ. আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

২ লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥ উজ্জ্বলনীলমণি, নায়ক ভেদ প্রকরণ (২১)

৩ দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা সর্বথাধিকা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিসম্মোহনীপরা॥ বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র, চৈ. চ. আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত।

আপ্তদূতী। রাধাকৃষ্ণলীলায় সখীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অবস্থাভেদে ও নায়কের সহিত প্রেম-সম্পর্কে এই সব নায়িকার আট রকম অবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে—

১। অভিসারিকা—(সংকেতস্থানে নায়কের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা)

২। বাসকসজ্জা—(সজ্জিত হইয়া নায়কের জন্য অপেক্ষা)

৩। উৎকণ্ঠিতা—(নায়কের অনাগমনে হতাশা)

৪। বিপ্রলব্ধা—(নায়ক কর্ত্তৃক প্রতারণা)

৫। খণ্ডিতা—(নায়কের অন্য স্ত্রী সংযোগে দুঃখ)

৬। কলহন্তারিতা—(নায়কের সহিত কলহ)

৭। প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা—(নায়কের প্রবাসে দুঃখ)

৮। স্বাধীনভর্ত্তৃকা—(নায়ককে স্ববশে রাখা)

নায়িকাদের এই বিভাগগুলি লৌকিক রসশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া কল্পিত হইয়াছে। হরিবল্লভাদের ভক্তির দিক হইতে ভাগ করা হইয়াছে,—সাধনসিদ্ধা, নিত্যসিদ্ধা ও দেবী

মধুর রসের উদ্দীপন বিভাব—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণবল্লভাদের গুণাবলী এবং বসন্ত, চন্দ্র, মেঘ প্রভৃতি তটস্থ বস্তু।

মধুররসের অনুভাব— বাইশটি মানসিক অলংকার, সাতটি উদ্‌ভাস্বর ও বারটি বাচিক। মধুররসের সাত্ত্বিকভাব—সাত্ত্বিকভাবগুলিকে অনুভাবের মধ্যেই ধরিতে হয়। প্রাচীন অলংকারের স্বেদ, কম্পাদিও এখানে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্যভিচারিভাব—উগ্রতা, আলস্যাদি ছাড়া যাবতীয় বস্তু।

সাধারণী (গণিকা), স্বীয়া (পত্নী) ও পরকীয়া নায়িকাভেদে এই মধুরা 'কৃষ্ণরতি' তিন প্রকারের—সাধারণী রতি, সমঞ্জসা রতি ও সমর্থা রতি।[১]

সাধারণী রতি—ভাগবত পুরাণে বর্ণিত মথুরার কুব্‌জার প্রেম সাধারণ রতির দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কুব্‌জার একমাত্র ইচ্ছা—শ্রীকৃষ্ণের সুখসঙ্গ লাভ। (এই রতি অতিকায় হয়না, সেইজন্য নিকৃষ্ট। এই সাধারণী রতি প্রেম পর্য্যায় পর্য্যন্ত উঠিতে পারে।)

---

১ সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাসৌ সমর্থা চ।
কুব্জাদিষু মহিষীষু চ, গোকুলদেবীষু চ ক্রমতঃ॥ উঃ নঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৩।৩৬

সমঞ্জসা রতি—রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষীর এই রতি হইয়া থাকে। ইহাতে পত্নীভাবের অভিমান, এই রতিতে কৃষ্ণের সুখেচ্ছা ও কচিৎ নিজসুখ-স্পৃহা উভয়ই বর্তমান থাকে। এই রতি 'অনুরাগ' পর্য্যায় পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। ইহা নিবিড়া ও নিশ্চলা।[১]

যে রতি সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে, যে রতির সহিত সম্ভোগেচ্ছাটি সর্বথা তাদাত্ম্যরতিস্বরূপতাই প্রাপ্তি করে তাহাই 'সমর্থা' রতি। এই রতির উদয়ে কুল, ধর্ম, লজ্জা, ধৈর্য্যাদি বাধাবিঘ্ন নিঃশেষে বিস্মৃত হইতে হয়। ইহা নিবিড়তমা, সর্বাপেক্ষা মহাবিস্ময়োৎপাদিনী শোভাসম্পত্তি-বিশিষ্টা। ইহাতে স্বসুখের লেশমাত্র গন্ধও নাই এবং যাবতীয় মনোবাক্য-কায়-নিষ্পন্ন ব্যাপারই শ্রীকৃষ্ণ-সুখার্থেই অনুষ্ঠিত হয়। ব্রজসুন্দরীদেরই এই সমর্থা রতি দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীতেই এই সমর্থা রতির পরিপূর্ণ পুষ্টি দেখা যায়। এই সমর্থা রতি শ্রীকৃষ্ণবশিকরত্বহেতু বিস্ময়াবহ অর্থাৎ যাহার প্রভাবে ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় বৈষ্ণবীয় শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব 'সমর্থা' নামে মধুরা রতি। ইহাতে নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা, প্রতি-নায়িকা চন্দ্রাবলী। এই 'সমর্থা' রতি প্রোচ্ছলিত (বিবৃদ্ধ) হইয়া মহাভাবদশা প্রাপ্তি করে। এই-জন্য প্রধান ভক্তগণ ও বিমুক্তগণ এই সমর্থা রতিকেই অন্বেষণ করে কিন্তু প্রাপ্ত করিতে পারেন না।

উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্যবশত অবস্থাভেদে এই রতি (সমর্থা) দৃঢ়া (বদ্ধমূলা) ও বিঘ্নদ্বারা অপ্রতিহতা হইলে প্রেমে পরিণত হয়; এই প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপে পরিণত হয়, যেমন, ইক্ষুবীজ হইতে ইক্ষুদণ্ড, তাহা হইতে রস, পরে গুড়, পরে খণ্ড, তৎপরে শর্করা, তাহা হইতে সিতা ও তাহারও পরে উপলা বা ওলা হয়। রস হইতে ওলা পর্য্যন্ত ছয়টি উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্যবশতঃ ইক্ষুরই পরিণতি। এই রকম রতি হইতে প্রেম এবং প্রেমেরই বিলাস-স্নেহাদি ছয়টিকে 'প্রেম' শব্দে প্রায়ই শাস্ত্রকারগণ ব্যবহার

---

১ পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা।
কচিদ্ভেদিত-সম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা ॥ উঃ মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।৪৮

করিয়া থাকেন।[১] যে সমর্থা নায়িকার শ্রীকৃষ্ণে যে ধরণের প্রেম উৎপন্ন হয় শ্রীকৃষ্ণেরও সেই নায়িকাতে সেই ধরণের প্রেমই উদিত হয়।

রূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে প্রেমাদির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার রতির ধ্বংসকারণ উপস্থিত হইলেও সর্বপ্রকারে ধ্বংসরহিত যে নিশ্চলরূপে ভাববন্ধন তাহাকেই 'প্রেমা' বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়।[২]

এই প্রেম পরমা কাষ্ঠা (চরমাবধি) প্রাপ্তিকরতঃ চিত্তরূপ প্রদীপের প্রকাশ করিয়া হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিলে 'স্নেহ' নামে কথিত হয়। এই স্নেহের আবির্ভাবে দর্শনাদিতে কখনও তৃপ্তি বোধ হয় না।[৩]

যে স্নেহ উৎকর্ষ প্রাপ্তিপূর্বক যুগলকে নূতন মাধুর্য্য অনুভব করাইয়া স্বয়ং বাহিরে কৌটিল্য ধারণ করে তাহাকেই মান বলা হয়।[৪]

উপরিউক্ত মানই গাঢ় বিশ্বাস ধারণ করিলে 'প্রণয়'নামে কথিত হয়।[৫]

প্রণয়োৎকর্ষবশত যে স্থানে চিত্তে অতিদুঃখকেও অতিসুখরূপে অনুকূল করায়, তাহার নাম রাগ।[৬]

---

১ স্যাদ্‌দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্‌ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্‌।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
সঃ শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা॥
উজ্জ্বলনীলমণি : স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।৫৯-৬০

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ডসার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্মল ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥ (চৈ. চ. মধ্য. ২৩ পরিচ্ছেদ)

২ সর্বথাধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাব-বন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ উঃ মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।৬৩

৩ আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ।
হৃদয়ং দ্রাবয়েন্নেষঃস্নেহ ইত্যভিধীয়তে।
অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তিঃদর্শনাদিষু॥ উঃ মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।৭৯

৪ স্নেহস্তূৎকৃষ্টতাবাপ্ত্যা মাধুর্য্যমানয়ন্নবম্‌।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ উঃ মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।৯৬

৫ মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ। উঃ মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।১০৮

৬ দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥
উজ্জ্বলনীলমণিঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।১২৬

যে রাগ নবনবায়মান হইয়া সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও (নায়ক-নায়িকা) অননুভূতবৎ প্রতীয়মান করায়, প্রতিক্ষণে নবীনতা দান করে তাহাকেই অনুরাগ বলা হয়।[১]

এই অনুরাগে নায়ক-নায়িকার পরস্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতি অনুরাগ প্রকাশিত হয়। অনুরাগ নিজের অনুভাবাবস্থা প্রাপ্তিকরতঃ প্রকাশিত হইয়া যদি সজাতীয়াশয় সিদ্ধ ও সাধক ভক্তগণে ব্যাপ্তি করে অর্থাৎ যাহার অনুভবে তাঁহারাও অনুরাগে বিবশ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে বলে 'ভাব'।[২] এই 'ভাব' রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণেরও অতিদুর্লভ। কেবলমাত্র শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণেরই অনুভবগম্য, ইহাকে 'মহাভাব' বলে।[৩]

এই 'মহাভাব' অপার্থিব অমৃতের স্বরূপ-সম্পত্তি-বিশিষ্ট এবং নিজের ঐ রসামৃতস্বরূপের প্রতি মনকে (চিত্তবৃত্তিকে) আকর্ষণ করে অর্থাৎ নিজের সহিত ঐক্য প্রাপ্তি করায়। 'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়' ভেদে ঐ মহাভাব দ্বিবিধ। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব-বিকার যে স্থলে উদ্দীপ্ত হয় অতিকষ্টেও কিছুতেই গোপন করা যায় না তাহাকে 'রূঢ়' মহাভাব বলে।

এই অধিরূঢ় মহাভাব দুই প্রকার 'মোদন' ও 'মাদন'। যে অধিরূঢ় মহাভাবে নায়িকা ও নায়কের স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাবসমূহের উদ্দীপ্তির আতিশয্য প্রকাশ পায় তাহাকে মোদন বলে। এই মোদনই বিরহদশায় 'মোহন' নামে কথিত হয়। 'দিব্যোন্মাদ', উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি অনেক প্রকার ভেদ ইহাতে দেখা যায়। শ্রেষ্ঠ মোদন মহাভাব হইতেও অত্যুৎকৃষ্ট যে হ্লাদিনী নামক মহাশক্তির স্থিরাংশ—যাহা কেবল শ্রীরাধাতেই চিরকাল বিরাজ করে তাহাকে 'মাদন' বলে।[৪] এই মাদন কিন্তু ললিতাদিতেও উদয় হয় না। এই অনির্বাচ্য বিলক্ষণ 'মাদনাখ্য মহাভাব' সংভোগ কালেই উদয় লাভ করে, কিন্তু বিয়োগে নহে।

---

১ সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবো সোঽনুরাগ ইতীর্যতে॥ উঃ মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।১৪৬

২ অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ উজ্জ্বলনীলমণিঃ, স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।১৫৪

৩ মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ।
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যমহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥ উঃ মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।১৫৬

৪ হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥ চৈ. চ. আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ

শৃঙ্গার ভেদ

এই মধুর বা উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার ভক্তিরস দুই প্রকার—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ আবার চারিপ্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাবিশেষের অনুসরণে ব্রজসুন্দরীগণের বিরহাবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু বৃন্দাবনে নিত্যকালের (সদাকালের) জন্য রাসাদি বিবিধ লীলাবিনোদ-বিহার-পরায়ণ হরির সহিত ব্রজদেবীগণের কখনও বিরহ হয় না। ভাগবতে ও পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলাই সূচিত হইয়াছে। তিনি যুগপৎ দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনে নিত্যক্রীড়া করিতেছেন। এবং ইহাতে লীলাবিলাসের নিত্যতাই প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলায় বিরহ কিন্তু অপ্রকট নিত্যলীলায় বিরহ নাই। অপ্রাকৃত ভাব-বৃন্দাবনে ভক্তগণ মানস-নয়নে নিত্য-লীলা দর্শন করিতেছেন।

পূর্বরাগের দশ দশা—১। লালসা, ২। উদ্বেগ, ৩। জাগর্য্যা, ৪। তানব, ৫। জড়তা, ৬। ব্যগ্রতা, ৭। ব্যাধি, ৮। উন্মাদ, ৯। মোহ, ১০। মৃত্যু।

মান—মানের দুইটি উপবিভাগ, অহেতুমান ও নির্হেতুমান।

প্রেমবৈচিত্ত্য—বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অপূর্ব সৃষ্টি, লৌকিক অলংকারশাস্ত্রে দেখা যায় না।

প্রবাস বা বিরহ, ইহা তিন রকমের—ভাবী, ভবন্ ও ভূত (আবার কিয়দ্দূর বা অদূর ও সুদূর প্রবাস)।

সম্ভোগ অর্থে নায়ক-নায়িকার মিলন। ইহা মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ।

মুখ্য সংভোগ চারিপ্রকার—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। গৌণ সম্ভোগের ও স্বপ্নসম্ভোগের চারিটি ভাগ কল্পিত হইয়াছে।

এখন বিচার্য্য 'ভগবদ্ভক্তিকে' রসপর্য্যায়ে উন্নীত করা যায় কিনা অর্থাৎ 'ভক্তি' কাব্যরসের মত আস্বাদ্য হয় কিনা। "দেবাদি-বিষয়া রতি" কাব্যের শৃঙ্গার রসে পরিণত হয় না। কেন না, ইহাতে বিভাবাদির পরিপুষ্টি দেখা যায় না। তাছাড়া, নায়ক-নায়িকার পরস্পর অনুরাগরূপ রতিরও ইহাতে অভাব আছে। সেইজন্যই বলা হইয়াছে কাব্যের রসের মত 'ভক্তি' রস হিসাবে আস্বাদনীয় হইতে পারে না। রূপ গোস্বামী এই বিষয়টির আলোচনা করেন নাই। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী তাঁহার "প্রীতি-সন্দর্ভে" এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন ভগবদ্প্রীতির স্থায়িভাবের যোগ্যতা আছে, 'প্রীতি' হিসাবে ইহার 'ভাবত্ব' আছে এবং লৌকিক

স্থায়িভাবের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে বর্তমান আছে। তাছাড়া, সাধারণ দেবাদি-বিষয়া ('প্রাকৃতদেবাদিবিষয়া') রতির নিষেধ থাকিলেও কৃষ্ণরতি সম্বন্ধে নিষেধ হইবে না, কারণ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"।[১] 'কৃষ্ণরতি'র আস্বাদনীয় বিপরিণাম 'ভক্তিরস' লৌকিক কাব্যের আস্বাদ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত অলৌকিক, 'কৃষ্ণরতি'ই প্রকৃত এবং স্থায়ী আনন্দদান করিতে পারে। লৌকিক কাব্যের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। বৈষ্ণবদের 'কৃষ্ণভক্তিরস' ব্রহ্মাস্বাদতুল্য, লৌকিক রস হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। এই 'কৃষ্ণরতি'তে 'স্বরূপ-যোগ্যতা' 'পরিকর-যোগ্যতা' ও 'পুরুষ-যোগ্যতা' লৌকিক রতির সবধর্মই বর্তমান। লৌকিক 'রতি' যদি বিভাবাদি-যোগে রসে পরিণত হইতে পারে, তবে কৃষ্ণরতির পক্ষে তাহার সব রকমেই সম্ভব। অতএব 'কৃষ্ণরতি'ও 'রসে' পরিণত হইতে পারে অর্থাৎ 'ভক্তি' 'রস'-পদবাচ্য হইতে পারে।

রূপ গোস্বামী সাধারণ অলংকার শাস্ত্রের সংজ্ঞা, বর্ণনা ও আলোচনা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপূর্ব মনীষাবলে অলৌকিক বৈষ্ণব রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিবিধ গ্রন্থ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থাদি হইতেও উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 'ললিত-মাধব', 'বিদগ্ধ মাধব' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া রসতত্ত্বের প্রয়োগও দেখাইয়াছেন। অনেক সাধারণ নরনারীর প্রেমের কবিতাকেও তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার 'পদ্যাবলী' ও 'গীতাবলী' উল্লেখযোগ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই বৈষ্ণব রসতত্ত্বই বিচিত্র ও বিস্ময়করভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। রূপ গোস্বামীর গ্রন্থাদি রচিত না হইলে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনার এত প্রতিষ্ঠা হইত না এবং সংস্কৃত-বাঙ্গালা-ব্রজবুলিতে লিখিত পদাবলীর এত উন্নতি হইত না, এই সমস্ত কিছুর মূলে আছেন একজন। তিনি 'রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত' 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য'। তাঁহার লোকোত্তর জীবনই দিয়াছিল আসল প্রেরণা।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার ভক্তি আবেগমূলক। মহাভারতের ভক্তিকে স্বামিস্ত্রীর ভালবাসার আদর্শে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নারদ ও শাণ্ডিল্য ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তিকে 'প্রীতি' 'ভাব' 'রাগ' ও 'অনুরক্তি' বলিয়া মনে করা হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে জ্ঞান ও কর্ম হইতে প্রেমভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া

---

১ "এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৮

হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আদর্শ হইল—পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মানবীয় আবেগমূলক সম্বন্ধের মধ্য দিয়া বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের লীলাদর্শন।

ব্রজপরিকরগণ বিশেষ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ যেভাবে কৃষ্ণের সেবা করিতেন সেই 'গোপীভাব' অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ভক্ত ভাববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেমলীলা আস্বাদ করিয়া থাকেন।

এই মানবীয় আবেগমূলক প্রেমভক্তির আদর্শে পূর্ব-প্রচলিত কৃষ্ণকাহিনীকে নূতনভাবে বিন্যস্ত করিতে হইল। পৌরাণিক কৃষ্ণকাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়া হইল, মহাভারতের কৃষ্ণ-বাসুদেবকে নূতনভাবে গড়া হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে আপনার ভালবাসার ধন বলিয়া মনে করা হইল অর্থাৎ পিতামাতা যেমন সন্তানকে ভালবাসেন, সখা যেমন সখাকে ভালবাসে, ভৃত্য যেমন প্রভুকে ভালবাসে এবং বিশেষভাবে প্রণয়িণী যেমন প্রণয়ীকে ভালবাসে, সেইভাবে হৃদয়ের আবেগে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হইবে। ইহাই ভক্তজীবনের পরম পুরুষার্থ। শ্রীচৈতন্য রাধাভাবেই শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেন। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে সামান্য পরিবর্ত্তন আসিল। ভক্ত ব্রজগোপীদের সখীর অনুগভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিতেন। 'সখী'-অনুগ বা মঞ্জরীভাবে সাধনার কথা রঘুনাথ গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতে এই সাধনার কথাই পাই।

পুরাণের রাধাকৃষ্ণকাহিনী বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে সত্য বলিয়া গৃহীত হইল এবং পরবর্তীকালের কাব্যে, নাটকে চম্পূ ও স্তবাবলীতে এবং রসশাস্ত্রে ঐ প্রেম-কাহিনী বৈষ্ণব সাধনায় ও ধর্মে পরম ও চরম তত্ত্ব বলিয়া বিবেচিত হইল। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বৈষ্ণব শাস্ত্রে জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক বলিয়া মনে করা হইত না। বৃন্দাবনলীলা পরম সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভক্তবৈষ্ণব এই প্রেমলীলাই হৃদয়ে সদা জাগরূক রাখেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

রাধাকৃষ্ণকাহিনীর প্রাচীন রূপ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের রস ভাল করিয়া আস্বাদন করিতে হইলে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পদাবলীতে মুখ্যভাবে ব্রজের রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণের শৈশবাদি লীলা গৌণ। সেইজন্য রাধা ও কৃষ্ণের কাহিনী সম্বন্ধেও আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। সেই সঙ্গে বৈষ্ণবদর্শন বা পদাবলীর বৈষ্ণবতত্ত্বও জানিতে হইবে। পদাবলী সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনা রসমূর্তি লাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন, তাঁহার উপদেশ ও বাণীকে অবলম্বন করিয়াই বৃন্দাবনের গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের রূপ দিয়াছেন। সেইজন্য চৈতন্য-তত্ত্বকেও জানিতে হইবে। গৌরলীলা-পদাবলী বৈষ্ণব পদসাহিত্যের অঙ্গীভূত।

প্রথমে বিষ্ণু বা বিষ্ণু-কৃষ্ণ বা কৃষ্ণবাসুদেব বা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করি।

ভারতে কখন এবং কেমন করিয়া বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি হইল বলা সহজ নহে। বৈষ্ণবধর্মে কত বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত আছে তাহাও ঠিক করিয়া বলা যায় না। প্রাচীন সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ ও পুরাতত্ত্বের সাহায্যে খানিক দূর আলোচনা করিতে পারা যায়। ভগবান্ বিষ্ণুকে যিনি ভক্তি দিয়া উপাসনা করেন তিনিই বৈষ্ণব। ('সা অস্য দেবতা'—তিনি ইহার উপাস্য দেবতা—এই অর্থে 'বিষ্ণু' শব্দের উত্তর 'অন্' প্রত্যয়যোগে 'বৈষ্ণব' হইয়াছে)। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। সেখানে তিনি শ্রেষ্ঠত্বে ইন্দ্রের নিম্নে, সূর্যদেবতার অংশ।[১] আবার এখানেই দেখা যায় তিনি সূর্য্য, উষা প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিতেছেন।[২] তিনি 'মহদ্দেবতা' বলিয়া উক্ত হইলেও সর্বপ্রধান দেবতা নহেন। তিনি ইন্দ্রের ছোট ভাই 'উপেন্দ্র', ত্রিবিক্রম

---

১ 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্'
—এই (বিশ্ব) বিষ্ণু পরিক্রমা করিয়াছেন, তিনি তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছেন।
'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্'

২ 'উরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং জনয়ন্তা সূর্য্যমুষামগ্নিম্'

বামন। যজুর্বেদ সংহিতায় যজ্ঞকার্যে বিষ্ণুর উপাসনা দেখা যায়, এখানে তিনি যজ্ঞীয় দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। পরবর্তী সংহিতায় 'বৈষ্ণব' শব্দটি আছে, তবে বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় অর্থে, 'বিষ্ণুভক্ত' অর্থে নহে। ঋগ্‌বেদের পরবর্তীকাল হইতেই বিষ্ণুর প্রাধান্য লক্ষিত হয় এবং বৈদিক যুগ শেষ হইবার আগেই তিনি প্রধান দেবতায় পরিণত হইয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদে ভক্তির পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ উল্লেখ রহিয়াছে। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে মাতা, পিতা, সখা, ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। মানবীয় সম্পর্কের মধ্য দিয়া দেবতাকে উপাসনা করা হইয়াছে অর্থাৎ মানবীয় সম্বন্ধমূলক দেবভক্তিবাদ দেখা যায়। কিন্তু সেই ভয়মিশ্রা ভক্তি বা প্রেম বিষ্ণুর প্রতি নিবেদন করা হয় নাই। অন্যত্র বলিয়াছি যে উপনিষদে রাগমার্গীয় ভক্তির উল্লেখ দেখা যায়।[১] অবশ্য জ্ঞানযোগ ও ব্রহ্মবোধ অর্থাৎ জ্ঞানমার্গীয় শান্তভক্তির কথাই উপনিষদের মূল বিষয়। উপনিষদের শেষস্তরে বিষ্ণু যখন প্রধান দেবতা হইলেন, তখন হইতেই ভক্তির দ্বারা তাঁহার উপাসনা করা হইতে লাগিল, যদিও পূর্ব হইতেই বিষ্ণুর উপাসনার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল।[২]

বৈদিক সাহিত্যে দেখি দেবতাদের প্রতিমা ছিল না। যজ্ঞে বা পূজায় যে-সকল দেবতাকে আহ্বান করা হইত, তাঁহারা অলক্ষ্যে উপস্থিত হইতেন। অগ্নিদেবতা ছিলেন তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দূত বা প্রতিনিধি, যজ্ঞাগ্নিতে দেবতার উদ্দেশ্যে 'হবিঃ' অর্পণ করা হইত, অগ্নি তাহা যথাস্থানে পৌছাইয়া দিতেন। দেবতাদের আচরণ মানুষের মত বলিয়া কল্পনা করা হইত। তাঁহাদের মূর্তি তখনও সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নাই। যেটুকু আভাসে ইঙ্গিতে পাওয়া যায় তাহাতে দেবতার মানবরূপই আরোপিত। ভয়ঙ্কর ও বীভৎস দেবতা-কল্পনা বৈদিক দৈব-ভাবনায় ছিল না, যদিও বৈদিক রুদ্র দেবতা ভীষণ ও মধুর দুইরূপেই কল্পিত হইয়াছিল। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, প্রভৃতি দেবতাদের স্ত্রীরও উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—ইন্দ্রাণী, বরুণানী, অগ্নায়ী। রুদ্রের পত্নী হইতেছেন পৃশ্নি পরবর্তী কালে রুদ্রাণী। যজুর্বেদে বিষ্ণুর দুই স্ত্রী'র বা শক্তির নাম পাওয়া যায়—শ্রী ও লক্ষ্মী। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের 'পুরুষ-সূক্ত' যেন পরবর্তী কালের 'পুরুষ-অবতারের' ইঙ্গিতবহ।

১ 'প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পারিষক্তঃ পুরুষো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্'—বৃহদারণ্যক।
—'প্রেমিকা পত্নী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া পুরুষ যেমন আপন-পর ভুলিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ক।'

২ 'বিষ্ণোঃ সুমতিং ভজামহে'

ছান্দোগ্য উপনিষদে 'দেবকীপুত্র' কৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে 'বাসুদেবে'র নাম পাওয়া যায়, এখানে বিষ্ণুই বাসুদেব। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দে লেখা পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে বাসুদেব ও অর্জুনের উল্লেখ দেখা যায়। 'বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্'। বাসুদেবের ভক্ত 'বাসুদেবক' সম্প্রদায়ের কথা আছে, আর ভক্তির কথাও পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দের পাতঞ্জল-ভাষ্যে 'দেবকীপুত্র বাসুদেব' ও বৃষ্ণিবংশোদ্‌ভূত বাসুদেবকে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বলা হইয়াছে। কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় কোন কাব্য হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হইতেও দেখা যায়।

'সংকর্ষণ-দ্বিতীয়স্য বলং কৃষ্ণস্য বর্দ্ধতাম্'—'সংকর্ষণ-(বলরাম) সহায় কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি হউক'। 'জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ'—'কৃষ্ণ কংসকে বধ করিলেন'। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পাণিনির সময় হইতে বাসুদেবকে কেন্দ্র করিয়া ভাগবত ধর্মের বিকাশ হইয়াছিল। বৌদ্ধজাতকগুলির মধ্যে ঘটপণ্ডিত জাতকটি (৪৫৪) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘটপণ্ডিত জাতকের গাথাগুলিতে কৃষ্ণের শৈশবলীলার কিছু কথা আছে। এখানে বলরামের নাম ঘটপণ্ডিত এবং তিনি কৃষ্ণের কনিষ্ঠ। দুই ভাইকে কেশব বলা হইয়াছে। প্রাচীন জৈনশাস্ত্রেও কৃষ্ণ ও যদুবীরদের কাহিনী পাওয়া যায়। 'ঘোষাণ্ডী' (রাজপুতানা) শিলালেখ (খ্রীঃ পূঃ ২০০) ও 'নানাঘাট' শিলালিপিতে (খ্রীঃ পূঃ ২০০) 'সংকর্ষণ' ও 'বাসুদেবের' নাম পাওয়া যাইতেছে। তক্ষশীলাবাসী পরমভাগবত গ্রীকরাজ হেলিওডোরাস (খ্রীঃ পূঃ ২০০) ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি ভক্তিবশতঃ গরুড়ধ্বজ স্থাপন করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দে লিখিত অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে' শ্রীকৃষ্ণের বাল্য জীবনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

"খ্যাতানি কর্মানি চ যানি শৌরেঃ সুরাদয়স্তেষ্ববলা বভুবুঃ ॥"[১]

—'শৌরি যে সমস্ত প্রখ্যাত কর্ম করিয়াছিলেন তাহাতে দেবতাগণ অক্ষম'। গুপ্ত সম্রাটেরা নিজেদের 'পরম ভাগবত' বলিতেন।[২] কালিদাসের মেঘদূতে 'গোপবেশিবিষ্ণোঃ' ও গিরিগোবর্ধনের উল্লেখ আছে।[৩] বাণভট্ট 'ভাগবত' ও পাঞ্চরাত্র (বিষ্ণুভক্ত) সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতে বাসুদেব দেবকীনন্দন কৃষ্ণই প্রধান, তিনি বিষ্ণুর অবতার। ভীষ্ম ইঁহাকেই নারায়ণের

১ (বুদ্ধচরিত ১·৫০)
২ সমুদ্রগুপ্তের হরিষেণ প্রশস্তিতে 'বিষ্ণুগোপ' নামটি পাওয়া যায়।
৩ পূর্ব্বমেঘ, ১৫ শ্লোক।

অবতার বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। ভগবদ্গীতাতে কৃষ্ণ নারায়ণ একই ব্যক্তি। মহাভারতেই ধর্মগোষ্ঠী হিসাবে 'বৈষ্ণব' শব্দের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। গীতা ও মহাভারতে সাত্ত্বিক ভক্তির প্রকাশ দেখা যায়। মহাভারতে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে 'গোপীজনপ্রিয়' বলিয়া উল্লেখ করিলেও বৃন্দাবনলীলার কোন উল্লেখ নাই।[১] রামায়ণে কৃষ্ণের বাল্যলীলার উল্লেখ পাই—"প্রগৃহ্য গিরিং দোর্ভ্যাং বপুর্বিষ্ণোর্বিড়ম্বয়ন্" (লংকাকাণ্ড ৬৯·৩২)। এখানে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের কথা বলা হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারত ও গীতার কৃষ্ণ (বা বাসুদেব) কোথাও স্বয়ং নারায়ণ বা বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অংশাবতাব। তিনি মানবী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বৃষ্ণিবংশে আবির্ভূত। ক্রমে এই মানব কৃষ্ণবাসুদেবই বৈদিক বিষ্ণু বা বিষ্ণু-কৃষ্ণের সহিত কেমন করিয়া এক হইয়া গিয়াছেন, বলা যায় না। পরবর্তী-কালের ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতিতে উল্লিখিত কৃষ্ণলীলা ও গোপীকৃষ্ণলীলা উহার সহিত যুক্ত হওয়ায় তিনি প্রেমের দেবতায় পরিণত হইযাছেন। মহাভারতীয় ভগবান্ কৃষ্ণের লীলার সহিত কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা যুক্ত হওযায় ভাগবত ধর্ম বৈষ্ণবধর্মে রূপান্তরলাভ করিল। বিভিন্ন পুবাণগুলিতে যখন কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যাত হইতেছিল তখন তিনি আস্তে আস্তে মানবত্ব ত্যাগ করিয়া দেবত্বে এমন কি পরমতত্ত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন।

উপরে যে বিষ্ণু-কৃষ্ণকাহিনী ও বৈষ্ণবধর্মের উল্লেখ করা হইল তাহাতে রাধাব কোন উল্লেখ পাই না। মহাভারতে গোপীদের কথা আছে কিন্তু বৃন্দাবনলীলা বা রাধাব কোন উল্লেখ নাই। মহাভারতের খিল অংশ হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের রাসলীলা সংক্ষেপে বণিত হইযাছে, তাহাতে রাধা বা কোন 'প্রধানা' গোপীর কথা নাই।

---

১ আক্রম্যমানে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব ॥
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজজননাথার্তিনাশন।
কৌরবার্ণবমগ্নাং মাং উদ্ধরস্ব জনার্দ্দন ॥
মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, সভাপর্ব ৬৮ ৪১।৪২

বিষ্ণু-পুরাণের রাসলীলায় একজন 'কৃতপুণ্যা মদালসা' গোপীর উল্লেখ আছে, কিন্তু রাধার নাম নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বেদস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণে স্পষ্ট করিয়া রাধার নাম নাই যদিও গৌড়ীয় গোস্বামিগণ ভাগবতের ভিতরেই রাধার সন্ধান পাইয়াছেন। সেখানে আছে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত রাসক্রীড়ার মধ্যেই কোন এক প্রধানা গোপীকে লইয়া রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। গোপীরা বনমধ্যে কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া খেদের সহিত বলিয়াছিলেন—

'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥' শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৩০।২৪

—ইহা কর্ত্তৃক (এই গোপী কর্ত্তৃক) নিশ্চয়ই ভগবান্ হরি আরাধিত হইয়াছেন, যেজন্য গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীত হইয়া এই নিভৃতস্থানে তাহাকে আনয়ন করিয়াছেন।

'অনয়ারাধিত'—অংশটুকুতে রাধার কথা আছে বলিয়া বৈষ্ণবগণ মনে করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে পদ্মপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে রাধার কথা উল্লিখিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বিস্তারিত ভাবে দেখা যায়। কিন্তু এই পুরাণগুলির সময় সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। 'রাধাতত্ত্ব' সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করিতেছি। রাধা-বিষয়ক শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে দেখা যায়—প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাধার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। মনে হয় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই শ্রীরাধা বৈষ্ণবধর্মে ও দর্শনে প্রবেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী হইতেই রাধার উদ্ভব। ঐতিহাসিকগণ বলেন, আভীর গোপ-জাতির মধ্যে প্রাচীনকাল হইতেই নবযুবক কৃষ্ণ ও চপলা গোপযুবতীদিগকে লইয়া আদিরসাত্মক প্রণয়কাহিনী প্রচলিত ছিল। এই লৌকিক প্রেমকাহিনীটি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। উপাখ্যানটি গান ও ছড়ার আকারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে। সেকালের সামাজিক অথবা গার্হস্থ্য উৎসবাদিতে (প্রধানত মেয়েদের মধ্যে) যে আদিরসাত্মক গান গাওয়া হইত বা ছড়া আবৃত্তি করা হইত, তাহার নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা অনামিকা গোপী বা পরে রাধা। জয়দেব এই ধরণের গানকেই ভদ্রসাহিত্যের জাতে তুলিয়াছিলেন। এই ব্রজবিলাস গান প্রথমে বহুনারীবিষয়ক ছিল, তারপর একনারী বিলাসে পরিণত

হইলে সংস্কৃত সাহিত্যের আওতায় আসে। কালিদাস ব্রজপ্রেমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কোন আখ্যান-কাব্য রচনা করেন নাই।[১]

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের রাসলীলায় বহুগোপীর সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হইলেও একজন প্রধানা গোপীরও উল্লেখ সেই সঙ্গে পাওয়া যায়। ভাগবতের গোপীগীত বা ব্রজগোপীদেব বিরহসঙ্গীতগুলি কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। প্রাচীন যুগে কৃষ্ণগোপীকাহিনী লইয়া কোন আখ্যানকাব্য দেখা যায় নাই। কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন প্রেমগীতি সঙ্কলনে, লিপিতে ও সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহে। তাহার পর জয়দেবের যুগ হইতে কৃষ্ণকে লইয়া নূতন বৈষ্ণবধর্মের সূচনা হইবার পরও লোকব্যবহারে এই আদিরসাত্মক গানের ধারা মন্দীভূতভাবে চলিতেছিল। বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই আদিরসাত্মক কাহিনী পাই যদিও কৃষ্ণভক্তির সুর তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে।

প্রাচীন সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণলীলা তথা রাধার প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাই হালের প্রাকৃত গানের সংকলন-গ্রন্থ 'গাহাসত্তসঈ' (গাথা-সপ্তশতী) তে। গাথাগুলি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতদের ধারণা। কবিতায় রাধার নামও পাওয়া যায়—

'মুহ-মারুএণ তং কণ্‌হ গোরঅং রাহিআএঁ অবণেন্তো
এআঁণ বল্লবীণং অন্নাণ বি গোরঅং হরসি॥ ১/৮৯ (গাহাসত্তসঈ)

—'হে কৃষ্ণ, তুমি তোমার মুখমারুতদ্বারা রাধিকার চক্ষু হইতে ধূলি (অথবা গোধূলি) অপনীত করিয়া, পুরোবর্ত্তিনী অন্যান্য বল্লবী (গোপী) গণের (সৌভাগ্য) গৌরব বা গৌরতা হরণ করিতেছ।'

এখানে অন্যান্য গোপ-রমণীদের মধ্যে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়।

'অজ্জ বি বালো দামোঅরোত্তি ইঅ জম্পিত্র জসোআত্র।
কণ্‌হ-মুহ-পেসিঅচ্ছং নিহুঅং হসিঅং বঅ-বহুহি॥ ২/১২ (গাহাসত্তসঈ)

—'আজ পর্যন্তও দামোদর (কৃষ্ণ) (আমার নিকট) বালকই রহিয়া গিয়াছে—যশোদা এইরূপ বলিলে পর, ব্রজবধূগণ কৃষ্ণমুখ প্রতি নয়ন অর্পিত করিয়া গোপনভাবে হাসিলেন'।

---

১ কালিদাস 'মেঘদূতে' (পূর্বমেঘ, ১৫ শ্লোক) "গোপবেশিবিষ্ণোঃ" এর উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণের ব্রজলীলা বাক্‌শিল্পে প্রথিত হইবার আগে মূর্ত্তিশিল্পে সুপ্রচলিত হইয়াছিল। গুপ্তযুগে নির্মিত উৎকৃষ্ট গোবর্দ্ধনলীলার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় আড়বারগণের গানগুলিতে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনা আছে। সেখানে কৃষ্ণের প্রিয়তমা একজন প্রধানা গোপীর উল্লেখ পাইতেছি, তাঁহার নাম 'নাপ্পিনাই,, এখানে 'রাধা' নামটির উল্লেখ পাই না। রাগমার্গে ভজনশীল এই বৈষ্ণবগণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দ হইতে নবম শতাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই আড়বারগণ নিজদিগকে নায়িকা এবং বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে নায়ক মনে করিয়া রাগমার্গে ভজনা করিতেন। এই 'নাপ্পিনাই' গোপী কৃষ্ণের নিকট আত্মীয়া ও লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

প্রাচীন সংস্কৃত গল্পসংগ্রহ পঞ্চতন্ত্রে রাধার উল্লেখ দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দ হইতে রাধা ও অন্যান্য গোপীদের সহিত কৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা (সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা) রচিত হইতে দেখা যায়। এই প্রেমকাহিনীটি কবিদের খুব প্রিয় ছিল। ত্রিবান্দ্রম হইতে প্রকাশিত কবি ভাসের নামে প্রচলিত 'বাল-চরিত' নাটক কৃষ্ণের ব্রজলীলার কাহিনী লইয়া রচিত। নাটকটি এই সময়ে রচিত বলিয়া মনে হয়।

পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে দণ্ডায়মান যুগলমূর্তিটিকে কৃষ্ণ ও রাধার (বা রুক্মিনীর) মূর্তি বলিয়া ধরা হয়। তাহা হইলে কৃষ্ণের ব্রজলীলার কথা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের পূর্বেই প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

অষ্টম শতাব্দে রচিত ভট্টনারায়ণের 'বেণী-সংহার' নাটকের নান্দীশ্লোকে কালিন্দী-পুলিনে রাসের সময়ে কেলি-কুপিতা অশ্রুকলুষা রাধিকা এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের অনুনয়ের উল্লেখ রহিয়াছে—

> কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎজ্য রাসে রসং
> গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
> তৎপাদ-প্রতিমানিবেশিত-পদস্যোদ্‌ভূতরোমোদ্‌গতে-
> রক্ষুন্নোঽনুনয়ং প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ॥

(বেণী-সংহারের নন্দীশ্লোক)

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের মধ্যভাগে লিখিত 'গৌড়বহো' কাব্যের মধ্যে একটি কবিতায় (১.২২) শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে শ্রীরাধার নখ ও চুড়ির দাগলাগার কথা আছে;

'ধ্বন্যালোক' নামক অলংকারগ্রন্থে আনন্দবর্ধন একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকটি রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। আনন্দবর্ধন নবম শতকের

লোক, তাহা হইলে শ্লোকটি তাহারও পূর্বে রচিত। বৃন্দাবন-প্রত্যাগত কোন সখাকে মথুরাপ্রবাসী কৃষ্ণ বলিতেছেন—

তোষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্ ॥
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষং পল্লবাঃ ॥ (২/৬ ধ্বন্যালোক)

—'ভাই, গোপবধূগণের সেই বিলাসের অনুকূল এবং রাধার গোপনতার-সাক্ষী কালিন্দী তীরবর্তী লতাগৃহগুলির কুশল? স্মরশয্যাকল্পন-বিধির জন্য ছেদনের প্রয়োজন না থাকায় মনে হয়, এখন সেই পল্লবগুলি শুকাইয়া জীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।[১]

'নলচম্পূ' রচয়িতা ত্রিবিক্রমভট্ট ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটনৃপতি তৃতীয় ইন্দ্রের নৌসরি লিপি রচনা করেন। উহার একটি দ্ব্যর্থক শ্লোকে রাধা ও কৃষ্ণের কথা পাই। 'শিক্ষিত-বৈদগ্ধ্যকলাপ-রাধাত্মিকা পরপুরুষে মায়াবিনি কৃতকেশিবধে রাগং বধ্নাতি'—"কলাকৌশলে চতুরা রাধা পরমপুরুষ মায়াময় কেশিহন্তার প্রতি অনুরক্ত ॥[২]

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় 'বা' সুভাষিতরত্নকোষ' খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সংগৃহীত বলিয়া অনেকে মনে করেন, সংগ্রহকারের নাম বিদ্যাকর। তিনি পরম সৌগত (বুদ্ধোপাসক) ছিলেন। সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার এই সংকলনের কয়েকটি কবিতায় কেবল যে কৃষ্ণরাধার কথা আছে তাহাই নহে, এই কবিতাগুলির ভাব, রস ও প্রকাশভঙ্গি পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।

কোঽয়ং দ্বারি হরিঃ প্রযাহ্যুপবনং শাখামৃগেনাত্র কিং
কৃষ্ণোঽহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণ কথং বানরঃ।
মুগ্ধেঽহং মধুসূদনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পাসবাং
ইত্থং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীনো হরিঃ পাতু বঃ ॥

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ২১; সদুক্তি-২৭৭

"দ্বারে ও কে"? 'হরি"—'উপবনে যাও, বানরের এখানে প্রয়োজন কি? 'প্রিয়ে, আমি কৃষ্ণ'। 'বড় ভয় করিতেছে। বানর কি কালো হয়! 'বোকা

১ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় (সুভাষিতরত্নকোষ)—অসতীব্রজ্যা ৫০১।
২ "নলচম্পূ"

মেয়ে, আমি মধুসূদন, 'যাও তবে ফুল ফুটিয়াছে যে লতায়'—এইভাবে প্রিয়ার দ্বারা বাক্যহারা হইয়া লজ্জিত হরি তোমাদের রক্ষা করুন।[১]

এই ভাবের পদ বৈষ্ণবপদালীতেও দেখা যায়।

আর একটি পদে দেখি—

> ময়ান্বিষ্টো ধূর্ত্তঃ স সখি নিখিলামেব রজনীম্
> ইহ স্যাদত্র স্যাদিতি নিপুনামন্যামভিসৃতঃ।
> ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভূবি ন গোবর্দ্ধনগিরের্
> ন কালিন্দ্যাঃ (কুলে) ন চ নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ॥

কবীন্দ্রবচন—হরিব্রজ্যা ৩৪।

—'সখি', এখানে থাকিতে পারে, ওখানে থাকিতে পারে, অন্য নারীর অভিসারে মিলিতে পারে—এই ভাবিয়া আমি সারারাত ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সেই ধূর্তকে খুঁজিয়াছি। কিন্তু মুরারিকে কোথাও দেখিতে পাই নাই—ভাণ্ডীরতলে নয়, গোবর্দ্ধন তটভূমিতে নয়, কালিন্দীর কূলে নয়, বেতস কুঞ্জে নয়।'

বিরহিনী রাধা সখীকে পাঠাইল কৃষ্ণের খোঁজ করিতে, কিন্তু কোথাও কৃষ্ণকে পাওয়া গেল না। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দেখি—অনেক দিন হইতে কৃষ্ণের দেখা নাই, রাধা বড়ায়িকে পাঠাইয়াছে বৃন্দাবনের নানাস্থানে রাধার খোঁজ করিতে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের বৈষ্ণব পদাবলীতে এই ধরণের বহু পদ পাওয়া যায়।

আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দে লিখিত মালবরাজ বাক্‌পতি মুঞ্জের তিনখানি অনুশাসনে রাধার বিরহে সন্তপ্ত কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ অভেদ অর্থাৎ কৃষ্ণই পরম দেবতা।

> যল্লক্ষ্মীবদনেন্দুনা ন সুখিতং যন্নার্দিতং বারিধে—
> র্ব্বারা যন্ন নিজেন নাভিসরসপদ্মেন শান্তিঙ্গতম্।
> যচ্ছেষাহিফণাসহস্র-মধুরশ্বাসৈ র্ন চাশ্বাসিতম্
> তদ্‌রাধাবিরহাতুরং মুররিপোর্ব্বেল্লদ্‌বপুঃ পাতু বঃ॥[২]

—'লক্ষ্মীর বদনেন্দু দ্বারা যাহা সুখিত হইতেছে না, বারিধির বারি দ্বারা

১ অনুবাদ—ডাঃ সুকুমার সেন।

২ (**The Indian Antiquery, 1877, ৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য**)

যাহা প্রশমিত নয়, নিজের নাভিসরসীপদ্মদ্বারাও যাহা শান্তিপ্রাপ্ত হয় নাই, যাহা শেষ সর্পের ফণাসহস্রের মধুর শ্বাসের দ্বারাও আশ্বাসিত হয় নাই এমন যে মুররিপুর রাধা-বিরহাতুর কল্পিত বপু তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।[১]

কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর নিকট লক্ষ্মীর প্রেম হইতে রাধার প্রেম শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইতেছে।

একাদশ শতাব্দে ভোজরাজ তাঁহার 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে' রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক একটি পদ 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদটি বৈষ্ণোক লিখিত। জৈনগ্রন্থকার হেমচন্দ্র দ্বাদশ শতাব্দে রচিত তাঁহার কাব্যানুশাসন গ্রন্থেও এই শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন—

কনকনিকষস্বচ্ছে রাধাপয়োধরমণ্ডলে
নবজলধরশ্যামামাত্মদ্যুতিং প্রতিবিম্বিতাম্।
অসিতসিচয়প্রাপ্ত-ভ্রান্ত্যা মুহুর্মুহুরুৎক্ষিপন্
জয়তি কলিতব্রীড়াহাসঃ প্রিয়াহসিতো হরিঃ॥ (কবীন্দ্রবঃ—৪৯)

—'শ্রীকৃষ্ণের নবজলধরশ্যামদ্যুতি শ্রীরাধার কনককলসতুল্য স্বচ্ছপয়োধরে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া যিনি উহাকে কালো কাপড় ভ্রমে বারংবার সরাইবার চেষ্টা করিলে রাধা হাসিয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাহাতে লজ্জা পাইয়া হরিও নিজের ভুল দেখিয়া হাসিয়াছিলেন সেই ক্রীড়াহাস্যের জয় হইক।

হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসন গ্রন্থের প্রাকৃত অংশে একটি অবহট্‌ঠ শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের কথা আছে।

হরি ণচ্চাবিউ পঙ্গণই বিম্হই পাডিউ লোউ।
এবহিঁ রাহ-পওহরঁহ জং ভাবই তং হোউ॥[২]

—'প্রাঙ্গণে (উঠানে) হরিকে নাচান হইতেছে, তাহাতে সকল লোক বিস্মিত হইয়া গেল। এখন রাধার পয়োধর সম্বন্ধে যাহা ভাবা হইয়াছে তাহাই হউক।[১]

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দে সংকলিত প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ-প্রকীর্ণ-কবিতার সংগ্রহ 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলে' রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক আছে। কবিতাগুলির কিছু অংশ তাহার পূর্বেই রচিত। একটি শ্লোকে কৃষ্ণের নৌকা-বিলাস কাহিনীর উল্লেখ দেখি।

১ অনুবাদ—ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত।
২ হেমচন্দ্র—কাব্যানুশাসন

অরে রে বাহহি কাণ্‌হ ণাব ছোড়ী
ডগমগ কুগতি ণ দেহি।
তই ইথি ণঈহি সন্তার দেই
যো চাহসি সো লেহি॥ ৯ ॥[১]

—'হে কৃষ্ণ, তুমি ছোট নৌকা বাহিতেছ, অস্থিরভাবে নৌকা চালনা করিয়া সংকটে ফেলিও না। স্ত্রীলোক আমাদিগকে নদী পার করিয়া দিয়া তুমি যাহা চাও তাহাই লও।'

এখানে রাধার নাম না থাকিলেও অনুমান করা চলে।

জিণি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআসিঅ
মুটি্‌ঠ অরিটি্‌ঠ বিণাস করু
গিরি তোলি ধরু।
জমলজ্জুণ ভঞ্জিঅ পঅভর গঞ্জিঅ
কালিঅকুল সংহার করু
জসে ভুবণ করু॥
চাণুর বিহণ্ডিঅ ণিঅকুল মণ্ডিঅ
রাহা-মুহ-মহু পাণ করে
জণি ভমর বরে।
সোই তুম্হ ণারায়ণ বিপ্পপরাঅণ
চিত্তহি চিন্তিঅ দেউ বরা
ভবভীই হরা॥ ২০৭

—'যিনি কংসকে বিনাশ করিয়া কীর্তি প্রকাশিত করিয়া মুষ্টি ও অরিষ্টিকে বিনাশ করিয়া গিরিগোবর্দ্ধন তুলিয়া ধরিয়াছেন, যিনি জমলার্জুনকে ভঙ্গ করিয়া পদভরে কালীয়কুলকে সংহার করিয়া কীর্তিতে ত্রিভুবন পূর্ণ করিয়াছেন, যিনি চাণুরকে বধ করিয়া রাধার মুখমধু পান করেন—সেই বিপ্রভক্ত নারায়ণকে তোমরা হৃদয়ে চিন্তা কর, তিনি তোমাদিগকে ভবভীতি-হর বর দান করুন।'

এখানে নারায়ণ ও কৃষ্ণ এক হইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা, ফল, ভবভয়হরণ; প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার উল্লেখ পাই।

১ প্রাকৃত—পৈঙ্গল, ৯

গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী'তে একটি অবহট্‌ঠ কবিতা আছে। এই কবিতাটিতে রাধাকৃষ্ণ লীলার যে ইঙ্গিত আছে, তাহা গীত-গোবিন্দ ও বৈষ্ণবপদাবলীর প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ।

রাই দোহড়ী পঢ়ণ শুণি হসিউ কণ্‌হ গোআল।
বৃন্দাবণঘণকুঞ্জঘর চলিউ কমণ রসাল ॥[১]

—'রাধার ছড়া আবৃত্তি শুনিয়া কৃষ্ণগোপাল হাসিল এবং রসাল পদক্ষেপে বৃন্দাবনের নিবিড়-কুঞ্জগৃহে চলিল।'

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দে রচিত রামতর্কবাগীশ সংকলিত 'প্রাকৃত-কল্পতরু' গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবহট্‌ঠ কবিতা আছে।

'রাহীউ বালাউ জুআণু কণ্‌হু
কীলন্ত আলিঙ্গই কণ্‌হ গোবী।'

—'রাধিকা নবযুবতী, কৃষ্ণ নবযুবক, কৃষ্ণ ও গোপী (রাধা) আলিঙ্গনাদি দ্বারা খেলা করিতেছে।'

লোক-প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী হইতে বিষয়বস্তু লওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

লক্ষ্মণসেনের সভাকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য 'আর্য্যা-সপ্তশতী' রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বন করিয়া তিনি কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছেন।

"মধুমথনমৌলিমালে সখি তুলয়সি তুলসি। কিং মুধা রাধাম্‌।
যত্তব পদমসদীয়ং সুরভিয়িতুং সৌরভোদ্ভেদঃ ॥

(আর্য্যাসপ্তশতী ৪৩৩।)

—'মধুমথ কৃষ্ণের মস্তকের মালারূপা হে সখি তুলসী, তুমি কি করিয়া নিজেকে রাধার সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেছ, যেহেতু তোমার পরিমলের উদ্রেক (রাধার) চরণকে সুরভিত করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।'

আর একটি কবিতায় দেখা যায় কৃষ্ণ বংশীনাদে গোপীদের মনোহরণ করিতেছেন।

মধুমথনবদনবিনিহিত-বংশীসুষিরানুসারিণো রাগাঃ।
হন্ত হরন্তি মনো মম নলিকাবিশিখাঃ স্মরস্যেব ॥

(আর্য্যাসপ্তশতী—৪৩৯।)

—"(কোন গোপী বলিতেছে) মধুমথনের (কৃষ্ণের) বদনস্থিত বংশীর

১ গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরীতে উদ্ধৃত

ছিদ্র হইতে যে সুমিষ্ট স্বর (রাগিনী) বিনির্গত হইতেছে তাহা মদনের শরের মত, হায়, আমার মনোহরণ করিতেছে।"

নিম্নের এই কবিতায় দেখা যায়—কৃষ্ণের বা বিষ্ণুর নিকট লক্ষ্মীপ্রেম হইতে রাধা-প্রেম অধিক স্পৃহনীয়। পরবর্তী কালে কৃষ্ণপ্রেমে রাধা লক্ষ্মীকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। রাধা দেবী পর্য্যায়েও উন্নীত হইয়াছেন দেখা যায়।

"লক্ষ্মী-নিঃশ্বাসানল-পিণ্ডীকৃতদুগ্ধজলধিসারভুজঃ।
ক্ষীর-নিধিতীর-সুদৃশো যশাংসি গায়ন্তি রাধায়াঃ॥'

(আর্য্যাসপ্তশতী—৫১১।)

"—ক্ষীরসাগরতীরে উপবিষ্ট সুন্দরীগণ লক্ষ্মীর উষ্ণ নিঃশ্বাসের দ্বারা (রাধার প্রতি বিষ্ণুর আসক্তি দেখিয়া) পিণ্ডীকৃত দুগ্ধসাগরের সার ভক্ষণ করিয়াও রাধার যশোগান করিতেছে। (অর্থাৎ লক্ষ্মী রাধাকে সপত্নী ভাবিতেছে।")

গোবর্ধনাচার্য্যের "আর্য্যাসপ্তশতী" শৃংগাররসপ্রধান কাব্য। তিনি পরকীয়া নারীর প্রেমের কথাই বেশী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জয়দেব কাব্যটির খুব প্রশংসা করিয়াছেন। কবি গোবর্ধন গোপীকৃষ্ণ লইয়া যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে কাব্য রস ছাড়া কোন অতিরিক্ত তত্ত্ব (বৈষ্ণব তত্ত্ব) নাই। কবি রাধাকৃষ্ণ বা গোপীকৃষ্ণপ্রেমকে পার্থিব নরনারীর সমপর্য্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এই সময়ে আশা করা যায় না। তবে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার মত যে গোপীদের সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলায় ক্রমশঃ রাধার প্রাধান্য সূচিত হইতেছে এবং কৃষ্ণের নিকট রাধা-প্রেম যে লক্ষ্মী প্রেম হইতে শ্রেষ্ঠ তাহারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহ 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সমাপ্ত হয় ১২০৭ ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে। সংকলনকারী শ্রীধর দাসের পিতা ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের বন্ধু ও রাজপ্রতিনিধি। শ্রীধর নিজেও ছিলেন একজন রাজকর্মচারী। রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে সংকলনটির কয়েকটি কবিতা বিশেষ মূল্যবান্। ইহাতে যে সকল বৈষ্ণব কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইগুলিতে দাস্য, বাৎসল্য, মাধুর্য প্রভৃতি প্রায় সকল রসের কবিতাই পাওয়া যায়। জয়দেব গোষ্ঠীর কবিকুলই এই সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বাংলার সেনরাজারা বৈষ্ণব ছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে লক্ষ্মণসেন ও

('কংসনিধন'), চতুর্ভুজের 'হরিচরিতকাব্য' (১৪৯৩), পদ্মনাভের 'হরিবিলাসকাব্য' (১৩৫০), বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত', কৃষ্ণভট্টের নাটক মুরারি-বিজয় (১৬৮৪ খৃঃ)., শেষকৃষ্ণের নাটক 'কংসবধ' ইত্যাদি। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বহু কবিতা রচিত হইয়াছিল। 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' আমরা তাহার পরিচয় পাই। এ থেকেই আমরা বুঝিতে পারি জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দে হঠাৎ কি করিয়া 'নিপুণকাব্যকলা-মণ্ডিত' ও 'রাধাকৃষ্ণ-লীলারসসমৃদ্ধ' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, জয়দেবের পূর্ব হইতে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলাসমন্বিত বৈষ্ণব কাব্য কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা বোঝা যায় রূপগোস্বামীর সংকলিত পদ্যাবলীতে। গোড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে এই সমস্ত কবিতার অশেষ মূল্য রহিয়াছে। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' আকস্মিক ঘটনা নহে, বেশ স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অনেক দিন হইতেই তাহার প্রস্তুতি চলিতেছিল। জয়দেবের সময় হইতেই রাধাকৃষ্ণকাহিনী ও উপাসনার দিক্ পরিবর্তন হইল। নূতন যুগের সূচনা হইল।

রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর পরবর্তী রূপ

জয়দেবেবের 'গীতগোবিন্দ কাব্য' রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি আলোকস্তম্ভ। জয়দেবের কাব্যে 'রাধা' পূর্ণমর্য্যাদায় সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিতা, শুধু জয়দেব কেন, জয়দেবের যুগের কাব্যেই রাধার প্রতিষ্ঠা। জয়দেবের কাব্যে আমরা কাব্যরস ও রাধাকৃষ্ণের লীলারস বা উপাসনা দুইএরই পরিচয় পাই। জয়দেবও তাঁহার কাব্যের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥ (গীত-গোবিন্দে ১।৩)

"যদি হরিস্মরণে মনকে সরস করিতে চাও, আর যদি বিলাস-কলাসমূহে কুতূহল থাকে, তবে এই জয়দেব-ভারতী মধুর কোমল ও কান্তপদাবলী শোন।" জয়দেব কেবল সাহিত্য রসিকদের জন্য কাব্য লিখেন নাই। জয়দেবের সময়ে আদিরসাত্মক রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত ছিল। সদুক্তি-

কর্ণামৃতে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। নরনারীর প্রেম-কবিতার সমপর্য্যায়েই কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী লইয়া অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, কোন বিশিষ্ট ধর্মীয় মতবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহারা কবিতা রচনা করেন নাই। জয়দেবও সেই ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেরও সূচনা দেখা যায়। পরে শ্রীচৈতন্যের অনুমোদনের ফলেই তিনি 'গোস্বামী' পদবীতে উন্নীত হইয়াছেন এবং তাঁহার 'গীতগোবিন্দ' বৈষ্ণব পদাবলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। বিল্বমঙ্গল মনে-প্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন, সেই বৈষ্ণবদৃষ্টিতে লীলা-প্রসার এবং লীলা-আস্বাদনের জন্যই তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, জয়দেবের কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে, মাঝে মাঝে ঐশ্বর্য্য-লীলাও দেখা যায়।

বাঙ্গালা দেশে ইহার পর রাধাকৃষ্ণকে লইয়া বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দে রচিত বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। বড়ুচণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক গ্রাম্য প্রণয়-কাহিনী অবলম্বন করিয়াছেন। কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলারও বহু উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেকে বলেন শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত রাধাকৃষ্ণ লীলার কথাও ইহাতে আছে। রাধাকৃষ্ণের এই স্থূল প্রণয়কাহিনীকে অনেকে আবার বৈষ্ণব ভাবাদর্শে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দামোদর গুপ্তের 'কুট্টনীমতম্' গ্রন্থে বর্ণিত বিকরলা নাম্নী কুট্টনীর বর্ণনার সহিত বড়াইয়ের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণারত্নাকরে কুট্টনীর যে বর্ণনা আছে তাহাতে বড়াইর প্রতিচ্ছবি পাই। মনে হয় প্রাচীন কামশাস্ত্রে বর্ণিত কুট্টনীর চরিত্রের আদর্শ ও লোকজীবনের আদর্শ, উভয়ের মিলনে বড়াই চরিত্র।

তাহার পর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণকাহিনীর পরিণত রূপ দেখিতে পাই। চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রীচৈতন্যের পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী অপ্রাকৃত ভাববৃন্দাবনের প্রেমলীলায় রূপান্তরিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর দিব্যজীবন ও সাধনার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও আমরা সেই সুরই লক্ষ্য করি। শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর প্রভাবেই বাঙ্গালা সাহিত্যে অজস্র বৈষ্ণব পদ রচিত

হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে।

আমরা দেখিলাম রাধাকৃষ্ণের লৌকিক আদিরসাত্মক প্রেমকাহিনীই আস্তে আস্তে দিব্য প্রেমলীলায় পরিণত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের হৃদয়-অনুমোদনের দ্বারা আদিরসের ক্লেদ এই প্রেমকাহিনী হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়াছে এবং মানব জীবনের পরম ও চরম প্রাপ্তিতে পরিণত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীর কথাও স্মরণ করিতে পারি। তিনি কেবল বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিকোণ হইতে পদাবলী রচনা করেন নাই। তাঁহার পদাবলীতে বিলাসকলা ও বৈষ্ণবতা উভয়ই দেখা যায়। জয়দেবের সময় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ হইতে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব পর্য্যন্ত বহু কবি সংস্কৃত-প্রাকৃত-আবহট্‌ঠ ও আধুনিক ভাষায় বৈষ্ণব পদ লিখিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে কিছু সংখ্যক সংস্কৃত বৈষ্ণব কবিতা সংগ্রহ করিয়াছেন।

কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

অকস্মাৎ একস্মিন্ পথি সখি ময়া যামুনতটং
ব্রজন্ত্যা দৃষ্টোঽয়ং নবজলধরশ্যামলতনুঃ।
স দৃগ্‌ভঙ্গ্যা কিং বা কুরুতে ন হি জানে তত ইদং
মনো যে ব্যালোলং ক্বচন গৃহকৃত্যে ন বলতে॥

জয়ন্তস্য

"সখি, একদিন যমুনাতটের দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ পথে নবজলধরতনু শ্যামকে দেখিলাম। সে কটাক্ষের দ্বারা কি করিল জানি না, তারপর হইতে আমার মন চঞ্চল হইয়াছে, গৃহকাজে আর মন বসে না।"

অপর একটি পদে দেখি—

রাধা উদ্ধবের দ্বারা মথুরায় কৃষ্ণের কাছে নিবেদন পাঠাইতেছেন।—

আস্তাং তাবদ্ বচন-রচনাভাজনত্বং বিদূরে
দূরে চাস্তাং তব তনুপরীরম্ভসম্ভাবনাপি চ।
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণতিভিরিদং কিন্তু যাচে বিধেয়া
স্মারং স্মারং স্বজনগণনে কাপি রেখা মমাপি॥

"সাক্ষাতে পরস্পর বাক্যালাপ করিবার অবকাশ দূরে থাক, তোমার তনুস্পর্শ লাভের সম্ভাবনা সুদূর হোক। কেবল বার বার প্রণতি করিয়া

তোমার নিকট এইমাত্র যাজ্ঞা করিতেছি—তুমি স্বজন-গণণার কালে আমার নামেও একটি রেখা টানিও।"

সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছে :—

মা মন্দাক্ষং কুরু গুরুজনাদ্ দেহলীং গেহমধ্যাদ্
এহি ক্লান্তা দিবসমখিলং হন্ত বিশ্লেষতোঽপি।
এষ স্মেরো মিলিত-মৃদুলে বল্লবীচিত্তহারী
হারী গুঞ্জাবলিভিরলিভির্লীঢ়গন্ধো মুকুন্দঃ॥

—"কৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছে। একবার দেখিয়া লও। গুরুজনের উপস্থিতিতে লজ্জা করিও না। সমস্ত দিন কৃষ্ণকে না দেখিয়া ক্লান্ত, দেহলীতে দাঁড়াও। মৃদুলে, ঐ অলিলীঢ়-গন্ধ-গুঞ্জামাল্যবান্ গোপীচিত্তহারী মুকুন্দ প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।"

শ্রীরূপের "গীতাবলী" শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে দেখা হইবার পূর্বেই রচিত।

কালিদাস ভবভূতি অমরু প্রভৃতি বহু কবির সাধারণ পার্থিব প্রেম-কবিতাও পদ্যাবলীতে বৈষ্ণবভাবাদর্শে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পূর্ববর্তীকালে রচিত একান্তভাবে মানবীয় প্রেমের কবিতাও রাধাকৃষ্ণের নামেও চলিতে লাগিল। পরকীয়া নারীর প্রেমের এই কবিতাটি নির্জনে সখীর প্রতি রাধার উক্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে। শ্রীরূপের নিজের একটি কবিতাতে সেইভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত শ্লোকটি গূঢ়ভাবব্যঞ্জক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কবিতাটি মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশে অসতী নারীর প্রেমের উদাহরণ হিসাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ পৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

(কাব্য-প্রকাশ ১।৪ ; সদুক্তিক ২।১২।৩, পদ্যাবলী-৩৮৬)

—"যে আমার কৌমারহর (যে আমার কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিল) সেই (আজ) আমার বর, আজও সেই চৈত্র নিশি, সেই বিকশিত মালতীর সুরভি, সেই কদম্ববনের পরিণত বা বর্ধিত বায়ু, আমিও সেই আছি, তথাপি সেই রেবানদীতটের বেতসীতরুতলে যে সব সুরতব্যাপারের লীলাবিধি তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে"।

এই ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া রূপগোস্বামী একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুর-মুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥ পদ্যাবলী-৩৮৭

—"হে সহচরি, সেই প্রিয় কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে, আমিও সেই রাধা, সেই আমাদের সঙ্গমসুখ, কিন্তু তথাপি যে বনমধ্যে মধুর মুরলীর পঞ্চমস্বরের খেলা হইত সেই কালিন্দীপুলিনবিপিনের জন্য আমার মন স্পৃহা করিতেছে।" "যঃ কৌমারহর" শ্লোকটির ঠিক পূর্বেই আর একটি শ্লোক দেখা যায়।

কিং পাদান্তে লুঠসি বিমনাঃ স্বামিনো হি স্বতন্ত্রাঃ
কঞ্চিৎকালং কচিদভিরতস্তত্র কস্তেঽপরাধঃ।
আগস্কারিণ্যহমিহ ময়া জীবিতং ত্বদ্বিয়োগে
ভর্তৃপ্রাণাঃ স্ত্রিয় ইতি নমু ত্বং মমৈবানুনেয়ঃ॥ পদ্যাবলী-৩৮৫
সদুক্তিকঃ ২।৪৭।১, (ভাবদেব্যাঃ)

—"বিমনা হইয়া কেন আমার পাদান্তে পতিত হইতেছ? স্বামীরা হইলেন স্বতন্ত্র, কিছুকালের জন্য কোথাও তাঁহারা অভিরত হইয়া থাকিতে পারেন, এ ব্যাপারে আর তোমার অপরাধ কি? এখানে আমিই হইলাম অপরাধিনী, কারণ তোমার বিয়োগেও আমি বাঁচিয়া আছি। স্ত্রীগণ হইল ভর্তৃপ্রাণ, সুতরাং তুমিই হইলে আমার অনুনেয়।" এইভাবে বহু পার্থিব প্রেমের কবিতাকে বৈষ্ণব কবিতা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই সব প্রাচীন কবিতাগুলির মধ্যে আমরা আর একটি কথা দেখিতে পাই। রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে আদিরসাত্মক কবিতা যেমন রচিত হইয়াছে তেমনি লক্ষ্মী-নারায়ণ ও শিব-পার্বতী সম্বন্ধেও বহু শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য ও কবিতা রচিত হইয়াছে। ক্রমে শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতায় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার প্রাধান্য ঘটিতে থাকে। তাহার কারণ রাধাকৃষ্ণ বা গোপীকৃষ্ণের এই রাখালিয়া প্রেম কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে উপযোগী ছিল। তাছাড়া, বাঙ্গালার সেন রাজারা বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের প্রভাব বাঙ্গালীদের চারিপাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কবিরা রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কবিতাতে দেবলীলা ও মানবপ্রেমকথা সমভাবেই বলিতে পারিয়া আনন্দিত হইতেন। এইভাবেই ক্রমশঃ রাধাকৃষ্ণলীলার

প্রাধান্য ঘটে এবং পরে 'কানুছাড়া গীত নাই' অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল। শিব দেবতার প্রাধান্যও কম ছিল না, অনুমান করা যায় একটি বাঙ্গালা প্রবাদ বাক্যে, "ধান ভান্‌তে শিবের গীত।"

আমাদের বক্তব্য এই যে, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গালা দেশে কেবল জয়দেব এবং চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ-লীলোপখ্যান রচনা করিয়াছিলেন তা নয়, তাঁহার বহু পূর্ব হইতেই বহু বৈষ্ণব কবিতা রচিত হইতেছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পদাবলী আলোচনা করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ঃ শ্রীচৈতন্যের 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'

(ক) বাঙ্গলাদেশে বিষ্ণু-কৃষ্ণকাহিনী ও ভক্তি-বাদ ॥

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন বুঝিতে হইলে বাঙ্গালাদেশে প্রাক্‌-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ জানা প্রয়োজন।

প্রথমে আমরা বাঙ্গালাদেশে বিষ্ণু-কৃষ্ণের কাহিনী ও ভক্তিযোগের কথা আলোচনা করিতেছি। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে শুশুনিয়া (বাঁকুড়া) পর্ব্বতগাত্রে চক্রস্বামীর সেবক পুষ্করণার অধিপতি চন্দ্রবর্মার উল্লেখ আছে। বাঙ্গালাদেশে চক্রস্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন ইহাই। পুষ্করণার রাজা সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার কৃতি চক্রস্বামীর দাসমুখ্যের দ্বারা উৎসর্গীকৃত।[১]

ইহা হইতে ধারণা করা চলে যে বাঙ্গালাদেশে তখন পর্যন্ত শ্রীমদ্‌ভাগবতের আদর্শ অনুযায়ী কৃষ্ণলীলা স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে পরম ভাগবত গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে বাঙ্গালাদেশে আট দশখানি ভূমিদান-পত্র ('তাম্রশাসন') পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি হইতে বোঝা যায় যে বাঙ্গালা দেশে বিষ্ণু-উপাসনা খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকে অন্যতম অংশাবতার রূপে দেখা হইত। পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে একটি 'যুগলমূর্তি' পাওয়া গিয়াছে। পুরুষ মূর্তিটি কৃষ্ণের, নারী মূর্তিকে অনেকে 'রাধা' বলিয়া মনে করেন। ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে, ভট্টনারায়ণ বাঙ্গালাদেশের কবি বলিয়াই পণ্ডিতদের ধারণা। পালরাজগণ বিষ্ণু-নারায়ণকে শ্রদ্ধা করিতেন। নারায়ণ পাল বিষ্ণু মন্দির ও গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ

---

১ "পুষ্করণাধিপতে র্মহারাজ-সিংহবর্মনঃ পুত্রস্য মহারাজশ্রীচন্দ্রবর্মন: কৃতি: চক্রস্বামি-দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ।"

করিয়াছিলেন।[১] রামপালের মহামন্ত্রী প্রজাপতি নন্দীর পুত্র, সন্ধ্যাকর নন্দী একটি 'রামচরিত' কাব্য[২] লিখেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতৃভূমি ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর। কবি বৈষ্ণব ছিলেন, শিবেরও পূজা করিতেন, তাই কাব্যের প্রথম শ্লোকে শিবের ও কৃষ্ণের বন্দনা পাই।

"শ্রীঃ শ্রয়তি যস্য কণ্ঠং কৃষ্ণং তং বিভ্রতঃ ভুজে নাগম্।
দধতং কং দামজটাবলম্বং শশিখণ্ডমণ্ডনং বন্দে" ॥

—"লক্ষ্মী যাঁহার কণ্ঠাশ্রিত (অথবা কৃষ্ণশোভা যাঁহার কণ্ঠে), কৃষ্ণ যিনি ভুজে কালিয়নাগকে ধরিয়াছেন (অথবা যাঁহার হস্তে ফণিবলয়) যিনি সুন্দর বন (মালাধারী) অথবা যিনি সুন্দর জটাজুটধারী ও বর্হাপীড় অথবা (শশিকলামণ্ডিত) তাঁহাকে বন্দনা করি।" ইহা হইতে ধারণা করিতে পারি খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দ হইতে পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা প্রাধান্য পাইতে থাকে এবং বৈষ্ণব ভক্তিবাদও ধীরে ধীরে প্রচারিত হইতে থাকে।

শাসনে বিষ্ণুকৃষ্ণের বন্দনা আসাম-বাঙ্গালায় বর্মরাজাদের সময় হইতে মিলিতেছে।[৩] কামরূপের বনমালবর্মের শাসনে (নবম শতাব্দের মধ্যভাগ) কৃষ্ণলীলার উল্লেখ আছে। সমতটের ভোজবর্মের শাসনেও (ঢাকা জেলার বেলাবো গ্রামে প্রাপ্ত) ব্রজলীলার স্পষ্ট উল্লেখ আছে (খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দ)।

"সোঽপীহ গোপীশত-কেলিকারঃ
কৃষ্ণো মহাভারত-সূত্রধারঃ।
অঘঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ
প্রাদুর্বভুবোদ্ধৃতভূমিভারঃ ॥"

(ভোজদেবের তাম্রশাসন)

—"সেই গোপীশত-কেলিকার, মহাভারত নাট্যের সূত্রধার, পরমপুরুষ কৃষ্ণ এখানে ভূমিভারোদ্ধারকারী অংশাবতার রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।[৪] এখানে শ্রীকৃষ্ণকে কেবল যে মহাভারত-সূত্রধার বলা হইয়াছে তাহা নয়, তাঁহাকে 'শ্রীমদ্‌ভাগবতের' "গোপীশত-কেলিকার" বলা হইয়াছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ পরম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতায় পরিণত হন নাই। তাঁহাকে "অংশাবতার"

---

১ নারায়ণ পালের মন্ত্রী ভট্টগুরব মিশ্রের প্রশস্তি (গৌড়লেখমালা)।

২ শ্রীহরপ্রসাদশাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত। দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত।

৩ কামরূপশাসনাবলী (পদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত)

৪ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডাঃ সুকুমার সেন।

বলা হইয়াছে। হরিবর্মের (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দ) মহামন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের নিবাস ছিল রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামে। ইনি ভুবনেশ্বরে বিরাট মন্দির, দীঘি ও উদ্যান নির্মাণ করাইয়া অনন্ত-বাসুদেব-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রশস্তিটি মন্দিরের দেওয়ালেই পাওয়া গিয়াছে। প্রশস্তির প্রথমে বিষ্ণু-বন্দনা।

গাঢ়োপগূঢ়-কমলাকুচকুম্ভপত্র-মুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ।
মা লুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি বাগ্দেবতোপহসিতোঽস্ত হরিঃ শ্রিয়ে বঃ॥
(ভট্টভবদেবের প্রশস্তি)

—"কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করায় তাঁহার কুচকুম্ভপত্রলেখার ছাপ যাহাতে লাগিয়াছে এমন বপুর দ্বারা আলিঙ্গনেচ্ছু হইলে "অভিনব বনমালা যেন নষ্ট না হয়", এই বলিয়া সরস্বতী যাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন, এমন হরি তোমাদের মঙ্গলের হেতু হন।"

সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন বরেন্দ্র ভূমিতে দেবমন্দির, সরোবর ও উদ্যান নির্মাণ করাইয়া প্রদ্যুম্নেশ্বর (মন্দির) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (দেওপাড়া প্রশস্তি)। সশক্তি শিব ও বিষ্ণুমূর্তি এখানে পূজার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল বিজয়সেনের এই প্রশস্তির রচয়িতা মহামন্ত্রী উমাপতি ধর। তিনি বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনেরও মহামন্ত্রী ছিলেন। সেনরাজারা শৈব ও বৈষ্ণব ছিলেন লক্ষ্মণসেন তো পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়' বা সুভাষিত-রত্নকোষের কবিতাবলী খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের পূর্বেই সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহার কতকগুলি কবিতাকে বাঙ্গালী কবির রচনা বলিয়া বেশ বোঝা যায়। গ্রন্থটি বাঙ্গালা দেশে সংকলিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। আমরা আগেই কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, ইহার কতকগুলি শ্লোক কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক এবং বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ। লক্ষ্মসেনের মন্ত্রী বটুকদাসের পুত্র শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলন' করেন (১২০৭ খ্রীঃ)। ইহাতে বাঙ্গালী কবি রচিত অনেক রাধাকৃষ্ণ, শিব-পার্ব্বতী ও লক্ষ্মী-নারায়ণ সম্বন্ধীয় কবিতা দেখিতে পাই। ইহাতে পুরাণ-বর্ণিত বিষ্ণু-কৃষ্ণলীলা, রাধাকৃষ্ণলীলা এবং লোক-প্রচলিত আদিরসাত্মক রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী উভয়েরই বর্ণনা পাই। তাহার পর আমরা রাধাকৃষ্ণলীলার পূর্ণরূপ পাই জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দে'। 'গীত-গোবিন্দে' যেভাবে রাধকৃষ্ণের মধুরলীলা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় বাঙ্গালা দেশে যেন ক্রমশঃ বিষ্ণু-উপাসনা মন্দীভূত বা অপ্রচলিত হইতেছিল এবং লোকপ্রচলিত

আদিরসাত্মক রাধাকৃষ্ণকাহিনী উচ্চতর সাহিত্যেও আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। ইহার সহিত ভাগবতোক্ত গোপী-কৃষ্ণলীলাও কবিদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। বলিতে গেলে দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে জয়দেবের যুগেই সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের মধুরলীলার প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্মণসেনের সভাকবিবৃন্দ ও অন্যান্য কবিকুল একাজে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন চেদিরাজ কর্ণদেবের সহিত যে সকল কর্ণাটদেশীয় লোক বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই বাঙ্গালা দেশে 'ভাগবত পুরাণ' প্রচার করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন নিজেকে 'কর্ণাটদেশীয় ক্ষত্রিয়' বলিয়াছেন। দক্ষিণ দেশ হইতেই মধুররসাশ্রিত ভক্তিধর্মের জোয়ার আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। লক্ষ্মণসেনের মহামন্ত্রী উমাপতি একজন অসাধারণ বাক্‌শিল্পী ছিলেন (বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ)। তাঁহার একটি কবিতায় কৃষ্ণলীলার যে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাকে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের রাধাকৃষ্ণলীলার পূর্বরূপ বলা যাইতে পারে। পদটি সদুক্তি-কর্ণামৃতে উমাপতির নামে প্রচলিত আছে। পদটি এই --

রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত-জলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া
রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভেদয়ালিঙ্গিতস্য।
বিশ্বং পায়ান্ মসৃনযমুনাতীরবানীর-কুঞ্জে
রাধা-কেলি-ভর-পরিমল-ধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ॥

(সদুক্তিকঃ ১।৬১।১)

---"রত্নচ্ছায়াস্ফুরিত জলধির তীরে দ্বারকার মন্দিরে প্রবলভাবে পুলকিত রুক্মিনীর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়াও শ্যামল যমুনাতীরের বেতসকুঞ্জে রাধার সঙ্গে প্রেমক্রীড়ার মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য ধ্যান করিতে করিতে মুরারির যে মূর্চ্ছা তাহা বিশ্বকে পালন করুন।"

সর্ব্বানন্দ 'টীকা-সর্ব্বস্ব' নামে অমরকোষের একখানি টীকা লিখিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি গোপালকৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন দেখিয়া মনে হয় তিনি বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন।

বন্দনা-শ্লোকটিতে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণের বাল্যলীলার পরিচয় মিলে। কবিতাটি এইরূপ—

"বর্হিণবর্হাপীড়ঃ স্থবিরপরো বালবল্লবো গোষ্ঠে।
মেদুরমুদিরশ্যামলরুচিরব্যাদ্ এষ গোবিন্দঃ॥"

—"উষ্ণীষে শিখিপুচ্ছধারী বেণুবাদনরত স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামলকান্তি গোষ্ঠে বালগোপাল সেই গোবিন্দ সকলকে পালন করুন।"

গীতগোবিন্দের মধ্যেই ভক্তিরসের স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়। সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতাগুলিতে ভক্তির আভাস পাওয়া যায়। জয়দেব হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সূচনা বলা যায়। জয়দেবে আমরা রাধাকৃষ্ণের মধুররসাশ্রিত প্রেমলীলা ও রাধামাধবের লীলা-কীর্ত্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। 'গীতগোবিন্দ' হইতে নবীন বৈষ্ণব ধর্মের আরম্ভ বলা যায়। "প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু, ফল হইতেছে মুক্তি আর নবীন ধর্মের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ, ফল হইতেছে ভক্তি বা প্রেমভক্তি"। গীত-গোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে যদিও দশাবতার স্তোত্রে ঐশ্বর্য্যলীলার কথাও আছে। অনেকে বলেন গীতগোবিন্দে জয়দেব রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ভাববৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলার কথাটি চৈতন্যোত্তর "রাধাকৃষ্ণভাবনা" এবং তাহা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শাস্ত্রগ্রন্থাদি রচিত হইবার পরই স্পষ্ট রূপ পাইয়াছে। জয়দেবের যুগে না থাকিবারই কথা। তাছাড়া, জয়দেব কোন একটা মতবাদকে অবলম্বন করিয়া কাব্যটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি ছিলেন প্রধানত কবি, কাব্যপ্রেরণাতেই আদিরসাত্মক রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেকালের জনপ্রিয় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনী তা সে লোক-প্রচলিত হউক বা পুরাণ-বর্ণিতই হউক, কবিদের নিকট খুব আকর্ষণীয় ছিল। অবশ্য জয়দেবে ভক্তিভাবও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যের অনুমোদনে ও বৈষ্ণবপ্রভাবে গীত-গোবিন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রগ্রন্থে (উপনিষদে) রূপান্তরিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-পদসাহিত্যে জয়দেবের অপরিসীম প্রভাব। বলিতে গেলে জয়দেবকে লইয়াই পদাবলীর শুভারম্ভ। অপভ্রংশ হইতে গান রচনার রীতি জয়দেব গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেবের পূর্বে প্রকৃত গান দেখা যায় না। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে কয়েকটি অপভ্রংশ গান আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে লোক-ব্যবহারে গীতি-কবিতার প্রচলন ছিল। এই অপভ্রংশে গান রচনার রীতি ক্রমে সংস্কৃতেও গৃহীত হইল। কবির নাম বা ভণিতা দিয়া গান রচনার রীতি কালিদাসের সময়েও ছিল বলিয়া মনে হয়।

তাঁহার মেঘদূতে দেখি—'মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা'। এই প্রসঙ্গে আমরা অবহট্‌ঠে রচিত কাহ্ণু ও সরহপাদের দোহাকোষগুলি স্মরণ করিতে পারি। এইগুলিতে ভণিতার ব্যবহার করা হইয়াছে। কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় একটিমাত্র গান লিখিয়াছেন। তিনি জয়দেবের একশত বৎসর পূর্বেকার লোক। গানটি পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। জয়দেব কিন্তু একটি গোটা 'গীতি-নাট্য' লিখিয়াছেন। গীত-গোবিন্দের মত পূর্ণাঙ্গ কাব্য দেখিয়া মনে হয় যে, প্রাকৃত-অপভ্রংশে এবং সংস্কৃতে কৃষ্ণলীলাগান লোকব্যবহারে দীর্ঘকাল হইতে প্রচলিত আছে। জয়দেবের আদর্শেই বাঙ্গালাদেশে, মিথিলায় ও অন্যত্র রাধাকৃষ্ণপদাবলীর অনুরূপ গীতিকবিতার ধারা নামিয়াছিল। জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন, ঠিক তারিখ পাওয়া না গেলেও তিনি যে দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। জয়দেব বাঙ্গালাদেশের কাছাকাছি কোন স্থান হইতে আসিয়াছিলেন মনে হয়।

জয়দেবের অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালা দেশে রাধাকৃষ্ণপ্রেমকাহিনী লইয়া 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' রচনা করেন বড়ু চণ্ডীদাস। কাব্যটি চৈতন্যদেবের পূর্বে রচিত। বড়ু চণ্ডীদাসের পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় রাধাকৃষ্ণপদাবলী রচিত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় যখন সিদ্ধাচার্য্যদের 'চর্যাপদ' রচিত হইতেছিল, সেই সময়ে রাধাকৃষ্ণপ্রেমকাহিনী লইয়াও পদ রচিত হইয়া থাকিতে পারে। তবে জয়দেবের সময়ে সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকে উপজীব্য করিয়া নানারূপ পদ রচনা চলিতেছিল তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছি। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যেও শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে পরম দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। 'দেবের দেব আহ্মে বনমালী', 'আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশ্বরে' প্রভৃতি বাক্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি শ্রীরাধার প্রেমের জন্যই অবতার গ্রহণ করিয়াছেন—'অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আশে।' ভূভার-হরণ তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ব্রজে পুতনা-বধাদির ব্যাপারে তাঁর ঐশ্বর্য্যলীলাও প্রকটিত হইয়াছে। কাব্যের ফলশ্রুতিতে একটি ভক্তিভাব পরিলক্ষিত হয়। বড়াই কৃষ্ণের ভগবত্তায় বিশ্বাস করিত।

"যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে
দেখিলে হএ মুকতী।
সে দেব সনে নেহা বাড়াইলে
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী॥" —শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ভিন্ন অন্য গোপীদের উল্লেখ নাই, কেবল জরতী বড়াই-এর কথা পাই।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগে রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে মুক্তির কথা থাকা বিচিত্র নয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রাধা প্রধানত মানবী। শ্রীকৃষ্ণ বার বার রাধাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে রাধা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, রাধা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-পদাবলীর 'মহাভাব-স্বরূপিনী' 'কৃষ্ণময়ী' শ্রীরাধার সাক্ষাৎ এখানে না পাইবার কথা। কথা হইতেছে জয়দেব ও বড়ুচণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণকাহিনী কোন্ সূত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বেদস্বরূপ ভাগবতের কৃষ্ণকাহিনীতে রাধার প্রসঙ্গ নাই। ভাগবতের 'রাসলীলা' হয় শরৎকালে আর জয়দেবের বসন্তকালে। মনে হয় গ্রামীন কৃষ্ণকাহিনীর সহিত পৌরাণিক কাহিনী মিশাইয়া জয়দেব 'গীত-গোবিন্দ' লিখিয়াছেন। বড়ুচণ্ডীদাস বিষ্ণুপুরাণকে বা ভাগবতপুরাণকে ঠিকমত অনুসরণ করেন নাই। লোকপ্রচলিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনীই তাঁহার আদর্শ বলিয়া মনে হয়। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীকে বাঙ্গালী নিজের করিয়া লইয়াছে। শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করিতেন। বিদ্যাপতির ভগ্ন-মৈথিলে লেখা পদগুলির প্রেরণায় বাঙ্গালা দেশে 'ব্রজবুলিতে' লেখা পদাবলীর জন্ম হইয়াছিল। বিদ্যাপতি ছিলেন বিদগ্ধ কলাকুশলী সচেতন শিল্পী। পদরচনায় তিনি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কে অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার পদাবলীতে মর্ত্যরসের সহিত অধ্যাত্মরসের (ভক্তিরসের) মিশ্রণ দেখা যায়। বিদ্যাপতির "এই রাধা জয়দেবের রাধার ন্যায় শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প। কিন্তু বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন।"[১] চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণলীলার ভাব-দৃষ্টি ও আস্বাদন বিদ্যাপতির পদাবলীতে না পাইবারই কথা, তথাপি দুই একটি পদে চৈতন্যোত্তর যুগের কৃষ্ণলীলা-চিন্তার আভাস দেখা যায়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে যে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে শ্রীচৈতন্যের 'মহাভাব' উপস্থিত হইলে সুকণ্ঠ মুকুন্দ ভাবের সদৃশ পদ গাহিয়াছিলেন—

"কি কহব রে সখি, আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥ ধ্রু॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ)

১ দীনেশচন্দ্র সেন।

উক্ত পদটি বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আবার,

"হাহা প্রাণ প্রিয়সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু প্রেম বিষে মোর তনু মন জরে॥ ধ্রু॥
রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয়াস্ত না পাঙ
যাঁহা গেলে কানু পাঙ, তাহা উড়ি যাঙ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ)

এই পদটি চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত আছে। এই রকম দুই চারিটি ধ্রুবা পদ দেখিয়া মনে হয় শ্রীচৈতন্যের পূর্বেই বাঙ্গালা দেশে আদি-রসাত্মক ভক্তি-সম্বলিত পদরচনা আরম্ভ হইয়াছে।[১]

রূপ গোস্বামী বাঙ্গালা দেশে রামকেলি নগরে অবস্থানকালে "পদ্যাবলী" সংকলন করেন। ইহাতে বাঙ্গালী কবি রচিত কৃষ্ণের ব্রজলীলাঘটিত ও দ্বৈতবাদী ভক্তি সংবলিত বহু প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দের কয়েকজন কবির নামও পাওয়া যায়। যেমন, জগদানন্দ রায়, কেশব ভট্টাচার্য্য, কেশব ছত্রী, গোবিন্দভট্ট, মুকুন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। কৃষ্ণভক্তির আদর্শ অনুসারে পদগুলি যেন সংকলিত।

গোবিন্দভট্টের এই শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ধ্বনির মোহিনী শক্তির কথা পাই। ভক্তির সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাও ইহাতে দেখা যায়। রূপ গোস্বামী পরবর্তীকালে যে বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রগ্রন্থ লিখেন তাহা যেন এই সংকলনের আদর্শেই রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই ভাব অজ্ঞাত নয়।

"সত্যং জল্পসি দুঃসহাঃ খলগিরঃ সত্যং কুলং নির্মলং
সত্যং নিষ্করুণোঽপ্যয়ং সহচরঃ সত্যং সুদূরে সরিৎ।
তং সর্ব্বং সখি বিস্মরামি ঝটিতি শ্রোত্রাতিথির্জায়তে
চেদুন্মাদ-মুকুন্দ-মঞ্জুমুরলী-নিঃস্বান-রাগোদ্‌গতিঃ॥

—"সখী, তুমি যথার্থই বলিতেছ যে খলবাক্য দুঃসহ, ইহাও সত্য যে আমার কুল নিষ্কলঙ্ক। ইহাও ঠিক এই সহচর নিষ্ঠুর এবং ইহাও যথার্থ যে যমুনাতীর

---

১ পুরীতে রথযাত্রার সম্মুখে নর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্য এই ধুয়া পদটি গাহিতেন।
"সোই, সেইত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু॥" চৈ. চ. মধ্য ১৩ পরিচ্ছেদ
তুঃ—"রথযাত্রা আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাঁহা এই পদমাত্র করয়ে গায়ন॥ (চৈ. চ.)

সুদূর। তথাপি সখী, এ সকলই আমি তখনই ভুলিয়া যাই, যখন মুকুন্দের মধুর মুরলী-নিঃসৃত উদ্দামরাগিনী আমার শ্রবণে প্রবেশ করে।"

সার্বভৌমের ভাই বিদ্যাবাচস্পতি একটি "ভ্রমরদূত" কাব্য লিখিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রমে সনাতনের গুরু বা আচার্য্য ছিলেন। রামকেলি নগরে থাকিয়া কবি চতুর্ভুজ 'হরিচরিত' কাব্য লিখিয়াছিলেন ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। পরিব্রাজক শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাইবার মানসে রামকেলি নগরে উপস্থিত হইলেন। পরে সনাতন গোস্বামীর ইঙ্গিতে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া পরদিন 'কানাইর নাটশালা' গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা চিত্রিত দেখিয়াছিলেন—

প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাটশালা।
দেখিলা সকলে তাঁহা কৃষ্ণচরিত লীলা॥

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ (২।১)

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের বহু পূর্ব হইতেই এখানে বৈষ্ণবভক্তির প্রচলন ছিল এবং কৃষ্ণলীলার অভিনয় হইত বলিয়া মনে হয়।

এইবার আমরা শ্রীচৈতন্যের ধর্মমতে যে সব গ্রন্থ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং যে সব মতবাদের দ্বারা তিনি অল্পবিস্তর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহাদের কথা আলোচনা করিতেছি।

জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' প্রাক্‌চৈতন্য যুগের ধর্মমতে ও সাহিত্যে অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভক্তিরসাত্মক কৃষ্ণলীলার পদ আস্বাদ করিতেন।

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥" চৈঃ চঃ ২।১০

আবার, জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥ (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)

শ্রীচৈতন্য শেষ জীবনে বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামতের ভক্তিমূলক কবিতা আস্বাদ করিতেন। সন্ন্যাসজীবনে শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ দুইখানি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তবে বাঙ্গালাদেশে কৃষ্ণকর্ণামৃত একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। শ্রীধরদাস সদুক্তিকর্ণামৃতগ্রন্থে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের কয়েকটি

শ্লোকে কৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলার ভাব প্রকটিত হইয়াছে। এখানে রাধার উল্লেখ লক্ষণীয়।

"তেজসেঽস্তু নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে।
রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষ-শায়িনে॥" ।৭৬। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত

—"সেই তেজোরূপকে নমস্কার যিনি ধেনুর পালক, যিনি রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়িত আছেন, যিনি শেষনাগের উপরে শায়িত।"

"যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাত্মাণাং
যে বা শৈশব-চাপল-ব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।
যে বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীল-মুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্তুহৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে॥"

(১০৬ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ; সদুক্তিকঃ ১।৫৮।৫)

— "তোমার যে সকল চরিতামৃত (ধন্যাত্মা) সৌভাগ্যবান্ পুণ্যাত্মাগণের রসনাদ্বারা লেহনযোগ্য, রাধার অবরোধে (রাধাকে নানাভাবে অবরুদ্ধ করিতে) উন্মুখ তোমার যে সকল শৈশবচাপল্য-প্রসূত চেষ্টা, যে সকল বা তোমার মুখপদ্মে ভাবশবল বেণুগীত-গতি-সমূহের লীলা, সেই সকল ধারাবাহিকরূপে আমার হৃদয়ে বহিতে থাকুক।[১]

লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বৈষ্ণব দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন এবং দূর হইতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার জয়গান করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। কবি ভাগবতোক্ত ভক্তিরসাপ্লুতা রাধা-কৃষ্ণপ্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্যের মধ্যে সর্বত্র একটা অধ্যাত্ম-অনুরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া নূতন করিয়া কৃষ্ণভক্তির জোয়ার আসিল। ইহার প্রধান হোতা হইলেন মাধবেন্দ্র পুরী, তিনি ছিলেন অদ্বৈতপন্থী সন্ন্যাসী কিন্তু কৃষ্ণরসে ভরপুর। তৎকালীন বঙ্গদেশের অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ পরিকর অদ্বৈতবাদী অদ্বৈত আচার্য তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন এবং শেষ জীবনে চৈতন্যের ভক্তিবাদ গ্রহণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যও মাধবেন্দ্র পুরীকে গুরুবৎ মান্য করিতেন এবং পুরীতে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মাধবেন্দ্ররচিত "অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে" শ্লোকটি পাঠ করিতেন। মাধবেন্দ্র অদ্বৈতবাদী হইতে পারেন কিন্তু

১ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কৃত অনুবাদ।

তিনি ভাগবতের আদিরসাত্মক ভক্তি অনুসরণ করিতেন। কথিত আছে অবধূত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী ছিলেন মাধবেন্দ্রপুরীর সর্বপ্রধান শিষ্য; তিনি গুরুর ভাব সবচেয়ে বেশী পাইয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামী অদ্বৈতপন্থী হইয়াও ভক্তিমার্গের সাধনা করিতেন। তিনি ভাগবতের টীকায় অদ্বৈতবাদের সহিত ভাগবতের আবেগমূলক ভক্তিবাদের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিকে তাঁহারা অদ্বৈতজ্ঞানের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন না। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মায়াবাদী ছিলেন, শেষ জীবনে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে দ্বৈতবাদী ভক্তিধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যও 'দশনামী' সম্প্রদায়ভুক্ত কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লইয়াছিলেন অথচ তিনি নিজে ভক্তিধর্মের প্রবক্তা ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব হইতেই নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া তৎসন্নিহিত অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সনাতন গোস্বামীর নেতৃত্বে রামকেলি অঞ্চলেও কৃষ্ণভক্তির প্রসার দেখা যায়। কিন্তু সেকালের বিদ্বৎসমাজ মীমাংসাস্মৃতি, নব্যন্যায় ও অদ্বৈততত্ত্বের আলোচনায় উৎসাহ বোধ করিতেন। বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিভাবকে সুনজরে দেখিতেন না। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গালাদেশে জনসাধারণের ধর্মকর্মের একটি চিত্র বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবতে' উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

"ধর্মকর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুতলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥" (চৈতন্য-ভাগবত)

ইহাদের মাঝখানে একদল ভক্ত-বৈষ্ণব আপনাদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিয়াছিল। প্রাক্‌চৈতন্যযুগে 'গীত-গোবিন্দ', ভাগবত, ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীধর-স্বামীর ভাগবতাদির ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা ভক্তজনের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়াছিল এবং ভক্তিবাদ ধীরে ধীরে বলসঞ্চয় করিতেছিল। শ্রীচৈতন্যের

আবিভাবে সেই ভক্তিবাদ সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। রামকেলি নগরের প্রেমভক্তিরস আসিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত প্রেমভক্তির ধারার সহিত মিলিত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্পূর্ণ হইল।

আমরা ইতিপূর্বে প্রাক্‌চৈতন্যযুগে বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব-ধর্মের অবস্থা সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই সব মহাজনদের কথাও সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যের পূর্বেও বাঙ্গালাদেশে ভক্তিবাদ প্রচলিত ছিল এবং ভক্ত-বৈষ্ণবেরও অভাব ছিলনা। শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রেমভক্তিরসাপ্লুত লোকোত্তর দিব্য জীবনের প্রভাবে সেই পূর্ব-প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের নবরূপ প্রদান করিলেন। শ্রীচৈতন্য নিজে বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই। বৈষ্ণবদের শিক্ষার জন্য 'শিক্ষাষ্টক' নামে সংস্কৃত ভাষায় আটটি শ্লোক লিখিয়া যান। হোসেন সাহের চাকুরী ছাড়িয়া রূপ ও সনাতন তাঁহার শরণাগত হইলে তিনি তাঁহাদের কিছু উপদেশ দিয়া যান। প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে শ্রীচৈতন্য অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ খণ্ডন করেন এবং স্বীয় মত স্থাপন করেন। রায় রামানন্দের সহিত প্রেমভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করেন। তাঁহার রচিত কোন দার্শনিক গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। মহাপুরুষদের জীবনই তাঁহাদের বাণী, ইহা শত শত গ্রন্থ অপেক্ষা মূল্যবান্। শ্রীচৈতন্য আপন জীবনের দ্বারাই তাঁহার প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্তরে যে ভাবের উদয় হইত, তাহাই তাঁহার দেহে, বাক্যে, আচরণে প্রকাশ পাইত। জনগণ প্রেমমুগ্ধচিত্তে তাহাই দর্শন করিত। শত শত গ্রন্থের দ্বারা তাহা সম্ভব হইত কিনা বলা যায় না। ভক্ত ও শিষ্যগণ শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবন দেখিয়া তাঁহার ধর্মের দর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামী বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ও দর্শন রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় রচিত 'চৈতন্য চরিত' গ্রন্থাদিতে তাঁহার ধর্ম ও দর্শন বিধৃত আছে। ভক্ত-কবি রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা ও গৌরলীলা গান করিলেন। এই সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদবলীতেও শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব রসতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় জীব গোস্বামীর 'ষট্ সন্দর্ভ' নামক সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থে। অষ্টাদশ শতাব্দে বলদেব বিদ্যাভূষণ ভাগবতের আদর্শ অনুসরণ করিয়া 'বেদান্তসূত্রের' (ব্রহ্মসূত্রের) 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত

এই গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্মমতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দের শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দের প্রথম পাদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাঙ্গালা ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র ও ধর্মমতকে নির্দিষ্ট রূপ দিলেন। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ও বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত বৈষ্ণবমতও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব আচার্য্য পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'চৈতন্যচরিতামৃতের' সংস্কৃত ভাষায় টীকা লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থটি বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজের তৎকালীন নেতা জীব গোস্বামীর অনুমোদন লাভ করিয়াছিল॥ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে গ্রন্থটি ভাগবত, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় অন্যতম আকর গ্রন্থরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী—এই তিনজনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত গড়িয়া তুলিয়াছেন। সনাতন ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রূপ গোস্বামী ভক্তিতত্ত্ব ও রসশাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছেন এবং জীব গোস্বামী 'ষট্সন্দর্ভ' রচনা করিয়া চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে ভাগবতই বেদান্তসূত্রের প্রকৃষ্টতম ব্যাখ্যা। ভাগবতকে বৈষ্ণব ধর্মের উপনিষদ বলিয়া মনে করা হয়। ভাগবতের শ্লোক অবলম্বন করিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের আরম্ভ—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ শ্রীভাগবত ১।২।১১

—'যাহা অদ্বয় জ্ঞান, তাহাকেই তত্ত্বজ্ঞানীরা (পরম) তত্ত্ব বলিয়াছেন; সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ নামে কল্পিত হইয়া থাকেন'। অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট যিনি ব্রহ্ম বা বৃহদ্‌বস্তু যোগীর নিকট তিনিই পরমাত্মা, আর ভক্তের নিকট তিনি ভগবান্।

"ব্রহ্ম আত্মা ভগবান অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিন"॥ (চৈঃ চঃ আদি ১ম পরিচ্ছেদ)

এখানে অদ্বয় জ্ঞানকে সগুণ দ্বৈত জ্ঞান হিসাবে জীবগোস্বামী গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তি—স্বরূপ শক্তি বা পরা শক্তি, তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়াশক্তি। এই স্বরূপশক্তি ও ব্রহ্ম এক, অবিচ্ছেদ্য ও অভিন্ন। স্বরূপশক্তিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সন্ধিনী শক্তি (ব্রহ্মের সদংশের অঙ্গীভূত), সংবিৎশক্তি—ব্রহ্মের

জ্ঞানস্বরূপা, এবং হ্লাদিনী শক্তি—ব্রহ্মের আনন্দময় শক্তি, ইহাদের মধ্যে 'হ্লাদিনী শক্তি' অন্য দুইটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইখানেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষত্ব। শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম এবং শ্রীরাধাকে তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি বলা হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামীও সেই কথাই বলিয়াছেন—

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেমনাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম রস 'মহাভাব' জানি।
সেই 'মহাভাবরূপা' রাধাঠাকুরাণী॥

(চৈঃ চ) আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অপ্রাকৃত দেহধারী, জীব হইতেছে ব্রহ্মের তটস্থা জীবশক্তির অঙ্গীভূত, সেইজন্য জীব ভগবানের অংশ, তাহা সত্য বটে। কিন্তু শক্তিরও একটা স্বাতন্ত্র্য ও পৃথক্ সত্তা আছে। এই ভগবান্ ও জীবশক্তির (জীবের) সম্পর্কটি কতকটা সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণের মত। অর্থাৎ ভেদও আছে বটে,—নাইও বটে, সেই সম্পর্কটি অচিন্ত্য,—চিন্তার অতীত। এই মতই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'। অবশ্য তাই বলিয়া জীব কখনও ব্রহ্মের সমতুল্য নহে, ব্রহ্মের সঙ্গে তাহার 'সেব্য-সেবক' সম্পর্ক।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই তত্ত্বটি শ্রীচৈতন্য ও সনাতন গোস্বামীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ)

বর্হিমুর্খ জীব কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া যখন মায়ার অধীন হয়, তখনই সে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হয়।

শ্রীচৈতন্য শংকর আচার্য্যকৃত বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নাই। অদ্বৈতবাদী শংকর জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা ও মায়াবাদ প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্যের মতে বেদান্তসূত্রের সহজ ও সুস্পষ্ট অর্থ ত্যাগ করিয়া শংকরাচার্য্য গৌণ অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্রের অর্থ তো স্বপ্রকাশ।

অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও কাশীর পণ্ডিত মায়াবাদী প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সহিত শাস্ত্রবিচারে শ্রীচৈতন্য অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া দ্বৈতবাদী দর্শন প্রচার করেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বেদান্তসূত্রের যে টীকা-ভাষ্য করিয়াছেন তাহার উত্তরে শ্রীচৈতন্য বলেন,—

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ে বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যের মতে ব্রহ্ম শব্দে বৃহদ্‌বস্তু বা ভগবানকেই বোঝায়। তিনি (ব্রহ্ম) অচিন্ত্যশক্তির অধিকারী, স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া জগদ্রূপে পরিণত হন। জড়রূপা প্রকৃতি কখনও নিখিল বিশ্বের কারণ হইতে পারে না। ভগবানই যখন জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন তখন জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না বটে তবে জগৎ নশ্বর। জীব মায়ার অধীন বটে, কিন্তু মায়া বলিতে বুঝায় "দেহে আত্মবুদ্ধি"। ভগবান্ সবিশেষ ও সগুণ, তিনি নির্গুণ ও নির্বিশেষ হইতে পারেন না।

ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥ (চৈ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যের এই অভিমতকে 'পরিণামবাদ' বলিতে পারি। ব্যাসদেব বেদান্তসূত্রে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান্ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও অচিন্ত্যশক্তির বলে জগদ্রূপে পরিণত হন, যেমন প্রাকৃত বস্তু চিন্তামণি নানা রত্ন প্রসব করিয়াও স্বরূপত অবিকৃত থাকে। শংকরের মতে ব্যাসদেব বেদান্তসূত্রে 'বিবর্তবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। জীব ও জগৎ যে সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা মায়া-কল্পিত। নদীতে আবর্ত, তরঙ্গ প্রভৃতি যাহা দেখিতে পাই তা জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তেমনি ব্রহ্মই আমাদের নিকট জীব ও জগদ্রূপে প্রতীয়মান হন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥" (চৈঃ চঃ ১।২)

মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে' বলিয়াছেন— 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।' তিনি সকলের আদি অথচ স্বয়ং অনাদি, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু, শ্রুতির 'রসো বৈ সঃ'॥ তিনিই বিশ্বের কারণ এবং মায়াধীশ। ভগবান্ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব হইয়াও কিশোরশেখর অখিল কল্যানগুণের আকর। শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণ মানবরূপী ভগবান্। মানুষের মতই লীলা করিয়া থাকেন।

চৈতন্যদেব সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নর বপু তাহার স্বরূপ,
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২১ পরিচ্ছেদ ২।২১)

শ্রীকৃষ্ণ অবতারী, অবতার নহেন। অসুরাদিদ্বারা ত্রিলোক উৎপীড়িত হইলে 'অবতারের' প্রয়োজন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে প্রকটিত হইয়াছেন নিজের লীলারস আস্বাদনের জন্য, কংসবধাদি তাঁহার মুখ্য কাজ নহে। এই সব কাজ তিনি তাঁহার কলা 'অংশের' দ্বারাই করাইয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোকে বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে।

সূতবাক্যম্—(১।৩।২৮ শ্রীভাগবত

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

—'উক্ত বা অনুক্ত অবতারসকল পুরুষাবতারের অংশ বা বিভূতি, কিন্তু বিংশতমাবতারে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। উক্ত অবতারসকল যুগে যুগে অসুরগণ কর্তৃক উপদ্রুত লোকসকলকে সুখী করিয়া থাকেন।'

"অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব অবতংশ॥" (চৈঃ চঃ আদি ২ পরিচ্ছেদ)
"কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয়-রূপে বিশ্ব ভরি॥"
(চৈঃ চঃ আদি ২য় পরিচ্ছেদ)

'ব্রহ্ম-সংহিতা'য় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥" ৫।১ ব্রহ্মসংহিতা
(চৈঃ চঃ আদি ২য় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত)

—'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি সকলের আদি, তাঁহার আদি নাই। তিনি সকল কারণের কারণ।'

ব্রজেন্দ্রকুমার কৃষ্ণ গোলোকে ও বৃন্দাবনে নিত্যকাল বিহার করিয়া থাকেন।—

"পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥" (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পরিচ্ছেদ)

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য যেমন সীমাহীন, তাঁহার মাধুর্য্যও তেমনি অনন্ত। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলা ও মাধুর্য্যলীলা উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে' ঐশ্বর্য্যলীলাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মধুর ভাবের উপাসক ছিলেন। তাঁহার আদর্শে চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলার কথাই পাই। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় ঐশ্বর্য্যলীলার প্রকাশ আছে। যেমন, পূতনা-বধ, গোবর্ধন-ধারণ, কালিয়দমন ইত্যাদি। কিন্তু তাহা একান্ত গৌণ এবং মাধুর্য্যলীলার পরিপুষ্টির জন্যই তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বলিয়াছেন,—

"এ যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃত-সিন্ধু।
মোর বাগ্‌মনোগম্য নহে একবিন্দু॥ (চৈঃচঃ মধ্য ২১ পরিচ্ছেদ)

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলার তো সীমা নাই—

"অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ তাঁর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্য সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন,—

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কন ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥ (চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২১ পরিচ্ছেদ)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপন মাধুর্য্যে সর্ব প্রাণীকে আকর্ষণ করেন বলিয়াই তাঁহার নাম 'কৃষ্ণ'।

বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলারই জয়গান করিয়াছেন—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো—
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ (বিল্বমঙ্গলকৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৯২)

—'মধুর—মধুর চেয়েও মধুর কৃষ্ণের দেহ। মধুর—মধুর চেয়েও মধুর তাঁহার আনন (মুখ)। মধুর সৌরভ সেই দেহে; মধুর হাসি সেই মুখে—আহা! মধুর সুমধুর। অতিসুমধুর—সর্বাপেক্ষা সুমধুর।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন—জ্ঞান, কর্ম ও যোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি দিয়া এই কৃষ্ণের ভজনা করিতে হইবে।

ঐছে শাস্ত্র কহে, কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ ২।২০)

মুক্ত পুরুষ আত্মারাম মুনিগণও 'অহৈতুকী' ভক্তির আশ্রয় করেন। তিনি আরও বলেন মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ বিস্মরণ ঘটিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া গুরুরূপে শাস্ত্ররূপে ও অন্তর্যামী রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি বা প্রেমই পরমপুরুষার্থ।[১] গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মুক্তি চাহেন না তাঁহারা চাহেন কৃষ্ণ-প্রেম। মুক্তিকে তাঁহারা তুচ্ছ বলিয়া ভাবেন।

---

১ "পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম মহাধন"। চৈ. চ. মধ্য (২।১৯)

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥"

(চৈঃচঃ আদিলালা ১ম পরিচ্ছেদ ১।১)

"সষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥"

(চৈঃচঃ আদি ৩য় পরিচ্ছেদ)

ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি ও নিত্যকালের জন্য তাঁহার সেবন ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মুক্তি।[1]

শ্রীচৈতন্যের পূর্বে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণবের অসদ্ভাব ছিল না, কৃষ্ণাশ্রয়ী ভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্মও প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া পূর্বাগত এই বৈষ্ণবধর্মের নবরূপ দান করিলেন। বৈষ্ণবধর্মের অপরাপর শাখার মত শ্রীচৈতন্য স্বাধীনভাবে আর একটি শাখার সৃষ্টি করিলেন। এই নব বৈষ্ণবধর্মে কি কি বস্তু আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে বলা শক্ত।[2] শ্রীচৈতন্য বলিতেন, জগতের পিতা কৃষ্ণ, সব জীব তাঁহার পুত্র, অংশাধিকারী।

তিনি বলিতেন সব মানুষ সমান, যেহেতু সকলের হৃদয়েই কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত। তিনি সকল মানুষের আধ্যাত্মিক অধিকার স্বীকার করিতেন। তাই ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল ভালবাসার বন্ধনে। মানুষকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীচৈতন্যের ভগবান্ ছিলেন নররূপী শ্রীকৃষ্ণ তাই তাঁহার মনুষ্য-প্রীতি একান্ত স্বাভাবিক।

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশে বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥

(চৈঃচঃ মধ্যে ২১ পরিচ্ছেদ ২।২১)

---

১ দারিদ্র্যনাশ ভব-ক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥ (চৈ. চ. মধ্য, ২০শ পরিচ্ছেদ ২।২০)

২ "হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা"—এই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পূজ্যতম বস্তু।
সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥ (চৈ. চ. মধ্য ২৪ পরিচ্ছেদ ২।২৪)

সকল মানুষই তাঁহার দেহাকৃতি ও স্নিগ্ধভক্তিভাব দেখিয়া আকৃষ্ট হইত।

"প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন॥
(চৈঃচঃ মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ ২।১৭)

বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥ (চৈঃচঃ ১।৩)

ভক্তদের লইয়া শ্রীচৈতন্যের কৃত্য (সাধনা) ছিল ভগবৎ-নাম-মালিকা পদকীর্ত্তন। নবদ্বীপে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় সারারাত্রি ধরিয়া হরিনাম করিতেন। নবদ্বীপের পথে পথে হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিতেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে ও পুরীতে নামকীর্ত্তন করিতেন। এবং কখনও বা ধুয়া পদ গাহিতেন। তিনি বলিতেন, মনে ভালোমন্দ কোন মতলব, ইহলোক-পরলোকের কোন স্বার্থ না রাখিয়া হরিনাম কর। তাহা হইলে কৃষ্ণ তোমাদের উদ্ধার করিবেন। নীলাচল-জীবনের শেষ আঠারো বছর তাঁহার দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটিয়াছিল। সেই সময় জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেন। রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটকের গানগুলিও তাঁহার ভাল লাগিত।

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"
(চৈঃচঃ মধ্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ)

এই দেখিয়া তাঁহার ভক্তগণ পদাবলী রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং গানে ও পদাবলীতে আধ্যাত্মিক মূল্য আরোপিত হইল। এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রেরণা দিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের রচিত কোন ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। বৈষ্ণবদের শিক্ষার জন্য সংস্কৃতে 'শিক্ষাষ্টক' নামে আটটি শ্লোক শ্রীচৈতন্য লিখিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণবীয় আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য বলিতেন, "ভক্তি, মুক্তি, নির্ব্বাণ, আমি কিছুই চাহি না, চাহি শুধু তোমাকে (ভগবানকে), তা তুমি আমাকে যে অবস্থাতেই রাখ না কেন।" এই পরম ভাবটি অন্তরঙ্গজনের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

"নং ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ (শিক্ষাষ্টক)[১]

—'হে জগতের ঈশ্বর, আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না—না ধন না জন না সুন্দরী নারী বা কবিতা রচনার প্রতিভা। আমার জন্মে জন্মে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কাম ভক্তি থাকুক।'

শ্রীচৈতন্যের অধ্যাত্ম-সাধনা কেমন ছিল তাহা তাঁহার আচার-আচরণ ও দিব্যজীবন হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি নিজে কিছু লিখিয়া যান নাই। অধ্যাত্মভাবনায় শ্রীচৈতন্য ছিলেন অনুরাগের পথের (রাগমার্গের) পথিক। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের যে নিত্যসম্বন্ধ, সেই প্রেমের আকর্ষণ দুর্নিবার। সেই প্রেম চিত্তে জাগরূক রাখাই পরম সাধনা। এই প্রেমভক্তির ধারা তিনি তাঁহার গুরু ঈশ্বরপুরী ও গুরুর গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট পাইয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী জীবনের শেষ সময়ে ঈশ্বরপ্রেমের যে অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি পাইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য একাদিক্রমে জীবনের শেষ আঠারো বছর ধরিয়া সেই অনুভূতিতে আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। মানুষের দেহে-মনে ঈশ্বর-প্রেমের ব্যাকুলতার এমন অপূর্ব্ব প্রকাশ ইহার পূর্বে কেহ দেখে নাই শুনে নাই, পড়ে নাই।[২] মাধবেন্দ্রপুরী স্বরচিত গোপীবিরহের একটি শ্লোক গাহিতে গাহিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্লোকটি কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

"তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীমাধবেন্দ্রবাক্যম্"—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে

মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং

দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"[৩] (পদ্যাবলী ৩৩৪)

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মে নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"। শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত আপনার জন ভাবিয়া অকৈতব প্রেমভক্তি নিবেদন করিতে হইবে। মাতা বা পিতা যেমন তাহার সন্তানকে

---

১ শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাশ্লোক (৪র্থ), পদ্যাবলী ৯৫, চৈ. চ. অন্ত্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত।

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন। প্র. খণ্ড পূর্বার্দ্ধ, পৃঃ ২৮৬

৩ পদ্যাবলী ৩৩৪, চৈ. চ. অন্ত্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত।

ভালবাসে, সখা যেমন সখাকে ভালবাসে, স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে, প্রণয়িনী যেমন প্রণয়ীকে ভালবাসে, সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণে পরিশুদ্ধ প্রেম অর্পণ করিতে হইবে। 'কৃষ্ণপ্রেম' আস্বাদ করাই জীবের পরমা গতি এবং চরম প্রাপ্তি। শ্রীচৈতন্যের ধর্মে শুষ্ক বৈরাগ্য-চর্চ্চার স্থান নাই। মানবের সংসারযাত্রা হইতে তাঁহার ধর্ম বিচ্যুত নহে। সংসারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়াই পরম প্রাপ্তি ঘটিবে। এই অহেতুকী ভক্তি অকৈতব প্রেমের আদর্শ শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রজবাসীরা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন, সেইভাবে পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতে হইবে।[১]

কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যই ছিল ব্রজবাসীর প্রেম। শ্রীচৈতন্য ছিলেন মধুরভাবের উপাসক, তাই তিনি ব্রজসুন্দরীদের ভাব অবলম্বন করিয়া প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেন। শ্রীচৈতন্যের সাধনা কান্তাভাবের সাধনা, তিনি ছিলেন রাধাভাবে ভাবিত, "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত" অর্থাৎ রাধার অনুরাগের আনুগত্যময়ী প্রেমসাধনা।

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীচৈতন্য তাঁহার কৃষ্ণবিরহ, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি লইয়া শ্রীরাধার অনুরূপ ভাবেই চিত্রিত হইতে লাগিলেন এবং শ্রীরাধাও তেমনি শ্রীচৈতন্যের ভাবে চিত্রিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় লোকোত্তর ভক্তের পক্ষে রাধার ভাব অবলম্বন করা সম্ভব, কিন্তু সাধারণ ভক্তের গোপীভাবের অনুগত প্রেমসাধনা। গোপীর কৃষ্ণপ্রেম সহজসিদ্ধ, জীবের (সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তের) সাধ্য বস্তু। শ্রীচৈতন্য ছিলেন পরকীয়া প্রেমের সাধক।

রাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীবৃন্দ অপরের বিবাহিতা পত্নী, তাই কৃষ্ণের পরকীয়া। কিন্তু বৈষ্ণবদের এই পরকীয়াতত্ত্ব দার্শনিক। এই রাধাকৃষ্ণলীলা লৌকিক নহে অপ্রাকৃত।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর শ্রীচৈতন্যের সাধনায় ঈষৎ পরিবর্তন আসে। রায় রামানন্দের সহিত 'সাধ্য-সাধনতত্ত্ব' লইয়া আলোচনা হয়[২]। রামানন্দ আগে হইতে সখী-সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে প্রেম-সাধনার ধারা পূর্ব

---

১ রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাব-যোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে। —চৈ. চ. ২।৮ম পরিচ্ছেদ

২ চৈ. চ. মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ।

হইতেই প্রচলিত ছিল। রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি', শ্রীকৃষ্ণে সর্বকর্ম-সমর্পণ, 'স্বধর্মত্যাগ-পূর্বক ভগবানের আরাধনা, তৎপর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধ্য, পরে 'ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধ্য'। তৎপরে রায় বলিলেন 'প্রেমভক্তিই শ্রেষ্ঠসাধ্যবস্তু'। শ্রীচৈতন্য বলিলেন—

"এহো হয় আগে কর আর"। তারপর রামানন্দ একে একে দাস্যপ্রেম ও বাৎসল্যপ্রেম এবং কান্তাপ্রেমের ক্রমিক উৎকর্ষ স্থাপন করিলেন। ব্রজ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 'কান্তভাবে' ভজনা করিতেন। ইহাদের মধ্যে আবার রাধার প্রেম শ্রেষ্ঠ।

"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।" (চৈঃচঃ মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ)। তারপর রামানন্দ রাধাপ্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, শ্রীচৈতন্য আরও শুনিতে চাহিলে রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি 'প্রেমবিলাসবিবর্ত' গীত গাহিলেন এবং শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

গীতটি এই,—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥ ইত্যাদি[১]

তখন শ্রীচৈতন্য নিজের স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকটিত করিলেন। রামানন্দ দেখিলেন ইনি রসরাজ কৃষ্ণ ও মহাভাবস্বরূপিনী রাধার সম্মিলিত মূর্তি বা যুগল-মূর্তি।

"তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥
(চৈঃচঃ মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ)
মোর তত্ত্বলীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে॥"
(চৈঃচঃ মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ)

রায় রামানন্দ বলিলেন যাঁহারা গোপীগণের অনুগত বা সখীর ভাব অবলম্বন না করিয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভগবানের ভজনা করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পান না। সখীরাও নিত্যসিদ্ধ, সুতরাং সাধারণ ভক্ত বৈষ্ণবের সাধনা সখীর সখী বা মঞ্জরীর

১ রায় রামানন্দ রচিত গীত—চৈ. চ. মধ্য ৮ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত।

অনুগভাবে সাধনা। পুরীতে স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের নিকট রঘুনাথ দাস এই মঞ্জরী-সাধনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিতেন স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ তাঁহার সাধনা ভাল জানেন। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের ধর্মে শুধু ভগবান্ ও ভক্ত মাঝখানে কেহ নাই, কিছু নাই। এখন মাঝখানে আসিলেন গুরু। ভগবান্ আর ভক্তের প্রিয় বা প্রেমিক রহিলেন না। ভক্তের স্থান লইল রাধা। রাধাকে লইয়া কৃষ্ণের লীলা। সে লীলার সহায়ক গুরু। প্রথম শ্রেণীতে গুরু সখী। তবে সখীরা রাধার অংশ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে গুরু সখীসহায়ক মঞ্জরী বা সেবাদাসী। সখীরা অপ্রাকৃত, মঞ্জরীরা মহাগুরুস্থানীয়, মহান্ত গুরু হইতেছেন মঞ্জরীদের অনুগৃহীত। তিনি শিষ্য-সাধককে মঞ্জরীর অনুগ্রহ লাভ করিতে সহায়তা করেন। মঞ্জরীর কৃপাতেই সিদ্ধদেহ পাইয়া সাধক ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবারসের আস্বাদন করেন ও মঞ্জরীত্ব প্রাপ্ত হন। সখী-মঞ্জরীর অনুগ্রহ ছাড়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির কোনই উপায় নাই। এই হইল রাগানুগা মার্গের রহস্য।

গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

(চৈঃচঃ মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ ২।৮)

পঞ্চদশ শতাব্দের শেষে বাঙ্গালা দেশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। সেই সময়ে বাঙ্গালাদেশে নানারকম ধর্মসাধনার ধারা প্রচলিত ছিল। রঘুনন্দন প্রবর্তিত স্মৃতির রক্ষণশীল আচার-আচরণে ও ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতাপে সমাজ-জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ভ্রষ্ট মহাযান বৌদ্ধধর্ম হইতে উদ্‌ভূত বজ্রযান ও সহজযানের বিকৃত আচার-আচরণ সুরঙ্গপথে প্রচারিত ছিল। বামাচারী তান্ত্রিকদের শক্তিতত্ত্ব ও নারী লইয়া দেহাশ্রিত শক্তিসাধনা এক শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে প্রচলিত হয়। "তন্ত্রসারের' লেখক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। গূঢ়াচারী 'নাথধর্মও' জনসমাজে প্রচলিত ছিল। চর্য্যাপদাবলীতে উল্লিখিত সহজসাধনার গুপ্ত ধারা সমাজের জীবনের অন্তস্তলে প্রচারিত ছিল। সহজিয়ারা ধর্ম-সাধনায় নারী-সঙ্গিনী গ্রহণ করিত এবং দেহাশ্রিত কতকগুলি 'কৃত্য' এই সব সাধক-সাধিকার দল পালন করিত। এই সহজ সাধকদের ("নেড়ানেড়ী") নিত্যানন্দ ও তৎপুত্র বীরচন্দ্র বৈষ্ণবধর্মে স্থান দিয়াছিলেন এবং পরে ইহারাই 'বৈষ্ণব

সহজিয়া' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কবি কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে ভণ্ড সন্ন্যাসী, বীভৎস কাপালিক ও ভ্রষ্ট তান্ত্রিকের উল্লেখ দেখি। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে মনসা, বাশুলী ও ধর্মঠাকুরের পূজার উল্লেখ আছে। ধর্মে লোকের আস্থা ছিল না। ধর্ম তখন বাহ্য আচার-আচরণে পর্যবসিত হইয়াছিল। চৈতন্যের ধর্মকে এইসব সাধনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যদিও দেবকল্প পূতচরিত্র চৈতন্যদেবের সহিত ইহাদের কোন সংশ্রব ছিলনা, তবু তাঁহার বৈষ্ণবধর্মে ইহাদের প্রভাব পড়িয়াছিল। তন্ত্রের মূল অর্থ যাহাই হউক, এই সব বৌদ্ধ হিন্দু বৈষ্ণব ও শাক্ত বা শৈব ধর্মে তন্ত্রের প্রভাব দেখা যায়। সকলেই শক্তি ও শক্তিমান্ তত্ত্ব বা নারীশক্তি-পুরুষশক্তির মিলন-জনিত 'সামরস্য' বা মহাসুখকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। 'বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র' ও কাশ্মীরীয় শৈব আগমে স্পষ্টতই তান্ত্রিক প্রভাব আছে। তন্ত্রের শিবশক্তিতত্ত্ব বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণতত্ত্বকে প্রভাবিত করিয়াছে। বৈষ্ণবদের শক্তিতত্ত্ব, কামগায়ত্রী ও কৃষ্ণের শক্তি-স্বরূপিনী রাধা—এইগুলি তন্ত্রের প্রভাবই সূচিত করে। রূপ ও জীব গোস্বামীর বৈষ্ণবশাস্ত্রে তন্ত্রগ্রন্থ হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। নারদ-পঞ্চরাত্র গ্রন্থে রাধাকে তান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে। 'রাধাতন্ত্র' জাতীয় গ্রন্থগুলির উল্লেখ না করিলেও চলে। রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে শ্রীরাধাকে 'তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা' কৃষ্ণের হ্লাদিনী মহাশক্তি বলা হইয়াছে।

"হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥"

(উ. ম.) উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীরাধাপ্রকরণ (ছয়)

সচ্চিদানন্দপূর্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ কৃষ্ণের তিন শক্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ।

"আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

(চৈঃ চঃ আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ।)

রাধা ও কৃষ্ণের লীলা তো শক্তি-শক্তিমানের লীলা।

"কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়।"
"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্"—

(চৈঃ চঃ আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীরাধা।

শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা প্রেমের দ্বারাই করিতে হইবে। এখানে যেন তন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
'কামগায়ত্রী' 'কামবীজে' যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের আগেই অম্বিকা-কালনার গৌরীদাস পণ্ডিত (সরখেল) চৈতন্য ও নিত্যানন্দের দারুময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার প্রচলন করেন। অদ্বৈত আচার্য্যের ইহাতে সম্মতি ছিল। এখানেও তান্ত্রিক প্রভাব দেখি।

চৈতন্য-তত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয় ১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৬ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা সন্ধ্যায়। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। শ্রীচৈতন্য দুইটি কাজ করিয়াছিলেন—"নাম দিয়া ভক্ত কৈল পড়াঞা পণ্ডিত"। শ্রীচৈতন্য জীবৎকালেই ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন অবধূত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ ও পরমজ্ঞানী অদ্বৈত আচার্য্য। নিত্যানন্দের প্রবল অনুরাগ ছিল কৃষ্ণলীলা-শ্রবণে ও হরিনামগানে। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পর নিত্যানন্দই বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সমাজের নেতা হন এবং কৃষ্ণনাম ও চৈতন্য-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। ভক্তগণ চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে কৃষ্ণ ও বলরামের অবতার বলিয়া মনে করিতেন। অদ্বৈত আচার্য্য পুরীতে গৌড়ীয় উৎকলবাসী ভক্তদের সমক্ষে প্রকাশ্যে প্রথম শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন জীবের উদ্ধারের জন্য। "অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।" মুরারি গুপ্তের কড়চায় শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার বলা হইয়াছে। কবি কর্ণপূর 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক সংস্কৃত নাটকে বলিয়াছেন, ত্রিবিধ প্রয়োজন সাধনে চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে—জীবগণের দুঃখমোচন, মায়াবাদ-খণ্ডন ও রাগানুগাভক্তির মহিমাস্থাপন। বৃন্দাবনদাস ঐশ্বর্য্য-লীলার উপর

জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে কলিযুগে নাম-সংকীর্ত্তন প্রচারের জন্য ও পাষণ্ডী-দলনের জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম চৈতন্যরূপে ও নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। 'চৈতন্য-ভাগবতে' শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে কীর্তনের একমাত্র জনক বলা হইয়াছে।

"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।'—'চৈতন্য-ভাগবত' মঙ্গলাচরণম্
"কলিযুগে ধর্ম হয় হরি-সংকীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥"
এই কহে ভাগবতে সর্বতত্ত্ব সার।
কীর্ত্তন-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার॥

—'চৈতন্য-ভাগবত' আদিখণ্ড ২য় অধ্যায়

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম নাম-সংকীর্ত্তন সার॥ (চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা ৩য়)

বাঙ্গালা দেশের ভক্ত বৈষ্ণবেরা এইমত পোষণ করিতেন। তাঁহার মাধুর্য্য-লীলার কথাও পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতানুযায়ী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। তাঁহার মতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজরস আস্বাদনের জন্য শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—নাম-সংকীর্ত্তন প্রচারাদি ছিল গৌণ উদ্দেশ্য। স্বরূপ দামোদর চৈতন্যলীলার আদিসূত্রধার। তিনি তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥[১]

"১। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ। ২। শ্রীরাধা যাহা আস্বাদন করেন, আমার সেই বিচিত্রমাধুর্য্য কিরূপ এবং ৩। আমার অনুভববশতঃ শ্রীরাধা যে সৌখ্য বা আনন্দ অনুভব করেন, সেই আনন্দই বা কিরূপ—এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লোভের বশীভূত হইয়া শচীর গর্ভরূপ সিন্ধুতে রাধাভাব-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণরূপ-চন্দ্র আবির্ভূত হইলেন।" এই তিন প্রয়োজনেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।

১ চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত

ভাগবতের একটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবভক্তেরা শ্রীচৈতন্যের অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর ভাবটি স্থাপন করিয়াছেন।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥[১]

(১১।৫।৩২ শ্রীমদ্ভাগবত)

এই মূলটিকে অবলম্বন করিয়া স্বরূপ গোস্বামী তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥[২]

—"রাধা হইলেন কৃষ্ণেরই প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি, এইজন্য তাঁহারা একান্ত একাত্ম হইয়াও পৃথিবীতে (বৃন্দাবনধামে) দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধুনা আবার সেই দুই ঐক্য লাভ করিয়াছেন, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত চৈতন্যাখ্য সেই প্রকট কৃষ্ণস্বরূপকে আমি প্রণাম করি।"[৩]

ভক্তের চক্ষে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণের মিলিতরূপ। মহাপ্রভুর সমস্ত জীবন হইল রাধাপ্রেমের ভাব-প্রতিরূপ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেম কেমন ছিল তাহা শ্রীচৈতন্যই তাঁহার দিব্যজীবনের মধ্য দিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন।

যদি গৌরাঙ্গ না হত কি মনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে ॥
মধুর-বৃন্দাবিপিন-মাধুরী-
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥

॥ পদটি বাসু ঘোষের, 'নরহরি সরকারের' নামে প্রচলিত ॥

১ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৫।৩২, চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত।
২ চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত।
৩ অনুবাদ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, কাঁচড়াপাড়ার শিবানন্দ সেন, নবদ্বীপের মুরারি গুপ্ত ও শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বপ্রথম গৌরপারম্যবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন।[১] বাঙ্গালাদেশের বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যকে পরমতত্ত্ব বা উপেয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকে গৌণ স্থান দিয়াছেন। এই গৌর-পারম্যবাদিগণ শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার কিশোর মূর্তিটির অনুরাগী ছিলেন। নীলাচলের রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্ত শ্রীচৈতন্যকে পরমতত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেন।

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা শ্রীচৈতন্যকে পরমভাগবত বলিয়া ভাবিতেন, চৈতন্য ও কৃষ্ণ এক বলিয়াও মনে করিতেন। তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য কৃষ্ণ। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে পরমতত্ত্ব লাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। সনাতন, রূপ, জীব গোস্বামী তাঁহাদের গ্রন্থে কৃষ্ণতত্ত্বই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, চৈতন্যতত্ত্বের কথা বলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহারা 'স্বয়ং ভগবান্' বলিয়াছেন। অবশ্য শ্রীচৈতন্যকে তাঁহারা হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। সমগ্র ভারতে বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রচারের জন্য তাঁহারা কৃষ্ণকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই সংস্কৃতে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন।

পরবর্ত্তীকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুকে 'স্বয়ং ভগবান্', স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলা হইয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণ ও চৈতন্যে আর ভেদ রহিল না।

বাঙ্গালাদেশে গৌড়পারম্যবাদিগণ আর এক ধাপ অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা ব্যক্তিগত জীবনে গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণনাগরভাবে ও নিজেদের ব্রজগোপী বা নাগরীভাবে কল্পনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার প্রথম এইভাবের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে; আরও অনেকে গৌরনাগরভাবের পদরচনা করিয়াছে। নরহরির শিষ্য লোচনদাস কড়া আদিরসাত্মক গৌরনাগরভাবের পদ রচনা করিলেন। গৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝিতে হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 'পঞ্চতত্ত্ব' জানিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য ভক্ত-মহাপ্রভু, নিত্যানন্দভক্ত-স্বরূপ, অদ্বৈত আচার্য্য ভক্ত-অবতার, শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত, গদাধর ভক্ত-শক্তিক।

---

১ বিমানবিহারী মজুমদার—'চৈতন্যচরিতের উপাদান'। ১ম সংস্করণ পৃ. ৬৭

রাধাকৃষ্ণলীলার রূপক বা জীবাত্মা-পরমাত্মাবাদ

বর্ত্তমানকালের চিন্তাধারার প্রভাবে অনেক মনীষী রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাকে ভক্ত ও ভগবানের রূপক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রতি রাধার বা গোপীদের প্রেমের আকর্ষণকে ভগবানের প্রতি ভক্তের আকর্ষণ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনী যাহা আমরা পুরাণাদিতে ও বৈষ্ণব-পদাবলীতে পাই তাহা হইতেছে কাল্পনিক, ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক বুঝাইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তত্ত্বদৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিত্য ও সত্য, কৃষ্ণের প্রকট-অপ্রকট লীলাও যেমন নিত্য ও স্পষ্ট সত্য তেমনি প্রকট-অপ্রকট ধামও নিত্য ও সত্য, পুরাণাদিতে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ কাহিনীও ঐতিহাসিক সত্য। ডাঃ সুশীলকুমার দে তাঁহার "Vaiṣṇava Faith and Movement" গ্রন্থে এবিষয়ে একটি মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন।

"It is important to note that the vṛndavana-līlā is not a mere symbol or divine allegory, but a literal fact of religious history. The Rādh -kṛṣṇa myth, as depicted in the Pūraṇas and elaborated in the Kāvyas, Nāṭakas and Campṭs as well as Rasa-śāstras, of the sect as the basis of its theology and devotional life, is taken as a vivid historical as well as super-historical reality, but there is no suggestion of its being an allegory. The pressure of modern thought has, no doubt, induced some modern writers on the subject to the desperate method of allegorical interpretation, but the theologians and poets of the sect never think it necessary to spiritualise the myth as a symbolism of religious truth ; for the Purṇaic world to them is manifestly a matter of history."

এই সম্বন্ধে কয়েকজন চিন্তাশীল আধুনিক মনীষীর মতবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণকে গভীর প্রেমাসক্তির রূপক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি এক সময় নবীনচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন— "আমি ভাগবতখানিকে একটি খুব উচ্চ-অঙ্গের রূপক (**allegory**) বলিয়া মনে করি।" আবার একবার তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন—

"পৃথিবীতে যে ভালবাসার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখা যায় না—যাহার সহিত পূর্বকৃত কোন সম্বন্ধবন্ধন জড়িত নাই—এমন কি, যাহা সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দুরূহ দুরাশায় আত্মবিসর্জন করিতে যায়, বৈষ্ণব কবিগণ পৃথিবীর সেই ভালবাসাকেই পরমাত্মার প্রতি আত্মার অনিবার্য্য নিগূঢ় ভালবাসার আদর্শ রূপকস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন'।[১] বৈষ্ণব-পদাবলীর অভিসার পর্য্যায়ের একটি পদে ভক্তের প্রতি ভগবানের করুণা প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় পদটির সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলা বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥" (চণ্ডীদাস, বৈঃ পঃ পৃঃ ৫২)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বৈষ্ণব কবিতাতেও' ভগবানের ও ভক্তের একান্ত লীলার কথা বলিয়াছেন।

"এই গীতি-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে।"
(রবীন্দ্রনাথ ; "বৈষ্ণব কবিতা")

মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বৈষ্ণব-পদাবলী হইতে নানা উদ্ধৃতি দিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন যে রাধাকৃষ্ণলীলায় আত্মা-পরমাত্মার সম্পর্কই প্রকাশিত হইয়াছে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অনেকে ভক্ত ও ভগবানের পারস্পরিক আকর্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত উইলিয়ম জোন্‌স গীতগোবিন্দের ইংরাজী অনুবাদে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে **"reciprocal attraction between the divine of goodness and the human soul."** বলিয়াছেন। পরবর্তীযুগে এই আদিরসাত্মক প্রণয়কাব্যটি ভক্তিরসের কাব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত গীয়ার্সন্ কিন্তু বিদ্যাপতির পদাবলীর রাধাকৃষ্ণরূপক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীরাধা জীবাত্মা আর শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "স্বয়ং জগদীশ্বর" পরমাত্মা।[২]

---

১ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্দ্ধ পৃঃ ৫৮৮)।

২ বৈষ্ণব সাহিত্য—ত্রিপুরাশংকর সেন।

বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে' বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের দেহাশ্রিত প্রেমকে অনেকে ভক্ত ও ভগবানের লীলারূপক বলিয়া মনে করেন। সংসারমুগ্ধ জীব রাধার মতই 'বড়ুআর বহুআরী আক্ষে বড়ুআর ঝী' এই গর্বে উদ্ধত হইয়া শ্রীভগবানকে স্বীকার করিতে চাহে না। তখন স্বয়ং ভগবান্ আঘাত-সংঘাতে জর্জরিত করিয়া মায়ামুগ্ধ ভক্তের মর্ত্য-পিপাসা দূর করেন। সুতরাং ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কটিকে এখানে রাধাকৃষ্ণের রূপকের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে।[১] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলীর[২]' ভূমিকায় বলা হইয়াছে, রাধাভাবে ভাবিত জীবাত্মা পরমাত্মা কৃষ্ণের সঙ্গে যখন অন্তর্বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস করেন তখন দ্বৈতভাবের ক্ষণিক তিরোধান ঘটে। ইহার আংশিক আভাস রহিয়াছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৩।২১), "প্রিয়া স্ত্রীর দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের যেমন বাহ্য বা আন্তর কোন ভেদজ্ঞান থাকে না, প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা আলিঙ্গিত পরমাত্মারও তেমনি বাহ্য বা আন্তর কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। এ অবস্থায় কামনার যেমন চরম প্রাপ্তি, তেমনি আবার সর্বকামনার শেষ"। "যে স্নেহ-প্রেম-সম্পর্ক মানুষকে তাহার জীবনের মধ্য দিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যায় তাহাই কৃষ্ণলীলার রূপকের মধ্য দিয়া জীবন-মরণাতীত নিত্যসম্পর্করূপে বৈষ্ণব-পদাবলীতে উপস্থাপিত।" একালের অনেকে মনে করেন, বৈষ্ণব কবিগণ রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভগবানের প্রতি জীবের আকর্ষণ, তাঁহার সহিত মিলনের আনন্দ, তাঁহার বিরহে ভক্তের মর্ম-বেদনা বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কেহ বা বলেন সীমা ও অসীমের সম্পর্ক দেখানই বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্দেশ্য।

বৈষ্ণব দার্শনিকগণ 'জীব ও ব্রহ্ম' (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) এই পারিভাষিক শব্দ দুইটি খুব কম ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্রজের কৃষ্ণলীলায় গোপী হইলেন জীব এবং কৃষ্ণ হইলেন ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। গোপীমুখ্যা শ্রীরাধা ব্রহ্মের (শ্রীকৃষ্ণের) নিষ্ক্রিয় স্বরূপ-শক্তি। ব্রহ্মে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয় শক্তিই বিদ্যমান, রসরূপ ব্রহ্ম নিজের রস নিজেই আস্বাদন করেন। যিনি আস্বাদন করেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ আর যাঁকে আস্বাদ করা হয় তিনিই শ্রীরাধা, কেননা রাধা ও কৃষ্ণ স্বরূপত এক এবং অভেদ, কেবল লীলার জন্যই ভেদ-কল্পনা, সুতরাং

---

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

২ বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (৭ম সংস্করণ)।

জীব হইতেছেন রাধা বা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। রাধা হইতেছেন গোপীশ্রেষ্ঠা এই রাধাভাবই জীবের সাধ্যসার। ডঃ সুকুমার সেন বলেন—

"The Vaisṇava Philosophers did not much use the term Brahman and the term Jīva was also used very seldom. In their terminology the name kṛṣṇa stands for Brahman, and Gopī for Jīva which has entered into the sportive cycle of Kṛṣṇa (Brahman). The term Rādhā stands for Jīva when viewed as the passive element of Brahman (Kṛṣṇa). In Brahman (Kṛṣṇa) the two aspeots are inseperably connected like the two pages of a leaf—Brahman the knower, the enjoyer and the Brahman the known, the enjoyed : in their words, Brahman the active or the enjoyer is Kṛṣṇa and Brahman the passive or the enjoyed is Rādhā, Jīve is of the nature of Brahman the passive."

Hence Rādhā is the head of the Gopīs and Rādhāhood is the finality of Jīva.[১]

আগেই বলিয়াছি রাধা-কৃষ্ণকে রূপক-প্রতীকরূপে গ্রহণ করা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্ত-সম্মত নয়। বৈষ্ণব মহাজনেরা ভাববৃন্দাবনে অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণলীলা মানস-নয়নে দর্শন করিয়া ধন্য হইতে চান। এই লীলা আস্বাদন ও হৃদয়ে প্রেম জাগরূক রাখাই পরম পুরুষার্থ। রাধার ভাব বা স্থান কোন বৈষ্ণব-ভক্তই অবলম্বন করিতে চাহেন নাই। প্রাক্-চৈতন্য যুগের গৌড়ীয় ধর্মে এমন কি শ্রীচৈতন্যের ধর্ম-সাধনা সম্বন্ধে-ও এই মতবাদটি কিছুটা খাটিতে পারে। কিন্তু চৈতন্য-পর যুগে একথাটা আর খাটে না। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণের লীলা দূর হইতে দর্শন করিয়াছেন, লীলায় নিজেরা অংশ গ্রহণ করেন নাই, সখীর অনুগ হইয়া 'যুগলের' সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দদাস এই ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন—

> শুন শুন সুবদনি বিনোদিনী রাই।
> তোমা বই কারু নই তোমারি দোহাই॥
> তোমার লাগিয়ে সাধের গোলক ছাড়িলাম।
> গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম॥

---

১ **A History of Brajabuli Lit.—Dr. S. Sen.**

ইথে না প্রত্যয় যাও মদন কর সাক্ষী।
তব চরণ দাও শ্রীশ্যাম নাম লিখি॥
কোমল পদে কঠিন নাম লিখিতে আঁচড় যায়।
ধুলাতে লিখিয়ে নাম চরণ রাখ তায়॥
গোবিন্দ দাসিয়া কহে শুন সব সখি।
বিকাইনু রাইপদে তোমরা হও সাখি॥

(বৈঃ পঃ পৃঃ ৬৭৩)

বৈষ্ণব-পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের এই অলৌকিক প্রেমলীলার কথাই পাই। লৌকিক নরনারীর প্রেম সেই অপার্থিব প্রেমেরই প্রতিচ্ছবি। ভক্ত কবিগণ লৌকিক প্রেমের বৈচিত্র্য ও সাধারণ অলংকার-শাস্ত্রের রীতি অনুসরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মাধুর্য্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অলৌকিক জগতের তত্ত্বকথাকে মানুষী ভাষায় রূপ দিয়াছেন।

"When the nature of Supreme Bliss is to be expressed in words and thereby rendered intelligible to human understanding, it can be expressed only in analogy of the highest form of human bliss, that is, love as existing between a girl and her lover."[১]

---

১ **A History of Brajabuli Literature—Dr. S. Sen.**

অষ্টম অধ্যায়

শঙ্করদেব

কামতা-কামরূপে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের মূলাধার ছিলেন শ্রীশ্রীশঙ্করদেব।

শঙ্করদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ঐ সকল অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব মতবাদ ছিল সন্দেহ নাই। তবে তাহা পৌগণ্ডত্ব অতিক্রমও করিতে সক্ষম হয় নাই। ভূমিদানপত্রে, পর্বতগাত্রে[১], তাম্র-অনুশাসনে বাসুদেব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, দেবকী এবং যশোদার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। নরক রাজবংশ নিজেদের বিষ্ণুর বরাহ অবতার বংশ-সম্ভূত বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

চতুর্দশ শতাব্দের পূর্ব-পর্যন্ত কামতা-কামরূপে বৈষ্ণবতার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম বা পদাবলী-সাহিত্য কিছুই পাওয়া যায় না। কামতা-কামরূপে বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলী-সাহিত্যের জন্মদাতা ও পাতা—শঙ্করদেব। প্রাক্-শঙ্করীয় যুগের কবিদের মধ্যে হেম সরস্বতী, হরিহরবিপ্র, কবিরত্ন সরস্বতী এবং মাধব কন্দলী উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহারা বিবিধ পুরাণ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং সেই সংগে ভক্তিবাদের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই একক কৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণকে লইয়া কোন কাব্য রচনা করেন নাই। তন্মধ্যে হেমসরস্বতী প্রহ্লাদের হরিভক্তিকে লইয়া "ইতি নরসিংহপুরাণে হিরণ্যকসিপুবধ" শীর্ষক একখানা পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে শঙ্করদেব তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়নের সময়ে 'ভাগবতপুরাণ' পাঠ করেন। এই ভাগবত পুরাণই তাঁহার ধর্মমতের আমূল পরিবর্তন ঘটায়। তিনি গীতা ও ভাগবতের মতবাদ জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে সুরু করেন। তিনি যখন প্রথম প্রচার কার্য সুরু করেন তখন তিনি নওগাঁতে বাস করিতেন, কিন্তু আহোমরাজ ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন এবং বাধ্য হইয়া তিনি প্রাণভয়ে নওগাঁ পরিত্যাগ করিয়া বড়দোয়াতে (বরপেটা) আসেন এবং সেইখান হইতে কোচবিহার নগরে গমন করেন। তদানীন্তন কোচরাজ নরনারায়ণও তাঁহাকে

১ **The Rock Inscription of Bargangā in the Mikir Hills dt. 554 A. D.; Vāskaravarmā's Grant, Harjjaravarmā's Plate, Ratnapāl's Plate, Banamālā's Plate.**

সুনজরে দেখিতে পারেন নাই, কিন্তু নরনারায়ণের কনিষ্ঠভ্রাতা চিলারায়ের সুনজরে পড়েন এবং স্বাধীনভাবে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতে সুরু করেন।

শঙ্কর-শিষ্যেরা (আতৈ বা) 'ভকত' নামে পরিচিত। শঙ্করদেবের প্রচারের মূলবস্তু ছিল 'ভক্তিবাদ' এবং ভক্তিবাদ প্রচার করিতে গিয়া তিনি বলেন—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, বন্দন, এবং আত্মনিবেদন দ্বারাই ভগবানকে ভক্তি করা যাইতে পারে—

শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বিষ্ণুর
অর্চ্চন পদ সেবন।
দাস্য সখিত্ব বন্দন বিষ্ণুর
করিব দেহা অর্পণ॥
বিবিধ ভক্তি বিষ্ণুত ঘাটের
সেহিসে উত্তম পাঠ।
(কীর্ত্তন)

শঙ্করদেব প্রবর্তিত উপাসনা-পদ্ধতিকে বলা হয় 'নামকীর্তন'। এই নাম-কীর্তনে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল লোক যোগদান করিতে পারিতেন।

'নামকীর্তন' প্রবর্তনের জন্যই তিনি কীর্তন রচনা সুরু করেন।

শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বেদ-বেদান্তকে মূল উৎসরূপে ধরিয়াছিলেন—

পুরাণ সূর্য মহা ভাগবত
বেদান্তর ইটো পরম তত্ত্ব। (পাষণ্ডমর্দ্দন)
*   *   *
আপনি কহিলা কৃষ্ণ বেদান্তর মত।
*   *   *
হরি সে চৈতন্য আত্মা জ্ঞানময়।
অবর সমস্তে যার
বেদ-বেদান্তর সমস্ত শাস্ত্রর
এহিসে বিচার বড়।

শঙ্করদেব কর্মবাদকে স্বীকার করেন নাই। উপরন্তু বলিয়াছেন জপতপ, ক্রিয়া-কলাপ, তীর্থদর্শন কোন কিছুই মানুষকে মুক্তি দিবে না, যদি না 'ভক্তি' থাকে—

"তীর্থ বরত তপজপ যাগ যোগ যুগতি
মন্ত্র পরম ধর্ম করম করত নাহি মুকতি।" (বরগীত)
কোটি করম কয় হরিকো নাহি পায়
পরল ভব বেরি বেরি।

সেইজন্য শঙ্করদেব 'নাম'-কীর্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন—

"কলির পরম ধর্ম হরিনাম"
* * *
সব অপরাধক বাধক সাধক
সিদ্ধি করু হরিনাম।
* * *
দেবক উপরি রাজা মাধব
ধরমক উপরি নাম
কোটি কলাপক পাতক নাশক
ডাকি বোলহু রামনাম।
"যেই নাম সেই হরি জান নিষ্ঠা করি।"

শঙ্করদেব অদ্বৈতপন্থী ছিলেন—

তোমার অদ্বৈতরূপ পরম আনন্দপদ
তাহে মোর মগ্ন হোক চিত্ত।" (বেদস্তুতি)

এই মতবাদের জন্য তিনি শঙ্করাচার্যের নিকট ঋণী এবং ঋণ স্বীকার করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"আছিল পরমহংস ভট্টাচার্য যতি
নামত শঙ্কর তান শুনিও সম্মতি
হেন বিশ্বনাথ কৃষ্ণকো সে করো সেবা
না মানো না মানো হরি বিনে আন দেবা
শঙ্কর আচার্য মত ভুজঙ্গ প্রখ্যাত
কহিলাম সাধু সব শুনিও সাক্ষাৎ।"

শঙ্করদেবের মতে ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি এই পৃথিবীর অধীশ্বর, তিনিই সমস্ত কার্য-কারণের মূলাধার, তিনিই সত্য, বাকী সমস্তই অসত্য, তিনি সর্বভূতে বিরাজমান—

"তুমি পরমাত্মা জগতর ইহ এক
একো বস্তু নাহিকে তোমাত ব্যতিরেক
তুমি কার্যকারণ সমস্ত চরাচর
স্বুবর্ণ কুণ্ডলে যেন নাহিকে অন্তর
তুমি পশু পক্ষী স্বুরাস্বুর তরু তৃণ"

* * *

"তুমি সে কেবল সত্য মিথ্যা সবে আন।"

* * *

তুমি সে প্রথম প্রভু ধরা বহুরূপ
তুমি বিনে বস্তু নাহি কহিলো স্বরূপ।
তুমি ব্রহ্ম তুমি সত্য
তুমি সত্য ব্রহ্ম তোমাত প্রকাশে
জগত ইটো অনন্ত
জগততো সদা তুমিয়ো প্রকাশা
অন্তর্যামী ভগবন্ত। (বেদস্তুতি)

শঙ্করদেবের এই অদ্বৈতবাদের সংগে বেদান্তের 'মায়াবাদের' সাদৃশ্য রহিয়াছে। উপনিষদে 'মায়া'কে বলা হইয়াছে 'প্রকৃতি।' ভগবান্ 'মায়ী' এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে তাঁহারই 'মায়া'। শঙ্করদেব বলিয়াছেন—এই পৃথিবী মায়াময় এবং এই মায়া হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে হইবে—

এ ভব গহন বন আতি মোহপাশে ছন্ন
তাতে হামু হরিণা বেড়াই।
ফান্দিলো মায়ার পাশে কাল ব্যাধ ধায়া আসে
কাম ক্রোধ কুত্তা খেদি খায়। (বরগীত)

ভগবানই সৃষ্টি করিয়াছেন 'বিদ্যা'র এবং যাঁহারা বিদ্বান্ নহে তাঁহারাই মায়ার ফাঁদে আটক পড়েন। বিদ্যা মুক্তিদাতা, অবিদ্যা মোহে আবিষ্ট করিয়া রাখে—

'তোমার অনাদি অবিদ্যা তিমিরে
অন্ধ করি আছে মোর
তোমাক না জানি দেহক মোর বুলি
মজিল দুখ ঘোর।'

সেইজন্য শংকরদেব বলিয়াছেন—

"তুমি সে কেবল সত্য সবে মায়াময়
তুমি বিনে সত্য আন বস্তু নাহি কয়॥" (ভাগবত)

* * *

হে কৃষ্ণ তুমি মাত্র চৈতন্যস্বরূপ নিত্য
সত্য সুধা জ্ঞান অখণ্ডিত
আবর যতেক ইটো তোমার বিনোদরূপ
চরাচর মায়ায়ে কল্পিত।

শংকরদেব আত্মা-পরমাত্মার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

ঈশ্বরত করি জীব ভিন্ন নুহি
শান্ত অবিকারি হয়।
ভ্রান্তিয়ে অজ্ঞান আবর্ত হুস্না
আপনাক নাজানয়॥

শংকরদেবের এই মতবাদের সহিত ছান্দগ্যোপনিষদের শাণ্ডিল্যসূত্রের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

অনেকের মতে শংকরদেবের 'অদ্বৈতবাদ' হইতেছে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' এবং ইহা রামানুজের মতেরই অনুরূপ। এই মতবাদ নূতন নহে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এই মতবাদ রহিয়াছে। তবে রামানুজের সংগে শংকরদেবের কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে। রামানুজ 'কর্মকাণ্ড' উত্তরমীমাংসাকে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু শংকরদেব একেবারে তাহা বর্জন করিয়াছেন।

শংকরদেব যুগল-মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন না, একক-শ্রীকৃষ্ণের (চতুর্ভুজের) এবং তাঁহার নিকট'দাস্যভাবই' ছিল প্রধান—

"গোবিন্দ দয়াশীল স্বামী
তুহু মোরি সয়েব চাকর আমি"

* * *

যাকেরি চাকেরি করতহোঁ গতি পাতকী পায়।
শংকর কহ সোহি হরিকো কতি ভকতি নাকায়॥ (বরগীত)

* * *

শংকর কহ হরি সেবক তোর

* * *

দাস দাস বুলি তারহু এহু শংকর ভাণা (বরগীত)

তুলনীয়—

"ম্যায়নে চাকর রাখজি। গিরিধারীলাল
চাকর রাখজি"—মীরাবাঈ,

শঙ্করদেব মূর্ত্তি-পূজার বিরোধী ছিলেন, তিনি বলেন—

"তীর্থ বুলি করে জলত শুদ্ধি
প্রতিমাত করে দেবতা বুদ্ধি
বৈষ্ণবত নাই ইসব মতি।" (পাষণ্ডমর্দ্দন)

শিখ-সম্প্রদায়ের লোকেরা যেরূপ 'গ্রন্থসাহেব' বেদিকার উপর রাখিয়া (তাঁহাকে) পূজা করেন তেমনি শঙ্করদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদীর উপর রাখিয়া পূজা করিতেন।

উপাসনাগৃহে নারীর কোন প্রবেশাধিকার শঙ্করদেব দেন নাই।

শঙ্করদেবের ভক্তি—রাগানুগাভক্তি নহে, তাহা 'পরাভক্তি'। এই ভক্তি নারদের ভক্তির অনুরূপ।

শঙ্করদেব রাধাতত্ত্ব ও 'রাধাভাব' গ্রহণ করেন নাই। তাই তাঁহার বাক্যে ও কর্মে রাধার কোন উল্লেখ নাই। রাধার পরিবর্তে তিনি রুক্মিনী সত্যভামা ও নারদের উল্লেখ করিয়াছেন। নারদ দৌত্যকার্য্য করিয়াছিলেন। দুষ্টা সরস্বতী যেমন বিবাদ সৃষ্টি করাইতেন নারদও অনুরূপ করিতেন।

বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকেরা বিভিন্নভাবে আখ্যায়িত হইয়াছেন।

রামনন্দ	—	স্বামী
তুলসীদাস	—	গোস্বামী
চৈতন্যদেব	—	মহাপ্রভু
শঙ্করদেব	—	মহাপুরুষ

বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকেরা তাঁহাদের স্ব স্ব মতকে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশের জন্য কতকগুলি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য করিয়াছিলেন—

শঙ্করদেব	—	চারি ধরণের নাম
হরিব্যাস	—	আট ধরণের নাম
রামানন্দ	—	দ্বাদশ ধরণের নাম
চৈতন্য	—	ষোড়শ ধরণের নাম

বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন প্রচারকেরা স্ব স্ব মতে নির্দেশ দান করিতেন—

শঙ্করদেব	—	শরণ : কীর্ত্তন।
চৈতন্যদেব	—	দীক্ষা : সংকীর্ত্তন।
রামানুজ	—	শরণাগতি : মন্ত্র (রামানন্দ)।
হরিব্যাস	—	সংঘশরণ : মৃত্গীত।

শঙ্করদেব 'রাধাবাদ' এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'পরকীয়া' মতবাদ গ্রহণ করেন নাই ইহা সত্য, তথাপি শঙ্কর-মতবাদকেও 'পরকীয়া' মতবাদ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কারণ পরকীয়া দুই প্রকারের—জ্ঞানী পরকীয়া ও শুদ্ধ পরকীয়া। শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত পরকীয়া 'জ্ঞানী পরকীয়া', শুদ্ধ পরকীয়া নহে। জ্ঞানী পরকীয়াতে ঈশ্বরের দৈবী মহিমা এবং ঐশ্বর্য্যের কথাই ব্যক্ত করা হয়—কেলিগোপাল নাট, কালীয়দমন নাট, পারিজাতহরণ নাট প্রভৃতিতে এইভাব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

"জ্ঞানী পরকীয়া ধর্ম কহে মায়াশ্রিতে
ইহার প্রমাণ দেখা শ্রীমত ভাগবতে।"

'শুদ্ধ পরকীয়া' প্রেমের ওপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই গঠিত। সেখানে জ্ঞান-গরিমার কোন মূল্য নাই এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে দর্শনীয়ও কিছুই নাই—

'অন্তস্ফুট ধর্ম এই বহিস্ফুট নয়

*　　*　　*

সুন্দর নায়ক দেখি সামান্য নায়িকা
সেইভাবে দেখে তারে হয়ে রাগাত্মিকা
সেইভাবে কৃষ্ণক ডাকহ বারবার
আপনি ঘুচিয়া যাবে মনের অন্ধকার।'

নবম অধ্যায়

গোপী-কাহিনী

গোপীকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলাই গোড়ীয় বৈষ্ণব-পদাবলীর মুখ্য বিষয়। গোপী-প্রেম কি তাহা না বুঝিলে বৈষ্ণব-পদাবলীর রস সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। 'রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী' বর্ণনা করিবার সময় ব্রজগোপীদের কথাও সেই সঙ্গে বলিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে গোপীকৃষ্ণ-কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি।

॥ পুরাণাদিতে গোপীকাহিনী ॥

মহাভারতে কৃষ্ণের জন্ম ও ব্রজে বাল্যলীলার কথা (শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত না হইলে) পাওয়া যায় কিন্তু ব্রজগোপীদের সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী নাই। অবশ্য দ্রৌপদী কৃষ্ণকে 'গোপীজনপ্রিয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব ॥

—(সভাপর্ব, মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ)

রামায়ণের একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণের উল্লেখ দেখা যায়—

পরিগৃহ্য গিরিং দোর্ভ্যাং বপুর্বিষ্ণোর্বিড়ম্বয়ন্।

(রামায়ণ,—লঙ্কাকাণ্ড, ৬৯।৩২)

ডঃ এইচ, সি, রায়চৌধুরী এই শ্লোকের মধ্যে কৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণের উল্লেখ করিয়াছেন।[১]

মহাভারতের খিল অংশ 'হরিবংশে' কৃষ্ণের ব্রজলীলার কথা স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন শকটভঙ্গ, পূতনাবধ (বকী বা পক্ষি-দানবী বধ), কালিয়দমন, হল্লীসক-ক্রীড়া (ব্রজগোপীদের সহিত রাত্রিতে 'হল্লীসক' নৃত্য) ইত্যাদি।

—'এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলংকৃতঃ।
শারদীষু স চন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী' ॥

—হরিবংশ

১ ('ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস'—ডঃ সুকুমার সেন)।

হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলার চেয়ে ঐশ্বর্য্য-লীলারই প্রাধান্য দেখা যায়। গোপীদের কোন নাম পাওয়া যায় না, প্রধানা গোপীর কথাও নাই। কৃষ্ণের সখাদের মধ্যে শ্রীদামের উল্লেখ আছে। গোবর্ধন পর্বতে ভাণ্ডীর (বটবৃক্ষ) গাছের কথা আছে।

বিষ্ণুপুরাণে ব্রজলীলার কাহিনী হরিবংশের অনুরূপ। সামান্য কিছু নূতন ঘটনা পাওয়া যায়। যেমন গর্গকর্ত্তৃক কৃষ্ণের নামকরণ, কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীদের প্রেম, একজন অনামিকা প্রধানা গোপীর কথা প্রথম পাওয়া যায়। হল্লীস-নৃত্যের অনুরূপ রাস-নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীধর গোস্বামী রাসলীলা বা রাসনৃত্যের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন।

"অন্যোন্যব্যতিষক্ত-হস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেন
ভ্রমতাং নৃত্য-বিনোদো রাসো নাম"।

—"নারী ও পুরুষ পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া গান করিতে করিতে ও মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্যানন্দ সম্ভোগ করে উহাকে 'রাস' বলা হয়।" ভাগবতে শরৎকালীন রাসের উল্লেখ আছে, আর জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' বসন্তকালীন রাসের কথা আছে।

কৃষ্ণের মথুরাগমনে ব্রজগোপীদের 'বিরহের' সর্বপ্রথম বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে। ইহাতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলা ও মাধুর্য্যলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়।

ভাগবতপুরাণে দুই একটি নূতন কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। অন্যান্য ঘটনা হরিবংশের মতই। নূতন কাহিনী যেমন তৃণাবর্ত্তবধ, বকাসুরবধ, দাবাগ্নি-পান, কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য গোপীদের কাত্যায়নী-পূজা, বস্ত্রহরণ ইত্যাদি। ভাগবতপুরাণের 'রাস-পঞ্চাধ্যায়' অংশে গোপী-কৃষ্ণপ্রেম বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পাঁচটি অধ্যায় কাব্যাংশে চমৎকার।

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎ-কাব্য-কথা-রসাশ্রয়াঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।২৫)

'এইরূপে সত্যসংকল্প শ্রীকৃষ্ণ অনুরক্তা অবলাগণের সঙ্গে চন্দ্রকিরণশোভিত রাত্রীগুলি যাপন করিয়াছিলেন। সেই রাত্রীগুলির কাহিনী লইয়া কত কাব্য-কথা রচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ আপনাতে সুরতকেলি-ব্যাপার রোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।'

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মথমন্মথঃ॥

(শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৩২।২)

—'কৃষ্ণ গোপিকাগণের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন, তিনি পীতাম্বরধারী, মাল্যবান্, তাঁহার মুখপদ্ম ঈষৎ বিকশিত, তিনি রূপে মন্মথের মনকেও মথিত করিতেছেন।'

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥"

—(শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।২৯।১)

—"সেই শরৎকালের রাত্রিসমূহে মল্লিকা ফুল বিকশিত হইয়াছে দেখিয়া ভগবান্ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া গোপীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন।"

বিষ্ণুপুরাণে কেবল গোপীকৃষ্ণ-প্রেমের উল্লেখই পাই কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য গোপীদের কাত্যায়নী পূজা করিতে দেখি। কৃষ্ণের প্রিয়তমা কোন একজন গোপীর কথা পাই। কিন্তু তাঁহার কোন নাম নাই। কৃষ্ণের কয়েক জন সখার নাম পাই—শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ, অংশু ইত্যাদি।

রাসমণ্ডল হইতে একজন প্রিয়তমা গোপীকে লইয়া কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে অন্যান্য গোপীদের যে বিলাপ তাহাকে 'গোপী-গীত' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দে ভাগবতপুরাণ রচিত বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলা ও ঐশ্বর্য্যলীলা দুইই দেখা যায়।

পরবর্তীকালে 'পদ্মপুরাণে' কৃষ্ণের ব্রজলীলাকে 'নিত্যলীলা' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রজ বা বৃন্দাবন 'ভাববৃন্দাবনে' পরিণত হইয়াছে। আরও পরের যুগের 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে' গোপী-কৃষ্ণের সখী বা সখার অনেক নূতন নাম আছে। ইহাতে গোপ-গোপীর পূর্বতন ইতিহাসও দেওয়া হইয়াছে। পদ্মপুরাণ রচিত হইবার কালে রাধা কৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়া স্বীকৃত এবং তাঁহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী বা প্রতিনায়িকারূপে চন্দ্রাবলী প্রাধান্য পাইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে গোপীপ্রেম কিছুটা আধ্যাত্মিক ভাবরসে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু ভাগবতে এই গোপীপ্রেম অনেকখানি পারমার্থিক সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এই গোপীপ্রেমই 'মহাভাবে' পরিণত হইয়াছে। ব্রজগোপীরা যেভাবে কৃষ্ণে সর্বস্ব অর্পণ করিয়া অনুরাগের পথে ভজনা করিতেন সেইভাবে কৃষ্ণের উপাসনা

করিতে হইবে,—"যথা ব্রজগোপিকানাম্" (নারদীয়-ভক্তিসূত্রে)। শাণ্ডিল্য-সূত্রে বলা হইয়াছে 'তদ্ভাবাৎ বল্লবীনাম্' (তাহার অভাব হইলে অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব হইলে বল্লবী যুবতীরা ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছিল)।

॥ প্রাচীন অপৌরাণিক সাহিত্যে গোপীকথা ॥

খ্রীষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৮ম শতাব্দের মধ্যে রচিত প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহ হালের 'গাথাসপ্তশতী'তে প্রথম গোপীকৃষ্ণের আদিরসাত্মক কাহিনী পাই। একটি শ্লোকে রাধার নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।[১]

কৃষ্ণ-প্রিয়তমা গোপী হিসাবে রাধার প্রাধান্যও দেখা যায়। আনন্দবর্ধনের ধন্যালোকেও (২।৬) গোপীদের ভিতর রাধার প্রাধান্য দেখা যায়। সংস্কৃত 'উদ্ভট' কবিতার সংগ্রহ (প্রকীর্ণ কবিতা) 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' প্রভৃতিতে গোপীকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-বিষয়ক বহু কবিতা আছে। কবিতাগুলির বেশীর ভাগই আদিরসাত্মক। ভক্তির সুর কোন কোন কবিতায় পাওয়া যায়। কৃষ্ণ-প্রেমলীলায় রাধার ক্রমে ক্রমে প্রাধান্যও দেখা দিয়াছে। পদ্মপুরাণের আগেই অপৌরাণিক সাহিত্যে কৃষ্ণের সহিত প্রণয়লীলায় রাধা অন্যান্য গোপিকাগণকে স্থানচ্যুত করিয়াছিল, সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের উদ্ধৃতি ও প্রাকৃত-সংস্কৃতপ্রকীর্ণকবিতায় তাহার নিদর্শন মিলে। অপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্য ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে বর্ণিত 'দানলীলা' ও 'নৌকালীলা' কাহিনীতেও গোপীদের চেয়ে রাধার প্রাধান্য দেখা যায়। অন্যান্য ব্রজগোপীরা রাধার প্রেমের সাহায্যকারিণী, তাঁহারা যেন সখী বা দূতীর ভূমিকা লইয়াছেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলায় গোপীরা সখীর স্থান লইয়াছেন। বড়ুচণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীতে একজন বৃদ্ধা গোপী আছেন, তিনি রাধাকৃষ্ণের মিলনে সহায়তা করিয়াছেন। বৈষ্ণব-পদাবলীতে গোপিকাগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সহায়, তাঁহারা রাধা বা কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রণয়-লীলায় সখীর স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজেদের কোনো কামনা-বাসনা নাই, কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা নাই। রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলায় সখীদের কাজ হইল সবসময় 'যুগলের' সেবা। চৈতন্যোত্তর পদাবলীতে সখী-

---

১ মুহমারুএণ তং কণ্হ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এআণং বল্লবীণং অণ্ণাণং বি গোরঅং হরসি ॥ (গাহাসত্তসঈ ১।৮৯)

সাধনার কথাই পাওয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, পৌরাণিক গোপীকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার পাশাপাশি একটি আদিরসাত্মক গ্রামীন গোপীকৃষ্ণ-প্রণয়কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই কাহিনী ছড়া বা গানরূপে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইত। উগ্র আদিরসাত্মক এই প্রণয়কাহিনীটি আদিতে বহুনারীবিলাস ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা একনারী-বিলাসে যখন পরিণত হইতেছিল তখন প্রণয়কাহিনীটি সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যের ভিতরে ধরা দেয়। এই গোপীকৃষ্ণের প্রণয়লীলার কাহিনীর ভিতরে একটি বিশেষ গোপীর সহিত কৃষ্ণের বিশেষ প্রেমলীলার কথা ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রেমকবিতার ভিতর দিয়া প্রবাহিত ছিল। ভাগবতের ও বিষ্ণু-পুরাণের রাসলীলার মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণ বা গোপীকৃষ্ণ প্রেমসম্বলিত বহু প্রকীর্ণ কবিতায় সেই ভাবটিরই পরিচয় মিলে। প্রাক্-চৈতন্যযুগের জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আদিরসের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। পরে চৈতন্যদেবের সাধনায় রাধাকৃষ্ণ প্রণয়কাহিনী হইতে আদিরসের ক্লেদ বিদূরিত হইয়া গেল। এবং উহা রাধাকৃষ্ণলীলা বা প্রেমভক্তিরসে পরিণত হইল। বৈষ্ণব-পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব লীলারসের কথাই পাই, তবু মনে হয় মর্ত্যচেতনা যেন একেবারে দূরীভূত হয় নাই, ক্ষণে ক্ষণে মানবীয় প্রেমের আভাস পাওয়া যায়, আবার কোথাও বা মানবী রাধারই প্রতিষ্ঠা দেখা যায়।

॥ গোপীপ্রেম বা গোপীভাব ॥

ভক্তিবাদী বৈষ্ণব-ধর্মের শাখায় শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ অবদান গোপী-প্রেম শিক্ষা। মানবীয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়া শ্রীভগবানকে অন্তরের ভালবাসা দ্বারা ভজনা করিতে হইবে। ব্রজবাসিগণ যেমন পুত্রভাবে, বন্ধুভাবে ও পতিভাবে অনুরাগের পথে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিতেন, সেইরূপ ব্রজবাসীর কোন একটি ভাব লইয়া পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে হইবে।

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিগণে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগ নামে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদ)

রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্য ভগবানের মাধুর্য্যলীলার উপাসক, তিনি ব্রজবধূগণের 'কান্তাভাব' অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন।

"রম্যা কাচিৎ উপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।"

—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরোঢ়া বা অনূঢ়া ব্রজগোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে দেখিতেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব সমর্পণ-করতঃ কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া অন্তরের প্রেম নিবেদন করিয়াছেন। ভাগবতের একটি শ্লোকে দেখি গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃ-বান্ধবানতিবিলংঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।১৬)

—"হে অচ্যুত, আমরা পতি, পুত্র, ভাই, বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, তুমি আমাদিগের আগমনাভিপ্রায় জ্ঞাত আছ। তোমার উচ্চ সঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ। হে শঠ, যে সকল নারী নিশিযোগে স্বয়ং আগতা, তাহাদিগকে কে পরিত্যাগ করে।"

গোপীরা নিজেদের কোনো সুখ-কামনা লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হন নাই। গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণে অহেতুকী প্রেম নিবেদন করিয়াছেন। কেননা, 'প্রেষ্ঠো ভবান্ তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা'[১]—(তুমি সকল লোকের পরম প্রিয় বন্ধু, আত্মাস্বরূপ)। শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের নিরুপাধি প্রেমাস্পদ। তাই গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"আমরা কোনও কামনা-বাসনা লইয়া তোমার নিকট আসি নাই। তোমাকে একান্তে ভালবাসি, তোমা অপেক্ষা আর আমাদের কিছু প্রিয় নাই, তাই জাতিকুলমানে জলাঞ্জলি দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি।" ব্রজগোপীদের মত ভগবানে (শ্রীকৃষ্ণে) 'পরমপ্রেমরূপা' ভক্তি নিবেদন করিতে হইবে। এই প্রেমভক্তি হৃদয়ে জাগরূক রাখাই পরম পুরুষার্থ। ইহাই গোপী-প্রেমের মূলসূত্র, গোপী-প্রেম কিন্তু প্রাকৃত কাম নহে, তবে প্রাকৃত কামের মত করিয়া বর্ণনা করিতে হইয়াছে। "গৌতমীয়তন্ত্রে" বলা হইয়াছে (ভক্তি রসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত)—

১ শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২৯।৩২

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ)

—“ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমই কামনামে বিখ্যাত বলিয়া উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্ত-সকল সেই প্রেম লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন।” কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ় ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥
কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন।

—‘সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ’ ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮৷৬৬

‘সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই আশ্রয় কর’।

—“মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।”

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮৷৬৫

(একমাত্র আমাতে মন সমর্পণ কর, আমাকেই ভজনা কর, আমার জন্যই যাগ কর, আমাকেই নমস্কার কর)।

—‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।’

—(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৷৪৭)

‘(কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে অধিকার কদাচ নহে)’।

গীতার এই নিষ্কাম আদর্শ অবলম্বন করিয়া গোপীগণ কৃষ্ণসুখের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

“ব্রজের গোপিকাগণ গীতার জঙ্গম প্রতিমা”। ব্রজসুন্দরীরাই এই নিষ্কাম অহেতুকী প্রেমের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। এই গোপীভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি নিবেদন করিতে হইবে।

“অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।” (চৈঃ চঃ ২৷২)

গোপীগণের মহিমা স্বয়ং হরিও বলিয়াছেন (শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৩২।২২)। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অনুসরণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ়ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম॥
কামের তাৎপর্য নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য হয় প্রেম ত প্রবল॥

(চৈঃ চঃ আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

চৈতন্যোত্তর পদসাহিত্যে এই গোপীপ্রেমের বিশদ ব্যাখ্যা রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য 'গোপীভাব' বা রাধাভাব অবলম্বন করিয়া ভগবান্‌ কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবের শিক্ষার জন্য শ্রীচৈতন্য যে আটটি সংস্কৃত শ্লোক (শিক্ষাষ্টক) লিখিয়াছেন তাহাতেও এই ভাবটি আছে। গোপীর অনুগভাবে শ্রীকৃষ্ণে নিরুপাধি প্রেম সমর্পণ করিতে হইবে, ফলাকাংক্ষা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হইবে। এই প্রেমভক্তির বলে বৈষ্ণবভক্ত গোপীদেহ লাভ করেন।

রাধাতত্ত্ব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ও দর্শনে শ্রীরাধা প্রথম হইতেই 'কৃষ্ণময়ী', 'মহাভাব-স্বরূপিণী'। বৈষ্ণব ধর্মমত ও দর্শন এবং রাধাকৃষ্ণকাহিনী বা গোপীকৃষ্ণকাহিনী ও গোপীপ্রেম লইয়া আমরা যে সমস্ত আলোচনা করিলাম তাহাতে দেখিতে পাই যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে জয়দেব-গোষ্ঠীর রচনাসমূহে তত্ত্বাশ্রিতভাবে শ্রীরাধা ধর্মের সহিত ঈষৎ মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করিয়া রাধাতত্ত্বটি শ্রীচৈতন্যের ভক্তিভাবের আদর্শে ও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রসশাস্ত্রে ও দর্শনশাস্ত্রে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাব্যাদিতে শ্রীরাধার কথা বহু পূর্ব হইতেই মিলিতেছে। আগেই দেখিয়াছি আদিরসাত্মক সাহিত্যের মধ্য দিয়াই শ্রীরাধা ধর্মমতের মধ্যে প্রবেশ লাভ

করিয়াছেন এবং বাঙ্গালার নববৈষ্ণবধর্মের মাধুর্যলীলার আদর্শে নব নব মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া পূর্ণরসময়ী হইয়া উঠিলেন।

রাধাতত্ত্বের ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে 'রাধা' নামটির সাক্ষাৎ কোন সময় হইতে মিলিতেছে। মহাভারতের পরিশিষ্ট অংশ খিল হরিবংশে কৃষ্ণের ব্রজলীলার কথা আছে। কৃষ্ণগোপীপ্রেম-লীলার কথা আছে। রাসলীলার অনুরূপ 'হল্লীসকক্রীড়া'র কথা আছে কিন্তু কোনো গোপীর নাম নাই বা একজন প্রাধানা গোপীও নাই। প্রাচীন পুরাণগুলির অন্যতম বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীদের প্রেমের উল্লেখ আছে আর একজন প্রধানা গোপীর উল্লেখ পাইতেছি। কিন্তু কোনো নাম পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ 'হল্লীসকনৃত্য' হইতে একজন প্রধানা গোপীকে লইয়া বাহিরে আসিলে অন্যান্য গোপীরা তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতে করিতে কৃষ্ণ ও গোপীটির পদচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন—

অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলংকৃতা।
অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চিতো যয়া॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৫।১৩।৩৪)

—'এই স্থানে উপবেশন করিয়া সেই রমণী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পুষ্পের দ্বারা অলংকৃত হইয়াছে যাহার দ্বারা অন্যজন্মে সর্বাত্মা বিষ্ণু 'অভ্যর্চিত' হইয়াছে।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ভাগবতপুরাণকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে ভাগবতের 'রাসলীলার' বর্ণনায় দেখি শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল হইতে একজন গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। গোপীগণ অন্বেষণ করিতে করিতে কোন কুঞ্জের বহির্দেশে কৃষ্ণ ও সেই কৃষ্ণপ্রিয়তমা গোপীর পদচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামানয়দ্রহঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩০।২৮)

—"ইহার দ্বারা (সেই গোপী কর্ত্তৃক) নিশ্চয়ই ভগবান্ হরি 'আরাধিত' হইয়াছেন, যার ফলে গোবিন্দ আমাদিগকে (গোপীদিগকে) পরিত্যাগ করিয়া প্রীত হইয়া ইহাকে এই নির্জন স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।" এই শ্লোকের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া 'রাধা' নামটির উল্লেখ নাই। বিষ্ণুপুরাণের 'অভ্যর্চিতঃ' শব্দের স্থানে ভাগবতপুরাণে পাইতেছি 'অনয়ারাধিতঃ'। এখানে অনয়া আরাধিতঃ বা অনয়া রাধিতঃ দুই রকম ব্যাখ্যাই হইতে পারে। শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকে

টীকায় কোনো কথাই বলেন নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের শাস্ত্রকারগণ ভাগবতের এই শ্লোকের মধ্যেই রাধাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামী ভাগবতের 'বৈষ্ণব-তোষিণী' টীকায় বলিয়াছেন—"অনয়ৈব আবাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ ন তু অস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তি ইতি রাধেতি নামকরণঞ্চ দর্শিতম্।" বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন—'নূনং হরিরয়ং রাধিতঃ। রাধাম্ ইতঃ প্রাপ্তঃ ইত্যাদি।[১] ভাগবতকার রাধানামের আভাস দিলেন, স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিলেন না। টীকাকারগণ এইস্থানেই রাধাকে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন—'গোপিকাগণ পদচিহ্নের দ্বারাই রাধাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়তমা রাধার সৌভাগ্য ব্যঞ্জিত করিবার জন্যই নামটি প্রকাশ করেন নাই।' এখানে রাধার নামটির স্পষ্ট উল্লেখ পাইলে অনেক সমস্যা সহজ হইয়া উঠিত।

পদ্মপুরাণের বহুশ্লোকে রাধার বা রাধিকার নাম স্পষ্ট করিয়া পাওয়া যায়। রূপ গোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে এবং কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পদ্মপুরাণ হইতে রাধার উল্লেখসহ বহু শ্লোক উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবেকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥"[২] (পদ্মপুরাণ)

পদ্মপুরাণে রাধার জন্মবৃত্তান্তও প্রদত্ত হইয়াছে। 'ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে বৃষভানুর যজ্ঞভূমিতে দিবাভাগে এই রাধিকা জাতা হইয়াছিল।'

ভাদ্রমাসি সিতে পক্ষে অষ্টমী-সংজ্ঞকে তিথৌ।
বৃষভানোর্যজ্ঞভূমৌ জাতা সা রাধিকা দিবা॥ (পদ্মপুরাণ ৪০।৪১)

এখানে রাধাকে কৃষ্ণের আদ্যাপ্রকৃতি ও কৃষ্ণবল্লভা বলা হইয়াছে, দুর্গাদি-দেবীগণ রাধিকার কলা অংশ, এই রাধিকার পদরজঃ-স্পর্শ হইতেই কোটি বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করে। রাধিকার এই রূপ কিন্তু পরবর্তী কালে প্রাপ্ত রূপ বলিয়া মনে হয়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বেশ ঘটা করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে রাধাকে কৃষ্ণের পরিণীতা স্ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে

১ তুঃ—কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥ (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

২ চৈঃ চঃ আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত।

দেখা যায়। 'রাধা' শব্দের যে ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে নারদপ-ঞ্চরাত্রে তদনুরূপ ব্যাখ্যা মিলিয়াছে।

'রা'শব্দোচ্চারণাদ্ ভক্তো ভক্তিং মুক্তিঞ্চরাতি সঃ।
'ধা'শব্দোচ্চারনেনৈব ধাবত্যেব হরেঃ পদম্॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—প্রকৃতি খণ্ড ৪৮।৪০)

রূপ গোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি'র শ্রীরাধাপ্রকরণে—বলিয়াছেন যে, 'গোপালোত্তরতাপিনী' নামক উপনিষদে যিনি গান্ধর্ব্বানামে বিশ্রুতা, ঋক্-পরিশিষ্টে সেই রাধা মাধবের সহিত উদিতা।

গোপালোত্তর-তাপন্যাং যদ্‌গান্ধর্ব্বেতি বিশ্রুতা
রাধেত্যৃকপরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা।

(উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীরাধাপ্রকরণ ৪)

'হ্লাদিনী যে মহাশক্তি যিনি সর্বশক্তিবরীয়সী সেই রাধা হইলেন তৎসারভাবরূপা, তন্ত্রে এই কথাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।'[১] জীবগোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র' হইতেও রাধা সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। আনন্দদায়িনী পরমদেবতা রাধিকা কৃষ্ণস্বরূপা। ইনিই নিখিলশ্রী বিশ্বকান্তি ও দিব্যরূপা সম্মোহিনী।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহনী পরা॥ (বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে)

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত)

জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'ব্রহ্মসংহিতা'র টীকায় ঋকৃপরিশিষ্টের এই শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা'

তত্ত্বরূপে শ্রীরাধার পূর্ণবিকাশ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শাস্ত্রগ্রন্থে। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেমলীলায় রাধার শ্রেষ্ঠত্ব গোস্বামীদের পূর্বেই সাহিত্যাদিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থে রাধাকে কৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জয়দেবের গীত-গোবিন্দের 'মেঘৈর্মেদুরম্' ইত্যাদি প্রথম শ্লোকে ও কেশব সেনের 'আহূতাদ্য' ইত্যাদিতে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

---

১ হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥ (উঃ নঃ শ্রীরাধা-প্রঃ ৬)

॥ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রাধার উল্লেখ ॥

রাধাকৃষ্ণকাহিনী আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেই প্রথম রাধার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। প্রাকৃত শ্লোক-সংগ্রহ, হালের 'গাহাসত্তসঈ' তে কৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক কয়েকটি কবিতা বা গাথা আছে। একটি কবিতায় স্পষ্ট করিয়া রাধার উল্লেখ দেখা যায়।

মুহমারুএণ তং কণ্‌হ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এআণং বল্লবীণং অন্নাণবি গোরঅং হরসি॥ (গাহা ১।৮৯)

—'হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতের (মুখের বাতাস) দ্বারা রাধিকার (মুখলগ্ন) গোরজ (গরুর খুর হইতে উত্থিত ধূলিকণা) অপনয়ন করিয়া এই বল্লবীগণের (ব্রজগোপীদের) ও অন্যান্য রমণীদেরও গৌরব হরণ করিতেছ।' এই গাথাটির মধ্যে কেবল যে রাধিকার নামই স্পষ্ট করিয়া পাওয়া গেল তাহাই নহে, কৃষ্ণ-গোপী প্রেমলীলায় রাধার প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা গেল। এই আদিরসাত্মক রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় কোন অতিরিক্ত তত্ত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না অর্থাৎ সাহিত্যের আদিরস ছাড়া আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। উগ্র দেহাশ্রিত গোপী-কৃষ্ণ বা রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকাহিনীকে সাহিত্যে রূপায়িত করা হইয়াছে। প্রাকৃত সংকলনটি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দ হইতে অষ্টম শতাব্দের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে ইহা বলা যায় যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দেই সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে রচিত ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকের নান্দী-শ্লোকে যমুনাতীরে রাসক্রীড়ার সময়ে কেলিকুপিতা ও অশ্রুকলুষা রাধা এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের অনুনয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। এখানে রাধা-কৃষ্ণকে দেবতারূপে স্তুতি করা হইলেও রাধার মধ্যে তদতিরিক্ত কোন তত্ত্ব নাই।

নবম শতাব্দে রচিত আনন্দবর্ধনের ধন্যালোক গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত দেখি। শ্লোকটি তাহার পূর্বে রচিত। ইহাতে প্রবাসী কৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত কোন সখাকে রাধা ও গোপীগণের কুশল প্রশ্ন করিতেছেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দ হইতে রাধাকৃষ্ণ বা গোপীকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীকে উপজীব্য করিয়া বহু সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ শ্লোক রচিত হইয়াছে। 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' প্রভৃতি সংগ্রহ-পুস্তকে এই ধরণের অনেক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কবিরা বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই যে রাধা-

কৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনী কবিদের নিকট অতি প্রিয় ছিল বলিয়াই এত অজস্র কবিতা রচিত হইয়াছে। তাঁহাদের রচিত বহু মানবীয় প্রেমের কবিতাও পাইতেছি। মনে হয় অনেকে কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে কবিরা লক্ষ্মী-নারায়ণ ও শিব-পার্বতীকে লইয়াও আদিরসাত্মক কবিতা রচনা করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত পদে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের লীলাভাবনার ক্বচিৎ সাক্ষাৎ মেলে। এই সমস্ত কবিতায় একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে রাধা 'দেবী' পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন এবং লক্ষ্মীপ্রেম হইতেও রাধাপ্রেম শ্রীকৃষ্ণের নিকট অধিকতর অভীপ্সিত হইয়া উঠিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা অবলম্বন করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করিলেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে রাধাকৃষ্ণলীলারস ও কাব্যরস দুইটি একসঙ্গে বিজড়িত হইয়া আছে। কাব্যের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়—'যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ' এবং 'যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্'—উক্তিটি সেই কথাই মনে করাইয়া দেয়। জয়দেবের কাব্যেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা গেল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধুররসের সূচনা জয়দেব হইতেই। জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলার চেয়ে মাধুর্য্য লীলার উপরই জোর দিয়াছেন। 'গীত-গোবিন্দে' রাধাকৃষ্ণলীলা ঈষৎ তত্ত্বাশ্রিত হইতে দেখা যায়। কেবল জয়দেবের কাব্যেই নয়, জয়দেবের যুগে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা সম্পর্কীয় যে প্রকীর্ণ কবিতাগুলি লেখা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও মধুররসের আভাস পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ-বিরহদশায় জয়দেবের পদ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেন। তাঁহার অনুমোদনের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিকট জয়দেব 'গোস্বামী' পদবীতে উন্নীত হইলেন এবং তাঁহার কাব্য "গীতগোবিন্দ" অন্যতম বৈষ্ণবশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইল। ভক্তিভাব বা অধ্যাত্মরস কাব্যের সমস্ত অংশে তেমন গভীরভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। কবি জয়দেবকে মনে-প্রাণে বৈষ্ণব বলিয়াও ধারণা করা শক্ত।

শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়া 'ব্রহ্ম-সংহিতা' ও 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' নামে দুইখানি ভক্তিভাবের গ্রন্থ আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিয়া আনেন। লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের 'কর্ণামৃত' (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত) গ্রন্থখানি অধ্যাত্মরসে ভরপুর। গ্রন্থখানি জয়দেবের সময়ে বা তাহার কিছু পরে দক্ষিণদেশে রচিত হইয়া থাকিবে।

কর্ণামৃত পড়িলে মনে হয় কবি মনেপ্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন, সেই বৈষ্ণবদৃষ্টিতে লীলাপ্রসার ও লীলা-আস্বাদনের জন্যই তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এইজন্যই চৈতন্যদেব গ্রন্থখানিকে এত সমাদর করিতেন। শ্রীচৈতন্যের 'রাধাভাবের' সাধনা পরিপূর্ণতা লাভ করে তাঁহার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর হইতে। গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সহিত 'রাধাভাবের' নিগূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল। ইহাতেই বোঝা যায় যে দক্ষিণদেশে 'রাগানুগা' সাধনা পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। দক্ষিণদেশের আলোয়ার বৈষ্ণবগণ অনুরাগের পথে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের ভজনা করিতেন। সেখানকার ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ ভক্তিভাবে পাঠ করিতেন। এই গ্রন্থের দুইটি শ্লোকে রাধার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্লোক দুইটি পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের মধ্যে মধুররসাশ্রিত আরও যে সমস্ত কবিতা আছে তাহাদের লক্ষ্যও রাধা। রাধকৃষ্ণপ্রেমের তত্ত্ব এই গ্রন্থখানিতে চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থখানির মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো এই যে রাধাতত্ত্ব ও লক্ষ্মীতত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। রাধাকে লইয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রসার হইতে আরম্ভ করিয়াছে, পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে তত্ত্বহিসাবে রাধার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনায়।

মধুররসের আশ্রয়ে রাধা বৈষ্ণবধর্মে প্রবেশ লাভ করার পর লক্ষ্মীর সহিত যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইলেন। বৈকুণ্ঠের বিষ্ণুর শক্তি বা স্ত্রী বা লক্ষ্মীদেবী ও রাধা অনেক ক্ষেত্রে এক হইয়া গিয়াছেন এবং উভয়েই 'কৃষ্ণবল্লভা'। ক্রমে ক্রমে রাধাপ্রেম বিষ্ণু ও কৃষ্ণের নিকট লক্ষ্মীপ্রেম হইতে অধিকতর স্পৃহনীয় হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী, শ্রী, রমা প্রভৃতির প্রেম হইতে গোপীপ্রেম যে শ্রেষ্ঠ তাহার আভাস ভাগবতাদি পুরাণের মধ্যে পাওয়া যায়। সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতায় তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১] 'গীতগোবিন্দে' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে' বিষ্ণুশক্তিরূপা লক্ষ্মী ও কৃষ্ণশক্তিরূপা রাধা যেন এক হইয়া গিয়াছেন। চতুর্দশ শতাব্দে রচিত 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলের' একটি আর্যায় দেখা যায় কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা দেবতাসমাজে সম্মানের আসন পাইয়াছেন। এখানে লক্ষ্মী, গৌরী, মহামায়া প্রভৃতি দেবীর সঙ্গে "রাহী" অর্থাৎ রাধিকারও উল্লেখ আছে।

১ "রাধাং সংস্মরতঃ শ্রিয়ং রময়তঃ খেদো হরেঃ পাতু বঃ।"

(কস্যচিৎ—সদুক্তিকর্ণামৃত, ১।৬১।৪)

"লচ্ছী রিদ্ধি বুদ্ধী লজ্জা বিজ্জা কৃথমা অ দেঈ।
গোরী রাঈ চুন্না ছাআ কন্তী মহামাঈ ॥"[১]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিষ্ণুশক্তি বা কৃষ্ণশক্তি হিসাবে রাধা লক্ষ্মীকে স্থানচ্যুত করিয়াছে, আর কোন দিন উভয়ের মিলন হয় নাই। গোড়াতে অবশ্য প্রাচীন লক্ষ্মীবাদকে আশ্রয় করিয়া রাধাবাদ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বিদ্যাপতি ও বড়ুচণ্ডীদাসের প্রাদেশিক সাহিত্যে (নব্য ভারতীয় আর্যভাষা) রাধা-কৃষ্ণের মধুররসাশ্রিত প্রেমলীলার স্ফুরণ দেখা যায়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে' সরল ভক্তিভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের যুগেই রাধাবাদকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্মে কৃষ্ণশক্তি হিসাবে রাধার পূর্ণবিকাশ হয়। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মননে ও চিন্তায় রাধাতত্ত্ব পূর্ণমর্যাদায় বিকশিত হইয়া উঠে। শ্রীচৈতন্যের সাধনাও ছিল রাধা-ভাবের সাধনা, 'আমার রাধাভাবের গৌরহরি', অথবা 'আমার গৌরভাবের রাধারাণী'। রূপ গোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বল-নীলমণি'তে মধুর বা উজ্জ্বলরসের মাধ্যমে রাধাকে 'পূর্ণরসময়ী' 'মহাভাব-স্বরূপিনী' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীব গোস্বামী তাঁহার 'ষট্‌সন্দর্ভে' রাধাবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এতদুভয়কে অনুসরণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রাধাবাদের চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। জীব গোস্বামী ভাগবতপুরাণকেই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। সেইজন্য ব্রহ্মসূত্রের আর ভাষ্য রচনা করেন নাই। কেননা ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য। পরবর্তীকালে বলদেব বিদ্যাভূষণ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অনুসরণ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতানুযায়ী কৃষ্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণশক্তিরূপে রাধাতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই 'গোবিন্দভাষ্য' নামে ব্রহ্মসূত্রের একটি 'ভাষ্যও' রচনা করেন।

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের পদাংক অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার ভাবনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের কবিত্বময় প্রকাশ ঘটিয়াছে। কবিরাজ গোস্বামীর নিজের অননুকরণীয় ভাষাতেই শ্রীরাধার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি।[২] তিনি বলেন—

১ ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,' প্রথম খণ্ডের পূর্বার্দ্ধ (পৃঃ ৫৯) দ্রষ্টব্য।
২ চৈ. চ. আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমান ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
রাধা, কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥"
"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি 'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥"
"সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি ॥"
"হ্লাদিনীর সার—প্রেম, প্রেম-সার—ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা—নাম মহাভাব ॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥
কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যায় চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায় ॥"
"গোবিন্দানন্দিনী রাধা—গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্বস্বসর্ব কান্তা-শিরোমণি ॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে
অতএব রাধিকা নাম পুরানে বাখানে" ॥[১]

পুরাণাদিতে দেখা যায় দার্শনিক দৃষ্টিতে লক্ষ্মী শক্তিমান্ বিষ্ণুর শক্তিমাত্র, কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী স্বামি-স্ত্রী মাত্র, সাধারণ জনগণ তাহাদের সমাজবোধের দ্বারাই ধর্মবোধকে গড়িয়া তোলে, এই সমাজবোধ দ্বারাই সর্বত্র

১ চৈ. চ. আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

শক্তি ও শক্তিমান্ স্বামী-স্ত্রীরূপে কল্পিত। সেইজন্যই লৌকিক বিশ্বাসে রাধা ও কৃষ্ণ, স্বামী ও স্ত্রী, দার্শনিক বিচারে যাহাই হউক না কেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ঘটা করিয়া রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির পাশে শ্রীরাধার মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হয়তো লৌকিক বিশ্বাস পরোক্ষভাবে কাজ করিয়াছে। জীব গোস্বামীর মতে রাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া স্ত্রী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবপদাবলী বৈষ্ণবধর্ম ও তত্ত্বের ভাষ্য। ভক্তকবি মানসনয়নে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। পরিকররূপে এই লীলা স্মরণ ও লীলা আস্বাদন বৈষ্ণবদের হইল পরম সাধন ও সাধ্য।

রাধার ভাব অবলম্বন করা সম্ভব নয়, সেইজন্য রাধাভাবের অনুগভাবে বা গোপী-অনুগতি আশ্রয় করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজনা করিতে হইবে। বৈষ্ণব কবি এই অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সাহিত্যে রূপায়িত করিতে গিয়া প্রাকৃত প্রেমের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন এবং নরনারীর প্রেমের সমস্ত বৈচিত্র্য ও মাধুর্য ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। রূপগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবরসশাস্ত্রকার আলংকারিক দৃষ্টিতে এই প্রেমের রসমূর্ত্তি দান করিয়াছেন। তাঁহারাও সাধারণ অলংকারের রীতি-অনুযায়ী 'কৃষ্ণ ও রাধাকে সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক ও নায়িকা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।'

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥[১] (চৈঃ চঃ মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদ)

রূপ গোস্বামীর বর্ণনার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রের ও কামশাস্ত্রের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ বার বার মনে করাইয়া দিয়াছেন যে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমলীলা প্রাকৃত মানবীয় কাম নহে, কিন্তু কাম-ক্রীড়াসাম্যে ইহাকে 'কাম' নাম দেওয়া হইয়াছে এবং সাহিত্যের রূপায়ণে ইহাকে প্রাকৃত কামের মত বর্ণনা করা হইয়াছে। এইজন্য সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ও কামশাস্ত্রে 'আদর্শ' নায়িকাকে যতপ্রকার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণের দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছে সে সমস্ত একাধারে শ্রীরাধিকাতেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাধাকে পূর্ণপ্রেমময়ী করিতে গিয়া বৈষ্ণবকবিগণ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃত নায়িকার দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণের লীলা-সংযোগকারিণী 'যোগমায়া' বা 'পৌর্ণমাসী' ও বড়ুচণ্ডীদাসের

১ চৈ. চ. মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদ।

কাব্যের 'বড়ায়িকে' কামশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত 'কুট্টনীচরিত্রের' মত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামীর রচনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দার্শনিক মত তথা রাধাতত্ত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ; রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে শ্রীরাধার যে বর্ণনা আছে তাহাতে মনে হয় শ্রীরাধাকে 'পূর্ণরসময়ী' ও 'প্রেমস্বরূপিণী' 'মহাভাবে' পরিণত করা হইয়াছে। জীব গোস্বামী ইহাকেই অপূর্ব মনীষা-বলে দার্শনিক মনন ও চিন্তার সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে শ্রীরাধার পূর্ণবিকাশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ-অবলম্বী সংস্কৃতভাষায় রচিত গ্রন্থাদিতে ও তদনুসারে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাপ্রেম বা রাধাতত্ত্বটি রূপায়িত করা হইয়াছে। গোস্বামীদের মতে শ্রীরাধার দেহ অপ্রাকৃত, মর্ত্যচেতনার গন্ধও ইহাতে নাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবি যে ভাবে রাধার বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—শ্রীরাধা তাঁহার 'মানবী' সঙ্গিনীকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। শ্রীরাধার পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, বিরহ, মিলন প্রভৃতি পর্য্যায়ের বর্ণনায় মর্ত্ত্যবাসনা যেন অনেক সময় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অধ্যাত্মসুর ও দেহকামনা যেন হাত ধরাধরি করিয়া বিরাজ করিতেছে।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের পদাবলীতে শ্রীরাধার এই মিশ্ররূপের পরিচয় বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীতে রাধার মর্ত্ত্য রূপটিই যেন বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতি কবি হিসাবেই রাধাকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও তাঁর পরিবেশটি ছিল 'বৈষ্ণব'। তবু বিদ্যাপতির কাব্যে অধ্যাত্মসুর স্পষ্ট, এমনকি শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত লীলাভাবনার সূচনাও দেখা যায়। বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্যে যেন মর্ত্ত্যরসেই প্রাধান্য। তবু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আকাঙ্ক্ষিত 'লীলাবাদ' ও মধুরসের কথাও ইহাতে পাওয়া যায়।

কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' রাধার যে মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে চৈতন্যদেব ও রাধা এক হইয়া গিয়াছেন।

কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের 'যুগল' সেবাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাধ্যবস্তু। কিন্তু শ্রীরাধা ভক্তগণের প্রেমদায়িনী বলিয়া ক্রমশঃ রাধাতত্ত্বেরই যেন প্রাধান্য অনুভূত হইল। "ভক্তগণের সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।" 'শ্রীরাধার' নামেই যেন কৃষ্ণের পরিচয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ও পদাবলী-সাহিত্যে কৃষ্ণের পরিচয়

হইল রাধার নামে—রাধানাথ, রাধাবল্লভ, রাধারমণ ইত্যাদি নামে। 'জয় রাধে' ধ্বনি বৃন্দাবনের ও বাঙ্গলাদেশের বৈষ্ণবদেব জিহ্বাগ্রে শোনা যায়।

॥ সখীসাধনা বা সখীভাব ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধ্যতম বস্তু—সখীর অনুগতভাবে রাধাকৃষ্ণের লীলা আস্বাদন। সখীভাবের আলোচনা করিতে হইলে আমাদের দুইটি জিনিষের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, একটি হইল তাহার ইতিহাসের দিক, আর একটি তত্ত্বের দিক। কৃষ্ণের প্রেমলীলায় সখীদের একটি ভূমিকা আছে। এই সখীরা আসলে ব্রজগোপী। ব্রজগোপীদের সহিত প্রেমলীলায় রাধার প্রাধান্য যেমন বাড়িতে লাগিল, ব্রজগোপীরাও সেইভাবে অন্তরালে যাইতে লাগিলেন। ভাগবতে ব্রজগোপীদের সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে একজন প্রধানা গোপীর উল্লেখ থাকিলেও সকল ব্রজসুন্দরীই কৃষ্ণের বল্লভা অর্থাৎ প্রেম-লীলায় অংশভাগিনী, পরবর্তী পুরাণে ও বিবিধ বৈষ্ণবশাস্ত্রে যখন রাধার সর্বময় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল তখন সেই ব্রজগোপীরাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় সখীর স্থান গ্রহণ করিল। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক লৌকিক সাহিত্যেও ক্রমে ক্রমে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়। সংস্কৃত-প্রাকৃতে রচিতে প্রকীর্ণ কবিতায় ব্রজগোপীদের মধ্যে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় ব্রজগোপীরাই সখীতে পরিণত হইয়াছেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মমতে পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশরূপে দেবীগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই দেবীগণই কৃষ্ণের প্রেমলীলায় গোপিকারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সখীস্থানীয়া হন। এই সখীগণ রাধিকারই কায়ব্যূহস্বরূপ। সখী ছাড়া রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা এতটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত কিনা সন্দেহ। সখীরা লীলা-বিস্তারিণী, রাধার সহিত কৃষ্ণের মিলনেই তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিতেন, তাঁহাদের নিজের কোন কামনা-বাসনা ছিলনা, 'কৃষ্ণসঙ্গসুখস্পৃহা'—তাঁহাদের মোটেই ছিলনা, মূল রাধিকা-স্বরূপ প্রেমকল্পলতার তাঁহারা পল্লবসদৃশা। লৌকিক সাহিত্যেও দেখি—দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয়কাহিনী সখী অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদাই সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ।" সখীরা দূর হইতেন রাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শন করিতেন এবং নানা ব্যপদেশে উভয়ের মিলন সংঘটন করাইয়া দিতেন এবং যুগলের সেবাই ছিল তাঁহাদের আন্তরিক কামনা। কৃষ্ণের প্রেমলীলায় অংশগ্রহণ তাঁহাদের কাম্য ছিল না।

তবু শ্রীরাধা অনেক সময় তাঁহার সখীদিগকে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইতেন। তাহারও উদ্দেশ্য রাধাকৃষ্ণলীলার পুরিপুষ্টি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর সখী-সাধনা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলায় সখীদের ভূমিকার কথা আছে। রঘুনাথ দাস পুরীতে স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দের নিকট সখীসাধনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ দাসের নিকট সমস্ত তথ্য অবগত হইলেন। রঘুনাথের স্তবাবলী ও কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃতে' সখী-সাধনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাধাকৃষ্ণলীলায় সখীদের ভূমিকা কৃষ্ণদাস কবিরাজ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী-বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী-লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে তারে করে যেই অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজকেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ-সেবা হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়।

(চৈ. চ.—মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ)

গৌড়ীয় পদাবলীতে এই সখীভাবে রাধাকৃষ্ণ-সেবার কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কুঞ্জমধ্যে রাধা-কৃষ্ণের সেবা করাই বৈষ্ণবগণের অভিলষিত বস্তু। ভক্ত বৈষ্ণবকবিগণ দূর হইতে সখীর অনুগভাবে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা আস্বাদ করিয়াছেন এবং রসসিক্ত ভাষায় সেই অপূর্ব অলৌকিক লীলার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিতায় দেখি সখীগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেম একবার ভাঙ্গিয়াছে, আবার ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছে, সখীগণই দূতী হইয়া প্রেমলীলাকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে। এই রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীয়ায় দূতীর ভূমিকা কিছু নূতন নয়, পূর্বাপর ভারতীয় প্রেমকাব্যে সখীগণই প্রেমলীলায় নায়ক-নায়িকাকে সাহায্য করিয়াছে। শকুন্তলা-কাব্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। রাজশেখরের কর্পূর-মঞ্জরী'তে সখী বিচক্ষণা রাজা ও কর্পূরমঞ্জরীর মিলনে সহায়তা করিয়াছে। এইরূপ অজস্র উদাহরণ মিলে। সখীরা কিন্তু প্রেমের অংশীদার নহে, তাহারা দূর হইতে রস-মাধুর্য আস্বাদ করিবার জন্য ব্যস্ত। বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যেও সেই পূর্বপ্রচলিত "সখীবাদ" গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহা হইলে দেখিতেছি যে বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় দূতী বা সখীবাদ পূর্বকবিদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা হইতেই অধ্যাত্ম-ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে।

সখীভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমসাধনাই জীবের সাধ্যসার। এই সখীরা নিত্যপ্রিয়া, শ্রীরাধার কায়ব্যূহ বা অংশ তাই শ্রীচৈতন্যের অপ্রাকৃত প্রেমসাধনায় গুরুর স্থান ভগবানের পরই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমসাধনায় এই সখীরাই গুরুস্থানীয়া। সখীসাধনার দ্বিতীয় স্তরে গুরু সখী-সহায়ক মঞ্জরী, সখীদের সখী 'মঞ্জরীরা' মহাগুরুস্থানীয়, মহান্ত গুরু হইতেছেন মঞ্জরীদের অনুগৃহীত। মহান্ত গুরু শিষ্য-সাধককে মঞ্জরীদের কৃপালাভে সহায়তা করেন এবং ভক্তসাধক রাধাকৃষ্ণের সেবারসের আস্বাদন করেন।

শ্রীরূপ মঞ্জরী দয়া করহ আমারে।
মিছা মায়াজালে পড়ি গেনু ছারে খারে॥
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনের ফুল গাঁথি দোঁহারে পরাব॥

—ইত্যাদি, নরোত্তম দাস। (বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৪৬)

॥ স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্ব ॥

বা—

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের শ্রেণীবিভাগ

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মকে বলা হয় 'প্রেমধর্ম' অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। গোপীগণ বা গোপীমুখ্যা রাধা যে ভাবে হৃদয়ের অহেতুকী প্রেমের দ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে কান্তভাবে ভজনা করিতেন, সেই রাগানুগা প্রেমভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে এই 'রাধাভাব' ও 'রাধাপ্রেম' কিন্তু দার্শনিক তত্ত্ব। রাধাপ্রেম সম্বন্ধে একটি কথা জানিতে হইবে, 'কৃষ্ণপ্রণয়িনী রাধা কৃষ্ণের 'স্বকীয়া' কিংবা 'পরকীয়া' স্ত্রী। শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী কালেই তত্ত্ব হিসাবে স্বকীয়া-পরকীয়া প্রেমের আদর্শ গড়িয়া উঠে। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—পরকীয়া প্রেম বা পরকীয়াতত্ত্ব স্বয়ং শ্রীচৈতন্যই প্রচার করিয়াছেন, "পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস,"। এখন আমরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের আদর্শ প্রথমে বিচার করি।

ইমোশনের পথ বাহিয়াই শ্রীচৈতন্যের প্রেমসাধনা। তিনি তাঁহার গুরুর গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট হইতে এই প্রেমসাধনার ধারা লাভ করিয়াছিলেন। —"অয়ি! দীনদয়ার্দ্রনাথ হে!" ইত্যাদি মাধবেন্দ্র-কথিত শ্লোকে ঈশ্বর-বিরহের যে প্রেমব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যেন শ্রীচৈতন্যের জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্লোক কিন্তু অলৌকিক নায়ক সম্পর্কেই বলা হইয়াছে—এই মত পরবর্তীকালের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত।

বৈষ্ণবদের শিক্ষার জন্য শ্রীচৈতন্য যে 'শিক্ষাষ্টক' লিখিয়াছেন তাহার অন্তিম শ্লোকটিও পরকীয়া প্রেমের আদর্শ বহন করে।

—"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥[১]

(পদ্যাবলী—৩৪১)

—"আমাকে আলিঙ্গন করে পায়েই পিষে দিন, না দেখা দিয়ে মর্মাহতই বা করুন কিংবা সেই লম্পট যেমন খুশী তেমনই বিহার করুন, তবু তিনিই আমার প্রাণনাথ আর কেউ নয়।"

১ চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত।

পরবর্তীকালের ভক্ত বৈষ্ণবগণ বলেন—"অলৌকিক নায়কের প্রতি অলৌকিক নায়িকার উক্তি এই শ্লোকটির ভিতরে রহিয়াছে।" লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতের এই শ্লোকটিতে হৃদয়ের আর্ত্তি ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরানি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—৪১)

—'হে অনাথের বন্ধু, দয়ার সাগর, তোমায় না দেখিয়া, হায় হায়, কি করিয়া বিফলে দিনগুলি কাটাইব।'[১]

পুরীধামে রথযাত্রার সময় নৃত্য করিতে করিতে শ্রীচৈতন্য নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিয়াছিলেন। শ্লোকটি মম্মটভট্টের কাব্য-প্রকাশে (১।৪) ও বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে (১।১০) প্রাগ্‌বৈবাহিক প্রেমের বা অবৈধপ্রেমের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা—
স্তে চোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলা-বিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

(চৈ. চ. মধ্য ১ম পরিচ্ছেদ, পদ্যাবলী-৩৮৬)

—'যে আমার কৌমার্য্য হরণ করিয়াছিল—সেই আজ আমার বর। আজও সেইতো মধুরজনী। সেইতো ধূলিকদমের বনের বাতাস আরো সুরভিত হইয়া উঠিয়াছে বিকশিত মালতী ফুলের সৌরভে। আমিও সেই আছি। তবু রেবানদীর তীরে বেতসতরুতলে যে প্রথম মিলন হইয়াছিল তারই জন্য আজও আমার মন আকুল হইয়া উঠিতেছে।'

এই সাধারণ প্রেমের কবিতাকে শ্রীচৈতন্য গূঢ়ভাবব্যঞ্জক বলিয়া আস্বাদ করিতেন। কেবল স্বরূপ দামোদরই এই শ্লোকের অর্থ জানিতেন, "এই শ্লোকের অর্থ জানে একল স্বরূপ"; আর জানিতেন বৈষ্ণবরসশাস্ত্র-প্রণেতা রূপ গোস্বামী। এই আদিরসাত্মক শ্লোকটিকে রূপ গোস্বামীর সংকলিত 'পদ্যাবলী'-

১ চৈ. চ. মধ্য ২য় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত।

তে শ্রীরাধার উক্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এই শ্লোকটির নীচে রূপ গোস্বামীর নিজ-কৃত একটি শ্লোক পাওয়া যায়।

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সারাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চম-জুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি॥ পদ্যাবলী ৩৮৭
(চৈ. চ. মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত)

—'সখি, কুরুক্ষেত্রে দেখা পাইলাম যাঁর তিনিই তো আমার সেই দয়িত কৃষ্ণ, আমিও সেই রাধা, আমাদের মিলনসুখও সেই। তবু যমুনাপুলিনের সেই যে বনে বাঁশরীর পঞ্চমস্বরের মধুর স্বরলহরী জাগিয়া উঠিত, তারই জন্য মন আমার আকুল হইয়া উঠিয়াছে।'

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে উল্লিখিত কবিতাটি (যঃ কৌমারহর ইত্যাদি) আধ্যাত্মিকভাবব্যঞ্জক এবং পরকীয়া প্রেমের আদর্শ-প্রকাশক। দুই চারিটি ধুয়াপদ যাহা শ্রীচৈতন্য আস্বাদ করিতেন তাহাতেও পরকীয়া প্রেমের প্রকাশ দেখা যায়।

"সেইত পরাণ-নাথ পাইনু।
যাঁহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু"।
(চৈ. চ. মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ)

"হায়, প্রাণপ্রিয়সখি, কিনা হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনুমন জরে॥
রাত্রিদিনে পোড়ে মন সোয়াথ না পাও।
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাও।"
(চৈ. চ. মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যের সময়ে স্বকীয়া-পরকীয়া প্রেমের প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতবাদ লিপিবদ্ধ হইবার পরই প্রশ্ন তোলা হয়—রাধা কৃষ্ণের 'স্বকীয়া' কিংবা 'পরকীয়া'।

লৌকিক প্রেমের কবিতায় দেখি অবৈধ প্রেমই প্রচ্ছন্ন কামুকত্ব ও নানা রকম বাধার জন্য অধিকতর পুষ্টি লাভ করে। সংস্কৃত-প্রাকৃত-প্রকীর্ণ কবিতা-সংগ্রহে রাধা-প্রেম বা গোপী-প্রেম সম্বন্ধে যত কবিতা পাই তাহাদের অনেকগুলির ভিতরে অসতী-প্রেমের উল্লেখ বা আভাস পাই। জনসমাজে যে

আদিরসাত্মক গোপীকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনী প্রচলিত ছিল তাহাতে গোপীরা পরোঢ়া ছিল বলিয়াই মনে হয়, অর্থাৎ প্রেম-কাহিনীটি অদাম্পত্য ছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' রাধা পরকীয়া। বিদ্যাপতির রাধাও পরকীয়া। বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্যেও রাধা আয়ানের স্ত্রী, অতএব কৃষ্ণের পরকীয়া। বৈষ্ণব-পদাবলীতে রাধা অনূঢ়া গোপকন্যা বা পরোঢ়া গোপবধূ—এই দুইভাবেই দেখা যায়। অদাম্পত্য প্রেমের এই ইঙ্গিতের জন্যই রাধাকে আয়ান ঘোষের বিবাহিতা স্ত্রী বলা হইয়াছে। গোস্বামীদের সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থে 'অভিমন্যু' নাম পাওয়া যায়। বড়ুচণ্ডীদাসের গ্রন্থে 'আইহন' শব্দটি 'অভিমন্যু' শব্দ হইতে জাত বলিয়া মনে হয়। বড়ুর কাব্যে 'রাধা ও চন্দ্রাবলী' একই ব্যক্তি কিন্তু অন্যত্র চন্দ্রাবলী রাধার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী বা প্রতিনায়িকা। আয়ানের বন্ধু গোবর্ধন মল্লের স্ত্রী হইতেছেন চন্দ্রাবলী অর্থাৎ পরোঢ়া গোপরমনী। এই আয়ান ঘোষ ছিলেন গোপরাজ মাল্যকের পুত্র। জটিলা ছিলেন আয়ানের মা আর যশোদা ও কুটিলা হইলেন তাঁহার বোন। সেইজন্য আয়ান ঘোষ কৃষ্ণের মামা এবং রাধিকা তাঁহার মাতুলানী বা মামী। রাধার বাবার নাম বৃষভানু বা ভানু। মায়ের নাম কীর্ত্তিদা।

রাধিকা কৃষ্ণ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন বলিয়া অনেক উপাখ্যানে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজা লক্ষণসেনের পুত্র কেশবসেনের একটি শ্লোকেও তাহার আভাস পাওয়া যায়।

> আহূতাদ্য ময়োৎসবে নিশি গৃহং শূণ্যং বিমুচ্যাগতা
> ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
> বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালমিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
> রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥ (শ্রীমৎকেশবসেনস্য)
>
> —সদুক্তিকর্ণামৃত ১।৫৪।৫

—"আজ আমি ইহাকে রাত্রিতে উৎসবে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, এ ঘর শূন্য রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ভৃত্যগুলিও মাতাল, এখন এ কুলবধূ কি করিয়া যাইবে? বাছা, তুমিই তাহা হইলে ইহাকে ইহার ঘরে লইয়া যাও। যশোদার এই কথা শুনিয়া রাধামাধবের যে মধুর স্মেরালস দৃষ্টিসমূহ তাহাদের জয় হউক।" এই পদটি 'পদ্যাবলীতে'-ও ধৃত হইয়াছে—এখানে রাধা কুলবধূ, অর্থাৎ কৃষ্ণের পরকীয়া। জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দের' 'মেঘৈর্মেদুর' ইত্যাদি প্রথম শ্লোকটিতেও পরকীয়া প্রেমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কৃষ্ণের জন্মের পর অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে শ্রীরাধাও কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। শিশু কৃষ্ণকে কোলে লইয়া রাধা প্রেমাবিষ্ট হন। অপরপক্ষে, সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত কেশরকোলীয়নাথোকের একটি শ্লোকে কৃষ্ণকে 'রাধাধব' বা রাধার স্বামী বলা হইয়াছে (১।৫৭।৫)।[১]

দাক্ষিণাত্যের নিম্বার্কস্বামীও বৃষভানুকন্যা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়ারূপে উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন।

রূপ গোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের 'কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণে' কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, সত্যভামা রুক্মিনী প্রভৃতি মহিষীগণ কৃষ্ণের স্বকীয়া এবং রাধা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণ পরকীয়ারূপে গৃহীত হইয়াছে। সাধারণী 'কুব্জাকে' পরকীয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। 'নায়ক-ভেদ-প্রকরণে' রূপ গোস্বামী দেখাইয়াছেন যে উপপতিভাবেই প্রেমের চরমোৎকর্ষ প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে তিনি ভরতমুনির মত উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন।[২]

কিন্তু লৌকিক অলংকারশাস্ত্রে পরকীয়া প্রেমকে হেয় করিয়া দেখান হইয়াছে। এ বিষয়ে তিনি (রূপ গোস্বামী) বলেন—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি॥

(উঃ মঃ ১।২১, নায়কভেদ-প্রকরণ)

—'এখানে (প্রেমের ঔপপত্য বিষয়ে) যে লঘুত্বের কথা বলা হইল তাহা প্রাকৃত (লৌকিক) কাব্যের নায়ক পক্ষেই প্রযোজ্য, রসনির্য্যাসের (আস্বাদনের) নিমিত্ত যে কৃষ্ণাবতার তাহাতে ইহার কিছুই প্রয়োজ্য নহে'।

---

১ অংসাসক্তকপোলবংশবদনব্যাসক্তবিম্বাধর-
দ্বন্দ্বোদীরিতমন্দমন্দপবনপ্রারব্ধমুগ্ধধ্বনিঃ।
ঈষদ্বক্রিমলোলহারনিকরঃ প্রত্যেকরোকানন-
ন্যঞ্চৎকুঞ্চদঙ্গুলিচয়স্ত্বাং পাতু রাধাধবঃ॥ (সদুক্তিঃ ১।৫৭।৫)

২ বহু বার্যতে খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ
যা চ মিথো দুর্লভতা, সা মন্মথস্য পরমা গতিঃ। (ভরতমুনিবাক্যম্)

—'যে রতির জন্য লোকত ও ধর্মত বহু নিবারণ, যে রতিতে পরস্পরের প্রচ্ছন্নকামুকতা এবং পরস্পরের দর্শন-স্পর্শন ও সম্ভাষনাদি বিষয়ে দুর্লভতা থাকে তাহাকে কামের শ্রেষ্ঠা বা পরমশোভাময়ী রতি জানিবে।'

আসলে রূপ গোস্বামী কৃষ্ণের উপপতিভাবকে নানাভাবে লঘু করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নাটকাদি পাঠ করিলে মনে হয় তিনি পরকীয়াবাদ তত্ত্বতঃ স্বীকার করেন না। অর্থাৎ পরকীয়াবাদ সম্বন্ধে রূপ গোস্বামীর নিজের মত স্পষ্ট নয়। 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে আয়ান ঘোষের সহিত রাধার বিবাহ সত্য বিবাহ নহে, আয়ানকে প্রতারিত করিবার জন্যই যোগমায়া বিবাহের ভান সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রাধাদি গোপিকাগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁহারা পরোঢা বা অনূঢা গোপকন্যা। ভাগবতেও ঠিক এই ভাবটি ছিল—রাসলীলার সময় গোপীরা যখন কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখনও যোগমায়ার প্রভাবে গোপিকাদের মায়া-বিগ্রহ তাঁহাদের স্ব স্ব স্বামীদের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল, সেইজন্য গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষ্যা পোষণ করিতেন না।

জীব গোস্বামীর রচনাদি পাঠে জানা যায় যে তিনি পরকীয়াবাদ তত্ত্বতঃ সমর্থন করিতেন না। তিনি 'গোপাল-চম্পূ' গ্রন্থে রাধা ও কৃষ্ণের বিবাহ সংঘটিত করিয়াছেন, তিনি বলেন স্বকীয়া প্রেমেই রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার পরমোৎকর্ষ সাধিত হয়, তাঁহার মতে অপ্রকট গোলোক-লীলায় স্বকীয়াই পরম সত্য, পরকীয়া হইল মায়িকমাত্র, কৃষ্ণের যোগমাযা প্রকট বৃন্দাবনলীলায এই পরকীয়াভাবের বিস্তার করিযা থাকে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে পরকীয়াবাদ সমর্থম করিতেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পরকীয়াবাদকে প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাতেই তুল্যভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে রাধামোহন ঠাকুরের সভাপতিত্বে পরকীয়াবাদ সম্বন্ধে বিতর্কসভা বসিয়াছিল, তাহাতে তত্ত্বহিসাবে পরকীয়াবাদের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদিত হইযাছিল।

ঐতিহাসিক দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় জয়দেবের পরে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও অন্যান্য কবিদের রচনায় রাধাকে পরকীয়া হিসাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। আবার, পরকীয়াকে কেবল মায়িক বা তাত্ত্বিক বলিলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা রসহীন হইয়া যাইত। বৈষ্ণব পদাবলীতে অঙ্কিত শ্রীরাধার মূর্তিকে জীবন্ত করিয়া চিত্রিত করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবিগণ রাধা ও অন্যান্য গোপিকাদের পরকীয়া বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্যই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা যতই

উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল তত্ত্বহিসাবে পরকীয়াবাদ ততই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। কৃষ্ণপ্রেয়সী হিসাবে শ্রীরাধাকে অনূঢ়া গোপকন্যা ও পরোঢ়া গোপরমণী উভয়রূপেই বৈষ্ণব পদাবলীতে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

বিরাট পদাবলী সাহিত্য হইতে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি, প্রাক্‌চৈতন্য যুগ হইতেই পদকর্তারা রাধাকে কৃষ্ণের পরকীয়া বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের পদকর্তা বিদ্যাপতি শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের 'পরকীয়া' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির পদ—তোহেঁ পর নাগর হমে পর নারি।
কাঁপ হৃদয় তুঅ প্রকৃতি বিচারি॥
ভণই বিদ্যাপতি গাবে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএণ
ঈ রস সকল সে পাবে॥ (বৈ. প. পৃ. ১১৬)

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের আর একজন কবি বড়ুচণ্ডীদাস। তিনিও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন কাব্যে রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পদাবলীর চণ্ডীদাসকে অনেকে শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী কবি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পদগুলিতে রাধাকে পরকীয়া বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের পদ—

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিনী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
শুন শুন প্রাণপ্রিয় সই।
তুমি সে আমার হও তেঁই তোমায় কই॥
বিনি ছলে ছল করি সদাই ধরে চুরি।
হেন মনে করি জলে প্রবেশিয়ে মরি॥
সতী সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

পোড়া লোক না জানে পিরীতি বোলে কারে।
তুমি যদি বল সমাধান দেই ঘরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি ;
অধিক যাতনা যার অধিক পিরীতি॥ (বৈষ্ণব পদাবলী পৃ. ৬২)

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতে পরকীয়া-তত্ত্ব আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যায়।

জ্ঞানদাসের পদ—

ঘর নহে ঘোর হেন ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোরে পতির পিরীতি॥
বিরলে ননদী মোরে যতেক বুঝায়।
কানুর পিরীতি বিনে আন নাহি ভায়॥
সখি মোর নব অনুরাগে।
পরবশ জীউ না উবরে পুণভাগে॥
আঁখে রৈয়া আঁখে নহে সদা রহে চিতে।
সে রস বিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে॥
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধান্দি।
তিলে কতবার দেখোঁ স্বপনসমাধি॥
জ্ঞানদাস কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥ (বৈ. প. পৃ. ৪১৮)

গোবিন্দদাসের পদ—

পতি অতি দুরমতি কুলবতি নারী।
স্বামি বরত পুন ছোড়ি না পারি॥
তেঁ রূপ যৌবন একু নহ উন।
বিদগধ নাহ না হোয়ে বিনি পুন॥
এ হরি অতএ দেখায়বি পন্থ।
পূজব পশুপতি গৌরি একন্ত॥
সহজে বধুজন গতিমতি হীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ না চীন॥
না মিলল কোই বনহিঁ বন আন।
অনুসরি মুরলি আয়লুঁ এহি ঠাম॥

আয়লুঁ দূর পুরব নিজ সাধে।
একলি বোলি করহ জনি বাধে॥
তুহুঁ যৈছে গোরি আরাধলি কান।
গোবিন্দ দাস তাহে পরমান॥ (বৈ. প. পৃ. ৫৯৩)

পদকর্তা রাধাবল্লভ দাস রূপ গোস্বামীর বন্দনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন। (পদকর্তার মতে রূপ গোস্বামী পরকীয়া মত সমর্থন করিতেন)।

রাধাকৃষ্ণ রসকেলি নাট্য গীত পদ্যাবলি
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি স্থাপন করিলা খিতি
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী॥
চৈতন্য বিরহে শেষ পাই অতিশয় ক্লেশ
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ।
সে সব কহিতে ভাই দেহে প্রাণ রহে নাই
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ॥ (বৈ. প. পৃ. ৭৭৮)

রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়। ঐগুলিতে পরকীয়া প্রেমের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়।

গুরুজনগঞ্জনমযশো গৃহপতিচরিতং চ দারুণং কিমপি।
বিস্মারয়তি সমস্তং শিব শিব মুরলী মুরারাতেঃ॥
(সর্ববিদ্যাবিনোদানাম্—পদ্যাবলী ১৭২)

দশম অধ্যায়

বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ

ভগবান্ বিষ্ণুকে ভক্তি দিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব। বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে, তিনিই পরে বিষ্ণু-কৃষ্ণ হইয়াছেন, আরও পরবর্তীকালে বিশেষ করিয়া কৃষ্ণরূপ পাইয়াছেন। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণকাহিনীর পুরাণো রূপটি পাওয়া যায়। ভাগবতে সেই কাহিনীই আছে। তবে এখানে কৃষ্ণকথা কবিতাভিষিক্ত হইয়া উপস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতই বৈষ্ণবতা ও ভক্তিধর্মের উপনিষদ্। ইহাই পরবর্তী ভারতীয় চিন্তায় ও সাহিত্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ এই বৈষ্ণবতা ও ভক্তিধর্ম অবলম্বন করিয়াই পদাবলী রচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব ও প্রেমলীলা লইয়া রচিত যে পদসাহিত্য তাহাই বৈষ্ণব-পদাবলী নামে পরিচিত। বৈষ্ণবদের ভগবান্ কৃষ্ণ একান্তভাবেই প্রেমের ঠাকুর। এই প্রেমের ঠাকুরকে লইয়া সাধক কবি নানা লীলা প্রকাশ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

জয়দেবের 'মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী' হইতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর মূল উৎস। আলংকারিক দণ্ডী সপ্তম শতাব্দে পদসমুচ্চয় অর্থে পদাবলী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।[১] 'সহজিয়া সাধন-সংগীত' চর্যাশ্চর্য্যাবিনিশ্চয়কেও অনেকে চর্যাগীতি-পদাবলী বলিয়াছেন। বৈষ্ণবপদাবলী গেয় কবিতা, গানের মধ্যেই বৈষ্ণবপদাবলীকে ভালভাবে আস্বাদ করা যায়। এই ভাবেই এখন বৈষ্ণব-

---

১ কালিদাসের মেঘদূতে দেখি—

মদ্‌গোত্রাঙ্ক-বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা—

"আমার ভণিতা-দেওয়া কথায়-গাঁথা গান গাহিতে গিয়া"। কালিদাসের সময়ে তাহা হইলে গানে ভণিতা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।

(—ডঃ সুকুমার সেন, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস)

এখানে 'পদ' মানে word, 'বিরচিতপদ গেয়' মানে কথাগাঁথাগান, তেলেনা গৎ নয়। কিন্তু সংস্কৃত কবিতায় বা শ্লোকে ভণিতা দেওয়ার প্রথা বিশেষ দেখা যায় না। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' মঙ্গলাচরণ গানে কবির নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে—

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি॥ (বৈ. প. পৃ. ৩)

—"তোমার চরণে আমরা প্রণাম করিতেছি, এই কথা স্মরণ কর।
প্রণত আমাদের কুশল কর।
শ্রীজয়দেব কবির এই উজ্জ্বল গীতিময় মঙ্গলনিবদ্ধ
আনন্দ বিস্তার করুক।"

পদাবলীকে দেখা হয়। পরে শাক্ত গানকেও 'শাক্তপদাবলী' বলা হইতে থাকে এবং এইভাবে 'শৈব-পদাবলী'-ও সৃষ্ট হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীকে 'মহাজন-পদাবলী'-ও বলা হয়। কীর্তনীয়ারা ও পরবর্তী পদকর্তাগণ পূর্ববর্তী পদকর্তাদের 'মহাজন' বা সাধক-কবি বলিয়া প্রণতি জানাইয়াছেন। পরে যাঁহারাই বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদিগেকেই 'মহাজন' বলা হইত, তাঁহারা প্রেমভক্তির আবেগে রাধাকৃষ্ণলীলা মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া সঙ্গীতের আকারে প্রকাশ করিতেন।

ভারতবর্ষে সঙ্গীতের মাধ্যমে আদিরসাত্মক অধ্যাত্ম-অনুভূতির প্রকাশ সেই আদিযুগ হইতে প্রচলিত আছে। বেদের সূক্ত-সমূহ, পুরাণের স্তোত্রগুলি, অবহট্‌ঠের দোহাকোষ ও চর্যাগীতিসমূহ, আলোয়ারদের সঙ্গীত, উত্তর ভারতের মরমীয়া সাধকদের সঙ্গীত, উড়িষ্যার বৈষ্ণব কবিদের গান, আসামের শংকরদেব-মাধবদেবের 'বরগীত' তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীও এই ধারার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ও প্রেমভক্তির ভাষ্যস্বরূপ।

বলিতে গেলে, জয়দেবের গীত-গোবিন্দের গীতগুলির আদর্শে পদাবলীর গানগুলি রচিত হইয়াছে। গীতগোবিন্দের গানগুলি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম গান, তেমনি বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষায় সভাসাহিত্যের উদ্‌বোধক। বাংলা, গুজরাটী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার সাহিত্যের আলোচনা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' লইয়াই শুরু করিতে হয়। কিন্তু আমরা এখন গান বলিতে যে ধরণের রচনাছাঁদ বুঝি তাহা প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকেই আগত। জয়দেবের গানের মতো বৈষ্ণবপদাবলীতে সাধারণতঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় ছত্রদ্বয় 'ধ্রুবপদ' বা 'ধুয়া', তবে উভয়ক্ষেত্রে পদের ছত্রসংখ্যা সমান নয়। এই প্রসঙ্গে চর্য্যাগীতির পদগুলিও লক্ষণীয়। চর্যাগীতি গান করা হইত, কি রাগে গাহিতে হইবে তাহার নির্দেশ আছে, তালের কোন নির্দেশ পাওয়া না গেলেও অনুমান করা চলে। গানগুলির ছত্রসংখ্যা প্রায়ই দশ আর দ্বিতীয় পদটি সাধারণত ধ্রুবপদ। জয়দেবের গানের এবং পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে চর্যাগীতির গঠনের মিল আছে এইসব ক্ষেত্রে। চর্যাগীতিতে কিন্তু 'ভণিতার' সাম্য নাই। জয়দেবের গান ও বৈষ্ণবগান কোন্ রাগে ও তালে গাহিতে হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। জয়দেবে ধুয়াপদ ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে—পদের ছত্রসংখ্যা ষোল, আর বৈষ্ণবপদে সাধারণত বারো বা চৌদ্দ।

শেষের দুইছত্রে কবির নাম বা 'ভণিতা'। জয়দেবের গানে প্রায়ই 'ভণিতম্' 'ভণতি' ইত্যাদি পদ আছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দে রচিত কাহ্নপাদ ও সরহপাদের অবহট্‌ঠে রচিত দোহাকোষগুলিতে প্রথম 'ভণিতার' ব্যবহার দেখা যায়। কাহ্নপাদের প্রত্ন বাঙ্গালায় রচিত চর্য্যাগীতিতে 'ভণিতা'র ব্যবহার দেখা যায়। বহু শিষ্য গুরুর নামে পদ রচনা করিয়াছেন।

জই গুরু-বুত্তউ হিঅই পইসই
ণিচ্চিঅ হত্থে ঠবিঅ দীসই।
সরহ ভণই জগ বাহিঅ আলেঁ
ণিঅসহাব ণউ লক্‌খিউ বালেঁ ॥

(দোহাকোষ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত)

—"যদি গুরু বাক্য হৃদয়ে প্রবেশ করে, তবে পরমার্থ নিশ্চয় হস্তে স্থাপিত অর্থাৎ হস্তামলকবৎ দেখা যায়। সরহ বলে, জগৎ কৃপায় ঘুরিয়া মরে। নিজ স্বভাব লক্ষ্য করে না মূর্খ।"

ভণই কাহ্ন জিণ-রঅণ বি কইসা
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা। (চর্যা ৪০)

—"কাহ্ন বলেন,—জিনরত্নটি কেমন,
যেমন কালা বুঝায় বোবাকে।"

বৈষ্ণব-পদকর্তারাও পদের শেষে 'ভণে', ভণই' ইত্যাদি পদ ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সঙ্গে থাকিত ঈশ্বর বা গুরুর নাম। অনেকে আবার ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদে তাঁহার পোষ্টার নামও পাওয়া যায়। সমগ্র উত্তর ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের আধুনিক ভারতীয় আর্য সাহিত্যে ভণিতার ব্যবহার দেখা যায়। মুসলমান যুগের পূর্বে কতকগুলি সংস্কৃত গীতে (কবিতাতে) ভণিতা দেওয়ার রীতি ছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা রূপ গোস্বামীর 'গীতাবলী' ও রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটকের গীতগুলি স্মরণ করিতে পারি। প্রাচীন সংস্কৃত কবিরা শ্লোকটি কোন্ ছন্দে রচিত হইয়াছে বুঝাইবার জন্য ছন্দের নামটি কবিতাতে কৌশলে ব্যবহার করিতেন, মনে হয় তাহা হইতেই 'ভণিতার' রীতি আসিয়াছে। গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির মত ভণিতা দিয়াছেন। একেবারে শেষছত্রে বৈষ্ণবোচিত দীনতাজ্ঞাপন আছে। কোন সময় বা শ্রোতৃকল্যাণ-কামনা বা আত্মকল্যাণকামনা আছে, জয়দেবে ও বৈষ্ণবপদাবলীতে। এই 'ভণিতা'—

অংশে বৈষ্ণব কবি এমন সব কথা যোজনা করিয়াছেন যার জন্য পদটি নূতনরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, এক অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি এখানে লীলা-সহচর। বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ কবিতায় 'ভণিতা' থাকিলেও 'ভণিতা-বিহীন' পদও দেখা যায়। হয়তো কালক্রমে পদের ভণিতা-অংশ হারাইয়া গিয়াছে কিংবা কবি হয়তো নিজের নাম কবিতায় যুক্ত করেন নাই। আবার ভণিতার গোলমালও দেখা যায়। একই পদ বিভিন্ন কবির নামে চলিয়া যাইতেছে, কোন্ পদটি কাহার দ্বারা রচিত নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। পদের শেষে ভণিতা থাকিলে পাঠক ও শ্রোতার পক্ষে কবিকে চেনা সহজ হয়। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ পাঁচালী-আকারে গীত ও পঠিত হইত, সেইজন্য পদের শেষে 'ভণিতা' দিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ও কাশীদাসের 'মহাভারতে' ভণিতা দেখা যায়। 'ভণিতা' অবলম্বন করিয়া কবির কাল নির্ণয় সহজ-সাধ্য নয়।

॥ বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ ॥

বৈষ্ণবগীতিকার বিষয়বস্তু প্রধানত কৃষ্ণের ব্রজলীলা, তাহার মধ্যে রাধা ও গোপীদের সঙ্গে তাঁহার অপরূপ প্রণয়লীলাই মুখ্য, অন্য সব লীলা যেমন, শৈশব ও বাল্যলীলা গৌণ। বৈষ্ণবের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময় ও মাধুর্য্যময়। মথুরা ও দ্বারকালীলায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যলীলা প্রকাশিত, মধুর শ্রীবৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্যলীলা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবকবি তাঁহার মাধুর্যলীলারই উপাসক। তাঁহার ভগবান্ 'রসিকশেখর রসময়কলেবর'। তিনি যশোদার স্নেহের ধন, ব্রজবালকদের প্রাণসখা ও ব্রজগোপীদের প্রাণবল্লভ। বৈষ্ণব কবি যেন ঐশ্বর্যের সকল সম্পর্ক মুছিয়া দিতে চান। বৈষ্ণবপদাবলীর প্রধান বিষয় রাধার বিরহ। এই বিরহের অনুরণণেই বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদগুলির মূল্য।

চৈতন্যলীলাও বৈষ্ণবপদাবলীর বিষয়ীভূত। প্রধান রাধাকৃষ্ণলীলার অন্তর্গত না হইলেও শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও সন্ন্যাস লীলা বৈষ্ণব কবিদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দের দ্বিতীয় দশক হইতে চৈতন্যকথা পদাবলী জুড়িয়া বসিয়া আছে।

পদকর্তাদের অনেকে শ্রীচৈতন্যের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহারাও মানস-নয়নে শ্রীগৌরাঙ্গের অপরূপ সৌন্দর্য

ও অলৌকিক লীলা দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ভক্ত কবিদের রচিত এই সমস্ত পদের আন্তরিকতা ও অনুভূতির নিবিড়তা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। শ্রীচৈতন্যের আবেগ-আর্তি ও মহাভাব দেখিয়া বা তাঁহার কথা শুনিয়া বা অনুভব করিয়া বৈষ্ণব কবি রাধার চরিত্র অঙ্কণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী পদাবলী-সাহিত্যে কৃষ্ণবিরহবিধুর শ্রীচৈতন্যের আদর্শেই বিরহিনী রাধার চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে। এই চিত্রে এমন একটি ভক্তিনম্র ব্যাকুলতা আছে, যাহা পূর্ববর্তী কবিদের রাধাচরিত্রে দুর্লভ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের তত্ত্বদৃষ্টিতে গৌরাঙ্গ রাধা ও কৃষ্ণের মিলিতরূপ বা যুগলরূপ, এই উভয়ভাবের পদই রচিত হইয়াছে কিন্তু রাধাভাবই তাঁহার মধ্যে বেশী ফুটিয়াছে। ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে গৌরাঙ্গদেব কান্তভাবেই ভজনা করিয়াছেন, তাঁহার দিব্যোন্মাদ রাধাভাবেরই প্রকাশ। শ্রীচৈতন্য এই 'মহাভাবাশ্রিত' হইলে মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তেরা 'ভাবের সদৃশ পদ' গাহিতেন। গৌরলীলা রাধা-কৃষ্ণলীলার ভাবপ্রতিরূপ। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীতে গৌরলীলা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সমস্ত পদকে 'গৌরচন্দ্রিকা' বলে।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কোন কোন গৌরচন্দ্রিকায় শ্রীগৌরচন্দ্র কৃষ্ণভাবে ভাবিত আবার কোন কোন পদে তিনি রাধাভাবে ভাবিত। যেমন, দানলীলা নৌকা-লীলা প্রভৃতিতে শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণভাবে লীলা করিয়াছিলেন, তাই এই সব গৌরচন্দ্রিকায় 'গৌরচন্দ্রের কৃষ্ণভাব'। খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা বা মাথুরে গৌরচন্দ্রের রাধাভাব। তাই এই সব গৌরচন্দ্রিকার পদে শ্রীচৈতন্য রাধাভাবে ভাবিত। প্রেমলীলার অন্যত্র কৃষ্ণের ব্রজলীলার গোষ্ঠলীলা, কালিয়দমন, গৌরচন্দ্রিকায় শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণভাব। কতকগুলি গৌরবিষয়ক পদে যেমন, গোবিন্দদাসের 'পতিত হেরিয়া কাঁদে, স্থির নাহি বান্ধে, করুণ নয়নে চায়,' পরমানন্দ সেনের 'পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা যে, পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা'—ইত্যাদিতে শ্রীচৈতন্যের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আচণ্ডালে প্রেম-বিতরণকারী 'পতিতপাবন' গৌরচন্দ্রের। এই ধরণের পদগুলিকে গৌরচন্দ্রিকা বলা হয় না। পালাবন্দি রসকীর্তনের ক্ষেত্রেই গৌরচন্দ্রিকার সার্থকতা।

রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনের সময় ভূমিকাস্বরূপ এই পদগুলি গীত হয়, তাহাতে শ্রোতা বুঝিতে পারেন বৃন্দাবনলীলার কোন্ পর্য্যায়টি আসরে গীত হইবে। গৌরাঙ্গবিষয়ক যে-কোন পদকেই 'গৌরচন্দ্রিকা' বলা হয় না, যে পদটিতে

বৃন্দাবনলীলার ভাবব্যঞ্জনা রহিয়াছে—তাহাকেই গৌরচন্দ্রিকা বলিয়া ধরা হয়। শুদ্ধ প্রেমপূত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা আস্বাদন করিতে করিতে শ্রোতা সাময়িক-ভাবে কামগন্ধহীন প্রেমলোকে উত্তীর্ণ হয়। আর এক শ্রেণীর চৈতন্য-জীবনী-বিষয়ক পদাবলীতে গৌরাঙ্গের জন্ম, বাল্য, যৌবন, কীর্তন, নামপ্রচার, সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভৃতি ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই পদগুলি গৌরচন্দ্রিকার মত ভাবরসসমৃদ্ধ নহে, তবে ইহাতে চৈতন্যজীবনের বাস্তবতার দিকটি সহজ সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত বৈষ্ণবকবির গাঢভক্তিরসাত্মক 'প্রার্থনা'-শীর্ষক পদগুলিকেও পদাবলীর অঙ্গীভূত করা যায়। ভক্তকবি তাঁহার ইষ্টদেব কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণের মিলিতবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। সাধককবি কখনও ভৃত্যভাবে কখনও সখী বা মঞ্জরী-অনুগত ভাবে মনের কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন। পদগুলির মধ্যে সহজ সরল ভক্তিনম্রভাব ও শরণাগতি প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলিকে ভজন-সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যায়। মীরার 'মৈনে চাকর রাখোজী' এই ভাবের দ্যোতক। নরোত্তমদাসের প্রার্থনা-সঙ্গীতে ভক্ত হৃদয়ের দীনতা ও আর্তি সুপরিস্ফুট।

হরি, হেন দিন হইবে আমার।
তুহুঁ অঙ্গ পরশিব　　তুহুঁ অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে　　সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি　　কর্পূর তাম্বুল পূরি
যোগাইব অধর যুগলে॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন　　সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিত পাবন　　দেহ মোরে এই ধন
তোমা বিনা অন্য নাহি ভায়॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু　　অধমজনের বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া　　দেহ মোরে পদে ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥　　(বৈ. প. পৃ.৫৪৭)

ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগের পর হইতেই পদাবলী সংগ্রহের কাজ সুরু হয়। পালাকীর্তন রচয়িতা ও গায়কদের প্রয়োজনের তাগিদেই পদসংগ্রহ হইয়াছিল। প্রাচীন পদসংগ্রহে ব্রজে কৃষ্ণলীলার বিষয় ও ভাব অনুসারে প্রধানত দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথমে, পিতা-মাতা, সখা-সখীদের সহিত বিবিধ লীলা, দ্বিতীয় রাধার সহিত একান্তে লীলা, বিশেষভাবে রাধার বিরহ।

ব্রজের কৃষ্ণলীলার আখ্যান অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিক ভাবে পদরচনা শ্রীচৈতন্যের পূর্বে হইত না; পালাবন্দি ভাবে গাওয়াও হইত না। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের অনেক পরে লীলানুসারে ধারাবাহিক পদরচনা শুরু হইল। জয়দেব কাহিনী অনুসারে কৃষ্ণপ্রেমলীলা গাহিলেন। 'গীতগোবিন্দের' পূর্বে কৃষ্ণপ্রেমলীলা আদিরসাত্মক ছিল। তাঁহার কাব্যে কৃষ্ণভক্তিরস থাকিলেও আদিরস মুছিয়া যায় নাই। পরে যাঁহারা কৃষ্ণলীলা লিখিলেন, তাঁহারা জয়দেবের পথ অনুসরণ করিয়া রসের দিক হইতে প্রাচীন সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের নির্দিষ্ট পথ ধরিলেন। পৌরাণিক সাহিত্যে কৃষ্ণকথা আদিরসাশ্রিত ছিল না। কিন্তু অবহট্‌ঠ সাহিত্যে ও লোক-প্রচলিত কৃষ্ণকথায় আদিরসের প্রাচুর্য ছিল। জয়দেব ও বড়ুচণ্ডীদাস এই লোকপ্রচলিত কাহিনী গ্রহণ করিয়া-ছিলেন বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাপতির পদাবলীতেও আদিরসের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের সাধনায় বৈষ্ণবধর্মে সর্বোপরি মধুর রসের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার আদিরস একেবারে নিষ্কাশিত হইয়া 'রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসে' পরিণত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাকেও শ্রীচৈতন্যনির্দেশিত পথে গড়িতে হইল। বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রপ্রণেতা রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থদ্বয়ে রাধাকৃষ্ণলীলার পথ বাঁধিয়া দিলেন এবং পরবর্তী পদকারগণ সেইভাবেই পদরচনা করিতে লাগিলেন। লীলার দুইভাগ—ব্রজলীলা ও নিত্যলীলা। ব্রজলীলায় পুরাণবর্ণিত 'অবতার' কৃষ্ণের কথা। নিত্যলীলায় জন্ম ও শৈশব প্রচেষ্টা ইত্যাদি নাই। অসুরবধাদি নাই, রাসলীলা নাই। আছে শুধু দিনে-রাত্রে নানা ব্যপদেশে রাধাকৃষ্ণের মিলন। সখীদের কাজই সেই মিলন-সাধনা। রাত্রে রাধাকৃষ্ণের শয়নের পর সখীদের ছুটি। কৃষ্ণের ব্রজলীলা নৈমিত্তিক বিলাস। তিনি দ্বাপরযুগের এক বিশেষ সময়ে এই লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোলোকে তাঁহার নিত্যলীলা। সেই লীলা ব্রজলীলার মত, তবে নিত্যধামে কৃষ্ণ চিরকিশোর। ব্রজলীলার কথা প্রাচীন শাস্ত্রে ও কাব্যে পাওয়া যায়। রূপ গোস্বামী ভক্তরুচিবিরুদ্ধ ভাব ও ঘটনা বাদ

দিলেন। তিনি নিত্যলীলারও উদ্দেশ দিয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংস্কৃতে 'গোবিন্দলীলামৃত' মহাকাব্য লিখিয়া গোলোকে রাধাকৃষ্ণের অষ্টপ্রহর-লীলা বর্ণনা করিলেন। পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার আভাস পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদকর্তারাও এই লীলার মধুর রূপ দান করিয়াছেন তাঁহাদের পদাবলীতে। 'নিশান্তলীলা' হইতে 'নৈশলীলা' পর্যন্ত বিচিত্র অবস্থানের মধ্য দিয়া শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রধান অবলম্বনরূপে দেখিতে পাই। অন্যান্য ব্রজপরিকরগণ এই লীলার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন মাত্র। রাধাকৃষ্ণের অষ্টপ্রহরিক নিত্যলীলা কি তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার 'গোবিন্দলীলামৃত' কাব্যের প্রারম্ভে সূত্রাকারে দিয়াছেন।

> কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যং
> প্রাতঃসায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
> মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধা পরাহ্নে
> গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ ॥[১]

"—সেই কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করুন, যিনি প্রভাতে কুঞ্জ হইতে বাথানে যান, দুগ্ধ দোহন ও ভোজন করেন, সকাল-সন্ধ্যায় যিনি সখাদের সঙ্গে গোঠে গরু চরাইয়া লীলায় বিহার করেন, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে যিনি কুঞ্জবনে রাধিকার সঙ্গে বিলাস করেন, অপরাহ্নে যিনি গোষ্ঠে যান অর্থাৎ গরু লইয়া গোশালায় ফিরিয়া আসেন। আর যিনি সন্ধ্যায় সুহৃদদের আনন্দ দেন।"

তারপর হইতে বৈষ্ণব কবিরা রূপ গোস্বামীকে অনুসরণ করিয়া ব্রজলীলা ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের অনুসরণে নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়া পদাবলী রচনা করিতে লাগিলেন। নিত্যলীলা লইয়া রচিত পদাবলীর বিশেষ নাম 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী'। অষ্টপ্রহর বা 'চব্বিশপ্রহর' সংকীর্তন অনুষ্ঠানে দণ্ডাত্মিকা পদাবলী গাওয়া হয়।

পরবর্তী পদকর্তারা ও কীর্তন-গায়কেরা মূল রাধাকৃষ্ণলীলার পরিপুষ্টির জন্য অতিরিক্ত কিছু কিছু নূতন কাহিনীর পরিকল্পনা করিয়াছেন, যেমন সুবল-মিলন, কৃষ্ণের নাপিতানীবেশে, মালিনীবেশে ও বাজীকরবেশে রাধার সহিত মিলন, কলঙ্কভঞ্জন, রাইরাজা, কৃষ্ণকালী, স্বয়ংদৌত্য, বংশীশিক্ষা ইত্যাদি। কতকগুলির আভাস রূপ গোস্বামীর গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব-পদাবলী গেয় কবিতা। গানে না শুনিলে বৈষ্ণব গীতিকবিতার

---

১ ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৪১।

পূর্ণ মূল্য বোঝা যায় না। ইহাতে সুরের ও কথার সমান মাধুর্য রহিয়াছে। সাধারণ গীতিকবিতার মত কাব্যরসও ইহাতে আছে।

বিভিন্ন পদকর্তার রচিত সমরসের পদাবলী যথাক্রমে সাজাইয়া কীর্তনীয়াগণ বিভিন্ন রাগে ও তালে যে লীলাগান করেন তারই নাম 'পালাবন্দি রসকীর্তন'। শ্রীচৈতন্যের সময়ে পালাবন্দি কীর্তনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। মহাপ্রভু অন্তরংগ ভক্তজনের সংগে জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের বিচ্ছিন্ন পদ আস্বাদন করিতেন। ধারাবাহিক পদাবলী রচনা বা পদাবলী-কীর্তন-পদ্ধতি তখনও সৃষ্ট হয় নাই। বহির্মুখ ভক্তদের জন্য ব্যবস্থা ছিল 'নাম-সংকীর্তন'। বর্তমানে যে কীর্তন-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার প্রবর্তন করেন নরোত্তম দাস। তাহার আগে পদাবলী পালাবন্দিভাবে গাওয়া হইত না, বা ধর্মানুষ্ঠানের অংশরূপেও পরিগণিত ছিল না। পদাবলী গান তখন উঁচুদরের বৈঠকী সংগীত ছিল। জয়দেবের সময় হইতে পদাবলী গানের যে রীতি মিথিলায় ও বাংলায় চলিত ছিল তাহার আধারে নরোত্তম পদাবলী-কীর্তনের ঠাট বাঁধিয়া দিলেন। মৃদঙ্গবাদ্য এই ঠাটের অপরিহার্য অংশ ছিল। খেতরীর মহোৎসবে কয়েকটি দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পদাবলী-কীর্তনের একটি বড় আসর বসাইয়াছিলেন নরোত্তম, তাহাতে খোল বাজাইয়াছিলেন দেবীদাস। নরোত্তমের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে পদাবলী-কীর্তন শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দন প্রবর্তন করিলেও তাহার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতকের শেষভাগ হইতে শ্রীখণ্ড (কাটোয়ার সন্নিকট) ছিল কীর্তন গানের প্রধান কেন্দ্র আর বিশিষ্ট পদকর্তারাও ছিলেন ঐ অঞ্চলের অধিবাসী। সপ্তদশ শতাব্দে পদাবলী-কীর্তনের চারিটি রীতি দেখা যায়। নরোত্তমের প্রবর্তিত কীর্তন-পদ্ধতির নাম হয় 'গরাণহাটী'। বিষ্ণুপুরে যে রীতি প্রচলিত ছিল, তার নাম 'ঝাড়খণ্ডী'। শ্রীখণ্ড, কাটোয়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে যে রীতি প্রচলিত ছিল, তাহাতে দেশী গানের ঢঙ্ খানিকটা মিশিয়া গিয়াছিল। এই রীতির নাম 'মনোহরশাহী'। বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে রাণীহাট পরগণা। 'রেণেটি' পদ্ধতি এই পরগণার নামানুসারে প্রচলিত।

সপ্তদশ শতাব্দের মধ্য ভাগ হইতে পদাবলী সংকলন শুরু হয়। শ্রীখণ্ড-অঞ্চল কীর্তন গানের প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাই ঐ অঞ্চলে পদ-সঙ্কলন হয় সর্বাগ্রে। ইহাদের মধ্যে কয়েকখানি বিশেষ মূল্যবান্। বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রথম সংকলয়িতা শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাস। সংকলনটির[১] নাম রাধাকৃষ্ণ-

১ অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

রসকল্পবল্লী বা রসকল্পবল্লী। তিনি নিজেও একজন পদকর্তা ছিলেন, 'গোপাল দাস' ভণিতায় লেখা পদগুলি তাঁহার রচিত। সংকলনটি সপ্তদশ শতাব্দের সপ্তম দশকে সমাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় গ্রন্থ আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' বা (গীতচিন্তামণি)[১], আনুমানিক ১৭০৪ খ্রীঃ বৃন্দাবনে সংকলিত হয়। তিনি নিজেও একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা, বড় পণ্ডিত ও বৈষ্ণবসাধক ছিলেন। তৃতীয় সংকলন গ্রন্থ নরহরি চক্রবর্ত্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়'। তাহার আর একটি সংকলন গ্রন্থ "গৌরচরিত্রচিন্তামণি"।[২] চতুর্থ গ্রন্থ রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত-সমুদ্র' আনুমানিক ১৭৩০ খ্রীঃ সংকলিত হয়। সেই সময়কার বাংলাদেশের বৈষ্ণব পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান। সংকলিত পদগুলির একটি সংস্কৃত টীকাও তিনি লিখিয়াছেন। পঞ্চম গ্রন্থ বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু' (গীতকল্পতরু)[৩] আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীঃ সংকলিত হয়। তাঁহার আসল নাম গোকুলানন্দ সেন, 'বৈষ্ণবদাস' ছদ্মনাম। 'পদকল্পতরু' বৃহত্তর সংগ্রহ, প্রায় চারি হাজারেব উপর পদ আছে, গ্রন্থটিকে পদাবলীর মহাভারত বলা যায়।

গৌরসুন্দরদাস পদাবলীর সংকলন করেন। সংকলনটির নাম 'সংকীর্তনানন্দ' বা 'কীর্তনানন্দ')[৪]। তিনি বৈষ্ণবদাসের সমসাময়িক ছিলেন। কীর্তনানন্দে এমন কতকগুলি পদ আছে যেগুলি পদকল্পতরুতে নাই।

অষ্টদশ শতাব্দের প্রথম পাদে 'সংকীর্তনামৃত'[৫] সংকলিত হয় বলিয়া মনে হয়। সংকলয়িতার নাম দীনবন্ধু। তিনি নিজে একজন প্রসিদ্ধ পদকার ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু শ্লোক ও পদ সংকলনটিতে আছে।

অন্যান্য পদসঙ্কলনের মধ্যে নাম করিতে হয় চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের 'নায়িকারত্নমালা'। নটবরদাসের 'রসকলিকা'। কমলাকান্তদাসের 'পদরত্নাকর' ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথম পাদে সঙ্কলিত হয়। নিমানন্দদাসের 'পদসার' ঐ সময়েই সঙ্কলিত হয় বলিয়া মনে হয়।

---

১ বহুবার মুদ্রিত।

২ হরিদাস প্রকাশিত (১৯৪৮)

৩ বনোয়ারীলাল গোস্বামী সম্পাদক, বহরমপুর হইতে প্রকাশিত।

৪ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। (১৩৩৬ সাল)

৫ বহু সংস্করণ হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (১৩২২—৩৮ সাল)।

আধুনিককালের কয়েকখানি পদসংগ্রহের নাম করিতে হয়। জগবন্ধু ভদ্র চৈতন্যপদাবলী সংগ্রহ করিয়া 'গৌর-পদ-তরঙ্গিনী' সংকলন করেন। তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীও প্রকাশ করেন। বর্তমান কালের পাঠকের জন্য ভাল ভাল পদ নির্বাচন করিয়া মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের সহায়তায় 'পদরত্নাবলী' নামে একটি ছোট পদ-সংকলন বাহির করেন। আধুনিক পাঠকদের পক্ষে বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবের কৃত্রিমতা ও ভাষার দৌর্বল্য পদাবলীর রসগ্রহণে বাধাস্বরূপ বলিয়া মনে হয়। কেন না, সব বৈষ্ণব পদই উচ্চাঙ্গের নয়, আবার পদাবলীর ভাব সুনির্দিষ্ট, বিষয়বস্তুও সংকীর্ণ। তাছাড়া আছে পুনরুক্তি। কীর্তন-গানে সুরতালের আবরণে ভাষার দৌর্বল্য, ভাবের কৃত্রিমতা ও পুনরুক্তি-দোষ ঢাকিয়া যাইত, সেজন্য অপ্রীতিকর হইত না।

আর একখানি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ-গ্রন্থ 'পদামৃত-মাধুরী', সংকলনটি চারিখণ্ডে বিভক্ত। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র নিত্যধামগত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর সহযোগিতায় সংকলনটি প্রকাশ করেন। আর একখানি বৈষ্ণবসংকলনের নাম করিতে হয়। গ্রন্থটির নাম 'বৈষ্ণব-পদাবলী', সংকলয়িতা বৈষ্ণবচার্য শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে একই কবির পদগুলি পূর্বরাগাদি বিভিন্ন রসপর্য্যায়ে সাজানো হইয়াছে এবং কোন্ পদটি কাহার উক্তি অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধার, সখীর বা দূতীর উক্তি, তাহারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থটি গবেষণাকার্যের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

'পুরাণো পদাবলী সংকলনগুলি পদাবলী-রচয়িতা ও গায়কদের ব্যবহারের জন্য গ্রথিত হইয়াছিল। সেইজন্য বিষয়, রস ও ভাব-পর্য্যায় অনুসারে পদগুলি সাজানো; বৈষ্ণব পদাবলীর রস পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে গেলে যেমন তাহা গানে শুনিতে হইবে, তেমনি বৈষ্ণব অলংকারশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে ব্রজলীলার বিষয়, রস ও ভাবপর্য্যায়ও জানিতে হইবে।[১]

শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ আরম্ভ বলা যাইতে পারে। চৈতন্যদেবের কৃষ্ণবিরহের আবেগ-আর্তি দেখিয়াই রাধার বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন কবিগণ। সেইজন্য কবিদের কালনির্ণয়ে আমি চৈতন্যদেবকেই আলোক-স্তম্ভ-স্বরূপ করিয়াছি। বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে তিনটি প্রধান

---

১ ভূমিকা—বৈষ্ণব পদাবলী, ৭ম সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
(—ডঃ সুকুমার সেন)।

স্তর দেখা যায়। এক, চৈতন্য-পূর্ববর্তী স্তর বা পদাবলীর 'উন্মেষকাল', এই স্তরের মধ্যে সংস্কৃতে রচিত পদাবলী অন্তর্ভুক্ত করিলে ইহার স্থিতিকাল খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দ (জয়দেবের সময়) হইতে পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ বা ষোড়শ শতাব্দের প্রথম দশক পর্যন্ত (শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগ্রহণ পর্যন্ত)। ইহার দুই ভাগ —চৈতন্য-পূর্ব যুগের সংস্কৃত পদাবলী আর চৈতন্য-পূর্ব যুগের (বাঙ্গালা-ব্রজবুলি) পদাবলী। দুই,—চৈতন্য-সমকালীন স্তর, ইহার স্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দের প্রথম হইতে মধ্যভাগ পর্যন্ত। এই সময়েই পদাবলীর পূর্ণবিকাশ হয়, ইহাকে মধ্যকাল-ও বলা যায়। এই সময়কার পদকর্তারা হয় শ্রীচৈতন্যের লীলাসহচর, ভক্ত-শিষ্য বা পরিকরের শিষ্য। তিন,—চৈতন্য-পরবর্তী স্তর। এই স্তরকে পদাবলীর পরিণতিকাল বলিতে পারি। পদাবলীর এই স্তরকে তিন উপস্তরে ভাগ করিতে হয়। প্রথম, ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাপ হইতে সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত, দ্বিতীয়, সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত, তৃতীয়, অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভ। প্রথম উপস্তরের মুখ্য পদকর্তারা শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্তের শিষ্য ও অনুশিষ্য, কেহ কেহ জাহ্নবা দেবীর বা বীরভদ্রের শিষ্য বা শ্রীখণ্ডের নরহরি অথবা রঘুনন্দনের শিষ্য কিংবা নরোত্তম ও শ্রীনিবাসের শিষ্য-প্রশিষ্য।

চৈতন্য-পরবর্তী স্তরে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ-লীলার বিশেষ নূতনত্ব নাই, পূর্বধারারই অনুবর্তন দেখা যায়। তবে কবিগণ রাধা ও কৃষ্ণের মিলনের নূতন নূতন ছল পরিকল্পনা করিয়া কিছু কিছু গৌণ লীলার সৃষ্টি করিয়াছেন যেমন, সুবলমিলন, কলঙ্কভঞ্জন, কৃষ্ণকালী, রাইরাজা, নাপিতানী ও বাজীকর বেশে মিলন ইত্যাদি। এইস্তরে পদাবলীর ভাষাতে কিছু বৈচিত্র্য আছে সংস্কৃত, সংস্কৃত-ব্রজবুলি, সংস্কৃত ব্রজবুলি-বাঙ্গলা ও সাদাসিধা বাংলা, ব্রজবুলী, সংস্কৃত-বাংলা, ব্রজবুলি-বাঙ্গলা।

এই তৃতীয় স্তরে বৈষ্ণব সাধনায় একটি গুরুতর পরিবর্তন হয়। কবিগণ সখী বা মঞ্জরীভাবে দূর হইতে রাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শন করিতেছেন। ভগবান্ কৃষ্ণ আর ভক্তের কান্ত বা প্রেমিক নহেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ও রঘুনাথ দাসের গ্রন্থাদির প্রভাবেই মঞ্জরী-অনুগ সাধনা প্রবর্তিত হয়। ভক্ত ও ভগবানের মাঝে গুরু আসিয়া আসর জুড়িয়া বসিয়াছেন। পদাবলীর প্রথম পর্যায় (চৈতন্যযুগ) ও দ্বিতীয় পর্যায়ের

(চৈতন্য-পরবর্তী) মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলার পার্থক্য আছে। এ সম্বন্ধে আমি যথাস্থানে আলোচনা করিব।

বৈষ্ণব-পদাবলী প্রেমধর্মের ভাষ্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রেমভক্তি বা "উন্নতোজ্জ্বলরসা স্বভক্তিশ্রীঃ" শ্রীচৈতন্যের অবদান। এখন ভক্তি রসের কথাই বলি। প্রিয়তম আত্মা বা ভগবানকে কান্তভাবে উপাসনা বা ভজনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূলসূত্র। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইহার অভাস আছে। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি মানুষের সহজ ধর্ম, জীবনানুকূল বৃত্তি। কাম ও প্রেম মূলে একই বস্তু। দেহানুগ অথচ সূক্ষ্ম সুন্দর ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ সুকুমাররূপে যাহা মানবীয় প্রেম, তাহাই দেহাতিক্রান্ত দিব্য প্রীতিতে ভগবৎপ্রেম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

(চৈ. চ. আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

দেহভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে প্রেম হয় না। কৃষ্ণের সুখের আকাঙ্ক্ষাই প্রেম। যেমন পঙ্ক হইতে পঙ্কজের জন্ম, তেমনি মানবীয় কাম হইতেই দিব্য প্রেমের উদ্ভব। কোন কোন ধর্মের সাধনায় কামজয়ের কথা আছে। তান্ত্রিক সহজিয়া-সাধনায় কাম স্বীকৃত কিন্তু উপায়স্বরূপ উপেয়রূপে নহে, সাধনরূপে, সাধ্যরূপে নহে। কাম গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে স্বীকৃত, কিন্তু দেহস্পর্শহীন সুনির্মল পূত ভাবমাত্রে পর্যবসিত। ইহাতে কামই সর্বস্ব, একমাত্র সাধ্যবস্তু, পরমপুরুষার্থ। এই প্রেম ও কৃষ্ণ এক। ভাববৃন্দাবনে কান্ত কৃষ্ণের সহিত কান্তারূপ ভক্তের নিরবিচ্ছিন্ন প্রেমানন্দই বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য। মুক্তিও ইহার নিকট তুচ্ছ।[১] ব্রজগোপীদের প্রেমকে কামই বলা হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥

(চৈ. চ. মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই 'অপ্রাকৃত কাম' (পরিশুদ্ধ প্রেম) যাঁহাকে সমর্পণ করেন, তিনি ভাগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি 'রসময় রসিকশেখর', শ্রুতির 'রসো বৈঃ

---

১ ভক্তি সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণে মুক্তি না ইচ্ছয় ॥ (চৈ. চ. অন্ত্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ)

সঃ', তিনি 'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন'। রাধাভাবে ভাবিত জীবাত্মা পরমাত্মা কৃষ্ণের সহিত অন্তর্বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস করেন, তখন ক্ষণিকের জন্য দ্বৈতভাবের তিরোধন ঘটে। এই ভাবের গভীর উপলব্ধি চৈতন্যদেবের হইয়াছিল। রায় রামানন্দের—

'না সো রমণ, না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি।'

(চৈ. চ. মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ)

এই ভাবই প্রেমের শেষ সীমা,—প্রভু কহে 'সাধ্যবস্তু-অবধি এই হয়'। গৌরাঙ্গ ছিলেন রাধাভাবে ভাবিত, 'রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার নিজ রস আস্বাদিতে' তিনি অবতীর্ণ। তিনি 'রাধাভাব-সুবলিততনু কৃষ্ণ-স্বরূপ,' অর্থাৎ রাধাভাবে ভাবিত প্রেমসাধক। রাধার রাগের আনুগত্যময়ী প্রেমসাধনা দ্বারা বৃন্দাবনের লীলার রহস্যলোকে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই অধিকারী ভক্তকে তিনি পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়,' এই অপূর্ব প্রেমভক্তি তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যর আগে ভক্তিধর্মের কোন প্রবর্তয়িতাই ভগবদ্‌বিষয়িনী রতিকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ অদ্‌ভুত শৃঙ্গাররসে পরিণমিত করিতে পারেন নাই।

রাধাভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রের ভাবস্পন্দনের বিচিত্র অভিব্যক্তি তাঁহার ভক্তমণ্ডলী বার বার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভের মূর্তিমান্ বিগ্রহ। নীলাচলে তাঁহার জীবনের শেষ বারো বৎসর বিরহ-দিব্যোন্মাদেই কাটিয়াছিল।

বৈষ্ণব পদাবলীর মূল সুর বিরহের, বাৎসল্য রসের কিছু পদ বাদ দিলে বৈষ্ণব পদাবলীর পট বিরহিণী রাধার মূর্তিতে আঁকা। মহাভাবাশ্রিত শ্রীচৈতন্যের আদলেই কবিগণ রাধার ছবি আঁকিয়াছেন, তাঁহাদের সেই রাধা-চরিত্রে এমন একটি ভক্তিনম্র প্রেমব্যাকুলতা আছে যাহা পূর্ববর্তী কবিদের পদাবলীতে দেখা যায় নাই। এই ভাবই বৈষ্ণবপদাবলীকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে।

॥ বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা ॥

বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রধানতঃ দুই ধরণের ভাষাছাঁদ ব্যবহৃত হইতে দেখি। একটি সাদাসিদে বাঙ্গালা, অপরটি খাঁটী বাঙ্গালা নয়, মিশ্রভাষা 'ব্রজবুলি'। ব্রজবুলি নামটি প্রাচীন নহে, ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথম পাদের আগে (ঈশ্বর গুপ্তের আগে) ব্রজবুলি নামটির ব্যবহার দেখা যায় না। প্রাচীন পদকর্ত্তারা ও কীর্ত্তনীয়ারা উক্ত ভাষাদ্বয়কে দুইটি স্বতন্ত্র ধারা বলিয়া মনে করিতেন এমন কোন প্রমাণ প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দে আসামে 'ব্রজবোলি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। ব্রজবুলির বিষয় রাধকৃষ্ণলীলা এবং তদনুসারে গৌরলীলা। ব্রজবুলির ব্যবহার সীমাবদ্ধ, জনসাধারণ বৈষ্ণব কবিদের এই নূতনসৃষ্ট কৃত্রিম ভাষা শুনিয়া ভাবিল, রাধাকৃষ্ণ ব্রজধামে অবতীর্ণ সুতরাং রাধা, কৃষ্ণ ও অন্যান্য ব্রজবাসীরা বুঝি এই ভাষায় কথা কহিতেন। তাই ব্রজমণ্ডলের ভাষা অর্থাৎ 'ব্রজের বোলি' বা 'বুলি' এই হিসাবে ব্রজবুলি নাম দেওয়া হইল। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। বর্ত্তমান বৃন্দাবন-মথুরা অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে বলা হয় 'ব্রজভাষা বা ব্রজভাখা'। ব্রজবুলির সহিত 'ব্রজভাষার' সম্বন্ধ নাই। মনে হয় নামটির মূলে ছিল ব্রজাওলী' (ব্রজ-সম্বন্ধীয়), যেমন সোনালি (অসমীয়া সোনাবলি), রূপালি।

॥ ব্রজবুলির জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি ॥

আমাদের ভাষার ইতিহাসে দেখি মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাব ও ভাষার আদর্শে পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ বা ষোড়শ শতাব্দের প্রথম হইতে বাঙ্গালা, আসাম ও উড়িষ্যায় ভগ্ন-মৈথিল বা ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি হয়, অন্যত্র বলিয়াছি পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়বস্তু ও গঠনরীতি জয়দেবের গানেরই মত। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছেন, তাঁহার গানের ছন্দ ও ধ্বনিঝংকার 'অবহট্‌ঠের' ভাঙ্গা পদ্ধতি থেকে নেওয়া। গীতগোবিন্দের গীতি-কবিতার আদর্শে বাঙ্গালা দেশে, মিথিলায়, আসামে ও অন্যত্র রাধাকৃষ্ণপদাবলীর ধারা নামিয়াছিল। বাঙ্গালা, মৈথিল প্রভৃতি ভাষার উদ্ভবের পরেও পদরচনায় অবহট্‌ঠের এই ভাঙ্গা পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত। অবহট্‌ঠের শব্দ, পদ, অন্বয় ছন্দ প্রভৃতি মৈথিল ভাষায় পরিগৃহীত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দে বিদ্যাপতি এই ভগ্ন-মৈথিল ভাষায় রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ

শতাব্দে লেখা 'পারিজাত-হরণ' নাটকে কতকগুলি মৈথিল গান আছে, এই গানগুলির ভাষা ও বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা একই। 'ব্রজবুলির' মূলে আছে প্রধানতঃ দুইটি ভাষা, একটি অবহট্‌ঠ অপরটি মৈথিল। ব্রজবুলির গানের ছন্দ পুরাপুরি অবহট্‌ঠের, ভাষাতেও অবহট্‌ঠের চিহ্ন আছে। ব্রজবুলিতে মৈথিল অংশই বেশী। এ মৈথিল ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দের ভাষা, বিদ্যাপতি এই ভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সময়ের কথ্যভাষা হুবহু এরূপ ছিল না। তীরহুতের কবি বিদ্যাপতির কৃষ্ণলীলাপদাবলী এবং সেই পদাবলী গানের পদ্ধতি বাঙ্গালা দেশের লুপ্ত সাহিত্যবৃত্তিকে নূতন চেতনায় জাগাইয়া দিল। শুধু সাহিত্য নয় অধ্যাত্ম-ভাবনায়ও নূতন সূত্রের নির্দ্দেশ দিল। ব্রজবুলি গীতিকবিতার রীতি মিথিলা হইতে পূর্বভারতের সংস্কৃতিমান্ রাজসভাগুলিতে বাঙ্গালায় আসামে ও নেপালে, মোরাঙ্গে, উড়িষ্যায় ছড়াইয়া পড়ে।' ব্রজবুলির বীজ লৌকিকের (অর্ব্বাচীন অবহট্‌ঠ), ইহার অঙ্কুরোদ্‌গম হইয়াছিল মিথিলায়, প্রতিরোপন বাঙ্গালায়[১]। বিদ্যাপতি 'লৌকিক' ও ভগ্ন-মৈথিল উভয় ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির এই ভাষা ও গানের ঠাট্ বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে পদাবলী রচনার আদর্শ যোগাইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দ হইতে এই ভাষার ঠাটে বাঙ্গালা সাহিত্যে বিস্তর পদাবলী রচিত হইয়াছে। বাঙ্গালার দুই প্রতিবেশী প্রদেশে আসামে ও উড়িষ্যায় ষোড়শ শতাব্দের কাছাকাছি সময়ে ব্রজবুলিতে পদাবলী রচিত হইতে দেখি। 'ব্রজবুলির' কাঠামো সর্বত্র এক। বাঙ্গালা ব্রজবুলিকে উড়িয়া ও অসমীয়া ব্রজবুলি হইতে স্বতন্ত্র করা সম্ভব নয়। দৈবাৎ স্থানীয় শব্দ ও দুই একটি নাম-বিভক্তি ছাড়া আর বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই।

ষোড়শ শতাব্দের শেষপাদ হইতে ব্রজবুলিতে হিন্দী ব্রজভাষার কিছু কিছু শব্দ ঢুকিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনেকে বৃন্দাবনে বসিয়া বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছেন ও সংকলন করিয়াছেন, তাঁহাদের রচনার মধ্য দিয়াই ব্রজবুলিতে ঐসব শব্দের আমদানী হইয়াছিল বলিয়া মনে করি। আর একটি কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবপদাবলী বাঙ্গালার বাহিরে রাজপুতনা প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল, হয়তো এই সূত্রেই কিছু কিছু হিন্দী শব্দ ঢুকিয়া থাকিবে। ব্রজবুলির অনুশীলন বাঙ্গালা দেশেই ব্যাপকভাবে হইয়াছিল ষোড়শ হইতে উনবিংশ শতাব্দ ধরিয়া। বিদেশী আরবী-ফারসী শব্দ বেশী নাই।

১ ভাষার ইতিবৃত্ত—ডঃ সুকুমার সেন

আগেই বলিয়াছি, মিথিলার উমাপতি-বিদ্যাপতির গীতিকবিতা, বাঙ্গালা অসমীয়া উড়িয়া ব্রজবুলি কবিতার আদর্শ যোগাইয়াছিল। বিদ্যাপতির 'রাধাকৃষ্ণ'-বিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলী সরলতর মৈথিল বা ভগ্ন-মৈথিলে রচিত কিন্তু তাঁহার 'হরগৌরী' পদাবলীর মৈথিল ভাষা কঠিন ও দুর্বোধ্য। শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট তদানীন্তন মিথিলা সারস্বত তীর্থস্বরূপ ছিল, তাছাড়া বিদ্যাপতির গানেও বাঙ্গালী বিদগ্ধ সমাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও মিথিলার ঘনিষ্ট যোগা-যোগের ফলে পরস্পরের ভাষাও অবোধ্য ছিল না। মনে করি বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলীর আদর তাহার জন্মভূমি মিথিলার চেয়ে বাঙ্গালা দেশেই বেশী হইয়াছিল। তাছাড়া, বাঙ্গালা, মৈথিল, অসমীয়া, উড়িয়া একই 'মাগধীয়' ভাষা হইত উদ্ভূত এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দে পরস্পর হইতে এতদূরেও সরিয়া যায় নাই। জয়দেবের ভাবাদর্শে ও সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠে রচিত আদিরসাত্মক ভক্তিরসার্দ্র কবিতার রূপাদর্শে পদ-রচনায় উমাপতি বিদ্যাপতিই প্রাচীনতম। স্বভাবতই বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাবে বাঙ্গালায় ব্রজবুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। আবার শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপতির ভক্তিরসাত্মক রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ অন্তরঙ্গ ভক্তজনের সহিত আস্বাদ করিতেন। চৈতন্যদেবের অনুমোদনের জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিকট বিদ্যাপতি 'গোস্বামী' বলিয়া বিবেচিত হইলেন। তাঁহার পদাবলীর ভাষার আদর্শে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 'বৈষ্ণবপদাবলী' রচনা করিলেন। সেই ভাষাকেই আধুনিক যুগে 'ব্রজবুলি' বলা হয়। ব্রজবুলি হইতেছে বাঙ্গালার সহিত মৈথিলের ক্ষেত্রোপযোগী সমীকরণ ও কিন্তু সচেতন প্রয়াসের দ্বারা নহে, আপন আপন মাতৃভাষার স্বাভাবিক প্রভাবে। 'ব্রজবুলি' হইতেছে কবি-সৃষ্ট কৃত্রিম ভাষা। সাহিত্যের প্রয়োজনেই ইহার উদ্ভব। কিন্তু যে ভাবে বৈষ্ণব কবি পদাবলী রচনা করিয়াছেন, দেখিয়া মনে হয়, ইহা যেন তাঁহার দ্বিতীয় মাতৃভাষা।[১] পদাবলী রসিকদের ধারণা—বিদ্যাপতি মৈথিল

১ পূর্ববর্তী যুগেও কবি-সৃষ্ট কৃত্রিম ভাষাতে বিরাট সাহিত্যসৃষ্টি হইতে দেখি। পালি গাথাভাষা বা 'বৌদ্ধ-সংস্কৃত' কথ্য ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহা কবি-সৃষ্ট সাহিত্যের ভাষা। এই কৃত্রিম ভাষায় মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধদের শাস্ত্রগ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষাগুলিও কৃত্রিম ভাষা। এইগুলি সংস্কৃত নাটক ও প্রাকৃত কাব্যাদিতে বহুদিন পর্যন্ত একই ভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসতেছিল। সাহিত্যিক অপভ্রংশ ভাষাকেও অনেকটা কৃত্রিম ভাষা বলা যায়। এই কৃত্রিম 'অবহট্‌ঠ' ভাষাই কবিদের নিকট খুব প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং একদা গুজরাট হইতে আসাম পর্যন্ত সকল কবিই সৌরসেনীর এই অপভ্রংশকেই সাহিত্যের বাহন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে দেখিলে 'লৌকিক সংস্কৃত' ভাষাকে কৃত্রিম সাহিত্যের ভাষা বলা যায়। অবশ্য বৈদিক সাহিত্যের ভাষা জনসাধারণের কথ্য ভাষার অনেকটা কাছাকাছি ছিল।

ভাষাতেই রাধাকৃষ্ণ পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। মিথিলাপ্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্র ও শিক্ষিত লোকদের দ্বারা বিদ্যাপতির পদগুলি বাঙ্গালা দেশে আনীত হইয়াছিল ও জনসাধারণের মাঝে প্রচারিত হইয়াছিল। সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট কোন কোন মৈথিল শব্দ কর্কশ ও কঠিন মনে হইত, ভালো করিয়া বুঝিতে পারিত না। তাহারা মাতৃভাষা বাঙ্গালার শব্দ ঐ সমস্ত স্থানে ব্যবহার করিত। লোকমুখে প্রচারিত হইবার ফলে মৈথিল ভাষাও নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইতেছিল। বাঙ্গালী কীর্ত্তনীয়ারাও শ্রোতার বুঝিবার সুবিধার জন্য বিদ্যাপতির পদের পরিবর্তন করিয়া দিতেন। আবার যাঁহারা পদাবলীর সাধারণ পাঠক, তাঁহারাও কিছু কিছু বাঙ্গালা শব্দ ঢুকাইয়া দিয়াছেন। এইভাবে অনেক বাঙ্গালা শব্দ ও কিছু কিছু বাঙ্গালাভাষার বাগ্‌রীতির আমদানী হইল। মৈথিল ভাষা ভাল করিয়া না জানায় মৈথিল ভাষার ব্যাকরণেও শিথিলতা আসিল। কালের ব্যবধানে বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় একটি রূপান্তর আসিল এবং এই রূপান্তরিত ভাষাকে অন্য একটি ভাষা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় গোস্বামীদের প্রভাবে এই কৃত্রিম ভাষা (অর্থাৎ মৈথিল ও বাঙ্গালাভাষার সংমিশ্রণ) বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। আধুনিক যুগে এই সাহিত্যিক ভাষাকে 'ব্রজবুলি' বলা হয়। এই ব্রজবুলি কোন জীবন্ত কথা ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সাহিত্যের খাতিরেই ইহার সৃষ্টি। সেইজন্য বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে খাঁটী মৈথিল ভাষায় লিখিত বিদ্যাপতির পদ খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রসিদ্ধ পদকার জ্ঞানদাস বাঙ্গালাপদ ও বজ্রবুলিপদ উভয়রীতিতেই সমান দক্ষতার সহিত পদরচনা করিয়াছেন। ব্রজবুলির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস ব্রজবুলিতেই পদাবলী লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় হয়তো দুই একটি লিখিয়া থাকিবেন। বাঙ্গালাতে লিখিত পদগুলির চেয়ে ব্রজবুলিতে লিখিত পদগুলি ছন্দোবৈচিত্র্যে, ধ্বনিঝংকারে ও চিত্রকল্পে অনেক সময় উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। ব্রজবুলি রচনায় বলরাম দাস, রায় শেখর গোবিন্দদাস কবিরাজ, রাধামোহন ঠাকুর বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে আরও কয়েকটি ভাষারীতি দেখা যায়। সংস্কৃতে কিছু কিছু পদাবলী রচিত হইয়াছে, তাহাদের কথা অন্যত্র বলিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দের শেষভাগ হইতে 'ভাষা-মিশ্র' (macaronic) রীতি দেখা যায়, যেমন, সংস্কৃত-বাঙ্গালা, সংস্কৃত-ব্রজবুলি, সংস্কৃত-বাঙ্গালা-ব্রজবুলি, বাঙ্গালা-ব্রজবুলি।

॥ সংস্কৃত-বাঙ্গালা ॥

দেখ সখী মোহন মধুর সুবেশং
চন্দ্রক চারু মুকুতাফলমণ্ডিত
অলিকুসুমায়িত বেশং ॥ ইত্যাদি বীরবাহু[১]

॥ সংস্কৃত-মিশ্র ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা ॥

যদুনন্দন—

ধৈর্যং রহু ধৈর্যং রাই গচ্ছ মথুরাওয়ে।
ঢুঁড়ব পুরী প্রতি প্রভাতে
যাঁহা দরশন পাওয়ে ॥
ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা।[২]

॥ সংস্কৃত-বাঙ্গালা-ব্রজবুলি ॥

কস্ত্বং শ্যামল-ধামা।
হরি-কিংকর হাম উদ্ধব-নামা ॥
অত্র হরিস্তব কুত্র।
মধুপুরে বসই বরজ-জন-মিত্র ॥
কুরুতে কিং মধু-নগরে।
কংসক পক্ষ দলন করি বিহরে ॥
পুন পুন পুছই গোরী।
চন্দ্রশেখর কহে প্রেম-ভিখারী ॥[৩] (চন্দ্রশেখর)

গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ ভাষামিশ্র (nacaronic) পদরচনা করেন। একটি ব্রজবুলি-বাঙ্গালা-মিশ্রিত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

---

১ বৈষ্ণব পদাবলী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত পৃঃ ১০৮৪
২ বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।
৩ বৈ. প. পৃ. ১০১৯।

সদা প্রেমোল্লাসী সো পিয়া পরবাসী বিধিবশাৎ
শশী বহ্নিপ্রায়ঃ করিব কি উপায়ঃ ক নু বসে।
গৃহৈকান্তস্থানে তাতেও লাগে কানে কুলিশবৎ
কুহূকণ্ঠী নাদঃ কি হৈল পরমাদঃ কহ সখি ॥[১]

—"সর্বদা প্রেমে মত্ত সে প্রিয় বিধির বিধানে প্রবাসে রহিয়াছে। চাঁদের আলো আগুণের মতো। কি উপায় করিব। কোথায় থাকি। ঘরের এক কোনেও (সেখানেও) বজ্রের মতো কানে লাগে কোকিলের ডাক। বল সখি, একি প্রমাদ হইল!"

॥ বাঙ্গালা-মিশ্র ব্রজবুলি ॥

রাই কিছু কহই ন পারি।
তুয়া রূপ গুণের বালাই লৈয়া মরি ॥[২]

—নরহরি চক্রবর্তী।

বাঙ্গলা ও ব্রজবুলির উদাহরণ পূর্বেই দিয়াছি। সংস্কৃতের অনুকরণে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ করিয়া পদাবলী লিখিতে দেখি গোবিন্দদাস কবিরাজ, রাধামোহন, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি পদকর্তাকে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের শেষার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব পদাবলী ব্যাপক ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্রজবুলিতে লিখিত পদসংখ্যাই সর্বাধিক। "পদাবলীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইবার আসল কারণ ব্রজবুলির ছন্দের সুভগতা। ব্রজবুলির পদ বাঙ্গালা পদের মতো স্বরান্ত নয়। মাত্রাছন্দে ধ্বনি-ঝংকার তোলা সহজ। অক্ষরের মাত্রা নিয়মনেও স্বাধীনতা আছে। ব্রজবুলির ব্যাকরণ বাঙ্গালার মাতা নিয়মবদ্ধ নয়। শব্দের বহর ইচ্ছামত ছোট বড় করা যাইত। যেমন-তেমন পদ ব্রজবুলিতে খাড়া করা যাইত। তা ছাড়া খোলের বোলের-সঙ্গে ব্রজবুলির কাটা কাটা ছন্দ খুব মিল খাইত।"[৩]

---

১ গোবিন্দরতিমঞ্জরী পঞ্চম স্তবক (শ্লোকটি 'সংকীর্তনামৃতে'ও উদ্ধৃত আছে)।
২ বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।
৩ বৈষ্ণব পদাবলী, সপ্তম সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাঙ্গালাদেশে ব্রজবুলিতে লেখা সবচেয়ে প্রাচীন রচনা কোন্‌টি বলা যায় না। তবে দুইখানি পদের দাবী সর্বাগ্রে। একটি যশোরাজ খানের পদ 'এক পয়োধর চন্দন লেপিত আরে সহজই গোর।' কবি হোসেন শাহার নাম করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার রাজত্বকালের মধ্যে (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীঃ) লেখা। পদটি প্রাক্‌চৈতন্যযুগে লেখা। দ্বিতীয়টি নেপাল হইতে প্রাপ্ত, বিদ্যাপতির পদ-সংগ্রহে মিলিয়াছে। পদটি 'প্রথম তোহর প্রেম গৌরব বাঢ়লি গেলি' ত্রিপুরার রাজা ধন্যমানিক্যের (১৪৯০—১৫২২ খ্রীঃ) সভাকবি 'রাজ-পণ্ডিতের' রচনা। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে এবং রূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণ লীলার সরণি বাঁধিয়া দিলে বাঙ্গলা দেশে ব্রজবুলি রচনার ধারা নামিয়াছিল, এই ধারায় প্রথম প্রবর্তক মুরারী গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি। অন্যত্র তাঁহাদের পদগুলি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের পদগুলিতে মিশ্র মৈথিলের যে পরিণত রূপ দেখিতেছি তাহা অন্ধ অনুকরণের ফল বলিয়া মনে হয় না। পদগুলির প্রকাশ-ভঙ্গি সাবলীল ও সচ্ছন্দ, মাতৃভাষার মত।

খাঁটী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনা করিতেছি না। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পদগুলিতেও মৈথিল প্রভাব যুগধর্মের ফলে কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়।

চৈতন্যদেব উড়িষ্যায় (নীলাচলে) জীবনের শেষ বার বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে অনেক কবি মধুররসের বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতদের অভিমত রচনাগুলির ভাষা ব্রজবুলি হয় নাই। মিথিলার বাহিরে ব্রজবুলিতে পদরচনা প্রথম এইখানেই হইয়াছিল। এই গানটি 'পরশুরাম-বিজয়' নামক একাঙ্ক নাটকের রচয়িতা উড়িষ্যার রাজা গজপতি কপিলেন্দ্রদেব (১৪৩৫-৬৬ খ্রীঃ) অর্থাৎ তাঁহার কোন সভাকবি। উমাপতির নাটকের মতই নাটকটির ভাষা সংস্কৃত। একটিমাত্র গান আছে। (অমররাগেন গীয়তে)—

কেবণ মুনিকুমার পরশু দক্ষিণকর
বামেন শোহে ধনুশর না।
কোপেণ বোলই বীরত্ত তু সে মো বধিলু তাত
আজ তোর ছেদিবই মাথ না।
শুণ রাজন হো কিএ তোর রাজ্যে ব্রহ্মবধে না॥ ১ ॥

এ তোর চন্দ্র বদন মেঘে কি ঢাকিলা জহ্ন
তাহা দেখি বিকল মো মন না।
আবর দেখই অরষ্টি রাজ্যে তো রুধির বৃষ্টি
পুর বেঢ়ি রোদন্তি শৃগাল না।
শুণ রাজন হো কিএ তোর রাজ্যে ব্রহ্মবধে না ॥ ২ ॥

ভাষায় উড়িষ্যার ছাপ এবং গঠনে ভণিতার অভাব লক্ষণীয়। আর একটি বিখ্যাত পদ রায় রামানন্দের, পদটি চৈতন্য-প্রভাবের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রেমের সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আলোচনাকালে পদটি তিনি গাহিয়াছিলেন (১৫১০)। রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দের প্রথম বা পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ।

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানুঠামে কহবি কিছুরহ জনি ॥
না খোঁজলুঁ দূতি না খোঁজলুঁ আন।
দুহক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥
অব সোই বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতি।
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধন-রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥[১]

এই একটিমাত্র পদে তিনি মিশ্র-মৈথিলের যে পরিণত রূপ দেখাইয়াছেন তাহা বিস্ময়কর।

॥ ব্রজবুলির ছন্দ ॥[১]

ব্রজবুলির ছন্দ মাত্রামূলক জয়দেব ও অবহট্‌ঠের থেকে নেওয়া। পুরাণো মৈথিলে লেখা উমাপতি ও বিদ্যাপতির গীতিকবিতা মাত্রামূলক। সংস্কৃত শব্দ যথেচ্ছভাবে ব্রজবুলিতে ব্যবহৃত। ই, ঈ, উ, ঊ, ধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব সংস্কৃতের

১ চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত। বৈ. প. ১৩৬. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

মতো। তবে ছন্দের অনুরোধে হ্রস্ব দীর্ঘ ব্যতিক্রম হইত। প্রাকৃতের মতো 'এ' 'ও' হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুইই হইত। 'আকারে'র অতিহ্রস্ব উচ্চারণও পাওয়া যায়, কোন কোন সময়ে একমাত্রা। ব্রজবুলিতে স্বরধ্বনির মাত্রা বানান-অনুযায়ী নয়, উচ্চারণ-অনুযায়ী। কান দুরস্ত না হইলে ব্রজবুলি কবিতার ছন্দস্পন্দ ঠিকমত ধরা যায় না। জয়দেবে যে ছন্দোবৈচিত্র্য দেখা যায়, তা বৈষ্ণব-পদাবলীতে নাই, আবার পদাবলীতে যে সব ছন্দ দেখা যায়, তা জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দে' নাই। ব্রজবুলি কবিতা পড়িবার সময় কানে লাগিলেও গানে তাহা ঢাকিয়া যাইত—কারণ পদগুলি গান, হ্রস্ব-দীর্ঘ-মাত্রাজনিত ত্রুটি কানকে পীড়া দেয় না। ব্রজবুলি ছন্দের অন্ত্যমিল (অন্ত্যানুপ্রাস) লক্ষণীয়, জয়দেবে ক্বচিৎ পাওয়া যায়, ইহা অবহট্‌ঠ হইতে নেওয়া।

কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি—

আটমাত্রার ছন্দ :

১১ ২১ ২১
জলকেলি সাধে। — ৮ মাত্রা
১১১২ ২১
চলু ধনী রাধে। — ৮ মাত্রা
১১১১ ২২
উত্তরল তীরে — ৮ মাত্রা
১১১১ ২২
পহিরল চীরে — ৮ মাত্রা
লঘু (হ্রস্ব)=১ মাত্রা
গুরু (দীর্ঘ)=২ মাত্রা

দ্বাদশমাত্রার ছন্দ ৮+৪ কিংবা ৪+৮

১১১ ১১১১১ ২২
গগন বিরহগহ। লাগি — ১২ মাত্রা
১১১ ১১২১ ২২
রজনি পোহায়ই। জাগি — ১২ মাত্রা।

ষোল মাত্রার ছন্দ ॥ দুই সমান ভাগে বিভক্ত ॥ চউপঈ

	২১১	১১১১	২১১	২২	
ক.	হাথক	দরপন ।	মাথক	ফুল — ৮+৮=১৬ মাত্রা	
	১১১১	২১১	১১১	২১২	
	নয়নক	অঞ্জন ।	মুখক	তাম্বূল—৮+৮=১৬ মাত্রা	
	১১	১১	২১১	২১১	২২
খ.	ইথে	যদি	সুন্দরি ।	তেজবি	গেহ—৮+৮=১৬ মাত্রা
	২১১	২২	১২১১	২১	
	প্রেমক	লাগি ।	উপেখবি	দেহ — ৮+৮=১৬ মাত্রা	

আটাশ মাত্রার ছন্দ, তিন যতি ৮ ৮ ১২ ত্রিপদী

২১১ ১১২ ২১ ১১ ১১১
নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে

১১১ ১১১ ১১২২
পুলক মুকুল অবলম্ব। — ৮ ৮ ১২

২১ ১১২১ ১১ ১১ ২১১
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত

১১১১ ২১ ১২২
বিকশিত ভাব কদম্ব । ৮ ৮ ১২

চারি যতিতে বিভক্ত ১২ ১২ ১২ ১০ ছচল্লিশ মাত্রার ছন্দ
(চতুষ্পদী)

২১ ১১১ ১১১ ২১ ১১১ ২১ ২১ ২১
মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ । মধুপ শব্দ গুঞ্জ গুঞ্জ ।

২১১ ১১ ২১ ১১১ ২১১ ১১২২
কুঞ্জর পতি গঞ্জি গমন । মঞ্জুল কুলনারী ॥
— ১২ ১২ ১২ ১০

তিন যতিতে বিভক্ত ১০ ১০ ১৪ চৌত্রিশ মাত্রার ছন্দ

(দীর্ঘ ত্রিপদী)

২১ ১১ ১১১ ১১ ২১ ১১ ২১১
কাহে তুহু কলহ করি কান্ত সুখ তেজলি

১১ ২ ১১ ২১১ ২২
অব সে বসি রোহসি রাধে।

—১০ ১০ ১৪

তিন যতিতে বিভক্ত ৬ ৬ ১০ বাইশ মাত্রার ছন্দ (ত্রিপদী)

২২ ১১ ২২ ১১
ধৈর্যং রহু ধৈর্যং রহু

২২ ১১ ২২
গচ্ছং মথুরায়ে।

— ৬ ৬ ১০

আবার ৭ ৭ ১০ প্রথম দুই যতিতে একমাত্রা বেশী (একটু ঘুরাইয়া)—

জিতি কুঞ্জর। গতি মন্থর। চলত সো বরনারী।
বংশী বট । যাবট তট। বনহি বন হেরি

আবার পঞ্চবিংশতি মাত্রা ৭ ৭ ১১ তিন যতি :—

২১ ২১১ ২১ ২১১ ২১ ২১১ ২২
নন্দ নন্দন । চন্দ চন্দন । গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ

[বৈষ্ণব পদাবলী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত]

॥ বৈষ্ণব-পদাবলীর অলংকার ॥

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে ভালভাবে বুঝিতে হইলে ভাষায় প্রযুক্ত অলংকারের কথাও জানিতে হইবে। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের পদসাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের রীতি অনুসরণ করিয়া প্রাচীন অলংকারেরই বেশী প্রয়োগ করিয়াছেন। বড়ুচণ্ডীদাস প্রভৃতি কবি পল্লীজীবন হইতে অলংকারের উপাদান খুঁজিয়াছেন। নানারকম অলংকার প্রয়োগের ফলে বৈষ্ণব পদসাহিত্য কাব্য-রসিকদের কাছে অতিশয় উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক পাঠকেরা এই সাহিত্য-কর্মের দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন।

সাহিত্যের বা কাব্যের অলংকার কাহাকে বলে? বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার 'সাহিত্য-দর্পণে' বলিয়াছেন—

শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ।
রসাদীনুপকুর্বন্তোঽলংকারাস্তে ঽঙ্গদাদিবৎ॥

(সাহিত্য-দর্পণ ১০।১)

—"যাহা শব্দ ও অর্থের অস্থায়ী ধর্ম, শোভাবর্ধক এবং রসভাবাদির উপকারক মনুষ্যদেহের অঙ্গদাদিভূষণতুল্য সেই পদার্থই হইল অলংকার।" সংস্কৃতে 'অলম্' শব্দের একটি অর্থ 'ভূষণ'। যাহা কাব্যকে ভূষিত করে শ্রী-সম্পাদিত করে তাহাই অলংকার। আলংকারিক দণ্ডী বলিয়াছেন—

"কাব্যশোভাকরান্ ধর্ম্মান্ অলংকারান্ প্রচক্ষতে"

—"কাব্যের শোভাবর্ধক ধর্মকেই ব্যাপক অর্থে অলংকার বলা হয়।" কাব্য বহিরঙ্গরূপে শব্দময়, আবার অন্তরঙ্গরূপে অর্থময়, তাই অলংকারও দুই প্রকার,—শব্দালংকার ও অর্থালংকার। এই অলংকারসৃষ্টির জন্য কবিদিগকে সচেতন প্রয়াস করিতে হয় না। যেন তাঁহাদের রচনার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অলংকারের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে।

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে উক্ত দুই প্রকার অলংকারেরই সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখা যায়। বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃত অলংকরণ রীতিই গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের পদরচনায়। আবার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ সহজ সরল রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তবু তাঁহাদের রচনাতেও অলংকারের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রাক্-চৈতন্যযুগে কবি বিদ্যাপতি অলংকার প্রয়োগে অসামান্য চাতুর্য্য

দেখাইয়াছেন। তিনি জয়দেবের প্রদর্শিত পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। জয়দেবই পদাবলী রচনায় অলংকরণ রীতির প্রথম পথিকৃৎ।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥

বিদ্যাপতির এই পদটিতে অনুপ্রাস ও শব্দমাধুর্য লক্ষণীয়। উপমা অলংকার প্রয়োগে বিদ্যাপতির দক্ষতা অপরিসীম।

জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বয়ণ সুছন্দ।
দাম-চম্পকে কাম পূজল
জইসে শারদ চন্দ॥

রূপকালংকারের ব্যবহার—

চিকুর নিকর তম সম
পুনু আনন পুনিম সসী।
নঅন-পঙ্কজ কে পতিআওব
এক ঠাম রহু বসী॥

উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ—

চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলিভরে উলটায়।

বিদ্যাপতির নিম্নস্থ বিখ্যাত পদটি নিরঙ্গরূপকের দৃষ্টান্ত—

হাথক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥

বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্যে রূপকালংকারের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখা যায়—

হাস কুমুদ তোর দশন কেশর।
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত অধর॥

উৎপ্রেক্ষা-অলংকারে কবি গ্রাম্য-জীবনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে জেহ্ন কুম্ভারের পণী॥

বিষম অলংকারের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখি—

ক্রুত দুখ কহিব কাহিনী
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় অভাগিনী॥

চণ্ডীদাসের একটি পদে ব্যতিরেক অলংকারের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাতিশায়ী রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—

কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।

চমৎকার লুপ্তোপমার দৃষ্টান্ত দেখি আর একটি পদে—

(শ্রীরাধা) তড়িৎ-বরণী হরিণ-নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।

স্মরণ অলংকার বা স্মরণোপমার দৃষ্টান্ত—

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি॥

চণ্ডীদাস 'সহোক্তি' অলংকারের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ প্রকাশ করিয়াছেন।

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরাণ সহিত মোর।

পরমানন্দ ব্যতিরেক অলংকারের সাহায্যে শ্রীচৈতন্যের রূপবর্ণনা করেন—

পরশ মণির সনে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
রতন হইল কত জনা॥

চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস সহজ রীতিতে পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পদাবলীতেও অলংকারের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বিষম অলংকারেব প্রয়োগে রাধার মনের ভাবটি চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস পদাবলী রচনায় অলংকরণ-রীতি ব্যবহার করিয়াছেন। অনুপ্রাসের অপূর্ব সুষমা দেখি তাঁহার একটি পদে—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব॥

অথবা নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার দৃষ্টান্ত—

কি পেখঁনু নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধনী তীরে উজোর॥

ভ্রান্তিমান্ অলংকার—

হরি হরি বলি ধরনী ধরি উঠই
বোলত গদ গদ ভাষ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরম ভরে
বিহি সঞে মাগয়ে পাখ॥

অতিশয়োক্তির দৃষ্টান্ত দেখি গোবিন্দদাসের পদে—

লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে।

জগদানন্দের বাহ্যচিত্রপদ—

কিতব কেশব কুশল কি কহব
কনকমঞ্জরী রাই।
কি জনি কতিখনে কব কি হোঅব
কহিতে আওলুঁ ধাই॥

ভাষাশব্দার্ণবের পদ জগদানন্দের রচনায়—

কংস-কুঞ্জর- কেশরী কর-
কুম্ভ করজে বিদার।
করভকর ভুজ- কোরে কুলবতি
করব কেলি বিহার॥

বলরামদাসের পদে ব্যতিরেক অলংকারের দৃষ্টান্ত, এখানে শ্রীরাধার রূপ ও সৌন্দর্য বর্ণনা করা হইয়াছে।

ছি ছি কি শারদের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥

বৈষ্ণব কবিগণের ভাবের ঐশ্বর্য যেমন সুগভীর, অলংকার-প্রয়োগের ক্ষমতাও তেমনি বিস্ময়কর। বৈষ্ণব পদসাহিত্য বিশ্বের সাহিত্যের দরবারে একটি স্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত 'সাহিত্য' যদি কিছু থাকে তবে তাহা বৈষ্ণব-সাহিত্য। বৈষ্ণবগণের অন্তরে যে ভাবের প্লাবন বহিয়া যাইতেছিল, তাহাই তাঁহারা সঙ্গীতের আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ-লীলারস প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহারা সাহিত্যের শিল্পকর্মের দিকেও দৃষ্টি দিতে ভুলেন নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্যে রসসৃষ্টির সহিত তত্ত্বসৃষ্টির সার্থক সমাবেশ হইয়াছে।

॥ কীর্তন ॥

বৈষ্ণব-ভক্তিশাস্ত্রকার রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে' কীর্তনের সংজ্ঞা দিয়াছেন—'নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্'—('নাম লীলা ও গুণাদির উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করাকে কীর্তন বলে')। জীব গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী 'ভক্তি-সন্দর্ভ' ও 'হরিভক্তি-বিলাসে' "ওষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রেণ" কীর্তন বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য প্রত্যেককেই হরিনাম-কীর্তন

করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।[১] কীর্তনের তিন শ্রেণী—নাম-রূপকীর্তন, গুণকীর্তন এবং লীলা-কীর্তন।

জীব গোস্বামী বলিয়াছেন, যতদিন চিত্ত-শুদ্ধি না হয় সে পর্যন্ত নামকীর্তনই বিধেয়। চিত্তশুদ্ধি হইবার পর শ্রীকৃষ্ণের রূপকীর্তন বা রূপসম্বন্ধীয়কীর্তন শ্রবণের অধিকার জন্মে, অন্তরে ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের রূপ উদ্‌ভাসিত হইলে গুণকীর্তন করা চলে। তারপর শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন করিবার অধিকার জন্মে। শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গ ভক্তজনের সঙ্গে লীলাকীর্তন আস্বাদন করিতেন।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ,
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥
(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা দশম পরিচ্ছেদ)

অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস আস্বাদন,
বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম-সংকীর্তন ॥ (চৈঃ চঃ)

নবদ্বীপ-জীবনে মহাপ্রভু শ্রীবাসের আঙ্গিনায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া অদ্বৈত, গঙ্গাদাস, মুরারি, গোপীনাথ প্রভৃতি ভক্ত বৈষ্ণবের সহিত সারারাত্রি ধরিয়া নাম-কীর্তন করিতেন। প্রকাশ্যভাবে কীর্তনে বহু বাধা ছিল 'সকল পাষণ্ডে মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে'। দীক্ষা লইয়া গয়া হইতে ফিরিয়া শ্রীচৈতন্য যে সঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা করেন তাহা নগরকীর্তন নহে।

দশ পাঁচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া
কীর্তন করহ সভে হাথে তালি দিয়া—(চৈতন্য-ভাগবত)

তারপর মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ সহযোগে দ্বারে দ্বারে পরমোৎসাহে কীর্তন আরম্ভ হইল। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য নাম-কীর্তনের উপরই জোর দিয়াছিলেন, এই নামসূত্রেই মানুষে মানুষে ভালবাসার গ্রন্থিবন্ধন হইয়াছিল। নাম-কীর্তনের দ্বারাই ভক্তির উদ্‌ভব। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ"। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই ভগবানের সন্তান, সকলেই অধ্যাত্ম-ধনের অধিকারী, সাধারণ মানুষ সমুন্নত উদার মানবতার ক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করিল। শ্রীচৈতন্য বিরোধিপক্ষদের দলনের জন্য সদলে সহস্র সহস্র লোকসহ নগরকীর্তনে বাহির হইয়াছিলেন। বলিতে গেলে শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই নগরকীর্তন আরম্ভ হইয়াছিল। এত অসাধ্যসাধন কেবল ব্যাখ্যায় ও প্রচারে হয় না।

---

১ সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্তন যজ্ঞে তারে ভজে সেই ধন্য। (চৈঃ চঃ আদি, ৩য় পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

'আপনা আস্বাদে নাম-সঙ্কীর্তনে'

শ্রীচৈতন্যের পূর্বেও ভগবানের নাম-কীর্তনের রীতি প্রচলিত ছিল। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখি—শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

(ভাঃ ৭।৫।২৩)

নারদীয় ভক্তিসূত্রে—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ (বৃহন্নারদীয়বচন ৩৮।১২৬)

(চৈঃ চঃ আদি ৭ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত)

—'কলিযুগে একমাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম, ইহা ভিন্ন আর গতি নাই, নাই, নাই।'

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

(শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাশ্লোক) পদ্যাবলী (রূপগোস্বামী) ৩২

(চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত)

—'তৃণ হইতেও অতিশয় নীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, এবং স্বয়ং মানাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া অন্যের মান দানপূর্বক শ্রীহরির কীর্তন করিবে।'

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে লেখা তামিলবেদ আড়বারদের ভক্তিশাস্ত্রে নাম-গ্রহণের কথা পাই। মহারাষ্ট্রে সন্ত তুকারামের অভঙ্গগুলিকে কীর্তন বলা হয়।

বিশ্বম্ভরেরর জন্মক্ষণে নবদ্বীপে নাম-কীর্তন হইয়াছিল। "উঠিল মঙ্গল ধ্বনি শ্রীহরি-কীর্তন।"

নিমাই পণ্ডিত পড়ুয়াদের ও ভক্তদের হাততালি দিয়া নামকীর্তন করিতে শিখাইতেন।

'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥'

(চৈঃ চঃ আদি ১৭ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত)[1]

---

১ এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ (শ্রীভাগবত ১১।১।৪০)

নিত্যানন্দ ও হরিদাস মহাপ্রভুর অনুমতি লইয়া নবদ্বীপের পথে পথে সদলে নাম-প্রচার করিতেন। হোসেন সাহের প্রতিনিধি কাজীকে দলনের জন্য তিনি শংখ ঘণ্টা করতাল ও মৃদঙ্গসহ সংকীর্তন দল চালনা করিয়াছিলেন। পুরীধামেও নৃত্য ও সংকীর্তনের ব্যবস্থা দেখি, শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে নাম-প্রচারের ভার দিলেন।

'নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥
আচার্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডাল জনে কর কৃষ্ণভক্তি দান॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ পরিচ্ছেদ)

ভট্টাচার্য কহে তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম-সংকীর্তন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ পরিচ্ছেদ)

বৈষ্ণবমতে নাম-সংকীর্তনে ভগবদ্‌ভক্তির উদয় হয়, 'নামের ফলে কৃষ্ণপদে মন উপজয়'। পালাবন্দিভাবে পদাবলী-কীর্তন বা রসকীর্তন শ্রীচৈতন্যের অনেক পরে আরম্ভ হয়। নরোত্তমের চেষ্টায় 'খেতরীর মহোৎসবে এই লীলাকীর্তন-পদ্ধতি প্রচলিত হয়। পদাবলী-কীর্তনের রীতি বহুদিন পূর্ব হইতে প্রচলিত আছে। চর্যাগীতিপদাবলী, জয়দেবের পদাবলী, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীও সুরে তালে গান করা হইত। সঙ্গীতজ্ঞ নরোত্তমের দ্বারা রীতিটি মার্গ গায়ন-রীতিতে পরিণত হয়।

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপে অবস্থান সময়ে পদ-গানের যে রীতি ছিল তাহা ঠিক পদকীর্তনের মত ছিল না। ইহাকে বৈঠকী রীতি বলিতে পারি। সংকীর্তনের দুই চারিছত্রের পদের গানে শ্রীচৈতন্যের নিজস্ব যে রীতি ছিল তাহা পদাবলী-কীর্তনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। নবদ্বীপে, শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে এবং পুরীতে মুকুন্দ দত্ত, স্বরূপ দামোদর ও বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য ও গীতের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের আনন্দ বিধান করিতেন।[১] সেই রীতিও পদাবলী-কীর্তন রীতিকে প্রভাবিত করিয়া থাকিবে। রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতির সুললিত ভাগবত পাঠের পদ্ধতিও কীর্তন-পদ্ধতিকে প্রভাবিত করিয়াছে—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার

১ কি কহব রে সাখ। আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ)

বলিয়াছেন—'এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ।' শ্রীখণ্ড বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, আবার পদাবলী-কীর্তনের আদি পীঠস্থানও বলা যায়। বৈষ্ণব-পদাবলী ও কীর্তন-গানের ধারা নরোত্তম শ্রীখণ্ড হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দ শেষ হইবার পূর্বেই কৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের পূজা-আরতি ও পর্ব-উৎসব উপলক্ষে শ্রীখণ্ড ও বৃন্দাবনে পদাবলী গানের রূপ নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নরোত্তম সেই রূপকেই সঙ্গীত-বাদ্যে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। এখনো বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকলের শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তনগান হয়, 'অষ্টপ্রহর', 'চব্বিশপ্রহর' ও বৈষ্ণব-উৎসব উপলক্ষে আসরে আনুষ্ঠানিক ভাবে লীলাকীর্তন হইয়া থাকে। এই লীলা-কীর্তনের নানা পদ্ধতি দেখা যায়। নরোত্তমের পূর্বেও পালাবন্দি লীলাকীর্তন ছিল বলিয়া মনে হয়। লীলাকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণ-লীলাকে বিচিত্র পর্যায়ে সাজাইয়া গান করা হয় এবং প্রত্যেক পালার পূর্বে অনুরূপ গৌরলীলা গান করা হয়। ইহাকে 'গৌরচন্দ্রিকা' বলে। মনে করি নরোত্তমই 'গৌরচন্দ্রিকার' পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধ হইতে কীর্তনগান বা রসকীর্তন যাহা আসরে আনুষ্ঠানিকভাবে, বৈষ্ণব-মহোৎসবে অথবা সম্পন্ন ব্যক্তির শ্রাদ্ধবাসরে গীত হইতে থাকে তাহা পদাবলী-সংকলন-গ্রন্থে ও পুথিতে যে পুরাণো ছাঁদে রক্ষিত ছিল তাহা হইতে পদগুলি কিছু ভিন্ন ও পরিবর্ধিত আকার প্রাপ্ত হইল। একই পালায় বিভিন্ন কবির বিভিন্ন পদসমূহের সহিত কাহিনীর যোগসূত্র রাখিবার জন্য গায়ক কিছু কিছু কথা যোগ করিয়া দিতেন। গান করিবার সময় বুঝাইবার জন্য কিছু কিছু কথা 'আখর' ('অক্ষর') যোগ করিয়া তান-বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইতেন। তারপর জয়দেব বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবির পদগুলি ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল সাধারণ শ্রোতার নিকট। সেইজন্য পদাবলীর ব্যাখ্যার দিকে ঝোঁক পড়িল অথচ গান ভঙ্গ করিয়া ব্যাখ্যা চালানো সম্ভব নয়। সুর ও তাল থামিতে না দিয়া এবং ব্যাখ্যা অংশকে যথাসম্ভব (ছড়ার ছন্দে) গাঁথিয়া পদ প্রসারিত করা হইল। এই ভাব-বিস্তারময় মূলপদাতিরিক্ত অংশকে 'ছুট' অথবা 'তুক্' বলে, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে 'তুক্' দেখিতে পাই না তবে কীর্তনীয়াদের খাতা হইতে মুদ্রিত পদাবলীতে দেখা পাই। যেমন 'গোপাল সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল'।

কীর্তনীয়ারা অনেকে সময় বড় তালের সমগ্র পদটি না গাহিয়া বৈচিত্র্য-সৃষ্টির জন্য ছোটতালে (তাল ফেরতা) পদের অংশবিশেষ গাহিয়া থাকেন।

ইহাকেও 'ছুট' বলা চলে, ইহাতে হালকা চালের সুর ব্যবহৃত হয়। গানে 'তুকের' ব্যবহার জয়দেবই আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করি, জয়দেবের সংস্কৃত গানের ধুয়া (ধ্রুবপদ) বড় বিচিত্র। ধুয়ায় পদ-ও আছে ছত্র-ও আছে।

পদ যেমন, "রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসম্।
"স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম্" ॥

ছত্র যেমন, —'জয় জয় দেব হরে'

অথবা, 'যামি হে কমিহ শরণম্ সখীজনবচনবঞ্চিতা'

ঘুরিয়া ফিরিয়া এই জিনিষই বহু পরবর্তী কালে 'তুকে' ও 'আখরে' পরিণত হইয়াছে।

কীর্তনের আসরের সাধারণ রীতি হইল মিলন গাহিয়া পালা শেষ করিতে হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা মহোৎসবাদিতে যেখানে তিন-চারদল কীর্তনীয়া গান করেন সেখানে সকলের পক্ষে মিলন গাহিয়া পালা শেষ করিবার সময় বা সুযোগ থাকে না। তখন তাঁহারা দুই-চার পংক্তি পয়ার বা ত্রিপদী হালকা চালে গাহিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন করাইয়া দেন, এই হালকা চালের অংশকে 'ঝুমুর' 'ঝুমর' বলে। কিন্তু সর্বশেষ গায়ককে মিলন গাহিয়া পালা শেষ করিতে হয়। কীর্তনগানে 'ঝুমুরের' অর্থ অন্যরূপ।

বর্তমানকালে জনসমাজ কীর্তনগানকে শুধু একটা গায়ন-পদ্ধতি বলিয়া ভাবে কিন্তু কীর্তন-পদাবলী আসলে ধর্মসঙ্গীত। সাধারণ লোকে কীর্তনের নানা উপাঙ্গ বুঝিতে সক্ষম নয় বা তাহাদের কৌতূহলও নাই, কীর্তনীয়ারাও আজকাল নিপুণভাবে কীর্তনের সাঙ্গোপাঙ্গ অনুশীলন করেন না। শ্রোতার মনোরঞ্জনের দিকেই তাঁহাদেব লক্ষ্য ভাঙ্গা কীর্তন গাহিয়া। কীর্তনগানের রাগ-রাগিনী, সুর-তাল ও গায়ন-পদ্ধতি অনুশীলন-সাপেক্ষ। ইহা মার্গ-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট শাখা (রীতি) বলিয়া বিবেচিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দে কীর্তনগানের একটি শিথিল রীতি বা লঘুরীতি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই রীতিকে 'ঢপকীর্তন' বলা হয়, ইহাতে বৈঠকী গানের হালকা সুর-তাল-লয় ব্যবহৃত হইত, কীর্তনের মার্গরীতি তেমন অনুসৃত হইত না। পদাবলী-কীর্তনের সঙ্গে দেশি ও বাউল গানের ছাঁদ মিলাইয়া এক নূতন কীর্তন-পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন যশোর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গায়ক মধুসূদন কান। এ পদ্ধতি "ঢপকীর্তন" নামে প্রসিদ্ধ।

পদাবলী-কীর্তনকে যাত্রার ছাঁচেও ঢালা হইল। তাহার নাম 'কৃষ্ণযাত্রা',

পশ্চিমবঙ্গের গোবিন্দ অধিকারী ও মধ্যবঙ্গের কৃষ্ণকমল গোস্বামী কৃষ্ণযাত্রায় প্রথম ও প্রধান গায়ক-কবিদের অগ্রগণ্য।

বিংশ শতাব্দের গোড়ার দিকে মহিলারাই ('কীর্তনওয়ালী') ঢপকীর্তন গাহিতেন। এখনো শ্রাদ্ধবাসরে কোথাও কোথাও ঢপকীর্তনের ব্যবস্থা আছে, আর মেয়েদেরই যেন একচেটিয়া অধিকার। ইহাকে ভাঙ্গাকীর্তন-পদ্ধতি বলা চলে। জনরুচির জন্যই এই রীতির উদ্‌ভব। ইদানীং বিশুদ্ধ কীর্তনরীতির উজ্জীবনের চেষ্টা দেখা যায়। কীর্তনগানকে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের একটি ধারা বলিতে হয়। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহান্ত, ভক্ত ও সাধকদের 'তিরোভাব' উৎসবে এক ধরণের পদাবলী গান করা যায়। এই পদগুলিতে তাঁহাদের জীবন-কথা ও স্মৃতিবন্দনা থাকিত। উহাকে 'সোচক' পদাবলী বলা হয়, শ্রীনিবাস-শিষ্য রাধাবল্লভ চক্রবর্তী কয়েকটি 'শোচক' অর্থাৎ তিরোভূত মহাজনদের স্মারক পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সাধক নরোত্তম 'শোচক' পদ লিখিয়াছেন। অনেকে ইহাকে 'সূচক' বলিয়াছেন।

এখন বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকল হিন্দুর শ্রাদ্ধ-বাসরে কীর্তন গানের ব্যবস্থা আছে। তাঁহার প্রথম প্রবর্তক চৈতন্যদেব বলিয়া মনে করি। নীলাচলে ঠাকুর হরিদাস দেহ ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিলেন, শ্রীচৈতন্য তাঁহার দেহ স্বহস্তে সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। তাহার পর নিজে প্রসাদান্ন ভিক্ষা করিয়া হরিদাসের নির্বাণোৎসব করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে অন্ত্যেষ্টি উৎসব বা 'মচ্ছব' এই হইতেই সুরু। নাম-কীর্তন, কৃষ্ণলীলাকীর্তন ও একত্র প্রসাদভক্ষণ—মহোৎসবের এই তিনটি অঙ্গ।

আর এক প্রকার 'মহোৎসব' আছে তাহার নাম 'দণ্ড-মহোৎসব'। শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটিতে আসিলে রঘুনাথ দাস দেখা করিতে গেলেন। শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—

"নিকটে না আইস্ মোর ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছো দণ্ডিমু তোমারে॥
দধি-চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে"...[১]

ধনীর সন্তান রঘুনাথ তৎক্ষণাৎ প্রচুর চিঁড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ মাটির মালসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নিত্যানন্দ, বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ, ব্রাহ্মণ সন্তান ও সাধারণ লোক একসঙ্গে ভোজনে বসিলেন। তাহার পর সকলকে মালাচন্দন

১ চৈ. চ. অন্ত্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ও দক্ষিণা দেওয়া হইলে নিত্যানন্দ খুশি হইয়া আশীর্বাদ করিলেন। পানিহাটির এই চিঁড়া-দধি মহোৎসব 'দণ্ড-মহোৎসব' নামে খ্যাত। নিত্যানন্দ সস্নেহে রঘুনাথের দণ্ড-বিধান (শাস্তি) দিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম। সপ্তগ্রামের ওই ধনীর পুত্র রঘুনাথ পরে ষড়্গোস্বামীদের অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবচার্য্য হইয়াছিলেন।

রাধাকৃষ্ণ, চৈতন্যনিত্যানন্দ প্রভৃতির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য উপলক্ষেও মহোৎসবের বিধান আছে।

॥ 'পদাবলী সাহিত্যের কাব্যস্বরূপ' ॥

বৈষ্ণব পদাবলী একাধারে কাব্য ও সংগীত। সাধারণ পাঠ্য গীতিকবিতার রস ইহাতে পাওয়া যাইবে। আবার রোমানটিক্ ভাবধারারও সাক্ষাৎ পদাবলী-সাহিত্যে মিলে, আবার অতীন্দ্রিয় ভাবরস বা মিষ্টিক্তত্ত্বের কথাও আছে পদাবলীতে। লিরিসিজম্ (গীতিধর্মিতা), রোম্যান্টিসিজ্ম্ (রোম্যান্টিকতা) ক্ল্যাসিসিজ্ম্ ও মিষ্টিসিজ্ম্ (রহস্যবাদ) কাহাকে বলে আগে ব্যাখ্যা করি। তাহার পর বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত এইগুলির সম্পর্ক কতখানি বিদ্যমান আলোচনা করিতেছি।

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, 'গীতের যে কাজ যে কবিতা সেই কাজ করে তাহাই গীতি-কবিতা'। অর্থাৎ যে-কবিতা সুরে তালে গাওয়া হয় তাহাই গীতি-কবিতা। ইংরাজি 'লিরিক্' শব্দটি বীণার মত এক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র হইতে আসিয়াছে। কালের প্রভাবে কবিতার গীতাংশটুকু খসিয়া গিয়াছে। সেইজন্য এখন অগেয় বা পাঠ্য গীতিকবিতার প্রচলন হইয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যে পাঠ্য গীতি-কবিতার নিদর্শনই বেশী। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অগেয় গীতিকবিতার সংখ্যাই বেশী। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতাকে সুরে তালে গানও করা হয়। নবীন (আধুনিক) বাংলা সাহিত্যে ইংরাজি গীতি-কবিতার ধরণে রচিত কবিতা বিহারীলালই আরম্ভ করেন। মাইকেল মধুসূদনের লেখার ভিতর গীতি-কবিতার সুর পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা-কার। আধুনিক যুগের গীতি-কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কবির ব্যক্তি-পুরুষের আশা-আকাংক্ষা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির প্রকাশ থাকে তাঁর রচনার মধ্যে। কবিচিত্তের উচ্ছ্বাস, পাঠকচিত্তের সহিত কবির

যোগাযোগ এবং সর্বোপরি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ—এইগুলিই আধুনিক গীতিকবিতার বিশেষত্ব। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য। সমালোচকেরা কবিতাকে দুইভাবে ভাগ করিয়াছেন বস্তুনিষ্ঠ (objective)—(আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য) এবং আত্মগত ভাবপ্রধান (subjective) গীতিকাব্য। মহাকাব্যেও গীতিকবিতার সুর থাকিতে পারে। গীতিকাব্যকার আপন মনের অনুভূতিকে সরসভাবে প্রকাশ করেন।

রোম্যান্টিকতা ('রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌') কাব্যের আর একটি ধর্ম। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রোম্যাণ্টিক্ কবিতার অসদ্ভাব ছিল না। বাণভট্ট প্রভৃতি লেখক তো রোমাণ্টিক্ ছিলেন। তবে ভারতীয় অলংকারিকেরা কাব্যের এই অধুনা-সৃষ্ট নামটি ব্যবহার করেন নাই, তাঁহারা অন্য রীতিতে কাব্য বিচার করিয়াছিলেন, তবে একথা অবশ্য-স্বীকার্য্য যে আধুনিক কাব্যেই ইহার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। 'রোম্যান্টিক্' বা রোম্যান্টিকতা বুঝিতে হইলে ক্ল্যাসিক্ বস্তুটি কি তাহা বোঝা দরকার। 'ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্' সাহিত্যের অন্য আর একটি ধর্ম। ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য হইতেছে অনেকটা 'ভাস্কর্য্যধর্মী'। অটুট স্বাস্থ্য, নিয়মানুবর্তিতা, সৌষম্য, সুসংগতি, সমগ্রতা এবং স্বচ্ছতা ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ। রোম্যান্টিক্ সাহিত্য অনেকটা চিত্রধর্মী। রোম্যান্টিক্ সাহিত্যে সুসংগতি, সমগ্রতা, স্বচ্ছতা ক্ল্যাসিক সাহিত্য হইতে বহুলাংশে কম। রোম্যান্টিকতার সংগে 'বিস্ময়বোধ' (Spirit of wonder) ও 'রহস্যবোধ' অংগাঙ্গিভাবে জড়িত। রহস্যময়তা আমাদের মনে জাগাইয়া তুলে একটি মোহ এবং উদ্রেক করে একটি কৌতূহলের, সেইজন্য রোম্যান্টিক্ সাহিত্য কুহেলিকার আবরণে মণ্ডিত, ইহার অর্ধেক ঢাকা অর্ধেক খোলা—'আধো আলো আধো আঁধার'—যেন চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারা যায় না। অনেকের ধারণা 'ক্ল্যাসিক্ সাহিত্য' রোম্যান্টিক্ সাহিত্যের প্রতিযোগী। কিন্তু সত্যই তাহা নয়। এ্যাবারক্রম্বে বলেন, ক্ল্যাসিক্ সাহিত্যের সংগে রোম্যান্টিক্ সাহিত্যের কোন বিরোধ নাই এবং বিরোধ থাকিতেও পারে না। রোম্যান্টিক্ সাহিত্য ও ক্ল্যাসিক্ সাহিত্য একই সংগে একই স্থানে থাকিতে পারে। মিল্‌টনের প্যারাডাইস্ লস্ট ক্ল্যাসিক্ সাহিত্য হইলেও মাঝে মাঝে অপূর্বভাবে রোম্যান্টিক্ হইয়া পড়িয়াছে। কালিদাসের 'রঘুবংশ' ক্ল্যাসিক্ সাহিত্য, রোম্যান্টিকতার লক্ষণও ইহাতে পাওয়া যাইবে।

মিষ্টিসিজ্‌ম্ (বা রহস্যবাদ) রোমান্টিকতার বিরোধী নহে, উভয়েরই জন্ম

কবির অন্তরে 'মানসলোকে' ; রোমান্টিকতা ও রহস্যবাদের মধ্যে একটা স্তরগত পার্থক্য রহিয়াছে মাত্র। রোমান্টিক্ মনই রহস্যের অতলে গভীর স্তরে পৌছিয়া 'মিষ্টিক্' হইয়া উঠে। আমাদের অন্তরে বুদ্ধি-দীপ্তির বাহিরেও আর একটি দীপ্তি রহিয়াছে। সেই দীপ্তিটি দিবালোকের মত স্পষ্ট ও প্রখর নয়, চন্দ্রলোকের ন্যায় অস্ফুট, স্নিগ্ধ এবং কমনীয়, অথচ এই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোককে ঠিক চিনিয়াও চেনা যায় না। এই স্তর অতিক্রম করিয়া যে কবি একটা অদ্বয় সত্যে উপনীত হইতে পারেন, তখনই সেই কবি মিষ্টিক্ হইয়া পড়েন। 'রহস্যবাদ' কবিকে অপরিচিতি ও রহস্যের আচরণে না রাখিয়া অন্তরে একটা বিশ্বাস আনিয়া দেয় এবং এই বিশ্বাসই কবিকে পৌছাইয়া দেয় একটি অদ্বয় সত্যের নিকটে। মনে রাখিতে হইবে মিষ্টিক্ সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য নহে, ইহা একান্তভাবেই হৃদয়ের সত্য।

কোন সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, 'যাঁহারা তত্ত্বরসিক, তাঁহারা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ বা বুদ্ধিগ্রাহ্য সত্যের চেয়ে অনুভূতিগম্য তত্ত্ববস্তুকেই অধিকতর প্রাধান্য দেন, এইজন্যই ইহাদিগকে অলোকপন্থী বা মরমিয়া কবিও বলা হয়। ইহারা বলেন, মানুষ বোধি বা প্রজ্ঞার (Intuition) দ্বারাই চরম সত্যকে জানিতে পারে। "বিষয়বস্তু অনুসারে মিষ্টিক্ বা অলোকপন্থী কবিগণকে প্রধানত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ প্রধানত প্রকৃতির কবি (বা Nature mystic), কেহ প্রধানত প্রেমের কবি (বা Love mystic), কেহ প্রধানত আধ্যাত্ম-চেতনার কবি (বা Religious mystic), আবার কেহ বা দেহতত্ত্বের কবি (বা Body mystic)। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত রোমান্টিক্ কবি হইলেও তাঁহাকে মিষ্টিক্ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যে শেলীর কাব্যে মিষ্টিসিজ্‌ম্ বা মরমিয়া কবির অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি সাধক-সম্প্রদায় দেহতত্ত্বের কবি। চর্যাগীতি ও দোহাকোষে আধ্যাত্ম-চেতনা মিষ্টিক্ পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতায় রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলার রসঘন প্রকাশ ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব মহাজনকবি কামগন্ধহীন অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের ধ্যানে তন্ময়, একটি অনির্বচনীয় দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়া পরম ও চরম সত্যে পৌছিয়াছেন, এই হিসাবে তাঁহারা মিষ্টিক্ বা অলোকপন্থী হইয়া পড়িয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে বৈষ্ণব সাহিত্যের মিষ্টিসিজম্ অন্তর্নিহিত না

আরোপিত। আমরা যে-ভাবে বৈষ্ণব পদাবলীকে দেখি তাহারই উপর অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিভংগির উপর এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা রূপকাশ্রিত। এই রূপকের আশ্রয়ে পরমাত্মা-জীবাত্মা বা ভগবান-ভক্তের সম্পর্ক বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের সহিত ভক্তের মিলন-জনিত আনন্দ ও তাঁহার বিরহে ভক্তের মর্মবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন, কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন-ঘটিত আনন্দ, এবং কৃষ্ণের বিরহে মর্মবেদনা ও কাতরতা। অথবা সীমার সহিত অসীমের সম্পর্কই বৈষ্ণব কবিতার বিষয়বস্তু। ইহাদের মতে তাহা হইলে ভগবান্ ও ভক্তের সম্পর্ক কৃষ্ণ ও রাধার উপর আরোপিত হইয়াছে। আবার একদল পণ্ডিত বলেন রাধাকৃষ্ণের প্রণয়গীতি আদিতে আধ্যাত্মতত্ত্ববর্জিত আদিরসাত্মক লৌকিক প্রেমগীতি ছিল, ক্রমে ক্রমে ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রবেশ ঘটিয়াছে এবং চৈতন্যোত্তরযুগে একেবারে অপ্রাকৃত প্রেমলীলায় পরিণত হইয়াছে। উভয়মতেই বৈষ্ণব পদাবলীর রহস্যবাদ বা মিষ্টিসিজ্‌ম্ আরোপিত, অন্তর্নিহিত নহে। কিন্তু এই মত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদাবলীর সম্বন্ধে এইমত কিছুটা খাটিলেও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে একেবারেই প্রযোজ্য নহে। চৈতন্যোত্তর যুগে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তারা 'সখীভাব' বা মঞ্জরী-অনুগ সাধনা অবলম্বন করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলারস আস্বাদন করিয়াছেন ও সেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্ত বৈষ্ণব মহাজনদের তত্ত্বদৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে। ভক্ত জীবনের পরম ও চরম কামনা হইতেছে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলার আস্বাদন। তাহা হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীকে যদিই বা মিষ্টিক্ বলিতে হয়, তবে সে মিষ্টিসিজ্‌ম্ পদাবলীর অন্তর্নিহিত, বাহির হইতে আরোপিত নহে। বৈষ্ণব পদসাহিত্য হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। তবে ঠিক অলোকপন্থী বা মরমিয়া বলিতে যে শ্রেণীর কবিকে বুঝি (যেমন, বাংলার বাউল, আউল প্রভৃতি), বৈষ্ণব কবিগণ যে ধরণের মিষ্টিক্ নহেন।

এখন আমাদের কাছে সাধারণ গীতিকাব্য বলিয়াই বৈষ্ণব পদাবলীর আদর। যদিও বৈষ্ণব পদাবলীতে বিষয়-বস্তুর ভার নাই, গল্পরসও কিছু নাই, তবু ইহাতে ভাবের যে আবেগ ও গভীরতা বর্তমান তাহা মানুষের অন্তরে সর্বদা যে মৌলিক স্নেহ-প্রেম-সখ্যের ভাব জাগরূক—পুত্রের প্রতি মাতার

ব্যাকুল স্নেহ, সখার প্রতি সখার অগাধ প্রীতি, প্রণয়ীর প্রতি প্রণয়িনীর দুর্নিবার আকর্ষণ ইত্যাদি—তাহাতে ঝংকার তোলে। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের বিরহে যশোদার যে স্নেহ-ব্যাকুলতা অথবা শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসে শচীদেবীর যে প্রগাঢ় বেদনা, তাহাতে সৃষ্টির আদিমকাল হইতে শিশুপুত্রের জন্য মানবমাতা যে আর্তি-ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া আসিতেছে তাহাই যেন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্যরস সর্বমানবীয়।[১] উপরি-উক্ত তত্ত্বগুলি বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে কতটুকু প্রযোজ্য, তাহা আলোচনা করিয়া দেখি—

বাঙ্গালার বৈষ্ণব-পদাবলী কবিতা ও সংগীত। সাধারণ গানের মত বাক্যজালময় ছন্দোময়ী রচনা ও সুরের বাহক নয়, ইহাতে সুর ও কথার সমান মাধুর্য। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিটি পদের শীর্ষদেশে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। আবার পাঠ্য গীতিকবিতার কাব্যরসও প্রচুর পরিমাণে ইহাতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-কবিতা বৈষ্ণব সাধনার অঙ্গ, ইহাতে যে রসই থাকুক না কেন ইহার মূল সুর ভক্তির। বৈষ্ণবতা বাদ দিয়া বৈষ্ণবকবিতা হয় না। ইহাতে ভক্তিরস ও কাব্যরস দুইই আছে। সাধারণ গীতিকবিতার সহিত এইখানেই ইহার পার্থক্য। প্রাচীনকালে গীতিকবিতার আশ্রয়েই ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইত। বেদের সূক্তগুলি ও পুরাণের স্তোত্রগুলিতো গীতিকবিতা। চর্যাগীতিও সহজিয়া সাধনার অঙ্গ, আবার এইগুলিতে কাব্যরসেরও প্রচুর প্রকাশ দেখি। পদাবলীতে প্রাচীন গীতিকবিতার ধারাই অনুসৃত হইতে দেখি। অশ্বঘোষ ও কালিদাসের কাব্যে গীতিকবিতার সুর স্পষ্ট। 'মেঘদূত'কে সেকালের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা বলিতে পারি। প্রাকৃতে লেখা 'গাথাসপ্তশতী'তে গীতিকবিতার রস মিলে।

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' প্রভৃতি সংস্কৃত-প্রাকৃত-প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহ-পুস্তকে অজস্র গীতিকবিতার সন্ধান মিলে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' গীতিসুর ঝংকৃত। বৈষ্ণব কবিতা পূর্বতন এই ধারারই ক্রম-পরিণতি। বিদ্যাপতির কবিতার কথাও বলা উচিত। সংস্কৃত-প্রাকৃতে রচিত প্রকীর্ণ কবিতার বাক্‌পরিমিতি অলংকরণ প্রভৃতি রিক্থস্বরূপ বৈষ্ণব কবিতা লাভ করিয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের কাহিনী—ডঃ সুকুমার সেন।

কালগত পরিণতি বৈষ্ণব গীতিকাব্যে খানিকটা রহিয়াছে। এই পরিণতি বেশী লক্ষ্য হয় অলংকারে ও ইমেজে। বৈষ্ণব গীতিকবিতার বাক্‌পরিমিতি ও ভাষানৈপুণ্য সংস্কৃত কবিতার সূত্রেই লভ্য। এই বাক্-শিল্প সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যে অন্যত্র দেখা যায় নাই।” আবার, “বৈষ্ণবকবিতা অর্থ যেটুকু প্রকাশ করে তাহার তুলনায় দ্যোতনা করে অনেক বেশী।” চণ্ডীদাসের পদে দেখি, তিনি যদি এক ছত্র লেখেন, পাঠককে দিয়া তিন ছত্র ভাবাইয়া লন। অর্থের এই ব্যঞ্জনা-শক্তি সংস্কৃত কবিদের কাছ হইতে আসিয়াছে। আধুনিক লিরিকের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহা আবেগপ্রধান ও গাঢ়বন্ধ। বৈষ্ণবগীতিতেও মানব হৃদয়ের অফুরন্ত প্রেমানুভূতির রসঘন প্রকাশ দেখি।

বর্তমান কালের কেহ কেহ বৈষ্ণব পদাবলীকে বিশুদ্ধ লিরিকের মত বিচার করিয়াছেন ও রসসম্ভোগ করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, “বৈষ্ণবধর্ম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য। বৈষ্ণবধর্মকে বাদ দিয়া এ সাহিত্যের বিচার চলে না।” আধুনিক লিরিক কবিতায় ধর্মের সংশ্রব নাই, যাহা আছে তাহা বিশুদ্ধ কাব্যরস। পদাবলীতে ভক্তিরস মুখ্য, কাব্যরস গৌণ।

আধুনিক গীতিকবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে কবিচেতনা বা কবির ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিই বর্তমান গীতি-কবিতার প্রাণ। কবির ‘অস্মিতা’ বা ‘অহংবোধই’ কবিতায় বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-মানসের প্রকাশ আধুনিক কালের ব্যাপার, বৈষ্ণব-পদাবলীতে না থাকিবার কথা। প্রাচীন গীতি-কবিতাতেও কবির নিজের মনের কথা বেশী নাই। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদের ‘ভণিতায়’, প্রার্থনা-সংগীতে ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে ভক্তকবির ধর্ম-জীবনের আশা-নিরাশা ব্যক্ত হইরাছে, তাহাতে মর্ত্যবাসনার কথা নাই বা কবির ‘অহংবোধের’ কথাও নাই। অহংবোধকে বিসর্জন না দিলে তো প্রকৃত বৈষ্ণব ভক্ত হওয়া যায় না বা ইষ্টদেব কৃষ্ণের লীলাও দর্শন করার অধিকার জন্মে না। বৈষ্ণব কবিগণতো রাধাকৃষ্ণলীলায় সখী বা মঞ্জরীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-গীতিকায় নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস পাই, কিন্তু কবিচিত্তের কথা নাই। কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠক-চিত্তের মধ্যে অন্তরের যোগাযোগের অভাব। পাশ্চাত্যদেশের আধুনিক গীতিকবির মত বাংলা আধুনিক গীতিকবিতা ‘অহংতন্ত্রী’, এই অহং বস্তুজগতকে বিচিত্রভাবে তিরস্কৃত করিয়া অভিনব ভাব-জগতে পরিবর্তিত করে—

"যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে ॥" (ধ্বন্যালোক, ৩য় উদ্দ্যোত)

"যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে,
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"—রবীন্দ্রনাথ

বৈষ্ণব-কবিতাতে দৃশ্য-গন্ধ-গান আছে, কিন্তু উদ্দীপন-বিভাবরূপে। আধুনিক কবির বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের ইহাই আলম্বন-বিভাব।

"ক্রোড়ে মিলল ব্রজদুলালী
পড়ু মুরলী খসিয়া।
কুসুম পুঞ্জ নবীন কুঞ্জে
গাওত কোকিলা রসিয়া ॥"—জগদানন্দ।[১]

এখানে রাধাকৃষ্ণের মিলনের উদ্দীপন বিভাব হিসাবে 'প্রকৃতি' উপস্থাপিত। ভাবের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে বৈষ্ণব কবিগণ ছিলেন অগ্রগণ্য। রায়শেখরের এই পদটিতে—

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই ॥[২]

নিবিড় বর্ষার একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির "মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী—ফাটি যাওত ছাতিয়া," পদটিতেও বর্ষার চিত্র মিলে। প্রাচীন কালের গীতিকবিতার লক্ষণ বৈষ্ণব পদাবলীতে পাই, ইহাতে গীতি-ধর্মিতা আছে তবে আধুনিক গীতি-কবিতার সব লক্ষণ ইহাতে নাই। "ভাবের ঐকান্তিকতা, হৃদয়বৃত্তির অকৃত্রিমতা, প্রকাশরীতির স্বচ্ছতা ও গাঢ়তা—উচ্চকোটির গীতিকাব্যের এই কয়টি বিশিষ্ট লক্ষণ বাঙ্গালা বৈষ্ণব গীতিকবিতায় আছে।" বৈষ্ণব কবিদের অনুভূতি ব্যক্তিগত নয়, গোষ্ঠীগত। বিশেষ সাধন-প্রণালীজাত আধ্যাত্ম অনুভূতিই বৈষ্ণব গীতিকবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরানো বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক্ কাব্য। ইহাতে রোমান্টিক কল্পনা ও বাস্তব আবেগের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকল শ্রেণীর পাঠক ইহাতে আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই ধর্মাতিশায়ী উৎকর্ষের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

---

১ বৈঃ পঃ ৮৭০ পৃঃ। ২ বৈঃ পঃ ৩০৩ পৃঃ।

"মনে পড়ে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর দুটি ছল ছল নলিন নয়ন।"—রবীন্দ্রনাথ[১]

"এ গীত উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে।
দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান—দূর হতে তাই শুনে
তরুণ বসন্ত যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি উঠে—শুনি সেই স্বর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা।" (রবীন্দ্রনাথ—বৈষ্ণব কবিতা।)

বৈষ্ণব গীতিকাব্য বৈষ্ণব-সাধনার অঙ্গ, বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শন ইহার প্রধান কথা। ভক্তকবি রসপূর্ণ ভাষায় তত্ত্বকথাটি প্রকাশ করিয়াছেন। রোমাণ্টিক্ কবিতা মর্ত্যবাসনাকেই অত্যুজ্জ্বল কল্পনা, আবেগ-আর্তির সাহায্যে প্রকাশ করে। বৈষ্ণব কবিগণও অধ্যাত্ম-সাধনার অনুভূতিকে মর্ত্যরসে সিঞ্চিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই রোমাণ্টিকতার জন্যই বৈষ্ণব কবিতা সম্প্রদায়বিশেষের ভজন-সঙ্গীত না হইয়া সর্বসাধারণের উপাদেয় কাব্যে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন সংস্কৃত-প্রাকৃত-সাহিত্যে নরনারীর প্রেম-বিরহ-মিলন প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া বহু কবিতা ও কাব্য রচিত হইয়াছে। এই সমস্ত কবিতাতে বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বই মনোহর কল্পনার তুলিতে চিত্রিত হইয়াছে। হালের 'গাথা-সপ্তশতী'তে বাস্তব কামনাকে সূক্ষ্ম অথচ মনোরম কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। কবিতাগুলির গীতিমাধুর্য যেন সংস্কৃত কবিতাকেও হার মানায়। যেমন,

"ধণ্ণা তা মহিলাও জা দইঅং সিবিণএ বি পেচ্ছন্তি।
ণিদ্দ ব্বিঅ তেণ বিণা ণ এই কা পেচ্ছএ সিবিণং॥"

—গাথাসপ্তশতী ৪।৯৭

১ বৈঃ পঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে উদ্ধৃত।

—যাহারা দয়িতজনকে স্বপ্নেও দর্শন করে সেই মহিলারা ধন্য। তাহার বিরহে আমার নিদ্রাই আসে না, কে স্বপ্ন দেখিবে ?

'প্রাকৃত-পৈঙ্গলে' উদ্ধৃত কোন কোন কবিতাতেও 'বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাস' যেন ঘনীভূত হইয়াছে। যেমন,

"কাঅ হুউ দুর্বল তেজ্জি গরাস
খণে খণে জাণিঅ অচ্ছ ণিসাস।
কুহূ রব তার দুরন্ত বসন্ত
ণিদ্দঅ কাম কি নিদ্দঅ কন্ত॥"

—'কায়া হইল দুর্বল, আহার ত্যক্ত, ক্ষণে ক্ষণে জানা যায় নিঃশ্বাস আছে। কুহুরব তীব্র, বসন্তও দুরন্ত। কাম নির্দয় কি কান্ত নির্দয় [বুঝিনা]।'

সংস্কৃত-প্রাকৃত শ্লোক-সংগ্রহে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বহু কবিতা আছে। সেগুলিও সাধারণ পার্থিব প্রেম-কবিতার ধারা অনুসরণ করিয়া লেখা হইয়াছে। রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে ধৃত পার্থিব প্রেম-কবিতাকেও রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার আশ্রয়ে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। জয়দেব ও বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে ভক্তিরস থাকিলেও তাহার পশ্চাতে একটি রোমান্টিক্ সৌন্দর্যলুব্ধ কবিমন ছিল।

এই সমস্ত পূর্বতন সংস্কৃত-প্রাকৃত-কবিতার আদর্শে জয়দেব-বিদ্যাপতির প্রভাবে বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও আবেগ-আর্তি যে রীতিতে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাকে রোমান্টিক্-আশ্রয়ী বলিতে হয়। বৈষ্ণব গীতিকাব্যের ছন্দঃকৌশল, শব্দ-যোজনা, অলংকরণ ও আবেগের নিবিড়তা প্রভৃতি রোমান্টিকতার চিহ্ন। প্রেমের অতি সূক্ষ্ম এবং রসঘন প্রকাশ পদাবলীতেই দেখা যায়। কবিগণ অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়লীলার বর্ণনায় মর্ত্যপ্রেমের কথা একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি বিলাস-কলা-কুতূহলী কবি, কিন্তু ভাব-সম্মেলন ও মাথুরের পদে তিনি শ্রীরাধিকার রূপকে আশ্রয় করিয়া অরূপে পৌছিয়াছেন—

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।

আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
অব মঝু যব পিয়াসঙ্গ হোয়ত
তবহি মানছু নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা ॥”

(‘বিদ্যাপতি’—বৈ. প. পৃঃ ১৩০)

“রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥”

(জ্ঞানদাস—বৈঃ পঃ পৃঃ ৪০০)

সংস্কৃত সাহিত্যে উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা থাকিলেও ‘মাথুরের’ কবিতাগুলিতে যে বিরহের আর্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তুলনা নাই। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-গীতিকায় ভক্তিরসের সহিত মর্ত্যজীবনরস যেন মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। ধারাবাহিকভাবে রাধাকৃষ্ণপদাবলী রচিত হওয়ায় একটি কাহিনীসূত্র অনুসরণ করা যায়। ইহাতে পদাবলী আস্বাদনে আরও সুবিধা হইয়াছে।

“সজনী ভল কএ পেউন ন ভেল।
মেঘমালা সঁয় তড়িতলতা জনু
হিরদয়ে সেল দঈ গেল ॥—বিদ্যাপতি। (বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৭)

“সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।”—কবিবল্লভ।[১]

(বৈঃ পঃ পৃঃ ১০৫৬)

---

১ পদটি বিদ্যাপতির নামেও প্রচলিত।

রোমান্টিক্ কবিতার মত বৈষ্ণব পদাবলীতেও একটা বিষাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের মিলনেও বিচ্ছেদের সুর শোনা যায়। যেমন,—

এমন পিরীত কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥"—চণ্ডীদাস।

(বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৫)

"এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি ছুটে॥"—চণ্ডীদাস

(বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৯)

পরিপূর্ণ মিলনেও যেন 'হারাই হারাই' ভাব।

কোন কোন সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, 'বৈষ্ণব-কবিতা' নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য—"মাধব তুহুঁ কৈছে কহবি মোয়"—"মাধব, বল আমাকে, তুমি কে এবং কেমন। কেননা তুমি তো আমার কাছে দুর্জ্জেয় বলিয়া মনে হইতেছ। তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও চিনিতে পারিলাম না।" পদাবলীর সুর এই ভাবে জানা জগৎ হইতে যাত্রা করিয়া অজানার পথে উধাও হইয়াছে। যেমন,

"বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্য পথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার। যুগ যুগান্তর
চিরদিন পৃথিবীতে যুবক যুবতী
নরনারী এমন চঞ্চল মতিগতি।"

(রবীন্দ্রনাথ—বৈষ্ণব কবিতা)

বৈষ্ণব সাহিত্যে অতীন্দ্রিয় ভাবরস ও মিষ্টিক্তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই গীতি-কবিতার মধ্য দিয়া মিষ্টিক্-তত্ত্ব প্রকাশ করিবার রীতি ছিল। বেদের কবি ছিলেন অধ্যাত্ম-জ্ঞানী, তাই হেঁয়ালী কবিতার মধ্য

দিয়া অধ্যাত্মচিন্তার প্রকাশ প্রাচীন ও অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে অপরিচিত নয়। উপনিষদের আরম্ভ শ্লোকটি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি।

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

—'উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণিত অভিব্যক্ত। পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।'

অবহট্‌ঠে রচিত অধ্যাত্মরসপুর কতকগুলি ছড়া-গান দেখা যায়। সত্য ও গভীর কথা অতিশয় সহজ সরল বেশে প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন,

এসো জপহোমে মণ্ডল-কম্মে
অণুদিণ অচ্ছসি কাহিউ ধম্মে।
তো বিণু তরুণি নিরন্তর ণেহেঁ
বোধি কি লব্ ভই এণ-বি দেঁহে ॥" (কাণ্হপাদ)

(প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত দোহাকোষ)

—"এইরূপ হোম-মণ্ডল-কর্মরূপ বাহ্য ধর্মে কেন অনুদিন (লিপ্ত) আছিস। তোর নিরন্তর স্নেহ বিনা, হে তরুণি, এই দেহে কি বোধি লাভ হয়।" এখানে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে কবিকল্পনার রূপক-উৎপ্রেক্ষায় মুড়িয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

পণ্ডিঅলোঅ খমহু মহু
এথু ণ কিঅই বিঅপ্প্।
জো গুরুবঅণেঁ মই সুঅউ
তহি কিং কহমি সুগোপ্প্ ॥
কমলকুলিস বেবি মজ্ঝঠিউ
জো সো সুরঅবিলাস
কো তহি রমই ণ তিহুঅণে
কস্‌স ণ পূরই আস ॥"[১] (সরহ)

—"পণ্ডিতেরা আমাকে ক্ষমা করুন। এখানে বিকল্প চলে না। গুরুবাক্যে যাহা আমি শুনিয়াছি তাহা সুগোপ্য কি করিয়া বলি। কমল-কুলিশের মধ্যস্থিত সেই যে সুরতবিলাস, কে তাহাতে না মজে। ত্রিভুবনে কাহার আশা পূর্ণ না হয়।"

১ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত দোহাকোষ পৃঃ ৩৮।

মিষ্টিক্ কবিতা হিসাবে এবং পরবর্তী কালের বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসের পক্ষে সরহের এই উক্তি গুরুত্বপূর্ণ।

চর্যাগীতি-পদাবলীতে সহজ কথায় গভীর অধ্যাত্মসত্যের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। যেমন,

জো মণ গোঅর আলা-জালা
আগম পোথী ইষ্টামালা।
ভণ হইসে সহজ বোলবা জায়
কাঅবাক্‌চিঅ জসু ন সমায়।
আলে গুরু উএসই সীস
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস।
জেতই বোলী তেতবি টাল
গুরু বোব সে সীসা কাল।
ভণই কাহ্নু জিণ-রঅণ কি কইসা
কালে বোব সংবোহিঅ জইসা॥" (৪০ সংখ্যক চর্যা)

—'যাহা মনগোচর (তাহা) তুচ্ছ—আগম, পুথি, ইষ্ট (জপ) মালা। বল কিসে সেই সহজ বলা যায়, যাহাতে কায়-বাক্-চিত্ত প্রবেশ করিতে পারে না। বৃথাই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেয়। বাক্‌পথাতীত কিসে কহা যায়! যাহারা যতই বলে তাহারা ততই ভুল করে। গুরু বোবা শিষ্য কালা। কাহ্নু বলে, জিনরত্ন কেমন, না যেমন কালা দ্বারা বোবা সংবোধিত হয়।'

পরবর্তী কালের সহজিয়া বৈষ্ণবদের মিষ্টিক্ (রাগাত্মিকা) পদাবলী এই ধারার ক্রমপরিণতি। যেমন,

"মৃত্তিকার উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পিরীতি বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ।"

কিংবা—

"গোপন পিরীতি গোপন রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ॥
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে ত রসিকরাজ॥"

অথবা "মাটির জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাষ।
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস॥"

পদগুলি সহজিয়া চণ্ডীদাসের নামেই প্রচলিত আছে।

বৈষ্ণবাচার্য নরোত্তমও কতকগুলি রাগাত্মিকা পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে—

"সখি পিরিতি আখর তিন জপহ রজনি দিন।
পিরিতি না জানে যারা কাষ্ঠের পুতলি তারা।
পিরিত জানিল যে অমর হইল সে।
পিরিতে জনম যার কে বুঝে মহিমা তার।
যে জনা পিরিতি জানে বেদবিধি সে কি মানে।
পিরিতি বেদের পর হৃদয়ে তাহারি ঘর।
ভজন পূজন যত পিরিতি বিহনে হত।
পিরিতি করহ আশ কহে নরোত্তম দাস॥"

বৈষ্ণব সাহিত্যের রাগাত্মিকা পদগুলির কথা বাদ দিলেও অন্যান্য পদেও মিষ্টিক্ বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রকাশ দেখা যায়। সাধক কবি এখানে রহস্যবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। বাক্‌পথাতীত অধ্যাত্ম-চেতনাকে কবি-কর্মের দ্বারা ব্যক্ত করা তো সোজা কথা নয়। বৈষ্ণব-সাধনতত্ত্ব অনুভূতিগম্য, লোকোত্তর রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলাকে প্রকাশ করার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন। ভক্তকবি সেই অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী। পদাবলীর 'আত্মনিবেদন' পর্য্যায়ের পদগুলিতে বৈষ্ণব কবিগণ একটি অদ্বয়সত্যের দ্বারে উপনীত হইয়াছেন।

জ্ঞানদাস—

শুন শুন হে পরাণপিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি
আর না দিব ছাড়িয়া॥
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥[১]

১ বৈঃ পঃ পৃঃ ৪৫৩

বৈষ্ণব কবিরা কামগন্ধহীন অপ্রাকৃত প্রেমের নিগূঢ় অনুভূতি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, এই উপলব্ধির চরম মুহূর্তেই সাধক কবি হইয়া উঠিয়াছেন মিষ্টিক্। বিদ্যাপতির পদে দেখি রাধা কৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে নিজেই মাধবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন—

"অনুখণ মাধব মাধব সুমরই
সুন্দরী ভেলি মাধাই।"—বিদ্যাপতি।[১]

আর কবি বলরামদাসের পদে প্রেমের অত্যাশ্চর্য্য অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে—

"(তোমায়) হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির॥" (বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৫৯)

গোবিন্দদাস কবিরাজের বর্ষাভিসার পদে মিষ্টিক্ অনুভূতির চমৎকার প্রকাশ ঘটিয়াছে।

"সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥" (বৈঃ পঃ পৃঃ ৬১৩)

চণ্ডীদাসের পদেও অনুরূপ অনুভূতি পাই—

"পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে।" (বৈঃ পঃ পৃঃ ৬৮)

প্রেমানুরক্ত মিষ্টিক্ সাধনা অন্যত্রও দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার-সম্প্রদায় স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে ভগবানকে দয়িত ও নিজেদের প্রেমিকরূপে সাধন ভজন করিয়াছেন। ইরানের সুফী ভক্তগণ প্রেমের আবেশে নিজেদের প্রেমী ও ভগবানকে 'প্রেমিকা' বলিয়াছেন। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্তগণ ভগবানকে দয়িতরূপে ভজনা করিয়াছেন। সাধিকা মীরাবাঈ কৃষ্ণকে প্রিয়-দয়িতরূপে ভজনা করিয়াছেন—"মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর।" ইহারা ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ককে প্রেমিক-প্রেমিকার রূপকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম-ভক্তির সহিত ইহাদের প্রেমানুরক্ত-সাধনার মৌলিক পার্থক্য আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলায় সখী বা মঞ্জরীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়াছেন। তাঁহারা লীলাসহচর, নিজেরা

১ মিত্র মজুমদার সম্পাদিত—বিদ্যাপতি, পদসংখ্যা—৭৫১

ভগবানের প্রেমিকা হইবার ইচ্ছা করেন নাই। এ সম্পর্কে সমালোচক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতটি প্রণিধানযোগ্য—"গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্বতন প্রাকৃত প্রেমকবিতাই উজ্জ্বলরসের মন্ত্রে পরিশুদ্ধ হইয়া একাধারে আদি ও ভক্তিরসের সমন্বয়ী রূপ ধারণ করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ যেমন প্রশংসনীয় কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তেমনি একটি বিশেষমণ্ডলেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাজেই রাধাকে তাঁহারা তিল তিল করিয়া মর্ত্যসৌন্দর্যের দ্বারাই সাজাইয়াছেন, বৃষভানুসুতার হৃদয়ে মর্ত্যকামনাই ভরিয়া দিয়াছেন, রসতীর্থের এই 'প্রৌঢ়া পারাবতী'র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে মর্ত্যের উত্তাপই সঞ্চারিত করিয়াছেন, এবং করিয়াছেন বলিয়াই বৈষ্ণব পদাবলী নিছক ভজন-সাধনের ধর্মগীতিকায় পরিণত হয় নাই—ইহা সর্বোপরি শিল্পের রূপ লাভ করিয়া সৌন্দর্য ও আবেগের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

"বৈষ্ণব পদাবলী শুধু মর্ত্যবাসনার কাব্য নহে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় রসতত্ত্ব, সাধনপ্রণালী এ কবিতার মর্ত্যপ্রেমের রক্তিমাকে গৈরিক রেণুরঞ্জিত করিয়াছে। তাই বলিয়া তাহা পুরাপুরি বৈরাগ্যধর্মী ভক্তি-সাধনার ব্রহ্মসূত্রে পরিণত হয় নাই। মর্ত্যকামনাকে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মতর করিয়া আদিরসকে আবেগের ভিয়ানে চাপাইয়া ধীরে ধীরে ইহাকে উজ্জ্বলরসে পরিণত করার বিচিত্র প্রণালী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনা ও সাহিত্যের মর্মকেন্দ্র। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে চৈতন্যযুগের পদসাহিত্যকে শুধু রোমাণ্টিক ও 'সেক্যুলার' বলা চলিবে না, আবার আবেগ-উত্তাপহীন সুকঠোর যতিধর্মও ইহার মূল প্রেরণা নহে। রোমাণ্টিক্ চেতনার বিস্ময়রস (Spirit of wonder) এবং ভক্তিকাব্যের আত্যন্তিক আত্মসমর্পণ এই দুইটি রূপ বৈষ্ণবপদাবলীতে মিলিত হইয়াছে।

"বৈষ্ণব গীতিকার যেমন একটি আধ্যাত্মিক আবেদন আছে তেমনি একটি সার্বকালিক মানবিক আবেদনও আছে। বাস্তবিকই বৈষ্ণব কবিতা স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছে। সীমা ও অসীমের মিলন সাধিত হইয়াছে।"

(ক) প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলী

পদাবলী গানের কিভাবে এবং কোথায় উৎপত্তি হইল সঠিক বলা যায় না, তবে তার প্রথম বিকাশ দেখি লক্ষ্মণসেনের রাজসভায়। লক্ষ্মণসেনদেব নিজে

এবং তাঁহার পুত্র কেশবসেনদেবও তাঁহার সভাকবিবৃন্দ ভক্তিরসাশ্রিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কিছু কিছু সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোক ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের দরবার হইতে মিথিলার রাজদরবারে পদাবলীর অনুশীলন হইয়াছিল। উমাপতির 'পারিজাত-হরণ' নাটকের মৈথিল গান ও বিদ্যাপতির পদাবলী তাঁহার সাক্ষ্য দেয়। পাঠান আমলে আবার গৌড়ের রাজদরবারে বিশেষ করিয়া হুসেন শাহার রাজকর্মচারী সনাতন-রূপের অধিনায়কতায়, তাহা হইতে ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রত্যন্ত রাজসভায় পদাবলীর বিশেষ করিয়া ব্রজবুলি ভাষায় লেখা গানের প্রচার ও প্রসার ষোড়শ শতাব্দের প্রথম দশক শেষ হইবার পূর্বেই ঘটিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে তাঁহার ভক্তবৃন্দের দ্বারা পদাবলীর অপূর্ব পুষ্টি সাধিত হইল। চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ ভক্তের শিষ্য-অনুশিষ্যের দ্বারা বিশেষ করিয়া শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ও খেতরির নরোত্তমের দ্বারা পদাবলী-বিধান বা রসকীর্তন সৃষ্ট হওয়ায় পদাবলী অধ্যাত্ম ও লৌকিক উভয় রসেরই আধাররূপে পরিণত হইল। রঘুনন্দন করিয়াছিলেন বিগ্রহ-উপাসনার অঙ্গরূপে পদাবলী-বিধান আর নরোত্তম মহোৎসবের অঙ্গরূপে। বাঙ্গালার রাজসভা ও শিক্ষিত জমিদারেরা পদাবলীর চর্চা ও কীর্তনগানের সাহায্য করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণব ভক্তরাই এই কাজে অগ্রণী ছিলেন, সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব সাধন-ভজনের অঙ্গরূপে পদাবলীর ব্যবহার পূর্বে দেখা যায় নাই।

বলিতে গেলে জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দের' পদগুলি লইয়াই বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর আরম্ভ। জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু সে সংস্কৃত-রচনার রীতি লৌকিক সাহিত্য (প্রাকৃত-অপভ্রংশ) হইতে নেওয়া। মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরিকর ভক্তবৃন্দ ভাবের অনুরূপ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ গাহিতেন। তিনি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও জয়দেবের পদ অন্তরঙ্গ ভক্তজনের সহিত আস্বাদ করিতেন। বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন চৈতন্যদেবের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। ইনিই পদাবলীর চণ্ডীদাস কিনা বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের প্রথমাংশ গাঢ় আদিরসাত্মক। এই পদ চৈতন্যদেব আস্বাদ করিতেন বলিয়া মনে হয় না। অন্তরের ভক্তি, আর্তি ও আত্মনিবেদন বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা-বিরহের কোন অংশ পদাবলীর মাথুর বা আক্ষেপানুরাগের সংগে সমমর্যাদা পাইতে পারে।

১॥ কি মোর যৌবন ধনে জ বড়ায়ি
কি মোর বসতী আশে।

আন পানী মোকো একো না ভাএ
কি মোর জীবন আশে ॥
মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ুচণ্ডীদাসে ॥

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহ খণ্ড)

এই সুরের সহিত পদাবলীর রাধাবিরহের সুরের কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। তবে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের রাধা প্রধানত মানবী। এই রাধা-চন্দ্রাবলীর বিরহবেদনা বাস্তব নারীর প্রেমযন্ত্রণাকেই তীব্র করিয়াছে আর পদাবলীর রাধার বিরহের পদে বাস্তবাতীত বেদনাই প্রকাশ পাইয়াছে।[১] চৈতন্য-পূর্ববর্তী পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদ—

(সিন্ধুড়া)

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নতারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে
কি কহে দু হাত তুলি ॥
একদিঠি করি ময়ুর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥[২]

---

১ সেজন্য কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন—
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যেখানে সমাপ্তি, চৈতন্যযুগের পদাবলী সেখান থেকে আরম্ভ'।
২ বৈঃ পঃ পৃঃ ৪৪

মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' ভাগবত পুরাণকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও তাহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর সুরের আভাস পাওয়া যাইবে। মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-লীলাকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

(ভবন্ বিরহ—গোপীবিলাপ)

১ ॥ আজি শূন্য হইল মোর গোকুল নগরী।
গোকুলের রত্ন কৃষ্ণ যায় মধুপুরী ॥
আজি শূন্য হইল মোর রসের বৃন্দাবন।
শিশু সঙ্গে কেবা আর রাখিবে গোধন ॥
... ...
আর না যাইব সখী চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে।
আর না দেখিব সখী সে চান্দ বদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন ॥

২ ॥ কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কি বা কাজ।
কৃষ্ণের সঙ্গেতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥
অল্পধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥

(মালাধর বসু 'গুনরাজ খান' বৈঃ পঃ পৃঃ ১৩৩)

চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের আর একজন কবি যশোরাজ-খান। ভণিতায় হুসেন শাহার নাম আছে। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতে ফিরিবার সময় হইয়াছে। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার আগ্রহ পদটিতে প্রকাশিত। ব্যস্ততা এতটাই যে বেশভূষা সম্পূর্ণ করিবারও সময় নাই। নিম্নোক্ত পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের 'মাধুর্য্যলীলা' প্রকাশিত হইয়াছে। এটি বোধহয় বাঙ্গালা দেশে লেখা প্রাচীনতম প্রাপ্ত ব্রজবুলি পদ।

(উন্মত্ত অভিসারিকা)

এক পয়োধর চন্দন লেপিত
আরে সহজই গোর।
হিম ধরাধর কনক ভূধর
কোরে মিলল জোড় ॥
মাধব তুয়া দরশন কাজে।

আধ পদচারি করত সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে ॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে
চাঁদ পূজল কাম ॥
শ্রীযুত হুসন জগৎ ভূষণ
সোহ্ এ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভণে যশোরাজ-খান ॥[১]

কালিদাস 'কুমারসম্ভবে' ও 'রঘুবংশে' বর দেখিবার জন্য পুরনারীদের ব্যগ্রতা এমনিভাবেই বর্ণনা করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের (১৪৯০-১৫২২) সভাকবি রাজপণ্ডিত রচিত একটি পদ বিদ্যাপতি-পদাবলী-সংগ্রহে পাওয়া যায়। রাধার দূতী উদাসীন কৃষ্ণকে মানিনী রাধার কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুনয় করিতেছে।

(মালব রাগ)

প্রথম তোহর প্রেম গৌরব গৌরব বাড়ালি গেলি
অধিক আদরে লোভে লুবুধলি চুকলি তে রতি খেড়ি। ধ্রু।
খেমহ এক অপ- রাধ মাধব পলহি হেরহ তাহি
তোহ বিন জএো অমৃত পিবএ তৈএো ন জীবএ রাহি।
কালি পরস্যুঁ মধুর যে ছলি আজ সে ভেলি ভীতি
আনহু বোলব পুরুষ নির্দয় সহজে তেজ পিরিতি।
বৈরিহু কে এক দোষ মরসিঅ রাজপণ্ডিত ভান
বারি কমলা- কমল রসিয়া ধন্যমাণিক জান ॥[২]

—"তোমার প্রথম প্রেমের গৌরবে সে গৌরব-গর্বিত হইয়া গেল। বেশি আদরে লোভ-লুব্ধ হইল। তাহাতে রতি খেলা চুকিয়া গেল। মাধব, এক অপরাধ ক্ষমা কর, ফিরিয়া রাধাকে দেখিতে চল। তুমি ছাড়া যদি অমৃত পান করে তবু রাধা বাঁচিবে না। কাল পরশু পর্যন্ত যে মধুর ছিল আজ সে

১ বৈঃ পঃ পৃঃ ১০৫০।
২ (ডঃ সুকুমার সেন বা. সা. ইতি, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ পৃঃ ১০৬)

তিত হইয়া গেল। অন্য লোকে বলিবে পুরুষটা নির্দয়, সহজে প্রেম উপেক্ষা করিল। শত্রুর ত একটা দোষ ক্ষমা করিতে হয়। রাজপণ্ডিত বলিতেছে, বালিকা কমলা কেমন রসিক ধন্যমাণিক্য ইহার মর্ম জানেন।"

পদটি মৈথিল ভাষায় রচিত হইলেও এখানে উল্লেখযোগ্য।

রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের সংগে দেখা হইবার পূর্বেই রাগমার্গ-ধর্মসাধনা ও সখীসাধনা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিলেন। সাধ্যসাধন-তত্ত্বের আলোচনার সময় নিম্নোদ্ধৃত পদটি প্রেমের সর্বশেষ সীমার অভিব্যক্তি হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটির ভাষার মধ্যে ব্রজবুলির আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে এবং ইহাতে চৈতন্য-দেবের সাধনার পরিচয়ও মেলে। পদটিতে 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত' অর্থাৎ রাধার প্রেমের প্রগাঢ় বা পরিপক্ক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

কলহান্তরিতা

(শ্রীরাধার উক্তি—শ্রীকৃষ্ণের দূতীর প্রতি)

ভৈরবী

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জনি ॥ ধ্রু ॥
না খোঁজলুঁ দূতি না খোঁজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ।
অব সো বিরাগে তুঁহুঁ ভেলি দূতি।
সুপুরখ প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বর্ধনরুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় কবি ভান।

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা, ২ অষ্টম পরিচ্ছেদ)

'প্রথমেই (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) আমার রাগের উদয় হইয়াছিল। তাহার পর পরস্পরের চারি চক্ষুর মিলন ঘটিয়াছিল। সেই রাগ দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিল, তাহার অন্ত পাওয়া গেল না। সে রমণ নয়, আমিও রমণী নহি, মনোভব আমাদের দুইজনের মনকে পেষণপূর্বক এক করিয়া দিয়াছিল।

সখি, সে সব প্রেমকাহিনী কানুকে বলিও, যেন ভুলিও না। সেদিন দূতীর অনুসন্ধান করি নাই, অপর কাহারও খোঁজ লই নাই। দুইজনের মিলনে মদনই মধ্যস্থ হইয়াছিল। এখন আমার প্রতি তাহার বিরাগ জন্মিয়াছে, তুমি দূতী হইয়া আসিয়াছ। সুপুরুষের প্রেমের এমনই রীতি। মহারাজ প্রতাপরুদ্র ইহা মানেন। কবি রামানন্দ রায় বলিতেছেন॥'

জয়দেবরচিত সংস্কৃতপদগুলি বাদ দিলে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় প্রথম পদকর্তা বিদ্যাপতি। রাধাকৃষ্ণপ্রণয়লীলা অবলম্বন করিয়া তিনি মৈথিল ভাষায় গান লিখিয়াছিলেন। সেই পদগুলি বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর গঠন-প্রকৃতি, স্তবকবন্ধন, ভাষা প্রভৃতিতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সংগে মিথিলার উমাপতির 'পারিজাত-হরণ' নাটকের মৈথিল গানগুলিও স্মরণীয়। এই গানগুলির ভাষা পরবর্তীকালে রচিত বিদ্যাপতির পদগুলির ভাষা একই রকম। বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রোক্ত সাধারণ রসপর্যায়ের অনুসারেই বর্ণনা করিয়াছেন। জয়দেবই এই পথ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। গীত-গোবিন্দে একপ্রকার ভক্তি আছে, তবে সে ভক্তি ঐশ্বর্যমিশ্রা ও আদিরসাত্মক। বিদ্যাপতির পদাবলীতে মর্ত্যবাসনার সহিত ভক্তিরসের কথাও মিশিয়া আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনেও' এই রীতি অনুসৃত হইতে দেখা যায়। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের পদকর্তাদের পক্ষে ইহা খুব স্বাভাবিক।

দ্যাপতির পদে—

(শ্রীরাধার পূর্বরাগ)

এ সখি পেখলুঁ এক অপরূপ।
সুনইত মানবি সপন সরূপ॥
কমল জুগল পর চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেঢ়ল বিজুরিলতা।
কালিন্দি তীর ধীর চলি জাতা॥
সাখাসিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহি নব পল্লব অরুণক ভাঁতি॥
বিমল বিম্বফল জুগল বিকাস।
তাপর কীর থীর করু বাস॥

তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোর।
তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোর॥
এ সখি রঙ্গিনি কহল নিসান।
হেরইত পুনি হমে হরল গিআন॥
কবি বিদ্যাপতি এহ রস ভান।
সুপুরুখ মরম তুহুঁ ভল জান॥

(বৈঃ পঃ পৃঃ ৮৪)

—'হে সখি, এক অপরূপ (দৃশ্য) দেখিলাম, শুনিলে স্বপ্ন-স্বরূপ মনে করিবে। (পদদ্বয়রূপ) কমলযুগলের উপর (নখ-পংক্তিরূপ) চাঁদের মালা, তাহার উপর (শ্যামল-দেহরূপ) তরুণ তমাল উৎপন্ন হইয়াছে। পীতবসনরূপ বিদ্যুল্লতা তাহাকে অর্থাৎ এই সেই তমাল (তনুকে) বেষ্টন করিয়াছে (সে) কালিন্দী তীর ধরিয়া ধীরে চলিয়া যাইতেছে। (তাহার হস্তদ্বয়রূপ) শাখার (অঙ্গুলিরূপ) শিখরেও (নখর-পংক্তিরূপ) সুধাকর-পংক্তি (এবং) তাহাতে (অর্থাৎ সেই হস্তদ্বয়রূপ শাখায়) অরুণের ভাতিবিশিষ্ট (করতলরূপ) নবপল্লব শোভমান। সেই দেহরূপ তমালবৃক্ষে ওষ্ঠাধররূপ বিমল বিম্বফল-যুগলের বিকাশ হইয়াছে। তাহার পর (তীক্ষ্ণ-নাসা-রূপ) কীর (শুকপক্ষী) স্থিরভাবে বাস করিতেছে। যাহার উপর (নেত্রযুগলরূপ) চঞ্চল খঞ্জনযুগল এবং তাহার উপর (ময়ূরপুচ্ছ) সাপিনীকে (কেশপাশকে) আচ্ছাদিত করিয়াছে। হে রঙ্গিনি সখি, (তোমাকে) এই সঙ্কেত কহিলাম। পুনরায় দেখিতে যাইয়া আমি জ্ঞান হারাইলাম। কবি বিদ্যাপতি এই রস বর্ণনা করিতেছেন। সুপুরুষের মর্ম তুমিই ভাল জান।'

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে দুই রকম রচনাশৈলী দেখিতে পাই। চৈতন্য-পূর্ব যুগের (পদাবলীর) চণ্ডীদাস সহজ সরল নিরাভরণ ভাষায় পদরচনা করিয়াছেন। তাঁহার পদগুলিতে হৃদয়ের গভীর আবেগ-আর্তি ও ভাবের গভীরতা ও বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে আছে ইন্দ্রিয়াতীত গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি। চণ্ডীদাসের পদে দেহের কথা একটু-আধটু থাকিলেও মূল সুর বেদনার ও আধ্যাত্মিক-চেতনার। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বলরাম দাস ও জ্ঞানদাস পদরচনায় মুখ্যতঃ চণ্ডীদাসকেই অনুসরণ করিয়াছেন। বিদগ্ধ ও কলাকুশলী কবি বিদ্যাপতি পদরচনায় ব্যবহার করিয়াছেন অলংকারবহুল বাক্‌নির্মিতি, জয়দেব-প্রদর্শিত সাধারণ অলংকারশাস্ত্রের

পদ্ধতি। তাঁহার পদগুলিতে ঐকান্তিক আর্তি ও বিলাসবিভ্রম উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। চৈতন্যপর যুগে গোবিন্দদাস ও রায়শেখর তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণলীলার চিত্রাঙ্কণে মর্ত্যরূপ ও প্রতীকের সাহায্য লইয়াছেন।

চৈতন্য-যুগেই বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। প্রকৃত পদাবলী এই যুগেই দেখি। শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তি দর্শন করিয়াই বৈষ্ণব-কবিগণ শ্রীরাধার চিত্র অংকন করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যেই সনাতন-রূপ গোস্বামীর বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র ও প্রেমভক্তিবিষয়ক গ্রন্থাদি রচিত হয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব না হইলে বৈষ্ণব পদাবলী কোনদিনই এরূপ রসরূপ লাভ করিতে পারিত না তাহা ঠিক, কিন্তু তেমনি বৈষ্ণবশাস্ত্র রচিত না হইলে পদাবলীর পালাপর্যায় ও লীলাকীর্তন এমন সুন্দর হইয়া উঠিত না। আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তিও এমন সুদৃঢ় হইত না।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের পদাবলীর সহিত চৈতন্যযুগের পদাবলীর গুরুতর পার্থক্য আছে। প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদাবলী-সাহিত্যে সর্বভারতীয় কৃষ্ণাশ্রয়ী ভক্তিবাদ পরিলক্ষিত হয়, ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান্ কৃষ্ণের কথা দেখি। কোন সম্প্রদায়-বিশেষের সাহিত্য বলিয়া চিহ্নিত হইয়া উঠে নাই। ইহাতে ভাগবত-বিষ্ণুপুরাণাদির আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে এবং জয়দেবের প্রভাবে সংস্কৃত আলংকারিক রীতিতে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই ইহাতে মর্ত্যরসের সহিত ভক্তিরসের মিশ্ররূপ পরিলক্ষিত হয়। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা ও মাধুর্যলীলা উভয়েরই প্রকাশ দেখি তবে চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-কবিগণ মাধুর্য-লীলার উপরই জোর দিয়াছেন। চৈতন্যপূর্বযুগে সংস্কৃতে রচিত পদাবলীতেও এই ভাব (ঐশ্বর্যলীলা ও মাধুর্য-লীলা) লক্ষ্য করি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠ হইবার পর ভগবান্ কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা পদকর্তারা যেন মুছিয়া দিতে চান। কবিরাজ গোস্বামী বলেন—শ্রীচৈতন্য যেন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা বুঝিতেই পারিতেছেন না—

"এ যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্‌মনোগম্য নহে এক বিন্দু ॥"

(চৈ. চ. মধ্য—২১ পরিচ্ছেদ ২।২১)

তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যেরই গুণগান করিতেছেন—

"অদ্‌ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥"

(চৈ. চ. আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ.

শ্রীচৈতন্যের ভক্তির তত্ত্বাদর্শের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে একটি পরিবর্তন আসিল। রাধাকৃষ্ণ অতঃপর একটি বিশেষ তত্ত্বদৃষ্টির দ্বারা পরিমার্জিত হইয়া নবকলেবর ধারণ করিল। শ্রীচৈতন্যের সময় হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে রাগানুগ ভক্তিতত্ত্ব ও বৈষ্ণব-সাধনার ভাবরূপ প্রত্যক্ষ হইল বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ব্যাখ্যাত রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব গৌরাংগদেবের অন্তর্জীবনের ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইল। চৈতন্যদেবের আবেগ-আর্তির মধ্যে 'বিরহিণী রাধার' মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া কবিগণ ধন্য হইলেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত অনুচরদের মধ্যে অনেকে তাঁহার দিব্যোন্মাদ দেখিবার পূর্বেই পদাবলী রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের পদগুলির মধ্যে গাঢ় প্রেমভক্তির বিকাশ দেখা যায় না। "চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগেও রাধাকৃষ্ণের পদাবলীতে মর্ত্যরূপ ও মর্ত্যরসের সংগে একপ্রকার ভক্তির স্পর্শ ছিল—তবে তাহা তখনও চৈতন্য-সম্প্রদায়ের দ্বারা রূপান্তরিত বা প্রভাবিত হইয়া ভজন-গীতিকা বা কীর্তনে পরিণত হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দের প্রথমদিকে যে সমস্ত পদ রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে গাঢ় ভক্তিরস ও গভীর প্রেমব্যাকুলতা তেমনভাবে পরিস্ফুট হয় নাই, যেমন হইয়াছে শ্রীচৈতন্যের বিরহ-ব্যাকুলতা দর্শনের পর রচিত পদগুলিতে চৈতন্যযুগের পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরূপই প্রকাশিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দের প্রথমার্ধে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিকরদের দ্বারা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক যে সকল পদ রচিত হইয়াছে, সেগুলিতে শ্রীরাধার একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—'মানবী রাধা ক্রমে ক্রমে 'মহাভাব-স্বরূপিণী' হইয়া উঠিতেছেন'।"

দুইটি পদ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্যটি পরিস্ফুট করিতেছি।

মুরারি গুপ্ত নিম্নোক্ত পদটি যখন লিখিলেন, তখনও শ্রীচৈতন্যের বিরহদশা ঘটে নাই। এই পদটিকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-পদাবলীর পর্যায়ে না ফেলিয়া কোন দুরূহ প্রেমক্লিষ্ট নায়িকার উক্তি হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারা যাইবে। মুরারি শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করিতেন।

॥ আক্ষেপানুরাগ ॥

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥
নয়ন পুতলী করি লইনু মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি আগুন জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি
জাতি-কুল-শীল-অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥ (বৈঃ পঃ পৃ ১৩৯)

অথচ নিম্নোদ্ধৃত গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর পদটিতে যে দীন আর্তি ফুটিয়া উঠিয়া শেষ ছত্রে যে নিখুঁত নিটোল অনুভূতিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সত্যতার প্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্য; পদটি একটি সার্থক বৈষ্ণবপদ। গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দের শেষপাদের কবি।

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী।
হৃদিমন্দিরে রাখি তোমারে হেরি ॥
গুরুগঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা ॥ ধ্রু ॥
সম শৈল কুলমান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী ॥
আমি কুরূপিনী গুণহীনী গোপনারী।
তুমি জগজনরঞ্জন বংশীধারী ॥
আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনি।
তুমি রসপণ্ডিত রসচুড়ামণি ॥

গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুয়া বিনে মোর চিতে আন নাহি ভায়॥
(বৈঃ পঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ)

এবিষয়ে সমালোচক ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"চৈতন্যপূর্ববর্তী রাধাকৃষ্ণপ্রেম-সাহিত্যে এবং চৈতন্য-পরবর্তী রাধাকৃষ্ণপ্রেম-সাহিত্যেও রাধিকার একটি দ্বৈত সত্তা রহিয়াছে, তাহার অপ্রাকৃত অধ্যাত্মমূর্ত্তি একটি অশরীরী ছায়ার ন্যায়ই কাব্যে রূপায়িত প্রাকৃত মূর্তির চারিদিকে ক্ষণে ক্ষণে একটি দিব্য পরিমণ্ডলের আভাস মাত্র দিয়াছে। সাহিত্যিক রূপায়ণে আমরা বরঞ্চ প্রাকৃতেরই জয় দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু রাধাকৃষ্ণপ্রেম-সাহিত্যকে আধ্যাত্মিকতার অতখানি উচ্চগ্রাম হইতে দেখিবার এবং গ্রহণ করিবার যে একটি দৃষ্টি রহিয়াছে সে দৃষ্টিটি মুখ্যতঃ চৈতন্যযুগেরই দান বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যের দিব্যভাব এবং আচরণে—তাঁহার পরমভক্ত এবং পরমজ্ঞানিগুনী পরিকরবর্গের ধ্যানমননের মধ্যে শ্রীরাধার এক নব আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম। এই কারণেই বৈষ্ণব সাহিত্যের আস্বাদ কালে সাহিত্যরসের সহিত অধ্যাত্মরসের মিশ্রণ না ঘটাইয়া পারি না, এই মিশ্রণসমন্বয় ব্যতীত বৈষ্ণব-সাহিত্যের আস্বাদনে কোথায় একটি অপূর্ণতা থাকিয়া যায়।"

চৈতন্যযুগের পদাবলীর সহিত চৈতন্য-পববর্তী যুগের পদাবলীর মধ্যে আর একটি গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হয়। চৈতন্যযুগের পদাবলীতে দেখি ভগবান্ কৃষ্ণ ভক্তের কান্ত, অর্থাৎ কান্তভাবেই ভগবান্ কৃষ্ণকে ভজনা করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যের সাধনা কান্তভাবের সাধনা। কিন্তু চৈতন্য-পরবর্ত্তীকালে সখী-সাধনা প্রবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। ভগবান্ ও ভক্তের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন গুরু; এই গুরুই সখী বা মঞ্জরী। এই মঞ্জরী-অনুগা সাধনা বা সখী-সাধনা পরবর্ত্তী কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কিন্তু চৈতন্যযুগে ভগবান্ ও ভক্তের মাঝে কেহ নাই।

(খ) চৈতন্য-সমকালীন ও অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব পদাবলী

শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও পরিকরদের মধ্যে মুরারি গুপ্তকে প্রথম পদাবলী-রচয়িতা রূপে পাই। ইনি চৈতন্য-বিষয়ক পদও রচনা করিতেন। বাংলায় ও

ব্রজবুলিতে কয়েকটি পদ মুরারি লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দুইটি অতি উৎকৃষ্ট; মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের চেয়ে কিছু বড় ছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বয়স্যরূপে দেখিতেন। নিম্নস্থ পদটিতে বিরহিণীর গভীর মর্মপীড়া প্রকাশিত হইয়াছে।

মাথুর

(কৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি)

কামোদ

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
সফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই॥
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগবাতি
সে কেমনে রহে অযোগানে।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন
ঝাট আসি রাখহ পরাণে॥ ধ্রু॥
বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি তোষে
স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
তার সাক্ষী পদ্ম-ভানু জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরীতি না রয়॥
যত সুখে বাঢ়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদ-বন্ধু ভাতি।
গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহু রাতি॥ (বৈঃ পঃ পৃ ১৩৯)

মুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুর সমাধ্যায়ী ও প্রিয় বয়স্য ছিলেন। তিনি সুকণ্ঠ সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার বড় ভাই বাসুদেব দত্ত ছিলেন নৃত্যে পারদর্শী, শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। দুই জনেরই একটি করিয়া 'গৌর-পদাবলী' পাওয়া গিয়াছে। গান দুইটি ব্রজবুলিতে রচিত।

আরে আমার গৌরাঙ্গ গোপীনাথ।
যাহার লাগিয়ে গেহ গুরু ছোড়নু
সেহি করল পরমাদ॥

অপরূপ বেশ কেশ সব মুণ্ডন
পিন্ধন অরুণ কৌপীন।
যো পহু ত্রিভুবন রস উল্লাসিত
সেহি বেশ সন্ন্যাস প্রধান ॥
ঐছা গুণ সোঙরি রোয়ত শান্তিপুরনাথ
যব পহু নীলাচলে যাই।
হেরইতে প্রেম-অঙ্গ মুকুন্দ মন ভুলন
লাগাওত লোক বুঝাই ॥[১]

'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি'তে বাসুদেবের ভণিতায় এই গানটি মিলে—

অপরূপ গোরা নটরাজ
প্রকট প্রেম বিনোদ নবনাগর
বিহরে নবদ্বীপ মাঝ।
কুটিল কুন্তল গন্ধ পরিমল
চন্দন তিলক ললাট।
হেরি কুলবতী লাজ-মন্দির-
দুয়ারে দেয়ল কপাট।
করিবরকর জিনি বাহুর সুবলনি
দোসরি গজমোতি-হারা
সুমেরুশিখরে যৈছন ঝাঁপিয়া
বহই সুরধুনি ধারা।
রাতুল অতুল চরণযুগল
নখমণি বিধু উজোর
ভকত ভ্রমরা সৌরভে মাতল
বাসুদেব দত্ত রহু ভোর ॥[২]

নরহরি 'সরকার ঠাকুর' একজন প্রসিদ্ধ পদকার ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। পুরীতে সংকীর্তনে যোগ দেন। অষ্টাদশ শতাব্দের গোড়ায় 'ভক্তিরত্নাকর' প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর সহিত একাকার

১ বা. সা. ইতিহাস প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ পৃ. ৩৯৭ (সুকুমার সেন)
(সংভাগবতকদম্ব, পৃঃ ৪০৬-৭)

২ বৈ. প. পৃ. ১০১৪।

হওয়ায় কোন্‌টি কাহার পদ ঠিক করা দুরূহ ব্যাপার, তবে প্রাচীন পদ-সংকলন গ্রন্থে (সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে) নরহরি ভণিতাযুক্ত যে সব পদ পাওয়া যায় সেগুলি 'দাস' ঠাকুরের রচনা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বিরহখিন্ন রাধার অবস্থা শুনিয়া কৃষ্ণ ব্যাকুল। পদটিতে প্রেমের তীব্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষা ব্রজবুলি।

রাই বিপতি শুনি বিদগধশিরমণি
পুছই গদগদ ভাষা
নিজ মন্দির তেজি চলু বরনাগর
পুন পুন পরশই নাসা।
বিছুরল চরণ রণিত মণিমঞ্জীর
বিছুরল সুরসিক রঙ্গ
বিছুর বেশ বসন ভেল বিগলিত
বিগলিত শিখিপুচ্ছচন্দ্র।
মলয়জ পরিমলে দশদিগ মোদিত
যামিনী বহে অতি পুঞ্জে
লালস দরশ পরশে দুহুঁ আকুল
চিরদিনে মীলল কুঞ্জে।
দুহুঁ মুখ হেরই অথির ভেল দুহুঁ তনু
পরশিতে ভুজে ভুজে কাঁপ
নরহরি হৃদি মাঝে অপরূপ জাগল
জলধর বিধুবর ঝাঁপ॥[১]

পদটি নরহরির রচনা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে।

গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ তিন ভাই শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার সহচর ছিলেন। তিনজনেই অকৃতদার ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আদেশে তাঁহারা নিত্যানন্দর সহচর হইয়া বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন, তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গ-সুখ লাভ করা। তিন ভাই-ই পদ-রচনায় ও সংগীতে কুশলী ছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ পরে অগ্রদ্বীপে বাস করেন—

---

১ বা. সা. ই. (ডঃ সুকুমার সেন।) প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ ২১১ পৃঃ

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও।
তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে।
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়
পরাণপুতুলি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।
আর না যাইব মোরা গৌরাংগের পাশ
আর না করিব মোরা কীর্তনবিলাস।
কান্দয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া ॥[১]

গৌরলীলার এই পদটিতে চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের সংবাদে ভক্ত-হৃদয়ের কাতরতা প্রকাশিত হইয়াছে।

মাধব ঘোষ কাটোয়ার নিকট দাঁইহাটে বাস করিতেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ-লীলা ও গৌরলীলাবিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুন পুন
দুহুঁ দোঁহা বদন নিহারি
অন্তরে উয়ল প্রেম পয়োনিধি
নয়নে গলয়ে ঘন বারি।
মাধব হামারি বিদায় পায়ে তোয়
তোহারি প্রেম সঞে পুন চলি আওব
অব দরশন নাহি মোয়।
কাতর নয়নে নেহারিতে দুহুঁ দোঁহা
উথলল প্রেমতরংগ
মুরছল রাই মুরছি পড়ু মাধব
কবে হবে তাকর সংগ।
ললিতা সুমুখি সুমুখি করি ফুকরত
রাইক কোরে আগোর
সহচরী কানু কানু করি ফুকরত
ঢরকত লোচন লোর।

১ বৈ. প. হ. মুখো. পৃ. ১৪৯

কথি গেও অরুণ- কিরণ ভয় দারুণ
কথি গেও লোকক ভীত
মাধব ঘোষ অবহু নাহি সমুঝল
উদভট মুগধ চরিত ॥[১]

বাসুদেব ঘোষ শেষজীবনে তমলুকে বাস করিতেন। তিনি গৌর-পদাবলী লিখিয়াছিলেন। এইগুলি আদি 'গৌর-চন্দ্রিকা' রূপে অভিহিত হয়। কৃষ্ণলীলা-পদাবলীও লিখিয়াছিলেন।

(বর্ষাভিসারে উৎসুক রাধার উক্তি)।

অহে নবজলধর
বরিষ হরিষ বড় মনে
শ্যামের মিলন মোর সনে।
বরিষ মন্দ ঝিমানি
আজু সুখে বঞ্চিব রজনি।
গগনে সঘনে গরজনা
দাদুরি দুন্দুভি বাজনা।
শিখরে শিখণ্ডিনী বোল
বঞ্চিব সুরনাথ কোল।
দোহার পিরীতি রস আনো
ভুবন বাসুদেব ঘোষে ॥[২]

বংশীবদন চট্ট শ্রীচৈতন্যের বয়ঃকনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য নীলাচলে চলিয়া গেলে বংশীবদন শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দেখাশুনা করিতেন। তিনি বাংলায় অনেকগুলি পদ লিখিয়াছিলেন।

(শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পরে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ বর্ণনা)।

আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকাতিলকা কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়ন খঞ্জন নাচ ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে
ভকত-চাতক লৈয়া।

১ পদকল্পতরু ২৮। ২ (নটবর দাসের রসকলিকা)।

আর কি নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চায়্যা ॥
... ...
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌর-রায়।
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া
বংশী গড়াগড়ি যায়।[১]

কুলীনগ্রাম-নিবাসী 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের' কবি মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসু। কীর্তনগানের সম্প্রদায় লইয়া ইহারা প্রতি বৎসর নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হইতেন। রামানন্দ অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদাবলী-রচয়িতা।

(স্বপ্ন-মিলনেব পর নিদ্রাভঙ্গে বিরহিণী রাধার খেদ)—

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী
পাছে লোক-মাঝে মোর হয় জানাজানি ॥
শাওন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিষে
নিন্দে তনু নাহিক বসন
শ্যামলবরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন।
বোলে সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিনো, যাচিয়া বিকাই।
চমকি উঠলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিনু সেহো নহে সতি
আকুল পরাণ মোর দুনয়ানে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি।
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিনী
কত রস ভঙ্গিমা চালায়
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায় ॥[২]

১ বৈ. প. হ. মুখো. পৃ. ২৫৪। ২ বৈ. প. হ. মুখো. পৃ. ১৮৮।

গোবিন্দ আচার্য শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালের গোবিন্দদাস কবিরাজের সঙ্গে নামসাম্যে একাকার হইয়া যাওয়ায় কোন্‌টি কাহার পদ বোঝা কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন নিম্নে উদ্ধৃত পদটি গোবিন্দ আচার্যের বলিয়া মনে করেন।

চৈতন্য-বন্দনা—

হরি হরি বড় দুখ রহিল মরমে
গৌরকীর্তনরসে জগজন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই
দীনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই।
হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে
না ভাজিলাম হেন অবতার
দারুণ বিষয়বিষে সতত মজিয়া রৈলু
মুখে দিনু জলন্ত অঙ্গার।
এমন দয়ালু দাতা আর বা পাইব কোথা
পাইয়া হেলায় হারাইলুঁ
গোবিন্দদাসিয়া কয় অনলে পুড়িলুঁ নয়
সহজেই আত্মঘাতী হইলুঁ ॥[১]

মুখ্য চৈতন্য-অনুচরদের শিষ্যভক্তেরা কেহ কেহ পদাবলী-রচনায় নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ ভক্তেরাই প্রধান। শ্রীচৈতন্যের আদেশে নিত্যানন্দ ভক্তশিষ্যদের লইয়া বাংলাদেশে নাম প্রচার করিতেন। তাঁহাকে কৃষ্ণেরই বড় ভাই বলরামের অবতার বলিয়া মনে করা হইত। তখন তিনি মুখ্যভাবে সখ্যরসাশ্রিত। তাঁহার মুখ্য অনুচরেরা (পরে যাঁহারা 'দ্বাদশ গোপাল' নামে অভিহিত) গোপালবালকের বেশ এবং ধরণ ও ধারণ অবলম্বন করিতেন।

বলরাম দাস নিত্যানন্দের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। বলরাম নামধারী একাধিক পদকর্তার সন্ধান মিলিতেছে।

১ বৈ. প. হ. মুখো. পৃ. ৬৫৭।

বলরাম দাস বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ-রচনা করিয়াছেন, তবে তাঁহার বাংলা পদগুলি শ্রেষ্ঠতর। বলরাম দাস একটি নিত্যানন্দবন্দনা পদে চৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রবর্তিত প্রেমধর্ম প্রচার ব্যাপারের বর্ণনায় হাটে 'কেনা-বেচার' রূপক সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তীকালে নরোত্তম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। পদটি এখানে উল্লেখ করিতেছি।

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়
মথিয়া সকল তন্ত্র হরিনাম মহামন্ত্র
করে ধরি জীবেরে বুঝায়।
অচ্যুত-অগ্রজ নাম মহাপ্রভু বলরাম
সুরধুনীতীরে কৈলা থানা
হাট করি পরিবন্ধ রাজা হৈলা নিত্যানন্দ
পাষণ্ড দলন বীর বানা।
পসারী শ্রীবিশ্বম্ভর সঙ্গে লয়্যা গদাধর
আচার্য চতুরে বিকেকিনে
গৌরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনে।
পাত্র রামাই লঞা রাজ আজ্ঞা ফিরাইয়া
কোটাল হইলা হরিদাস
কৃষ্ণদাস হৈলা দ্বারি কেহ যাইতে নামে ভাঁড়ি
লিখয়ে পড়য়ে শ্রীনিবাস।
বলরাম দাসে বোলে অবতার কলিকালে
জগাই মাধাই হাটে আসি
ভাণ্ড হাতে ধনঞ্জয় ভিক্ষা মাগিয়া লয়
হাটে হাটে ফিরয়ে তপাসি ॥[১]

জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবাদেবীর অনুচর ছিলেন। তিনি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষারীতিতে পদ লিখিয়াছিলেন। কবি বলিয়া জ্ঞানদাসের খ্যাতি চণ্ডীদাসের পরেই। চণ্ডীদাসের মতই তিনিও সহজ সরল ভাষায় মনের

১ বৈ. প. ই. মুখো. পৃ. ১২২

ভাব প্রকাশ করিতে সিদ্ধহস্ত। তিনি চৈতন্য-নিত্যানন্দ-বর্ণনা ও বাৎসল্যরসের পদ লিখিয়াছিলেন।

স্বপ্নসমাগমের এই পদটির ভাষায় ব্রজবুলির মিশ্রণ আছে—

(সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি)

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামলবরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই।

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে
পালঙ্কে শয়নরঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।

শিখরে শিখণ্ডরোল মত্ত দাতুরীবোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে ঘন গাজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে।

মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল লেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী।

রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা যিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন বিকাইলু বোলে।

কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে।

রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল।[১]

চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থ 'চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা লোচনদাস শ্রীখণ্ডের নরহরিদাস সরকারের শিষ্য ছিলেন। তিনি কতকগুলি মেয়েলি ভাবের রূপানুরাগের পদ লিখিয়াছিলেন। ভাষা ঘরোয়া; ছন্দ নাচনিয়া, ছড়া হইতে নেওয়া, এই ধরণের পদের নাম ধামালি বা ঢামালি' (অর্থাৎ নাগরালি)। পদগুলি প্রায়ই গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধীয়।

আর শুন্যাছ আলো সই গোরাভাবের কথা
কোণের ভিতর কুলবধূ কান্দ্যা আকুল তথা।
হলদি বাঁ টিতে গোরী বসিল য- তনে
হলদি বরণ গোরাচাঁদ পড়্যা গেল মনে।
কিসের রান্ধন কিসের বাঢ়ন কিসের হল্‌দি বাঁটা
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভাস্যা গেল পাটা।
উঠিল গৌ- রাঙ্গ ভাব সম্বরিতে নারে
লোহেতে ভিজিল বাঁটন গেল ছারে খারে।
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর
হয় নাই হবার নয় গোরা অব- তার॥[২]

চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলী তিন উপস্তরে বিভক্ত।

প্রথম উপস্তরের মুখ্য পদকর্তারা শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্তের শিষ্য ও অনুশিষ্য। এই সময় পদাবলীকীর্তন-রীতির উদ্ভব হয়। যে গানের রীতি জয়দেবের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল তাহা প্রধানত নরোত্তমের চেষ্টায় নূতন রাগ-তাল-সমন্বিত হইয়া পদাবলীকীর্তনের রীতি সৃষ্টি করিল। পদাবলীকীর্তন বা রসকীর্তন জনসাধারণের জন্য সৃষ্টি হয় নাই, সৃষ্টি হইয়াছিল শিক্ষিত বিদগ্ধ ভাবুক বৈষ্ণবদের জন্য। পদাবলী গীতি আর বিক্ষিপ্ত গান রহিল না, পালাবন্দি হইয়া কৃষ্ণলীলার ধারা অনুসরণ করিল। ইহাকে বৈষ্ণব গীতিকবিতার ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্যায় বা 'পদাবলী-বিধান' বলিতে পারি। প্রথম পর্যায়ে

১ বৈ. প. ই. মুখো. পৃ. ৩৭৬-৭৭।
২ বৈ. প. ই. মুখো. পৃ. ৪৬০।

অর্থাৎ চৈতন্য-সমকালীন পদাবলী-সাহিত্যে ধারাবাহিক পদরচনার বা রীতি প্রবর্তিত হয় নাই।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণলীলা দুইমতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের ব্রজলীলা ও রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা বা 'দণ্ডাত্মিকা' লীলা।

প্রথম পর্য্যায়ের পদকর্তার ভূমিকা ছিল—রাধার বা কৃষ্ণের সখী দূতী বা বন্ধু। দ্বিতীয় পর্যায়ে পদকর্তা—মঞ্জরী, রাধার পরিচারিকা। নায়ক-নায়িকা যেন নাচের পুতুল, সজীব মানুষের মতো নয়। পদগুলির ভণিতা অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হয় যে শ্রীচৈতন্যের ধর্মে সামান্য পরিবর্তন আসিয়াছে। পদকর্তারা দূর হইতে রাধাকৃষ্ণলীলা দর্শন করিয়া নিজেরা ধন্য হইয়াছেন। মঞ্জরী-অনুগতভাবে সাধনা না করিলে রাধাকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্তির অন্য পন্থা নাই। রঘুনাথ দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ মঞ্জরীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥[১]

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছে শিক্ষা লইয়া যে তিন জন বৈষ্ণবাচার্য ও পদকর্তা বাংলাদেশে নূতন প্রেরণায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারা হইতেছেন—শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ দাস (দুখিনী)। শ্রীনিবাস আচার্যের কর্মস্থল ছিল পশ্চিমবঙ্গে। তাঁহার রচিত কয়েকটি বাংলা পদ পাওয়া গিয়াছে।

বদনচান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো
কেনা কুন্দিলে দুটি আঁখি
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাখী।
অমিয়া মধুর বোল সুধা খানি খানি গো
হাতের উপরে লাগি পাঙ
তেমনি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
ভাজিয়া ভাজিয়া উহা খাঙ।
করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুলে জড়িত তার আগে
যৌবন-বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে।…

১ চৈ. চ. মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নাটুয়া ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়
চলে যেন গজরাজ মাতা
শ্রীনিবাস দাস কয় লখিলে লখিল নয়
রূপসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা।[১]

নরোত্তম দাসের কর্মস্থল ছিল উত্তরবঙ্গ, তিনি পদ্মাতীরে খেতরীগ্রামে বাস করিতেন। নরোত্তম খেতরীতে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই উৎসব হইতেই আসর পাতিয়া পদাবলী-কীর্তনের আরম্ভ হয়। তিনি পদাবলী-কীর্তনগানকে একটি বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট শিল্পের ভূমিতে উন্নীত করিয়াছিলেন। নরোত্তম কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—বহু কবিতা ও পদ, রাধাকৃষ্ণ পদাবলী ও প্রার্থনা সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সার করিয়াছিলেন 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'। রাধাভাবে তন্ময় সাধক-কবি নরোত্তম এই পদটিতে নিজের অন্তরের বাসনা অনুরাগিনী রাধার মনের কথায় প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন—

কিবা সে তোমার প্রেম কত লক্ষ কোটি হেম
সর্বদাই জাগিছে অন্তরে
পুরুবে আছিনু ভাগী তেঁই সে পাইয়াছি লাগি
প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ডরে।
কালিয়া বরণখানি আমার মাথার বেণী
আঁচরে ঢাকিয়া রাখি বুকে
দিয়া চাঁদমুখে মুখ পুরাব মনের সুখ
যে কহু সে কহু ছার লোকে।
মণি নহ মুকুতা নহ গলায় গাঁথিয়া লহো
ফুল নহ কেশে করি বেশ
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিত দেশ দেশ।
নরোত্তম দাস কয় তোমার চরিত্র নয়
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া
যে দিন তোমার ভাবে আমার পরাণ যাবে
সেই দিন দিহ পদছায়া॥[২]

১ বৈঃ পঃ পৃঃ ১০৩৮। ২ কীর্তনানন্দ, পৃঃ ৩১৪।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ একজন ভাল পদকার ছিলেন। নরোত্তমের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

কাহারে কহিব মনের কথা
কেবা যায় পরতীত
হিয়ার মাঝারে মরম বেদন
সদাই চমকে চিত।
গুরুজন আগে বসিতে না পাই
সদা ছল ছল আঁখি
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি।
সখী সঙ্গে যদি জলেরে যাই
সে কথা কহিল নয়
যমুনার জল আকুল কবরী
ইথে কি পরাণ রয়।
কুলের ধরম রাখিতে নারিনু
কহিনু সবার আগে
রামচন্দ্র কহে শ্যাম নাগর
সদাই মরমে জাগে॥[1]

রামচন্দ্রের ছোট ভাই গোবিন্দ দাস দ্বিতীয় পর্য্যায়ের পদকর্ত্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আবার ব্রজবুলি গীতিকারদের মধ্যেও প্রধানতম ছিলেন। ইনিও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। গোবিন্দের 'কবিরাজ' উপাধি কবিখ্যাতির জন্য, বৈদ্য ছিলেন বলিয়া নয়। ইনি 'সংগীত-মাধব নাটক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতে ও ব্রজবুলিতে লেখা কয়েকটি গান ছাড়া নাটকটি মিলে না। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার পদগুলির প্রশংসা করিয়াছেন। পত্র ব্যবহারও চলিত।

ব্রজবুলিতে লেখা—

মরকত মুকুর মিলিত মুখমণ্ডল
মুখরিত মুরলী সুতান
শুনি পশুপাখী শাখিকুল পুলকিত
কালিন্দী বহই উজান।

---

১ অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, সতীশচন্দ্র রায়। ৫১০

কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ
কামিনী মনহি মূরতিময় মনসিজ
জগজন নয়ন আনন্দা (ধ্রু)
তনু অনুলেপন ঘনসার চন্দন
মৃগমদ কুঙ্কুমপঙ্ক
অলিকুলচুম্বিত অবনিবিলম্বিত
বনি বনমাল বিটঙ্ক।
অতি সুকুমার চরণতল শীতল
জীতল শরদরবিন্দ
রায় সন্তোষ মধুপসন্নিভ
নন্দিত দাস গোবিন্দ।[১]

গোবিন্দদাস ব্রজবুলিতে পদ লিখিয়াছিলেন। বাংলায় কোন পদ তিনি রচনা করেন নাই জোর করিয়া বলা যায় না। গোবিন্দদাসের রচিত অষ্টকালীয় 'লীলাবর্ণন' বা 'একান্নপদ' ছাপা হইয়াছে। পদগুলি কাব্যের মত ধারাবাহিক রূপে গ্রথিত।

গোবিন্দদাস চক্রবর্তী নামে শ্রীনিবাসের এক শিষ্য ছিলেন। গোবিন্দ চক্রবর্তী সঙ্গীতজ্ঞ ও ভাবুক ছিলেন। তিনি একজন ভাল পদকর্তা ছিলেন। গোবিন্দ চক্রবর্তী বাংলায় দেশী পদ লিখিয়াছেন। তাঁহার ব্রজবুলির পদও ভালো। গোবিন্দদাস কবিরাজের পদের সহিত তাঁহার রচিত পদ একাকার হওয়ার ফলে কোন্ পদটি কাহার ঠিক করিয়া বলা যায় না রামগোপাল দাস, রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণব দাস অল্প কয়েকটি পদ গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদে চটকের চাইতে রসভার বেশী।

১। উলসিত মঝু হিয়া আজি আওব পিয়া
দৈবে কহল শুভবানী
শুভসূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত
অতএ নিচয় করি মানি।
সজনী সবহি বিবাদ দূরে গেল
সুখ সম্পদ বিহি আনি মিলায়ব
অইছন মতিগতি ভেল।

---

১ গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৬-৭, পদকল্পতরু ২৪২৪

মঙ্গল কলসপর দেহ নবপল্লব
রোপহ ঠামহি ঠাম
গ্রহগণক আনি করহ বিভূষিত
তুরিতে মিলয়ে জনু শ্যাম।

হারিদ দাড়িম কাজর দরপণ
দধি ঘৃত রতন প্রদীপে
সুবরণ ভাজন লাজহি ভরি ভরি
রাখহ নয়ন সমীপে।

নব নব রঙ্গিনী দেই হুলাহুলি
বসন ভূষণ করু শোভা
প্রাণ প্রাণ হরি নিজ ঘরে আওব
গোবিন্দদাস মনলোভা॥[১]

যদুনন্দন নামে অন্তত তিনজন পদকর্তা ছিলেন।, যদুনাথ নামেও একজন ছিলেন। চারিজনেই কখনও কখনও 'যদু' ভণিতা ব্যবহার করিতেন। যদুনন্দনের অনেকগুলি পদ কীর্তনগানে সমাদৃত হইয়াছিল।

মোরে উপেখিল শ্যাম সুনাগর
এসব শুনিলঁ কানে
দুরাশা বিরোধী হৈয়া নিরবধি
তথাপি দগধ মনে।

সখি হে দঢ়াইলুঁ এই সার
সো হরি দুর্লভ না হয় সুলভ
মরণ সে প্রতিকার।

কালিন্দী গম্ভীর জলের ভিতর
প্রবেশ করিব আমি
তবে সে পিরীতি বহয়ে কীরিতি
নিচয়ে জানিহ তুমি।

---

১ পদকল্পতরু ১৭০৪

এমতে রাধিকা ব্যাকুলা অধিকা
ভাবের তরঙ্গে ভাসে
অনুরাগী মন ধৈর্য গেল ভন
এ যত্নন্দন দাসে।[১]

'বল্লভদাস', 'কবিবল্লভ' বা 'বল্লভ' নামে একাধিক পদকর্তা ছিলেন।

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়
সেই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তব হিয়ে জুড়ন না গেল।
বচন অমিয় রস অনুখন শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি
কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়লু
না বুঝলু কৈছন কেলি।
কত বিদগধজন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না পেখ
কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥[২]

রাধাবল্লভ চক্রবর্তী (সিংহ) ও ভূপতি 'রায় চম্পতি' ভণিতায় কয়েকটি পদ পাওয়া যায়।

কবিশেখর (রায়), শেখর (রায়) ও রায়শেখর ভণিতায় এক বা একাধিক কবি অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। ভাব ও রচনারীতির দিক দিয়া বিচার করিলে কবিশেখর (শেখর) ভণিতার পদগুলিকে অন্ততঃ তিনজন পৃথক কবির রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। একজন কবিশেখর ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের সন্ধিক্ষণের কবি, একজন কবিশেখর রায় (রায়শেখর) সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগের কবি।

[১] পদকল্পতরু—১৮৪। [২] ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সেন পৃঃ ১৪৮-১৫০। পদটি বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত। বৈ. প. ১০৫৬ পৃঃ

কবিশেখরের কৃষ্ণলীলা-পদাবলী 'দণ্ডাত্মিকা-লীলা' নামে সংগৃহীত হইয়াছিল। নিত্যলীলার বর্ণনা রূপ গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত-অনুযায়ী। এগুলি ব্রজবুলিতে লেখা—

কাজররুচিহর রয়নি বিশালা
তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা।
যতনহিঁ নিঃসরু নগর তুরন্তা
শেখর আভরণ ভেল বহন্তা ॥[১]

শেখর সখী বা মঞ্জরী হইয়া রাধার অলংকারভার বহিতেছেন, এখন ভাব ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগের আগে কোন পদকর্তা লিখেন নাই। কেননা, চৈতন্য-পরবর্তী যুগে মঞ্জরী-অনুগ সাধনা প্রবর্তিত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দেও পদাবলী রচনা গুরুশিষ্য-পরম্পরায় চলিয়াছিল। কৃষ্ণলীলার বিষয়বস্তুতে কোন নূতনত্ব নাই। সেই পুরাতন ধারারই পুনরাবৃত্তি। সামান্য যাহা কিছু অভিনবত্ব দেখা গেল তাহা রাধাকৃষ্ণের মিলনের নূতন নূতন ছল ও সুযোগ কল্পনায়। এই সুযোগ-কল্পনা কতকটা সংস্কৃত কামশাস্ত্র ও কুট্টনী মতকে অনুসরণ করিয়াছে বলিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—কৃষ্ণের বাজিকর বেশে মিলন, কৃষ্ণের নাপিতানীবেশ ধরিয়া দিনের মেলায় রাধার সংগে মিলন, কৃষ্ণের দেয়াসিনী বেশ ধরিয়া সাক্ষাৎ, মালিনীবেশ ধরিয়া মিলন। রাধাকৃষ্ণের মঞ্জুষা-মিলন, রাধার সুবলবেশ ধরিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলন, কৃষ্ণকালী, কলঙ্ক-ভঞ্জন, রাইরাজা, শ্রীকৃষ্ণের গ্রহাচার্যবেশে রাধার সহিত মিলন, শ্রীরাধার 'বারমাস্যা', কৃষ্ণের 'বারমাস্যা' ইত্যাদি। গৌরপদাবলীতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর (বারমাস্যা) বর্ণনা দেখি। অষ্টাদশ শতাব্দে 'রাধার চৌতিসা' 'রাধার বারমাসী' (বারমাস্যা) নামে কিছু কিছু কবিতা পাওয়া গিয়াছে চাটিগা অঞ্চলে। রচয়িতা—মদন দত্ত, শ্রীধর বানিয়া, ক্ষীণ দেবীদাস। পশ্চিমবঙ্গে মিলিয়াছে 'শ্রীকৃষ্ণ চৌতিশা', রচয়িতা জয়দেব।

এই সমস্ত নূতন লীলাপরিকল্পনার কিছু কিছু ইঙ্গিত রূপ গোস্বামী দিয়াছিলেন তাঁহার রচনায়। নূতন সৃষ্ট কাহিনীগুলির মধ্যে 'কলঙ্ক-ভঞ্জন' কাহিনীটি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। 'রাইরাজা' আখ্যান রূপ গোস্বামীর কীর্তি। 'কৃষ্ণকালী' আখ্যানে শাক্তদের প্রভাব থাকাও আশ্চর্য নয়। রূপ

১ পদকল্পতরু ২৭০৬

গোস্বামীর 'বিদগ্ধ-মাধব' নাটকে কৃষ্ণের গৌরীমূর্তি গ্রহণের কথা আছে। কলঙ্ক-ভঞ্জনের কাহিনীটি এইরূপ—গোকুলে রাধার কলঙ্কিনী নাম ঘুচাইবার জন্য কৃষ্ণ এক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিদারুণ পীড়ার ভাণ করিলে পর ব্রজমণ্ডলীর স্ত্রী-পুরুষ বালবৃদ্ধ সকলে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কৃষ্ণের এক সখা বৈদ্যবেশে আসিয়া ঔষধ দিয়া ব্যবস্থা দিল যে, যে নারী কায়মনোবাক্যে সতী সে যদি ধুচুনি করিয়া যমুনার জল আনিয়া সেই জল অনুপান যোগে ঔষধ খাওয়াইতে পারে তবে রোগী সঙ্গে সঙ্গে নীরোগ হইবে। গোকুলের খ্যাতনামা সতী নারীরা জল আনিতে গিয়া একে একে সকলেই ব্যর্থকাম হইল। শেষে রাধা গিয়া ধুচুনি (মতান্তরে সচ্ছিদ্র কলসী) ভরিয়া জল আনিল। তখন কৃষ্ণ আরোগ্যলাভ করিল এবং রাধা সতীশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইল।

এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা উনবিংশ শতাব্দের প্রায় শেষ অবধি অক্ষুন্ন ছিল।

॥ কলঙ্ক-ভঞ্জন ॥ (ঝুমুর সঙ্গীত)

সান্ত্বনা করিয়ে শ্রীরাধারে।
নিশি শেষে গেলেন কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে॥
রাই কলঙ্ক ঘুচাইতে, উপায় ভাবিযে চিতে
কপট রোগের যন্ত্রনাতে আকুল অন্তরে
চাপিয়ে যশোদার কোলে, মরি মা, মরি মা বলে॥
ধরয়ে রাণীর গলে ছটফট করে।
রাণী বলে ও নীলরতন, কেনরে বাপ কর এমন,
(গোপাল রে) ধরিতে পারি না জীবন
যাতনা তোর হেরে।
শয্যা পাতি ধরাতলে, শয়ন করায় গোপালে
পীতাম্বর দাস হৃদয় খুলে ডাক শ্রীকৃষ্ণেরে।

* * * *

ধন্য ধন্য রাই কমলিনী গো।
তব তুল্য সতী রমণী ভুবনে নাই গো॥
অসাধ্য সাধন করিলে, ছিদ্রকুম্ভে জল আনিলে
যারা কলঙ্কী রাধা বলে তাদের মুখে ছাই গো

আমরা যত কুলনারী, আনিতে নারিলাম বারি
শূন্য কুম্ভ কক্ষে করি, ফিরিলাম সবাই গো।
জটিলা কুটিলা তারা, লজ্জাতে প্রাণে মরা,
সতী গরবিনী হয়ে সতীত্ব হারাই গো।
জানিতে পারিলাম এখন, তুমি নারী-শিরোভূষণ
তাই আনিয়ে যমুনা-জীবন, বাঁচাও জগৎ-জীবন গো
তাই আনন্দে আজ গোপবৃন্দ
হেরিয়ে প্রাণের গোবিন্দ
আনন্দে মাতিল নন্দ ব্রজবাসী সবাই গো॥

॥ কৃষ্ণকালী-কাহিনী ॥

রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ-মাধব' নাটকে কৃষ্ণের গৌরী-মূর্তি ধারণের কথা আছে। কাহিনীটি এইরূপ—রাধা তাঁহার দুই সখী ললিতা ও বিশাখার সঙ্গে সূর্য্যপূজায় চলিয়াছেন। পৌর্ণমাসী রাধা ও কৃষ্ণের গোপন মিলনের ব্যবস্থা করিলেন। এদিকে চন্দ্রাবলীও তাঁহার দুই সখী পদ্মা ও শৈব্যার সঙ্গে চলিয়াছেন গৌরীতীর্থের দিকে চণ্ডিকার পূজা করিতে। এখানে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার গোপন মিলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু পৌর্ণমাসী রাধা ও ললিতাকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া চন্দ্রাবলী-কৃষ্ণ-মিলন বানচাল করিয়া দিলেন। পিতামহী করালিকার হস্তক্ষেপের ফলে চন্দ্রাবলীকে বাধ্য হইয়া কৃষ্ণের আশা ছাড়িতে হইল। কৃষ্ণ এই 'সংকটজনক পরিস্থিতিতে' গৌরীর মূর্তি গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধা জটিলার তর্জন হইতে বাঁচিয়া গেলেন এবং পরিশেষে রাধাব সঙ্গে মিলিত হইলেন।

পদাবলীতে প্রচলিত কাহিনীটি এই রকম—

বৃন্দাবনের কোন এক কুঞ্জে রাধা ও কৃষ্ণ গোপনে মিলিত হইয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া কুটিলা রাধার স্বামী আয়ান (অভিমন্যু) ঘোষকে বলিয়া দেয়। এই আয়ানের সহিত রাধার বাহ্যিক বিবাহ হইয়াছিল। রাধাকে শাস্তি দিবার জন্য আয়ান উগ্রমূর্তি ধরিয়া সেই দিকে আসিতেছিল। এই 'সংকটজনক' পরিস্থিতিতে কৃষ্ণ 'কালীমূর্তি' ধারণ করিলেন। আয়ান আসিয়া দেখিতে পাইল যে রাধা কালীপূজা করিতেছে। খুসী হইয়া সে গৃহে ফিরিয়া গেল।

রাধা ও কৃষ্ণ সে-যাত্রা নিস্তার পাইল। আয়ান ঘোষ কালীভক্ত ছিল। এই কাহিনীর মধ্যে শাক্তদের প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়।

॥ কৃষ্ণকালী ॥ (ঝুমুর সঙ্গীত)

প্রাণেশ্বরী একি বল মোরে।
বিপদে ফেলিয়ে তোমায় পলাইব ঘরে ॥
কাতরা হতেছ কেনে ধৈরজ ধর মন-প্রাণে।
আয়ান আসিয়া এখানে কি করিতে পারে ॥
বসিয়ে করহ পূজন নির্ভয় অন্তরে
কালী আরাধনা দেখে আয়ান ভাসিবে সুখে,
পবিত্রা বলিয়া লোকে জানিবে সকলে ॥
কালিকা করিলে দৃষ্ট সকলে হইবে হৃষ্ট
দাস পীতাম্বর ভজ কালী হৃদয় মাঝে ॥

॥ শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ ॥

কৃষ্ণকালী হলেন নিধুবনে।
বিপিন হইল আলো রূপের কিরণে ॥
চতুর্ভুজ এলোকেশী, দিগম্বর করে অসি,
লোলজিহ্বা অট্টহাসি, করালবদনে।
শিরেতে কিরীটি শোভা, প্রভাকর জিনি প্রভা,
মুণ্ডমালা গলে কিবা দুলিছে সঘনে।
নানা জাতি বনফুলে, রক্তজবা বিল্বদলে।
পূজ রাধা কুতূহলে অভয় চরণে।
আয়ান আসিয়া দেখে, রাধিকা পূজে কালিকাকে
অঙ্গ পূর্ণ হয় পুলকে লোটায় ধরাসনে।
কৃষ্ণ-কালীর পদকমল।
দাস পীতাম্বর সাধে কেবল,
দুরন্ত কৃতান্ত কবল, এড়াতে নিদানে।

(পীতাম্বর দাস)

(গ) চৈতন্য-পরবর্তী যুগ

চৈতন্য-পরবর্তী দ্বিতীয় উপস্তরেও গুরু-পরম্পরাক্রমে পদাবলী-রচনা চলিয়াছিল। কোন নূতনত্ব নাই কৃষ্ণলীলায়। ভাষা-মিশ্রের ব্যবহার ও শব্দচিত্রের আড়ম্বর দেখা যায়, আর আছে বৃন্দাবন-মথুরার প্রভাবে অবহট্‌ঠ-ঠাটে পদ-রচনা। 'পদাবলী-সংকলন' এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই পদ-চয়নিকাগুলিই বৈষ্ণব গীতি-কবিতাকে কালের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে।

পদাবলী সাহিত্যে বাৎসল্য রসের ভাল পদ বেশী নাই। বলরাম দাসের পর বিপ্রদাস ঘোষ এবিষয়ে কৃতিত্বের দাবী রাখে। তিনি কীর্তন-গানের 'রেনেটী' (রাণীহাটী) পদ্ধতির প্রচলন-কর্তা বলিয়া খ্যাত।

এ খীর নবনী দণ্ডে দণ্ডে খাও
তিলে তিলে লাগে ভোকছানি
খাইয়া মায়ের মাথা এত বেলা ছিলে কোথা
অ মোর কুলের যাদুমণি।
অদূর অরুণ প্রখর কিরণ
ঘামিয়াছে ও চান্দ-বদন ॥
বিম্বাধর তোমার মলিন হয়্যাছে
আহা মরি মায়ের পবাণ।
নিমিখ করিতে ভরসা না করি চিতে
মনে করি পাছে হই হারা।
বিপ্রদাস ঘোষে কয় মনে বড় বাসি ভয়
ঘর মাঝে তুমি ধন সারা ॥[১]

বৈষ্ণবশাস্ত্রে পণ্ডিত দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সপ্তদশ শতাব্দের শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' প্রথম বিশুদ্ধ পদাবলী সংগ্রহ। তিনি নিজেও একজন পদকর্তা ছিলেন। 'হরিবল্লভ' বা 'বল্লভ' ভণিতায় তিনি পদ লিখিয়াছেন, ভাষা ব্রজবুলি।

"কহ কহ এ সখি মরম কি বাত।
সো তোহে কি করল শ্যামর-গাত ॥

---

১ বা. সা. ই. ১ম খণ্ড পয়ার্ধ পৃ ১০৩

মনমথ-কোটি-মথন তনু-রেহ।
কৈছে উবরি তুহুঁ আওলি গেহ॥
কুলবতী কোটি হোয়ে যহিঁ অন্ধ।
পাওলি কছু কিয়ে সো মুখ-গন্ধ॥
যাকর মুরলী শ্রবণে যহিঁ লাগে।
বসতহি বসন শাশ-পতি-আগে॥
অব নিরধারসি কোন বিচার।
বল্লভ সে রস-সাগর পার॥"[১]

'ঘনশ্যাম দাস' নরহরি চক্রবর্তীর নামান্তর। ইহার পিতা জগন্নাথ বৈষ্ণববাচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। নরহরি একজন বিশিষ্ট পদকর্তা, সঙ্গীতজ্ঞ ও সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভক্তিরত্নাকর'। গ্রন্থটি বৈষ্ণব দর্শন ও ইতিহাসের বৃহৎ কোষ বলা যাইতে পারে। নরহরি একটি পদসংকলন আরম্ভ করিয়াছিলেন—নাম 'গীতচন্দ্রোদয়'। অবহট্‌ঠ-ঠাটে পদ রচনায় নরহরি নিপুণ ছিলেন।

আজু কি আনন্দ ভেল প্রথম মিলনে।
তিলে তিলে কত অভিলাষ উঠে মনে॥
কত না মিনতি করি ধরি ধনী পায়।
হিয়ারে মাঝারে রাখি চাঁদমুখ চায়॥
অধরে অধর দিতে অবশ হৈল।
রাই কোলে করি কানু অঙ্গ গড়াইল॥
নিকুঞ্জ-মন্দিরে কিবা শয়নমাধুরী।
নরহরি ইহা কি দেখিব আঁখি ভরি॥[২]

অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমার্ধে রাধামোহন ঠাকুর বিদ্যমান ছিলেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। নিজে একজন পদকর্তা ছিলেন কিন্তু তাঁহার রচিত পদে গোবিন্দদাসের দুর্বল অনুকরণ দেখা যায়। পদগুলির কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নাই। তাঁহার পদাবলী-সংগ্রহ 'পদামৃত-সমুদ্র' বিশেষ মূল্যবান, তিনি এই গ্রন্থের 'মহাভাবানুসারিণী' নামে একটি সংস্কৃত টীকা লিখিয়াছিলেন।

১ ক্ষণদাগীত চিন্তামণি বা. সা. ই, ১ম পরার্ধ পৃ ১০২
২ বৈঃ পঃ পৃ ৮৩০

অভিনব-জলধররুচির সুদেহ।
পীতাম্বর-বর তড়িত-থির-রেহ॥
জয় জয় গোবিন্দ গোকুল-ভাগি।
ব্রজ-নব-রমণী যাক মন লাগি॥
কত কোটি চাঁদ জিনিয়া বর মুখ।
যাকর দরশে মিটয়ে সব দুখ॥
নিরুপম-রূপ-জলধি অবতার।
রাধামোহন পহু মুরতি শিঙ্গার॥"[১]

দীনবন্ধু একজন প্রসিদ্ধ পদকার ছিলেন—

চলল দূতি কুঞ্জর জিতি
মন্থর-গতিগামিনী।
খঞ্জন দিঠি অঞ্জন মিঠি
চঞ্চল মতি চাহনী॥
জঙ্গল তট পন্থ নিকট
আসি দেখিল গোপিনী।
গোপ সঙ্গে শ্যাম রঙ্গে
গোঠে কয়ল সাজনী॥
না পাঞা বিরল আঁখি ছল ছল
ভাবিঞা আকুল গোপিকা।
নাহ রমণ দরশন বিনু
কৈছে জীয়ব রাধিকা॥
যমুনা কূল চম্পক মূল
তাঁহি বসিল নাগরী।
দীনবন্ধু পড়ল ধন্ধ
হইল বিপদ পাগলী॥"[২]

জগদানন্দ (১৭৮২-৮৩) এই সময়কার একজন প্রসিদ্ধ পদকার। ধ্বনি-ঝংকারে ও শব্দচিত্রে ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। পদরচনায় জগদানন্দ গোবিন্দদাস কবিরাজকে অনুসরণ করিয়াছেন। ইনি শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের বংশধর।

১ বৈ. প. পৃ ৮৯৭। ২ বা. সা. ই. ১ম খণ্ড, পরার্ধ (ডঃ সেন) পৃঃ ৩৯৮।

মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ
মধুপ শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতীফুলমালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী খঞ্জন-গতিহারী ॥
কাঞ্চনরুচিরুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিনী করকঙ্কন মৃদু ঝঙ্কত মনুহারী।
নাচত যুগ ভ্রু-ভুজঙ্গ
কালিদমনদমন রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীল শাড়ী ॥
দশন কুন্দকুসুম নিন্দু
বদন জিতল শরদ-ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে প্রেমসিন্ধু প্যারী।
ললিতাধরে মিলিত হাস
দেহদীপতি তিমির নাশ
নিরখি রূপ রসিক ভূপ ভুলল গিরিধারী ॥
অমরাবতী-যুবতিবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্দ
মন্দমন্দ-হসনা নন্দনন্দন-সুখকারী।
মণিমণিক নখবিরাজ
কনক নূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থলজলরুহ-চরণক বলিহারি ॥[১]

যাদবেন্দ্র—

আমার শপতি লাগে না যাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥

---

১ শ্রীজগদানন্দ পদাবলী পৃঃ ২১-২৩ (বা. সা. ই. প্রথম খণ্ড পরার্ধপৃঃ ৪০১-৪০২, ডঃ সেন)

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইয় সঙ্গ ছাড়া না হইয়
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে॥
ক্ষুধা হৈলে লইয়া থাইয় পথ পানে চাহি যাইয়
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইয় কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিবে তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইয় বাধা পানই হাতে খুইয়
বুঝিয়া যোগাবে রাঙা পায়।"[১]

অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগের উল্লেখযোগ্য পদকর্তা নটবর দাস। ইঁহার পদ-সঙ্কলন-গ্রন্থ (রসকলি) রসকলিকা হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি, পদটি পরে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হইল।
গুরু দুরজনে ভয় নাহি মনে
কোথা বা কি দেবা পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসিয়া পড়ে॥
রাজার ঝিয়ারী বয়সে কিশোরী
তাহে কুলবতী বালা।

১ বৈঃ পঃ পৃঃ ৯৫১

কিবা অভিলাষে বাড়াইলা লালসে
বুঝিতে নারি এ ছলা ॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইলা চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমানে
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে ॥”[১]

তৃতীয় উপস্তরের পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রশেখর-শশিশেখর। কেহ কেহ অনুমান করেন যে চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর দুই ভাই এবং আধুনিক বর্ধমান জেলার কাঁদড়া (কিংবা পড়ান) গ্রামনিবাসী গোবিন্দানন্দন ঠাকুরের পুত্র। তিনি বা তাঁহারা অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ পাদে জীবিত ছিলেন। “নায়িকা-রত্নমালা” নামক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে তাঁহাদের পদ পাওয়া যায়, অন্যত্র কিছু কিছু পদ মিলিয়াছে। ধীর ও চপল উভয় চালের ছন্দে লেখা পদে চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দে কীর্তন-গানের যে রীতি প্রচলিত ছিল তাহাতে চন্দ্রশেখরের অনেকখানি কৃতিত্ব ছিল। সে রীতি এখনো পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের মান-ঘটিত পদাবলী এখনো কীর্তনের আসরে প্রচলিত আছে। প্রথম পদটিতে দীনবন্ধুদাসের পদের অনুকরণ লক্ষণীয়। প্রথম পদ—

“জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর
চলত সো বরনারী।”
(নায়িকারত্নমালা) (সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত)

দ্বিতীয় পদ— “অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দ মধুর বহনা।” (বৈঃ পঃ পৃঃ ১০২৮)

তৃতীয় পদটি কোন প্রাচীন মৈথিল বা ব্রজবুলির পদের আধারে গঠিত—
মাধব দরশনে আনন্দ উপজল
পিরীতি সায়রে ডুবি রাই।”

---

১ নটবর দাসের রসকলিকায় উদ্ধৃত (বা. সা. ই. ১ম খণ্ড পর্য্যার্ধ পৃঃ ৩১৮-৩১৯, ডঃ সেন) বৈ. প. পৃঃ ৪৩

শচীনন্দন বিদ্যানিধি বর্ধমান জেলার চানক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পদকর্তা হিসাবে উল্লেখযোগ্য—

"যাকর পদদ্যুতি দরশনে নিগরব
কোটি কোটি মনমথ ভেল।
কুটিল দৃগঞ্চল বিদগধি বিহরণি
ত্রিভুবন মন হরি নেল॥
অভিনব জলধর- সুন্দর-আকৃতি
করতহি প্রেমবিহার।
ত্রিজগত যুবতীক ভাগিবরসাধন
মূরতি সিদ্ধি অবতার॥
সো অব নন্দহি নন্দন নাগর
তোহে করু আনন্দভোর।
শ্রীশচীনন্দন ও নবমাধুরী
বরণি না পাওল ওর॥"

(ঘ) আধুনিক যুগের ব্রজবুলি

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জন্মেঞ্জয় মিত্র 'সংকর্ষণ' ভণিতায় অনেকগুলি পদ লিখিয়াছিলেন। তিনি 'সঙ্গীত-রসার্ণব' নামে স্বরচিত পদগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তাঁহার পিতামহ মহারাজা পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর রচিত কয়েকটি ব্রজভাষার পদও সন্নিবিষ্ট করেন।

অকিঞ্চন :— শুন শুন সুবল সাঙ্গাতি।
কহনে না যায় সুখ আজিকার রাতি॥
রাইক প্রেম-মহিমা নাহি ওর।
পরশি রহই তনু হিয়া হিয়া জোড়॥
ভাবে বিভোর রাই মঝু পরসঙ্গ।
অনিমিখ হেরই নয়ন তরঙ্গ॥
রসবতী রাই কতহু রস জান।
প্রেমরসে বান্ধই হামারি পরাণ॥
সে ধনী অধরে অধর যব দেল।
রাজহংসী যেন সরোবরে খেল॥

ভণই অকিঞ্চণ নাগর সুজান।
ইহ রসলীলা সব তুহুঁ জান॥ (বৈঃ পঃ ১০৩৭)

কমলাকান্ত দাস বর্ধমান জেলার সিউর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ব্রজবুলিতে ভাল পদ লিখিয়াছেন। একটি 'পদ-সংগ্রহ' প্রকাশ করিয়াছেন। নাম 'পদ-রত্নাকর'।

শ্যাম গুণ- ধাম বিনে
যাম যুগ ভেল।
কাম শর দাম অব
ভেল মুঝে শেল॥
ভ্রমর-কুল- নাদে অব-
সাদ মঝু প্রাণ।
কুঞ্জ মন- রঞ্জ ভয়-
পুঞ্জ সম ভান॥
কোকিল-কল- ভাষে অব
ত্রাস ভেল চীত।
সঙ্গ-সুখ লাগি মম
অঙ্গ ভেল ভীত॥
গন্ধ সহ গন্ধবহ
মন্দগতি ভেল।
ইহ সুখদ বিপিন-ক্রম-
দাম দুখ দেল॥
বিকচ ফুল- বৃন্দ চিত
গন্ধ হরি গেল।
সবল হৃদি কমল অব
তরল মতি ভেল॥"

মধুসূদন দত্ত— "কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি,
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা ?"

আবার,— "কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ?"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ—

"কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজ কি কিশোর সই, তাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ॥
মিলি গেই নাগরী, ভুলি সেই মাধব,
রূপ-বিহীন গোপ কুঙারী।
কো জানে পিয় সই রসময় প্রেমিক,
হেন বঁধু রূপ কি ভিখারী॥"

আবার— শুনহু শ্রবণ পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে
যব শুনন্ লাগি সই, সো মধুর বোলি,
জীবন না গেলো?
ধায়নু পিয় সই, সোহি উপকূলে
লুটায়নু কাঁদি সই শ্যাম পদমূলে।
সোহি পদমূলে রই, কাহে লো হামারি
মরণ না ভেলো?

॥ ভানুসিংহ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)॥

"গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।

অঙ্গে চারু নীল বাস,
হৃদয়ে নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ বনমে আও লো॥
ঢালে কুসুম সুরভ ভার
ঢালে বিহগ সুরব সার
ঢালে ইন্দু অমৃত ধার
বিমল রজত ভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে,
বকুল যুথি জাতি রে॥
দেখ সজনি শ্যামরায়
নয়নে প্রেম উথল যায়
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে॥"

উনবিংশ শতাব্দের প্রথম ভাগেও পূর্ববৎ পদাবলী রচনা হইতেছিল। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব রাজেন্দ্রলালের পিতা জন্মেজয় মিত্র 'সঙ্কর্ষণ' ভণিতায় অনেকগুলি বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ তিনি 'সঙ্গীত-রসার্ণব' নামে স্বরচিত পদগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ইহাতে তাঁহার পিতামহ পিতাম্বর মিত্র রচিত কয়েকটি ব্রজভাষার পদও দিয়াছেন। জন্মেজয় মিত্র প্রাচীনপন্থী পদকর্তাদিগের মধ্যে কনিষ্ঠতম। ইহার সমসাময়িক রঘুনন্দন গোস্বামীও অনেকগুলি বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু দিক্‌পাল বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে পদ রচনা করিয়াছেন বা 'বৈষ্ণব পদ' রচনা করিয়াছেন। পদাবলীর খাত দিয়াই প্রাচীন ও নবীন ধারার সংযোগ হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অখণ্ডতা ও ধারা-বাহিকতা

রক্ষিত এবং তাহা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাগর-সঙ্গমে চরিতার্থতা-প্রাপ্ত।

॥ সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব পদাবলী ॥

জয়দেব হইতেই বৈষ্ণব পদাবলীর আরম্ভ বলা যায়। জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু অবহট্‌ঠের ছন্দের দোলা ও ভাব-সম্পদ যুক্ত হইয়া সে সংস্কৃত ভাষা আরও কোমল ও সরস হইয়া উঠিয়াছে। আবার, জয়দেবকে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় সভা-সাহিত্যের উদ্বোধকও বলা হইয়া থাকে। জয়দেবই প্রথম রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া একটা গোটা কাব্য রচনা করেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রাধাকৃষ্ণের লীলা-স্মরণ লীলা-আস্বাদনের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বকালীয় সংস্কৃতে রচিত প্রেমকাব্যের রীতি ও প্রকাশ-ভঙ্গি অবলম্বন করিয়া জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে যাঁহারা সংস্কৃতে পদাবলী রচনা করিয়াছেন তাঁহারা পূর্বতন কবি এবং জয়দেবকে অনুসরণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা, ব্রজবুলি প্রভৃতি ভাষায় পদাবলী রচিত হইবার পর যাঁহারা সংস্কৃতে পদাবলী রচনা করেন, তাঁহাদের রচনায় নব্য ভারতীয় ভাষা বা আধুনিক ভাষার প্রভাবও দেখা দিয়াছে। অনেকে আবার আধুনিক ভাষা ও সংস্কৃত উভয় বন্ধেই পদ-রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সমস্ত রচনায় নানা মিশ্র উপাদান লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ পূর্বতন সংস্কৃত-প্রাকৃতে রচিত প্রেম কবিতার ধারাকেই বৈষ্ণব কবিগণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অনুসরণ করিয়াছেন। ব্রজবুলিতে ও বাঙ্গালাতে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার মত সংস্কৃতে পদাবলী-রচনা তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই। অতি অল্প কয়েকজন বৈষ্ণব কবি সংস্কৃতে পদ রচনা করিয়াছেন

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র গানগুলির ভাষা সংস্কৃত কিন্তু সেগুলির ছন্দ অপভ্রংশের। অপভ্রংশ ছন্দের লালিত্য ও অনায়াস-প্রবাহ এগুলিতে দেখি। জয়দেবের গানগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ধ্বনি-ঝংকার ও পদলালিত্য। অপভ্রংশের আর একটি বড় বিশেষত্ব হইল অন্ত্যমিলময় ছন্দ॥ যেমন,

"জিণি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআসিঅ
মুট্‌ঠি অরিট্‌ঠি বিণাস করু
গিরি তোলি ধরু

জমলজ্জুণ ভঞ্জিঅ পঅভর গঞ্জিঅ
কালিঅকুল সংহার করু
জসে ভুঅণ ভরু ॥ (প্রাকৃত-পৈঙ্গল ২০৭)

অথবা,—

ঘরেঁ অচ্ছই বাহিরে পেচ্ছই
পই দেক্খই পড়িবেসী পুচ্ছই।
সরহ ভণই বড় জাণউ অপ্পা
ণউ সো ধেঅ ণ ধারণ জপ্পা ॥ (দোহাকোষ)

ইহার সহিত জয়দেবের পদের তুলনা করা যায়। যথা—

পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্ ॥
উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে ॥
(গীতগোবিন্দে ৫।১১)

প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার ছন্দে পাদান্ত বা চরণান্তিক মিল (Rhyme) বলিয়া কিছু নাই। অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ কবিতায় এবং তাহা হইতে প্রাদেশিক ভাষার কবিতায় চরণান্ত বা পাদান্ত মিল দেখা যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভাষায় অন্ত্যমিলময় ছন্দ দেখা যায়; পরবর্তীকালে জয়দেবের অনুকরণে যাঁহারা সংস্কৃতে বৈষ্ণব পদাবলী লিখিয়াছেন তাঁহারা জয়দেব ও অবহট্‌ঠ বা প্রাদেশিক ভাষা হইতে অন্ত্যমিলময় ছন্দরীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং জয়দেবের পদলালিত্য অনুসরণ করিয়াছেন।

জয়দেবের একটি পদে আছে, রাধার বিরহে কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। সেই কথা সখী রাধার নিকট নিবেদন করিতেছে।

॥ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ॥
(শ্রীরাধার প্রতি সখী)
দেশবরাড়ীরাগ, রূপকতাল

বহতি মলয়-সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায় ॥

সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥
দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি।
পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি।
ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥
বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম।
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥
ভণতি কবিজয়দেবে বিরহবিলসিতেন।
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন ॥

—'সখি, তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, (তাহার উপর) এখন মদনোদ্দীপক মলয়সমীর প্রবাহিত হইতেছে, বিরহিগণের বেদনা-দায়ক কুসুমসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। চন্দ্রকিরণে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছেন, কুসুমপতনে মদনবানভ্রমে অতিশয় বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতেছেন। তিনি অলিগুঞ্জন শুনিয়া হস্তদ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন এবং বিরহজনিত মনোবেদনায় এই রাত্রিকালে ক্ষণে ক্ষণে যাতনা ভোগ করিতেছেন। মনোহর বাসভবন ত্যাগ করিয়া তোমার জন্য তিনি বনবাসী হইয়াছেন এবং তোমার নাম লইয়া বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইতেছেন। কবি জয়দেব ভণিত হরিবিরহবিলসিত সঙ্গীত শ্রবণের পুণ্যফলে রসবৈভবযুক্ত ভক্তদের মনে হরি উদিত হউন।'

কবি জয়দেব বাস্তব নরনারীর বিরহ-বেদনা অবলম্বন করিয়াই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পদের ভণিতায় শ্রীকৃষ্ণের বিরহের অপার্থিব প্রেমলীলার কথা বলিয়াছেন কিন্তু পদটি পাঠ করিলে মনে হয় যেন 'হরিশরণ' ও 'বিলাসকলা' উভয়ের বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য। বাস্তব নায়ক-নায়িকার মিলনসাধনে সখীদের এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, এখানেও আমরা তাহাই দেখিতেছি। এই সংস্কৃত পদটির ছন্দ কিন্তু অবহট্‌ঠের। সংস্কৃতে চরণের শেষে মিল দেখা যায় না। তাছাড়া, পদটির লালিত্যও অপভ্রংশের প্রভাব স্মরণ করাইয়া দেয়। সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ শ্লোকগুলিতে নরনারীর বিরহ-বেদনার যে চিত্র পাই, তাহাই যেন এখানে আরও সরসভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। পদটির ধ্বনি-ঝংকার অপরূপ।

জয়দেবের অনুকরণে সংস্কৃতে গীতিকবিতা (বা বৈষ্ণব পদাবলী) কিছু কিছু লেখা হইয়াছিল। জয়দেবের রচনার পরই নাম করিতে হয় রূপ গোস্বামীর 'গীতাবলীর'। গীত-গোবিন্দের ও গীতাবলীর মাঝখানে পাইতেছি দুইটি 'ধ্রুবাগীতি'। প্রথম গানটি (পদটি) কৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি।

॥ গান্ধার রাগ ॥

কেশব কলমমুখী-মুখকমলম্
কমলনয়ন, কলয়াতুলমমলম্।
কুঞ্জগেহে বিজনেঽতিবিমলম্।
স্বরুচিরহেমলতাবলম্ব্য তরুণতরুং ভগবন্তম্
জগদবলম্বনমবলম্বিতুমনুকলয়তি সা তু ভবন্তম্ ॥[১]

—'ওহে কমলনয়ন কেশব, কমলমুখী (রাধার) অতুল অমল অতি বিমল মুখকমল কুঞ্জগেহে দেখ গিয়া। সুশোভিত হেমলতা অবলম্বন করিয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছে, জগদবলম্বন তরুণতরু ভগবান্ তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য।'

উক্ত পদটির লালিত্য, ধ্বনিঝংকার ও চরণান্তিক মিল জয়দেবের গানগুলির মতই। অনুপ্রাস-রূপকাদি অলংকারও সার্থকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে জগদবলম্বন ভগবান্ কেশবের প্রতি ভক্তি নিবেদিত হইয়াছে অর্থাৎ বৈষ্ণব পদাবলী হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের এই অপার্থিব প্রেমলীলায় সখী-দূতীর ভূমিকাও লক্ষণীয়। লৌকিক নায়ক-নায়িকার মিলনব্যাপারে সখীরা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে। এখানেও দেখিতেছি রাধার সহিত কৃষ্ণের মিলন ঘটাইবার জন্য দূতী মধ্যস্থতা করিতেছে। দ্বিতীয় গানটি—কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি।

॥ শ্রীরাগ ॥

রসিকেশ কেশব হে।
রসসরসীমিব মামুপযোজয়
রসমিব রসনিবহে ॥

"হে রসিকরাজ কেশব, আমাকে রসাবগাহনার্থে রসসরসীর মত অঙ্গীকার কর।"

---

১ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড চতুর্দশ অধ্যায়। প্রাচ্যবাণী মন্দির প্রবন্ধাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২০৩।

পদটিতে দেখি রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিতেছেন। 'স্বয়ং-দূতিকা' নায়িকা নায়ককে মিলনের জন্য আহ্বান জানাইতেছে—মর্ত্যপ্রেমের এই ছবিটির আদর্শ যেন গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের পূর্বে রচিত পদাবলীতে মর্ত্যরস ও আধ্যাত্মিক রস হাত ধরাধরি করিয়া বিরাজ করিত। পদটির রচনাশৈলী জয়দেবের গানের মত।

কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্র জয়দেবের প্রায় একশ বছরের আগেকার কবি। কবি ক্ষেমেন্দ্র জয়দেবের ধরণের একটি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ লিখিয়াছিলেন সংস্কৃতে। ইহার রচিত ভণিতাহীন গানটি 'দশাবতার-চরিত্রে' (৮।১৭৩) আছে। কৃষ্ণ মথুরা চলিয়া গেলে ব্রজগোপীরা এই গান গাহিয়াছিল।

ললিতবিলাসকলাসুখখেলন-
ললনালোভনশোভনযৌবন-
মানিতনবমদনে।
অলিকুল-কোকিলকুবলয়কজ্জল-
কালকলিন্দসুতাবিবলজ্জল-
কালিয়কুলমদনে।
কেশিকিশোরমহাসুরমারণ-
দারুণগোকুলদুরিতবিদারণ-
গোবর্ধনধরণে।
কস্য ন নয়নযুগং রতিসজ্জে
মজ্জতি মনসিজতরলতরঙ্গে
বররমণীরমণে॥

—"ললিতবিলাসকলায় সুখক্রীড়ায় নারীপ্রিয় শোভনযৌবনের দ্বারা যিনি মান্য নব মদন স্বরূপ, অলিকুল কোকিল কুবলয় কজ্জল কালো যমুনার জলরাশি এবং কালিয়নাগবংশ যিনি জয় করিয়াছেন, অশ্বদানব কেশী প্রভৃতি মহা অসুর মারিয়া যিনি গোকুলের দারুণ বিপদ দূর করিয়া গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, রতিসাজে সজ্জিত উত্তাল কামসমুদ্র, সেই শ্রেষ্ঠ রমনী-আকাঙ্খিত কৃষ্ণে কাহার নয়নযুগল মগ্ন না হয়।"

হোসেন শাহের অধীনে কাজ করিবার সময়েই রূপ গোস্বামী কৃষ্ণলীলা-বিষয়ে কয়েকটি সংস্কৃতকাব্য ও কতকগুলি সংস্কৃত গীতিকা রচনা করেন। সংস্কৃতে রচিত গানগুলি (পদাবলী) জয়দেবের গান অনুসরণ করিয়া লেখা।

এগুলি পরে 'গীতাবলী' নামে সংকলিত। শ্রীচৈতন্যের সহিত দেখা হইবার পূর্বেই এগুলি রচিত ও সংকলিত হয়। বড় ভাই সনাতন রূপের গুরু ছিলেন। নামটির মধ্যে শ্লেষ আছে—এক অর্থে ভণিতা আর এক অর্থে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। পরবর্তীকালে কোন কোন বৈষ্ণব কবি সংস্কৃতে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেগুলি রূপ গোস্বামীর রচনার চেয়ে নিকৃষ্ট। 'গীতাবলী' হইতে দুইটি গান উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম গানটি বিভাস রাগে গেয়। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রি কাটাইয়া প্রাতঃকালে শ্রীরাধার কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে রতিচিহ্ন দেখিয়া কুপিতা শ্রীরাধা নিজেকে খণ্ডিতা ও অপমানিতা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি খেদোক্তি বর্ষণ করিতেছেন।

॥ খণ্ডিতা ॥

বিভাস

হৃদয়ান্তরমধিশয়িতম্।
রময় জনং নিজ-দয়িতম্॥
কিং ফলমপরাধিকয়া।
সম্প্রতি তব রাধিকয়া॥
মাধব পরিহর পটিমতরঙ্গম্।
বেত্তি ন কা তব রঙ্গম্॥
আঘূর্নতি তব নয়নম্।
যাহি ঘটীং ভজ শয়নম্॥
অনুলেপং রচয়ালম্।
নশ্যতু নখ-পদ-জালম্।
ত্বামিহ বিহসতি বালা।
মুখর-সখীনাং মালা॥
দেব সনাতন বন্দে।
ন কুরু বিলম্বমলিন্দে॥ (গীতাবলী ২৯)

(বৈঃ পঃ পৃ ১৭৯)।

"—তোমার হৃদয়াধিষ্ঠিতা নিজ দয়িতার মনোরঞ্জন কর, এখন আর অপরাধিনী রাধার নিকট তোমার কোন্ প্রয়োজন? মাধব, প্রবঞ্চনা-চাতুর্য পরিত্যাগ কর, তোমার রঙ্গ কে না জানে? (রাত্রি জাগরণে) ঘুমে দুটি আঁখি

ঢুলু ঢুলু, যাও কিছুক্ষণ শয্যায় গিয়া ঘুমাও। অনুলেপন মাখিয়া (তোমার প্রিয়তমার কৃত) নখক্ষতগুলি ঢাকিয়া ফেল। মুখরা যুবতী যত সহচরীদল তোমাকে উপহাস করিতেছে, সহিতে পারিতেছি না। দেব সনাতন তোমাকে প্রণাম। অলিন্দে আর বিলম্ব করিও না। (হে দেব, ভক্ত সনাতন তোমাকে প্রণাম করিতেছে। তুমি আর শ্রীমতীকে মিথ্যা বাক্যে উত্যক্ত করিও না")।

সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যে চিত্রিত বাস্তব প্রেমে খণ্ডিতা নায়িকার অবস্থার অনুকরণে রূপ গোস্বামী শ্রীরাধার 'খণ্ডিতা' অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। পদটিতে 'রাধা', 'মাধব' 'বন্দে দেব সনাতন' প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও পুরাপুরি অধ্যাত্মরসের কবিতা হইয়া উঠে নাই, ভক্তিরস তেমন গাঢ় হয় নাই। মর্ত্যরসই যেন বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথবা বলিতে পারি উভয়েরই সংমিশ্রন হইয়াছে। লৌকিক 'খণ্ডিতা' নায়িকার মতই যেন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছেন। পদটিকে কৃতাপরাধ নায়কের প্রতি খণ্ডিতা নায়িকার উক্তি বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। পদটিতে ছন্দের সাবলীল প্রবাহ ও অন্ত্যানুপ্রাস লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় গানটি গান্ধার রাগে গেয়। শ্রীকৃষ্ণ বহুদিন হইল মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। সখী-দূতী মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার বিরহ-বেদনা নিবেদন করিতেছে।

॥ গান্ধার ॥

কুর্বতি কিল কোকিলকুল
উজ্জ্বল-কল-নাদং।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি
জল্পতি সবিষাদং ॥
মাধব তব বিয়োগ-তমসি
নিপততি রাধা।
বিধুর-মলিন- মূর্তিরধিক-
সমধিরূঢ়-বাধা ॥
নীল-মলিন- মাল্যমহহ
বীক্ষ্য পুলক-বীতা।
গরুড় গরুড় গরুড়েত্যভি-
রৌতি পরম-ভীতা ॥

লম্বিত-মৃগ- নাভিমগুরু-
কর্দমমনুদীনা।
ধ্যায়তি শিতি- কণ্ঠমপি
সনাতনমনুলীনা ॥ (বৈঃ পঃ পৃ ১৮৬)
(পদকল্পতরু, ১৯১৩)

—"মাধব, তোমার বিরহরূপ দারুণ অন্ধকারে রাধা নিপতিতা হইয়াছেন। তাঁহার বেদনাকাতর মলিনদেহ অধিকতর বলবতী পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। কোকিলকুল মধুর কলনাদ করিলে অশনিপতন আশংকায় তিনি বিষাদে 'জৈমিনি' 'জৈমিনি' উচ্চারণ করিতেছেন। নীলোৎপলের মালা দেখিয়া কৃষ্ণসর্প ভাবিয়া রোমাঞ্চিত দেহে অত্যন্ত ভয়ে রোদন করিতে করিতে রাধা 'গরুড়' 'গরুড়' বলিয়া ডাকিতেছেন, মৃগনাভিমিশ্রিত অগুরু চন্দন দর্শনে কাতরা হইয়া তিনি সনাতন (শ্রীকৃষ্ণচিন্তা) লীলায় তন্ময় হইয়াও (মৃগনাভির শ্যামবর্ণ সাদৃশ্যে কন্দর্পভ্রমে) মহাদেবের ধ্যান করিতেছেন।"

পদটিতে অপার্থিব রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু যে কোন প্রাকৃত নায়িকার বিরহবেদনার বর্ণনা বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই পদটির রচনা-কৌশল ও ভাব পরবর্তীকালে রচিত চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের একটি ব্রজবুলি পদকে স্মরণ করাইয়া দেয়। পদটিতে জয়দেবের প্রভাব তো আছেই তার সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। রূপ গোস্বামীর পূর্বে প্রাদেশিক ভাষাতে বহু বৈষ্ণব পদ রচিত হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দের গোড়ার দিকে রামানন্দ রায় 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক লিখেন। ইহাতে একুশটি গান আছে, সবই সংস্কৃতে রচিত। নাটকের গানগুলি শ্রীচৈতন্য শুনিতে ভালবাসিতেন। রামানন্দ উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। নাটকে শ্রীচৈতন্যের নাম না থাকিলেও মনে হয় শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রথম মিলনের পর নাটকটি লিখিত। 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের সংস্কৃত গান প্রায় সবই জয়দেবের অনুকরণে রচিত। ভণিতায় কবি রাজার নাম করিয়াছেন। একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি।

॥ শ্রীরাধার অভিসার ॥

॥ শ্রীরাগ ॥

চিকুর-তরঙ্গক- ফেন-পটলমিব
কুসুমং দধতী কামম্।
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ
নর্ত্তিতুমতনুমবামম্॥
রাধা মধুর-বিহারা।
হরিমুপগচ্ছতি মন্থরপদগতি-
লঘু-লঘু-তরলিত-হারা॥
শঙ্কিত-লজ্জিত- রসভঙ্গ-চঞ্চল-
মধুর-দৃগন্তলবেন॥
মধু-মথনং প্রতি সমুপহরন্তী
কুবলয়-দাম-রসেন॥
গজপতি-রুদ্র- নরাধিপমধুনা-
তন-মদনং মধুরেণ।
রামানন্দ-রায়- কবি-ভণিতং
সুখয়তু রস-বিসরেণ॥ (বৈঃ পঃ ১৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)

—"তরঙ্গায়িত (কৃষ্ণ) কেশকলাপে ফেনপুঞ্জ সদৃশ (শুভ্র) পুষ্পরাজি ধারণ করিয়া শ্রীরাধা শুভসূচক স্পন্দিত বাম নয়নের ইঙ্গিতে রতি-বিরহিত কামদেবকে যেন নর্তনের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। মধুর লীলাবিলসিনী শ্রীরাধার মৃদু পদসঞ্চারে বক্ষের মুক্তা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপনীতা হইয়া লজ্জা ও আশংকায় কম্পিত রসলীলায়িত কটাক্ষ-পরম্পরায় তাঁহাকে যেন প্রীতির নীলোৎপল মাল্য উপহার অর্পণ করিতেছেন। কবি রামানন্দ রায় রচিত এই সঙ্গীত সুমধুর রসপ্রসারে মদনের অধুনাতন অবতার গজপতি প্রতাপরুদ্রকে সুখদান করুক।"

পদটিতে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাকৃত নায়িকার মতই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য অভিসারোচিত বেশ ধারণ করিয়া যাত্রা করিতেছেন। পদটির ধ্বনি-ঝংকার ও পদলালিত্য জয়দেবের মত। কবি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য রসেরই বর্ণনা করিয়াছেন।

জীব গোস্বামী সনাতন ও রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র ও অনুপমের (বল্লভের) পুত্র। পিতার মৃত্যুর সময় ইনি শিশু ছিলেন। দেশে থাকিয়া লেখাপড়া শেষ করেন। পরে নিত্যানন্দের আশীর্বাদ লইয়া বৃন্দাবনে আসেন এবং সনাতন ও রূপের নিকট বৈষ্ণব মত শিক্ষা করেন। সনাতন ছিলেন রূপের গুরু আর রূপ হইলেন জীবের গুরু। জীব পিতৃব্যদের উপদেশ অনুসারে সংস্কৃতে বৈষ্ণব মতের তত্ত্ব ও দর্শন লিখেন। জীব 'গোপাল-চম্পূ' নামে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ছত্রিশটি গান আছে। সেগুলি বড় কবিতার মত করিয়া রচিত, গানের জন্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্যই বোধ হয় কোন বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। এখানে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।[১]

রাধা-রাকা-শশধর মুরলীকর গোকুলপতিকুলপাল
জয় জয় কৃষ্ণ হরে
রাধা-বাধা-মোচন সুখরোচন বিদলিত-গোকুল-কাল
জয় জয় কৃষ্ণ হরে ॥
রাধা-পরিকর-পুণ্যদ নৈপুণ্যদ গোকুলরুচিযু বিশাল
জয় জয় কৃষ্ণ হরে।
রাধা-সুকৃতবশীকৃত মঙ্গলভূত তিলকিত-গোকুল-ভাল
জয় জয় কৃষ্ণ হরে।
রাধা-নিজগতিধর্মদ পুরুশর্মদ হতগোকুলরিপুজাল
জয় জয় কৃষ্ণ হরে।
রাধা-জীবন-জীবন গোব্রজধন গোকুলসরসি মরাল
জয় জয় কৃষ্ণ হরে ॥
রাধা-মোদরসাকর সরসিজবর গোকুল-নন্দন-নাল
জয় জয় কৃষ্ণ হরে।
রাধা-ভূষণ-ভূষণ গতদূষণ গোকুল-হৃদ্দল-ভূপাল
জয় জয় কৃষ্ণ হরে ॥[১]

"হে রাধারূপ রজনীর পূর্ণচন্দ্র! হে মুরলীধর! হে গোকুলপতিপালক! হে কৃষ্ণ, হে হরি! তোমার জয় হউক, জয় হউক। হে রাধার বাধাসমূহের অপসারণে

---

১ ডঃ সুকুমার সেনের 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে' উদ্ধৃত।

আনন্দিত। হে বৃন্দাবনের অরিষ্টধ্বংসকারিন্। হে কৃষ্ণ, হে হরি! তোমার জয় হউক। হে রাধার পরিবারদের আনন্দবিধানকারিন্! হে নৈপুণ্যদায়িন্! হে গোকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্মান্, হে কৃষ্ণ, হে হরি! তোমার জয় হউক। জয় হউক। হে রাধা-সুকৃত-বশীভূত! হে মঙ্গলপ্রদায়ক! হে গোকুলের কপালে তিলক (অলংকারস্বরূপ)! হে কৃষ্ণ! হে হরি, তোমার জয় হউক, জয় হউক! হে রাধার আচরণের পুণ্যদায়ক! হে অনন্তসুখবিধায়ক! হে গোকুলের শত্রুকুলনাশন্! হে কৃষ্ণ! হে হরি, তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক। হে রাধার জীবনের জীবন! গোসমূহ ও ব্রজের ধন! হে বৃন্দাবন-সরোবরের রাজহংস! হে কৃষ্ণ! হে হরি! তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক। হে রাধার আনন্দরসের ইন্দীবর! গোকুলের আনন্দনাল! হে কৃষ্ণ! হে হরি, তোমার জয় হউক। তোমার জয় হউক। হে রাধার ভূষণের ভূষণ! হে দোষলেশশূন্য! হে গোকুলের হৃদয়রাজ, হে কৃষ্ণ, হে হরি, তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক।" পদটিতে জীব গোস্বামীর শুদ্ধা কৃষ্ণ-ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। জীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের মাধুর্য্যলীলার বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় ঐশ্বর্য্যলীলার কথা উল্লেখ করেন নাই। গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলারই উপাসক।

লোচনান্দদাস বা লোচন দাস 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। পদকর্তাদের মধ্যে ইঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইনি সংস্কৃতেও একটি পদ বা গান লিখিয়াছেন। পদটি রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটকেব পঞ্চম অংকের সর্বশেষ গানের সংস্কৃত ভাবানুবাদ। দুই একটি আধুনিক ভাষার শব্দও আছে। রায় রামানন্দের নাটকের গান—

> পরিণত-শারদ-শশধর-বদনা।
> মিলিতা পানিতলে গুরুমদনা॥
> দেবি, কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টম্।
> বহুতর-সুকৃত-ফলিতমনুদিষ্টম্॥
> পিক-বিধু-মধু-মধুপাবলী-চরিতম্।
> রচয়তি মামধুনা সুখভরিতম্॥
> প্রণয়তু রুদ্রনৃপে সুখমমৃতম্।
> রামানন্দ-ভণিত-হরিরমিতম্॥

লোচনের সংস্কৃত ভাবানুবাদ—

নিরমল-শারদ-শশধর-বদনী।
বিদলিত-কাঞ্চন-নিন্দিত-বরণী॥
পিক-রুত-গঞ্জিত-সুমধুর-বচনা।
মোহন-কৃত-করি-শত-শত-মদনা॥
দেবি শুনু বচনং মম সারম্।
কিল গুণধাম মিলিতমনুবারম্।
চিরদিন-বাঞ্ছিতং যদিহ মদিষ্টম্।
তব কৃপয়াপি ফলিত-মনোঽভীষ্টম্॥
ইদমনু কিং মম যাচিতমস্তি।
নিখিল-চরাচরে প্রিয়মপি নাস্তি॥
প্রণয়তু রসিক- হৃদয়-সুখমমিতম্।
লোচন-মোহন-মাধব-চরিতম্॥[১]

—"তাঁহার (রাধার) বদন শারদচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, তাঁহার অঙ্গের বর্ণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণকেও লজ্জা দেয়। তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর কোকিলের কলস্বরকেও হার মানায়। তিনি শত শত মদনকেও বশীভূত করিয়াছেন। দেবি, আমার সার কথা শোন, সর্বগুণধাম (কৃষ্ণের) সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তোমার কৃপায় আমার বহুদিনের বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। ইহার পর আমার আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে? জগতে ইহার চেয়ে প্রিয় আমার আর কিছু নাই। লোচনের (পদকর্তার) মনোমুগ্ধকর মাধবের কর্মসমূহ রসিকজনের আনন্দ বিধান করুক।"

পদটিতে রাধাকৃষ্ণের প্রতি হৃদয়ের গভীর ঐকান্তিক ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। এই অহেতুকী ভক্তিই বৈষ্ণবদের সারবস্তু।

ষোড়শ শতাব্দের একেবারে শেষের দিকে প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ 'সঙ্গীতমাধব' নামে যে 'সঙ্গীত-নাটক' বইটি লিখিয়াছিলেন তাহা নামমাত্রে পর্যবসিত। তবে ঐ নাটকের গান বৈষ্ণব-পদাবলী-সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে। গোবিন্দদাসের আগে বাঙ্গালা দেশে কেহ 'সঙ্গীত-নাটক' লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গোবিন্দদাসের পদটি এই—

১। ডঃ সুকুমার সেনের 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে' উদ্ধৃত।

শ্রীরাগ

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতম্।
ব্রজবনিতা-কুচ-কুঙ্কুম-ললিতম্॥
বন্দে গিরিবর-ধর-পদ-কমলম্।
কমলা-কর-কমলাঞ্চিতমমলম্॥
মঞ্জুল-মণি-নূপুর- রমণীয়ম্।
অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ম্॥
অতিলোহিতমতিরোহিতভাসম্।
মধু-মধুপীকৃত-গোবিন্দদাসম্॥[১]

"তোমার শ্রীচরণকমল ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ এবং পদ্মাদি চিহ্নিত এবং ব্রজবনিতার কুচকুঙ্কুমে পরিশোভিত। গিরিধর, সেবানিরতা কমলার করকমলাঞ্চিত, তোমার অমল পদকমল বন্দনা করি। ঐ শ্রীচরণদ্বয় মঞ্জুল মণিমঞ্জীরে সুন্দর, এবং অচপল কুলরমণীগণের আকাঙ্ক্ষিত। গোবিন্দদাসকে ঐ অবিলুপ্তকান্তি আরক্ত পদ-কমলের মধুর মধুপ করিয়াছ।"

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর ঐ পদটিকে খণ্ডিত নায়িকার পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পদকর্তার হৃদয়ের ঐকান্তিক ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

গোবিন্দদাসের সম-সাময়িক লেখক পুরুষোত্তম মিশ্রের রচিত একটি ধ্রুবাগীতির সন্ধান পাওয়া যায়।

সুজন বদ মধুরিপুনাম
দুষ্কৃতমপহায় যাহি দুর্লভহরিধাম।
পুত্রমিত্রবান্ধবগণমিহ ন কলয় সত্যম্
পুরুষোত্তমমিশ্র-গদিতমনুভাবয় নিত্যম্।[২]

—"সুজন হে, মধুসূদনের নাম বল আর দুষ্কার্য ত্যাগ করিয়া দুর্লভ হরির স্থানে চলিয়া যাও। এ জগতে পুত্রমিত্র-কুটুম্ব প্রভৃতির উপরে আস্থা রাখিও না। পুরুষোত্তম মিশ্রের এই উক্তি সর্বদা স্মরণ কর।"

পদটিতে দেখা যায় সমস্ত ত্যাগ করিয়া হরির শরণ লইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং হরিনাম-সংকীর্তনের কথাও বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন ও শরণাগতি বৈষ্ণবদের সারবস্তু। জয়দেবের অনুসরণে পদটি রচিত।

---

১ বৈষ্ণব পদাবলী—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৬৬
২ নরহরি চক্রবর্তীর 'সঙ্গীতসার সংগ্রহ' গ্রন্থে (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সম্পাদিত) উদ্ধৃত।

মাধব দাস সংস্কৃতে কয়েকটি পদ লিখেন। ইনি কীর্তনে খুব পারদর্শী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার নৃত্য ও কীর্তনে খুব আনন্দিত হইতেন।

(কানাড়া)

বন্দে শ্রীবৃষভানুসুতাপদম্।
কঞ্জনয়নলোচনসুখসম্পদম্॥
কমলান্বিত-সৌভগরেখাঙ্কিতম্।
ললিতাদিক-কর-যাবকরঞ্জিতম্॥
সংসেবক-গিরিধরমতিমণ্ডিতম্।
রাসবিলাসনটন-রসপণ্ডিতম্॥
নখরমুকুরঞ্জিত-কোটি-সুধাকরম্।
মাধবহৃদয়-চকোরমনোহরম্॥[১]

"বৃষভানুসুতা (শ্রীরাধিকার) পদবন্দনা করি। যে পদ (কমলায়ত-লোচন) শ্রীকৃষ্ণের সুখদায়ক সম্পদ। কমলান্বিত (লক্ষ্মী-শ্রীযুক্ত) ঐশ্বর্য দানকারী। সৌভাগ্যরেখায় অঙ্কিত। ললিতাদি সখীগণের (সেবাপর) করের যাবকে অনুরঞ্জিত এবং সেবাপরায়ণ গিরিধারীর মতি (অনুরাগে) মণ্ডিত। (যে পদ) রাসবিলাসে নৃত্যরসে পণ্ডিত, নখররূপ দর্পণশোভিত, কোটি চন্দ্রকে জয় করিয়াছে। (যে পদ) মাধবের হৃদয়চকোরের মনোহরণকারী।"

ভণিতায় মাধব শব্দটি শ্লিষ্ট, এক অর্থে পদকর্তা 'মাধব দাস,' আর এক অর্থে শ্রীকৃষ্ণ। পদটিতে শ্রীরাধার প্রতি অন্তরের ভক্তি নিবেদিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন পদটি মাধব আচার্যের লেখা

সপ্তদশ শতাব্দের বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বা 'হরিবল্লভ' বৈষ্ণবপদ-সংগ্রহ গ্রন্থ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' সংকলন করেন। উহাতে তাঁহার রচিত কয়েকটি পদও সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি 'হরিবল্লভ' বা 'বল্লভ' ভণিতায় পদরচনা করিতেন। তিনি সংস্কৃতেও কয়েকটি পদ রচনা করেন। তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রে পণ্ডিত ও একজন দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার রচিত একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

---

১ বৈষ্ণব পদাবলী—(শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) পৃঃ ২৭২

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ইহ নব-বঞ্জুল-কুঞ্জে।
কুরুবক-কুসুম-সুষম-নব-গুঞ্জে ॥
তামভিসারয় ধীরাং।
ত্রিজগদতুল-গুণ-গরিম-গভীরাং ॥
গুরুমঙ্গীকুরু ভারং
বিরচয় মদন-মহোদধি-পারং ॥
ভবতীং গতিমবলম্বে।
যদুচিত-মিহ কুরু বিগত-বিলম্বে ॥
ইতি গদিতা মধু-রিপুনা।
ত্বরিত-মগাদিয়-মতিশয়-নিপুণা ॥
রহসি সরস-চাটু-রাধাং।
সমবোধয়দঘহর পুরু-বাধাং ॥
হৃদি সখি বসসি মুরারে।
জ্বলয়সি তদপি কিমকৃত- বিচারে ॥
অধুনা দৃশি চ বসন্তী
শিশিরিয় তদমৃত-রুচিরিব ভান্তি ॥
হরিবল্লভ-গিরমমলাং।
শ্রবসি রচয় সুমনস-মিব মৃদুলাং ॥[১]

"ত্রিজগতে অতুলনীয়া গুণ-গরিমা-গভীরা শ্রীরাধাকে সুন্দর কুরুবক কুসুমে এবং নূতন গুঞ্জামালায় সাজাইয়া এই নব অশোককুঞ্জে অভিসার করাইয়া আন। এই কার্যভার তুমি গ্রহণ কর, আমাকে মদন মহাসমুদ্রের তীরে তুলিয়া লও। তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। অতএব অবিলম্বে যথা-কর্তব্য কর। মধুরিপুর এই বাক্যে অতিশয় নিপুণা দূতী অতি সত্বর শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং নির্জনে সরস চাটুবচনে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বেদনা বর্ণনা করিলেন। বলিলেন, সখি (এ জগতে কেহ নিজগৃহে অগ্নিসংযোগ করে না, আর) তুমি তোমার একমাত্র আবাসস্থল মুরারির হৃদয় অবিচারে দগ্ধ করিতেছ। এখন তাঁহাকে দেখা দিয়া চন্দ্রের মত অমৃত-বর্ষণে তাঁহার দগ্ধ

১ বৈষ্ণব পদাবলী—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৮১৭

হৃদয় শীতল কর। ভক্তগণ হরিবল্লভের এই অমল বচনাবলী সুরতরুর মৃদু কুসুমের মত কর্ণে ধারণ করুন।"

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলায় সখীর ভূমিকা ঠিক বাস্তব নর-নারীর প্রেমের মত। সখী রাধা ও কৃষ্ণের মিলনকার্য্য সম্পাদন করিতেছে। পদটিতে রাধাকৃষ্ণের লীলা-আস্বাদন ও লীলা-স্মরণ প্রকাশিত হইয়াছে। 'হরিবল্লভ' পদটিতে জয়দেব বা রূপ গোস্বামীর অনুসরণে অনুপ্রাসমুখর ভাষা ব্যবহার কবিয়াছেন। পদটির ছন্দপ্রবাহও চমৎকার।

নরহরিদাস বা নরহরি চক্রবর্তীর অপর নাম 'ঘনশ্যাম দাস'। তাঁহার পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী বৈষ্ণবশাস্ত্রে পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য।[১] নরহরি একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। নরহরি একখানি পদ-সংগ্রহ আরম্ভ করেন, নাম—'গীতচন্দ্রোদয়'[২] কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'ভক্তিরত্নাকর'।[৩] তিনি সংস্কৃতেও পদ রচনা করেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' তাঁহার রচিত দুইটি পদ আছে। গীতচন্দ্রোদয়েও তাঁহার কয়েকটি সংস্কৃত পদ আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমার্ধে রাধামোহন ঠাকুর বর্তমান ছিলেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। তাঁহার পদসংগ্রহ 'পদামৃতসমুদ্র'[৪] বিশেষ মূল্যবান্। তিনি পদগুলির 'মহাভাবানুসারিণী' নামে একটি সংস্কৃত টীকা লিখেন। তিনি নিজেও একজন পদকর্তা ছিলেন। তিনি কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা বিষয়ে কয়েকটি সংস্কৃত পদ রচনা করেন। এখানে একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বন্দনা

মল্লার, কন্দর্পতাল

নিন্দিত-শশধর-নিরুপম-নখরং।
হৃদ্গততিমির-বিনাশকশিখরং॥
বন্দে রাধামাধবচরণং।
ভক্তজনানাং কেবলশরণং।
পরমানন্দকমতিশয়-ললিতং।
ব্রজযুবতীকুলনন্দিত-চরিতং।

১ 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে (শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) উদ্ধৃত পৃঃ ৮১৭
২ হরিদাস দাস প্রকাশিত (১৯৪৮)
৩ গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ (১৯৪০)
৪ বহরমপুর রাধারমন যন্ত্র হইতে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রকাশিত (১২৮৫)

অহমতি-পামর-পাপ-বিশিষ্টঃ।
রাধামোহন-সংজ্ঞক-দুষ্টঃ।[১]

'শশধরনিন্দিত-নিরুপম-চরণ-নখর। হৃদয়ের অন্ধকার-বিনাশক উদয়গিরি। শ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণ বন্দনা করি। যাঁহারা ভক্তজনের একমাত্র শরণ। অতিশয় ললিত পরমানন্দদায়ক ব্রজযুবতীগণনন্দিত চরিত্র। পাপবিশিষ্ট পামর দুষ্টজন আমি রাধামোহন নাম ধরি।'

পদটিতে রাধাকৃষ্ণের প্রতি পদকর্ত্তার হৃদয়ের ঐকান্তিক ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণই ভক্তজনের অনন্যা গতি। ভণিতা অংশে রাধামোহনের প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। পদটিতে জয়দেবের প্রভাব সুস্পষ্ট। ছন্দের প্রবাহও লক্ষণীয়।

হরেকৃষ্ণ দাস একজন প্রসিদ্ধ পদকার। তিনি সংস্কৃতেও পদ রচনা করেন। এখানে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীগৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের পূর্বাভাষ
গৌরী

বন্দে শচীসুতগৌরনিধিং।
বন্দিতমহেশসুরেশবিধিং॥
দুষ্টদলনকলিকলুষ-নাশং।
মন্দ্রমধুর-হরিনামপ্রকাশং॥
কৃতমুণ্ডন-আশ্রমোচিতকেশং।
দণ্ড-কমণ্ডলু-ধৃত-সুবেশং॥
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীসেবিতচরণং।
দাসহরেকৃষ্ণবঞ্চিত-শরণং॥[২]

"শচীসুত শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা করি। মহাদেব, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার বন্দনা করেন। তিনি দুষ্টের দমন করেন এবং কলির পাপ নাশ করিয়া থাকেন। তিনি মন্দ্র ও মধুর স্বরে হরিনাম প্রকাশ করেন। যিনি সন্ন্যাস-আশ্রমের জন্য বেশ নূতন করিয়াছেন এবং দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণে শোভিত। বিষ্ণুপ্রিয়া

১ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃঃ ৮৯৭
২। বৈষ্ণবপদাবলী পৃঃ ৯৪০

দেবী যাঁহার চরণসেবা করিতেছেন। হরেকৃষ্ণদাস যাঁহার আশ্রয় হইতে বঞ্চিত।"

পদকর্তা হরেকৃষ্ণ দাস শ্রীচৈতন্যকে ভগবান্ কৃষ্ণের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্য-অবতারের মুখ্য কাজ 'দুষ্টের দমন' ও 'হরিনাম-প্রচার' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে চৈতন্য-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য 'নিজরস-আস্বাদন'। শ্রীচৈতন্যের প্রতি গভীর ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে পদটিতে।

দীনবন্ধু বা দীনবন্ধু দাস একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। ইনি শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দনের বংশধর। ইনি সংস্কৃতেও পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পদাবলী সংগ্রহগ্রন্থ 'সংকীর্তনামৃতে' তাঁহার একটি সংস্কৃত পদ দেখি। পদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের যশোদার নিকট নবনীত প্রার্থনা—

পূরবী

জননি দেহি নবনীতম্।
জঠরানল উপ- দহতি কলেবর-
মনুপালয় সুত-গীতম্॥
মম নীরস-মুখ- মচিরমপাকুরু
দধি বিতরয় নিজডিম্ভে।
চলয়তি মৃদু-পব- নেঽপি তনুং মম
ভোজন-সময়-বিলম্বে॥
দশন-বসন-রস- নে ন চ রস ইহ
জীবয় নিজপরিবারং।
সুতমপি লঘুতর- ময়ি মনুষে কিল
ধনমতিগুরু দধিসারম্॥
অয়ি কঠিনে ময়ি করুণালবমপি
নহি কুরুষে যদি তোকে।
সহচর-দীন- বন্ধুরপযশ ইতি
সদসি বদিষ্যতি লোকে॥[১]

১। বৈ. প. (৯৯১ পৃঃ)

—'মা, আমাকে নবনীত দাও। জঠরানল দেহ দগ্ধ করিতেছে। কথা রাখ, আমার মুখ শুকাইয়াছে, অচিরে নিজ পুত্রকে দধি দিয়া শুষ্কতা নিবারণ কর। খাওয়ার বিলম্ব হইলে মৃদু বাতাসেও আমি টলিয়া পড়ি। আমার অধর এবং রসনাও নীরস হইয়াছে। নিজ পরিবারকে বাঁচাও। পুত্র তোমার নিকট নগণ্য হইল, আর নবনীতই হইল বহুমূল্য। ক্ষুধার সময়, অয়ি পাষাণি, এই বালককে যদি বিন্দুমাত্র করুণা না কর, দীনবন্ধু লোকের নিকট তোমার অপযশ গাহিয়া বেড়াইবে।'

পদটিতে বালক শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদার নিকট নবনীত প্রার্থনার চিত্রটি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। পদকর্তা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা যেন মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং সেই লীলা আস্বাদন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। পদকর্তা সহচরের ভূমিকা লইয়া কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিতেছেন। বাঙ্গালা, ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলির ভাবে ও ঢঙে এই সংস্কৃত পদটি রচিত হইয়াছে। ছন্দে বাঙ্গালা ত্রিপদী ছন্দের রীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। চণ্ডীদাস প্রভৃতির ত্রিপদী ছন্দে অনেক সময় তৃতীয় পদ হইতে গানটি আরম্ভ করা হয়। যেমন,

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥

ইহার সহিত তুলনা করুন—

জননি দেহি নবনীতম্।
জঠরানল উপ- দহতি কলেবর-
মনুপালয় সুত-গীতম্॥

জয়দেব-রূপগোস্বামীর প্রভাবও অনস্বীকার্য। দেখিয়া মনে হয় যেন বাঙ্গালা পদটিকে সংস্কৃত করা হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষপাদে চন্দ্রশেখর-শশিশেখর জীবিত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহারা দুই ভাই। তিনি বা তাঁহারা প্রসিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন। 'নায়িকারত্নমালায়' [১] চন্দ্রশেখরের একটি সংস্কৃত পদ পাওয়া যায়।

---

১ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ও মধুসূদন অধিকারী প্রকাশিত, আলাটি হুগলী হইতে (১৯২৮)।

শ্রীরাধার ভাবোল্লাস

বরাড়ী

নন্দসুত ইতি বিদিত্বা হন্ত গোকুলং
মধুপুরাদাগত্য সময়ে।
স্বকর-জলজেন মৃদুলেন তনু-বল্লরী
স্পর্শমনুকরিষ্যতি কিময়ে॥
সখি হে কিমহমপি মুগ্ধ-হরিণা।
পুনরপি বিধাস্যামি রাস-রস-কৌতুকং
প্রাণনাথেন মধু-রিপুণা॥

হা কদা তেন সহ কল্পতরু-মণ্ডলে
পূর্ববদ্গীতমতিমিষ্টং।
কিমু করিষ্যামি সখি মদন-রস-মণ্ডিতং
চন্দ্র-বদনেন পুনরিষ্টং॥
শ্যামতনু-মাধুরীং পুনরপি দৃশা কিমহ-
মালোকয়িষ্যামি সততং।
চন্দ্রশেখর-ভণিত- মিদমমৃত-সুমধুরং
সাধবঃ শৃণুত রস-ললিতং।

(নায়িকারত্নমালা[১]), বৈ. প. পৃ. ১০২০

—'অহো, শ্রীনন্দনন্দন সখীমুখে আমার দুঃখের সংবাদ অবগত হইয়া (নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট) সময়েই মধুপুর হইতে গোকুলে শুভাগমন করিবেন। তিনি কি আপন কোমল করকমলে আমার বিরহক্লিষ্ট দেহলতা স্পর্শ করিবেন? সখি, আমিও কি হরিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া সেই প্রাণনাথ মধুসূদনের সঙ্গে রাসরস কৌতুক উপভোগ করিব? হায়! কবে আমি তাঁহার সহিত কল্পতরুকাননে পূর্বের মত সুমিষ্ট স্বরে গান করিব? আর কবেই বা সেই চন্দ্রবদন হরির সঙ্গে মদনরসমণ্ডিত অভীষ্ট লাভ করিব? আহা, আমি পুনরায় কি সর্বদা সেই শ্যামতনুমাধুর্য দেখিতে পাইব! চন্দ্রশেখর বর্ণিত এই অমৃত-মধুর রসললিত পদ সাধুগণ শ্রবণ করুন।'[১]

১ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ও মধুসূদন অধিকারী প্রকাশিত, আলাটী হুগলী হইতে (১৯২৮)।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। বিরহ-বিধুরা রাধার অবস্থা সখী-দূতীরা কৃষ্ণকে জানাইল। কৃষ্ণ শীঘ্র ব্রজে ফিরিবেন বলিয়া জানাইলেন। সখীমুখে রাধা সেই কথা শুনিয়া কল্পনা করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলে কি কি তিনি করিবেন। এই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পূর্বানুভূত সুখস্মৃতির রোমন্থন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমন-সংবাদে শ্রীরাধার অন্তরের উল্লাস পদটিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

পদটিতে আধুনিক ভাষার প্রভাবও দেখা যায়। জয়দেবের অনুসরণও স্পষ্ট। রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন ও লীলা-শ্রবণ গানটির মুখ্য কথা।

শচীনন্দন বিদ্যানিধি বর্ধমান জেলার চানকগ্রামের অধিবাসী। তিনি 'উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা' রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তাঁহার রচিত একটি সংস্কৃত গান পাওয়া যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একটি পুঁথিতে প্রতাপ নারায়ণের একটি সংস্কৃত পদের সাক্ষাৎ মেলে। তিনি ব্রজবুলি ও বাঙ্গালাতেও পদ লিখিয়াছেন। সংস্কৃত পদটির ভাষা অশুদ্ধ।[১]

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

মুকুলিত-বকুল-কুসুমমঙ্গল-কেশম্।
রুচির-চন্দন-চারু-চর্চিত-বেশম্॥
অভিনব-জলধর-কুন্তল-জালে।
শোভিত-পরিমল-মালতী-মালে॥
মণিময়-মকর-কুণ্ডল-শ্রুতি-দেশম্।
তড়িদিব নবপীত-বসন-বিকাশম্॥
প্রতাপ-নারায়ণ-ভণিত-মধুপম্।
পরম-পুরুষ-পুরুষোত্তম-রূপম্॥

—'মুকুলিত বকুল কুসুমে সজ্জিত কেশদাম। শোভাময় চন্দনচর্চিত বেশ। নূতন জলধরের মত কেশে সুবাসিত মালতীর মালা শোভা পাইতেছে। শ্রবণে মণিময় মকর-কুণ্ডল। নবীনা দামিনীর মত পীত বসনের বৈশিষ্ট্য। মধুপ প্রতাপ নারায়ণ ভণিত পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের রূপ।'

---

১ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১০৮৬

পদকর্তার মতে শ্রীকৃষ্ণই পরমপুরুষ পুরুষোত্তম। তাঁহার বৃন্দাবন-লীলার কথাই এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই ভাবেই বিভোর হইয়া পদকর্তা বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য বর্ণনা করিয়াছেন। পদটির ধ্বনিঝংকার জয়দেবের মত।

অষ্টাদশ শতাব্দে ব্রজবুলি বা বাঙ্গালা-সংস্কৃত মিশাইয়া পদরচনা বৈষ্ণব কবিদের নিকট খুব প্রিয় হইয়া উঠে। চন্দ্রশেখব-শশিশেখর-দীনবন্ধুদাস প্রভৃতি পদকর্তা এই মিশ্রভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দে লোচন-দাসই প্রথম তাহাব সূচনা করেন। উদাহরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা মিশাইয়া সংস্কৃতের ছন্দে পদ-রচনাও দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দের পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলির কোন কোনটিতে এই ধরণের পদ দেখা যায়। সংকীর্তনামৃতে সংস্কৃত ছন্দে লেখা সংস্কৃত-বাংলা-মিশ্রভাষার দুইটি পদ পাওয়া যায়॥

একাদশ অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতার তুলনামূলক আলোচনা

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান উপজীব্য বিষয় ব্রজে রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র মধুর প্রেম-লীলা। গৌণভাবে রাধার ও কৃষ্ণের বাল্য ও শৈশব লীলা ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ যে-ভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা চিত্রিত করিয়াছেন তদ্‌দৃষ্টে মনে হয় প্রাচীন ভারতীয় প্রেমকবিতা হইতে বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের বৈচিত্র্য, মাধুর্য্য ও সূক্ষ্মত্ব প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রাচীন সংস্কৃত-প্রাকৃত-প্রকীর্ণ কবিতাগুলির কালগত পরিণাম লক্ষ্য করি। ভাবে ভাষায় ও অলংকরণ-রীতিতে প্রাচীন প্রেম-কবিতার আদর্শ অনুসরণ করা হইয়াছে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে। আমরা পূর্ববর্তী ভারতীয় সাহিত্য হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত তাহাদের সাদৃশ্য দেখাইতেছি। বৈষ্ণব পদাবলীর পদগুলিকে রসপর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। আবার লৌকিক প্রেমকাব্যের নায়িকাদের মত শ্রীরাধার প্রেমের বিভিন্ন অবস্থা-অনুযায়ী অভিসারিকা, খণ্ডিতা প্রভৃতি রাধার অবস্থা কল্পিত হইয়াছে। আসলে শ্রীরাধার খণ্ডিতা, অভিসারিকা, স্বাধীনভর্তৃকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, বাসকসজ্জা প্রভৃতি অবস্থা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের বিভিন্নরূপে প্রকাশ মাত্র। আমরা শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা হইতে ভাব-সম্মেলন পর্যন্ত কৃষ্ণের ব্রজলীলার আলোচনা করিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার পটভূমিতে রহিয়াছে পূর্বতন ভারতীয় প্রেম-কবিতা। মহাকবি কালিদাসের পর সংস্কৃত সাহিত্যের গতিপথ অন্য পথ অবলম্বন করিল। সংস্কৃত কবিরা এখন প্রকীর্ণ শ্লোক-রচনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। 'অমরুশতক'কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেম কবিতার সংগ্রহ বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থটি প্রাচীনতারও দাবী রাখে। অবশ্য ইহার পূর্বে আমরা প্রাকৃত কবিতার সংগ্রহ হালের 'গাহাসত্তসঈ' (গাথাসপ্তশতী) পাইতেছি। এই প্রাকৃত কবিতার সংগ্রহে নরনারীর প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়ের সূক্ষ্ম অথচ মনোহারী বর্ণনা পাইতেছি। সংস্কৃত-প্রকীর্ণ-কবিতা সংগ্রহের মধ্যে 'কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়' (সুভাষিতরত্নকোশ) বিশেষ মূল্যবান্। তাহার পর

পাই শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। এই সকল সংগ্রহ পুস্তকে নানা বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। নানা দেব-দেবীর বন্দনার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ, শিব-পার্বতী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী সম্বন্ধে প্রেম-কবিতা লক্ষ্য করা যায়। সেই সময়ে জানপদী ভাষাতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করা হইত। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' নামে ছন্দোগ্রন্থের উদাহরণগুলির প্রায় সবই জানপদী ভাষা বা অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠে রচিত। রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের কথাও ইহাতে দেখা যায়। এই সম্বন্ধে পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে রূপ গোস্বামীর সংগ্রহ-পুস্তক 'পদ্যাবলী'রও নাম করিতে হয়। এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে বিভিন্ন রস-পর্য্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা-বর্ণনায় এই সমস্ত কবির নিকট বহুলভাবে ঋণী। প্রকৃত পক্ষে জয়দেব হইতেই বৈষ্ণব পদাবলীর সূচনা। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বলিতে গেলে বাঙ্গালা, গুজরাটী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় সভা-সাহিত্যের উদ্বোধক। জয়দেবের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গানে ও চর্য্যাপদাবলীর সিদ্ধাচার্য্যদের গানগুলিতে যে পদ-রচনা-রীতি অর্থাৎ পদাবলী-রচনার ধারা প্রবর্তিত হইল তাহাই পরবর্তীকালে পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণব মহাজন কবিদের হাতে পরিপুষ্টি লাভ করিল। আধুনিক যুগেও বাঙ্গালা সাহিত্যে এই গীতি-কবিতার ধারা খাত বদলাইয়া বহিয়া চলিয়াছে। এই দেখিয়া বলা চলে যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি গানের মধ্যে।

বাল্য-লীলা ও বাৎসল্যরস (শিশুরস)

পূর্বতন ভারতীয় কবিগণ নরনারীর প্রেমের বর্ণনা করিতে গিয়া বয়ঃসন্ধি বা যৌবনাগম হইতেই শুরু করিয়াছেন। কোন কোন কবি নায়ক-নায়িকার বাল্য-জীবনও বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যে বাৎসল্যরসের স্থান তর্কের খাতিরে যদিও বা থাকে তা অত্যন্ত গৌণ। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলাই মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়, কোন কোন বৈষ্ণব কবি রাধা ও কৃষ্ণের বাল্য-লীলাও দেখাইয়াছেন। গৌর-পদাবলীতেও ভক্ত-কবি কৃষ্ণের বাল্য-লীলার অনুরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস তাঁহার 'কুমার-সম্ভবে' পার্বতীর শৈশব-চেষ্টাদি বর্ণনা করিয়াছেন।

"দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষাঞ্জ্যোৎস্নান্তরানিব কলান্তরাণি॥"

(কুমার—১।২৫)

'—শশিকলা যেমন উদয়ের পর দিন দিন ক্রমশঃ অধিকতর জ্যোৎস্নাপূর্ণ নব নব কলার সংযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও সমধিক সুন্দর হয়, সেইরূপ তাহার (উমার) দেহ দিন দিন বর্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে অধিকতর লাবণ্যে বিকশিত হইল।'

তুলনীয়ঃ—এ তোর বালিকা চান্দের কলিকা
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি
হেন মনে লয়ে সদাই হৃদয়ে
পসরা করিয়া রাখি॥"

(জ্ঞানদাস, বৈঃ পঃ পৃ ৩৭৪)

বড়ু চণ্ডীদাস—দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা
পুরিল যে চন্দ্রকলা। (রাধার)

—(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

"মন্দাকিনী-সৈকত-বেদিকাভিঃ সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিম-পুত্রকৈশ্চ।
রেমে মুহুর্মধ্যগতা সখীনাং ক্রীড়ারসং নির্বিশতীব বাল্যে॥"

(কুমার ১।২৯)

—'সে (উমা) সখীদের সহিত বাল্যবয়সে মন্দাকিনী সৈকত-বেদিকায় কন্দুক ও পুতুল লইয়া ক্রীড়াসুখ অনুভব করিতেছিল।'

"মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিস্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্তপুষ্পস্য মধোর্হি চূতে দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা॥"

(কুমার ১।২৭)

—"পুত্রবান্ রাজার (হিমালয়ের) সেই অপত্যে (উমাতে) যেন তৃপ্তি লাভ করিল না, যেমন বসন্তকালে বহু পুষ্প থাকিলেও ভ্রমরগণ আম্রমুকুলেই বেশী আসক্ত হয়।" ইহার সহিত জ্ঞানদাসের পদটির তুলনা করা যায়।

"প্রাণনন্দিনী রাধাবিনোদিনী
কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপনগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥"

(জ্ঞানদাস, বৈঃ পঃ পৃ ৩৭৪)

কালিদাসের 'রঘুবংশে' রঘুর বাল্যজীবন অতি চমৎকাররূপে বর্ণনা কর হইয়াছে।

"যদাহ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো যযৌ তদীয়ামবলম্ব্য চাঙ্গুলীম্।
অভূচ্চ নম্রঃ প্রণিপাতশিক্ষয়া পিতুর্মুদং তেন ততান সোঽর্ভকঃ ॥"

(রঘুবংশ ৩য় সর্গ)

—'ধাত্রীর সাহায্যে প্রথম মাতাকে ডাকা, তাহার অঙ্গুলী ধরিয়া প্রথম চলা এবং ধাত্রী রঘুকে প্রণাম করা শিক্ষার পর, তাহার নম্রতা প্রভৃতি কার্য্যকলাপে পিতার (দিলীপের) প্রচুর আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছিল।'

একটিমাত্র শ্লোকেই কবি শিশুর পরিপূর্ণ আলেখ্য আঁকিয়া দিয়াছেন। পালি সাহিত্যের ঘটপণ্ডিত জাতকের গাথাগুলিতে কৃষ্ণের শৈশব-লীলার কথা আছে। এখানে বলরামের নাম ঘটপণ্ডিত এবং তিনি কৃষ্ণের কনিষ্ঠ। দুই ভাইকেই 'কেশব' বলা হইয়াছে। কৃষ্ণের খরগোস মরিয়াছিল, কৃষ্ণ তাহার শোকে মুহ্যমান হইলে ঘটপণ্ডিত তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ভুলাইয়াছিল।

'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে কালিদাস রাজা পুরুরবার পুত্রস্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

"বাষ্পায়তে নিপতিতা মম দৃষ্টিরস্মিন্
বাৎসল্যবন্ধি হৃদয়ং মনসঃ প্রসাদঃ।
সংজাত-বেপথুভিরুজ্ঝিত-ধৈর্য-বৃত্তির্
ইচ্ছামি চৈনমদয়ং পরিরব্ধুমঙ্গৈঃ ॥

—'আমার চোখ ইহার উপর পড়িয়া জলে ভরিয়া উঠিতেছে। হৃদয় যেন বাৎসল্যে বাঁধা পড়িতেছে। মনে প্রসন্নতা জন্মিতেছে। কাঁপনি জাগিতেছে, আমার ধৈর্য লুপ্ত হইতেছে, ইচ্ছা হইতেছে উহাকে অঙ্গে জড়াইয়া ধরিতে।'

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় মহর্ষি কণ্বের স্নেহ-ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং স্পৃষ্টং সমুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যমহো তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ ॥"

(শাকুন্তলে ৪র্থ-অংকে)

—"শকুন্তলা আজ যাইবে ইহা মনে করিতেই হৃদয় উৎকন্ঠিত হইতেছে, চাপা কাঁদনের ঠেলায় কথা বাধিয়া যায়, চিন্তায় চোখে দেখিতেছি না। স্নেহের বশে যদি অরণ্যবাসী আমারই এমন অবসন্নতা হয়, তাহা হইলে না জানি গৃহীরা আসন্ন কন্যাবিচ্ছেদদুঃখে কতখানি না পীড়িত হয়।"

ভবভূতি অতি অল্প কথায় বাৎসল্যরসের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

"অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ।
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়মপত্যমিতি কথ্যতে॥"

(উত্তররামচরিতের তৃতীয়াংকে)

—'দম্পতীর (নরনারীর) স্নেহসংযোগ হেতু অন্তঃকরণতত্ত্বের একমাত্র আনন্দগ্রন্থি হইতেছে অপত্য।'

'সদুক্তিকর্ণামৃতে' কৃষ্ণের বাল্যজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার আভাস পাওয়া যায়।

"কৃষ্ণেনাম্ব গতেন রন্তুমনসা মৃদ্‌ভক্ষিতা স্বেচ্ছয়া
সত্যং কৃষ্ণ ক এবমাহ মুসলী মিথ্যাম্ব পশ্যাননম্।
ব্যাদেহীতি বিদারিতে শিশুমুখে দৃষ্ট্বা সমস্তং জগ-
ন্মাতা যস্য জগাম বিস্ময়পদং পায়াৎ স বঃ কেশবঃ॥

(কস্যচিত্, সদুক্তিকর্ণামৃতম্ ১।৫১।১)

—'কৃষ্ণ আজ খেলা করিতে যাইয়া ইচ্ছা করিয়াই মাটি খাইয়াছে', 'কৃষ্ণ, ইহা কি সত্য' 'কে বলিল' 'মুসলী' (হলধর), মা, মিথ্যা কথা, আমার মুখ দেখ', 'মুখ ব্যাদান কর'। শিশুর (কৃষ্ণের) মুখ বিদারিত হইলে যাঁহার মাতা (তাঁহার মুখে) সমস্ত জগতকে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন; সেই কেশব তোমাদের রক্ষা করুন।

উদ্ধবদাসের একটি পদে এই ভাবটি দেখি।

"বাল গোপাল রঙ্গে সমবয় সখা সঙ্গে
হামাগুড়ি আঙ্গিনায় খেলায়।
তেজিয়া মাখন সরে তুলিয়া কমলকরে
মৃত্তিকা মনের সুখে খায়॥
বলরাম তা দেখিয়া যশোদা নিকটে যায়্যা
কহিলা ভাইয়ের এই কথা।

শুনি তবে যশোমতী আইলা ত্বরিত গতি
গোপাল খাইছে মাটি যথা ॥
মায় দেখি মাটি ফেলে না খাই না খাই বোলে
আধ আধ বদন ঢুলায়।
মুখ নিরখয়ে রাণী ধরিয়া যুগল পাণি
মন-দুখে করে হায় হায় ॥
এ খির নবনী সর কিবা নাহি মোর ঘর
মৃত্তিকা খাইছ কিবা সুখে।
পিতা যার ব্রজরাজ তার কি এমন কাজ
শুনিলে হইবে মনে দুখে ॥
এতেক বলিয়া রাণী কোলে করি নীলমণি
ছল ছল ভেল দু নয়ান।
এ উদ্ধব দাস গীতে যশোমতী হরষিতে
অনিমিখে নেহারে বয়ান ॥

(বৈষ্ণব পদাবলী ৪৯৯ পৃঃ, পদকল্পতরু, ১১৪৩

॥ তথারাগ ॥

বদন মেলিয়া গোপাল রাণী পানে চায়।
মুখ মাঝে অপরূপ দেখিবারে পায় ॥
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলোক আদি যত ধাম।
মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ ॥
শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে।
নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতরে ॥
দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিলুঁ হেন মনে করে ॥
নিজ প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে ॥

ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে করে দান ॥
এ দাস উদ্ধবে কহে ব্রজেশ্বরীর প্রেম।
কিছু না মিলায় যেন জাম্বুনদ হেম ॥

(বৈ. প. ৫০০ পৃঃ, পদকল্পতরু, ১১৪৪)

মন্থানমুজ্ঝ মথিতুং দধি ন ক্ষমস্ত্বং
বালোঽসি বৎস বিরমেতি যশোদয়োক্তঃ।
ক্ষীরাব্ধি-মন্থন-বিধিস্মৃতি-জাত-হাসো
বাঞ্ছাস্পদং দিশতু বো বাসুদেব-সূনুঃ ॥

(কস্যচিৎ, সদুক্তিক: ১।৫২।৫)

—"মন্থন ত্যাগ কর, তুমি দধিমন্থন করিতে সমর্থ নও, এখন তুমি বালক, বৎস, তুমি থাম,—যশোদা এই বলিলে যিনি সমুদ্রমন্থন-বিধি-স্মরণজনিত হাস্য করিয়াছিলেন সেই বসুদেবপুত্র (কৃষ্ণ) তোমাদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করুন।"

রূপ গোস্বামীর সংগৃহীত 'পদ্যাবলী'তে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং গোচারণাদি শৈশবলীলা সম্বন্ধীয় কয়েকটি কবিতা দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি পূর্বতনসংগ্রহ-পুস্তক 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতিতেও দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব পদকর্তারা রূপ গোস্বামীর প্রদর্শিত পথে বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়াছেন। দুইটি শ্লোক এখানে উদাহরণস্বরূপ দিতেছি।

"ইদানীমঙ্গমক্ষালি রচিতং চাহুলেপনম্।
ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলি-ধূসরিতং বপুঃ ॥"

(সার্বভৌমভট্টাচার্য্যানাম্, পদ্যাবলী ১৩৩)

—'এইমাত্র তোমার অঙ্গ ধৌত করিয়া দিয়া প্রসাধন করিয়া দিলাম আবার এখনই হে কৃষ্ণ, তোমার শরীর ধূলিধূসরিত করিয়া ফেলিলে?'

"দধিমন্থননিনাদৈস্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মুখকমলসমীরৈরাশু নির্বাপ্য দীপান্
কবলিত-নবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ ॥'

(কস্যচিৎ—পদ্যাবলী—১৪২

—"প্রভাতে দধিমন্থনের শব্দে নিদ্রা হইতে উঠিয়া চুপি চুপি গোপীদের গৃহে প্রবেশ করিয়া এবং মুখের বাতাসের দ্বারা শীঘ্র দীপ নির্বাপিত করিয়া যিনি নবনীত গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই শিশুকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন"

ইহার সহিত তুলনা করুন—

"রজনী প্রভাতে উঠি নন্দের গৃহিণী।
দধির মন্থন করে তুলিতে নবনী॥
নিদ্রাগত ছিল কৃষ্ণ শয়ন মন্দিরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল বৈসে পালঙ্ক উপরে॥"

(বলরাম দাস, বৈঃ পঃ ১২৫ পৃঃ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর বৎসল্যরস অলৌকিক জগতের সামগ্রী। মাতা যশোদা বা পিতা নন্দ ভগবান্ কৃষ্ণকে পুত্রভাবে দেখিতেন। সময় সময় লালন-তর্জন-তাড়ণ করিতেন। যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রভাবে দেখা সম্ভব হইয়াছিল। যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্য ভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করিতেন। পুরাণে তাহার আভাস পাওয়া যায়। বৃন্দাবনের যশোদা নন্দ প্রভৃতির ভাব অনুসরণ করিয়া মানবীয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ভগবান্ কৃষ্ণকে স্নেহভক্তি দ্বারা ভজনা করিতে হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজন কবিগণ বাৎসল্য-রসের বহু পদ রচনা করিয়াছেন। সেই সমস্ত পদে ভক্ত-কবির আশা-আকাংক্ষা যেন মূর্ত হইয়াছে। বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলরাম দাস। যাদবেন্দ্র, উদ্ধবদাস, মাধবদাস প্রভৃতি পদকর্তৃগণও বাল্যলীলার পদ রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তৃগণও বাল্য-লীলার পদ রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তৃগণ মধুর রসকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। তাই মধুর রসের তুলনায় বৎসল্য রসের পদ অতি অল্পই দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলায় সখ্যরস চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃন্দাবনের শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সখাভাবে ভজনা করিতেন। বৈষ্ণব ভক্তকবিগণও হৃদয়ের প্রীতি অর্পন করিয়া সখার অনুগ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহার অপূর্ব প্রকাশ দেখা যায়। প্রাকৃচৈতন্য যুগের কোন বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদরচনা করেন নাই। পালা-কীর্তন 'গোষ্ঠলীলায়' সখ্য ও বাৎসল্য উভয় রসেরই পদ গাওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার চিত্রও পাওয়া যায়। গোষ্ঠলীলার

'গৌরচন্দ্রিকা' হিসাবে গৌর-লীলার কয়েকটি পদ গাওয়া হয়। বাল্যলীলার এই পদগুলিতে মাতা যশোদার বা শচী দেবীর মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-ব্যাকুলতা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলায় যশোদার বাৎসল্য ও শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতির সখ্য সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কোন বাঙ্গালী কবির সখ্য ও বাৎসল্য রসের কোন রচনা পাওয়া যায় না।" বৈষ্ণব কবিগণ অলৌকিক বাৎসল্যরসের বর্ণনা করিতে গিয়া অপূর্ব কাব্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। এইখানেই পদবলীর সর্বমানবীয় আবেদন।

(বাৎসল্য-রস)

শ্রীযশোদার উক্তি—

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপালে করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥
নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডোকো
ঘরে থাকি যেন রব শুনি
বিহি কৈলা গোপ জাতি গোধনপালন-বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই বাছনি॥
বলরামদাসের বানী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমি যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥ (বলরাম দাস)
(বৈঃ পঃ—১২৬ পৃঃ)

অপর একটি পদে দেখি—

আমার শপতি লাগে না যাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।

নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইয় সঙ্গ ছাড়া না হইয়
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে ॥
ক্ষুধা হৈলে লইয়া খাইয় পথ পানে চাহি যাইয়
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইয় কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥
থাকিবে তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইয় বাধা পানই হাতে থুইয়
বুঝিয়া যোগাবে রাঙা পায় ॥ (যাদবেন্দ্র)
(বৈঃ পদাবলী—৯৫১ পৃঃ)

আবার, বিপিন গমন দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেবে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষামন্ত্র পড়য়ে আপনি ॥" (মাধব দাস)
(বৈঃ পদাবলী—২৭২ পৃঃ)

সখ্য-রস

উদ্ধব দাস—

"তোর এঁঠো বড় মিঠে লাগে কানাই রে।
খাইতে বড় সুখ পাই তেঞি তোর এঁঠো খাই
খেত্যে খেত্যে বেতে (মুখ) হৈতে
দিতে হৈল ভাই রে ॥
ও রাঙা অধর মাঝে না জানি কি মধু আছে
আমরা তোর চান্দমুখের বালাই যাই রে।
এই উপহার নেও খাইয়া আমাদিগে দেও
এ দাস উদ্ধবে মোরা কিছু দিতে চাই রে ॥"
—বৈঃ পঃ পৃঃ ৫০২

বলরাম দাস—

"আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়।
শ্রীদামে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে লইয়া যায় ॥
সুবল বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়া
শ্রমজলধারা বহে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানুর সঙ্গে ॥
কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তভু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইর কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম ॥
মত্ত বলাইচান্দে কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে
বলরাম দাস দেখি কয় ॥" —বৈঃ পঃ পৃঃ ৭২৮

বৈষ্ণব সাহিত্যের রসবেত্তা ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় তাঁহার 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায়[১] শিশু কৃষ্ণের প্রতি যশোদার বাৎসল্য সম্পর্কীয় পদ প্রাচীন তামিল সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বাংলার পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের মাখন চুরি লইয়া অনেক পদ রচিত হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দের প্রাচীন তামিল সাহিত্যে শিশু কৃষ্ণের প্রতি যশোদার বাৎসল্য লইয়া পেরিয়া আড়বার **Peria Alwar** যে কয়েকটি সুন্দর পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার ভাবানুবাদ দিতেছি।

১। ওগো বড় চাঁদ, তোমার কপালে যদি চোখ থাকে তো দেখ আমার ছেলে গোবিন্দের খেলা, সে ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাই তার কপালের টিক্‌লি দুল্‌ছে, আর কোমরের ঘুণ্‌ঠি বাজছে।

২। আমার সোনামণি তার ছোট হাত দুখানি বাড়িয়ে তোমায় ডাক্‌ছে। ওগো বড় চাঁদ, যদি তুমি আমার কালো মাণিকের সঙ্গে খেল্‌তে চাও তবে মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থেকো না, চলে এসো।

১ ডঃ বিমানাবহারী মজুমদার, 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী'র ভূমিকাতে উদ্ধৃত (পৃঃ ১৫১)

৩। যে তার হাতে গদা, চক্র ও ধনুঃ ধারণ করে, সে এখন ঘুমের চোটে হাই তুলছে। তার যদি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে সে যে দুধ খেয়েছে তা হজম হবে না। তাই ওগো বড় চাঁদ, তুমি আকাশ থেকে তাড়াতাড়ি চলে এসো।

৪। আমার এই সিংহশাবককে ছোট্ট মনে করো না। যাও, বলি রাজাকে তার বামন-লীলার ক্ষমতার কথা জিজ্ঞাসা করে এসো।[১]

এই পদগুলির মধ্যে বাৎসল্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যভাবও মিশ্রিত আছে। যশোদা জানেন যে তাঁহার পুত্র চক্রগদা-ধনুর্ধারী। তিনি বামনরূপে বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন এবং ইচ্ছা করিলে তিনি চন্দ্রকে শাস্তি দিতে পারেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদকর্তারা ঐশ্বর্য্যভাবকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। ঐশ্বর্যবুদ্ধি থাকিলে সখ্য, বৎসল্য ও মাধুর্য্য রসের যে হানি হয় তাহা তাঁহারা জানিতেন। যদুনাথ দাসের পদ—

"চাঁদ মোর চাঁদের লাগিয়া কাঁদে।"

এবং—

নীলমণি তুমি না কাঁদ আর
চাঁদ ধরি দিব কহিনু সার!"

(পদামৃতমাধুরী ৩।১১৮-১২০)

তুলনীয়—

হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ
এই হল তার বুলি
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া
কাঁদে যে দুহাত তুলি।

(রবীন্দ্রনাথ—'আকাশেব চাঁদ' : সোনার তরী)।

॥ রাধা-কৃষ্ণের বয়ঃসন্ধি ॥

সংস্কৃত কাব্যে নায়ক-নায়িকার বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কল্পনা নাই, প্রায় সকলেই যেন নবযৌবনে উপনীত হইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে উমার বাল্যকাল হইতে যৌবনে বিবাহ পর্যন্ত সমস্তই

১ Hymns of the Alvars by J. S. M. Hopper পৃঃ ৬৭

দেখাইয়াছেন। রঘুবংশের নায়ক রঘুর বাল্যকাল প্রভৃতির বর্ণনা দেখি। সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা-সংগ্রহ 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি' প্রভৃতিতে নায়ক-নায়িকার ও কৃষ্ণের বাল্যকালের কথা কবিত্বপূর্ণভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাকৃত কবিতার সংগ্রহ হালের 'গাথাসপ্তশতী'তেও নায়ক-নায়িকার বাল্যকাল ও বয়ঃসন্ধির কথা আছে।

কালিদাস তাঁহার 'কুমারসম্ভব' কাব্যে পার্বতীর বয়ঃসন্ধির কথা বলিয়াছেন—

"অসংভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টেরণাসবাখ্যং করণং মদস্য।
কামস্য পুষ্পব্যতিরিক্তমস্ত্রং বাল্যাৎ পরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে॥

(কুমার ১।৩১)

—'পার্বতী তদীয় অঙ্গযষ্টির অযত্নসিদ্ধ মণ্ডন আসবরহিত মত্ততার সাধন এবং পুষ্পব্যতিরিক্ত কামদেবের অস্ত্রের মত বাল্যকালের পর যৌবন প্রাপ্ত হইল।'

প্রাক্‌চৈতন্য যুগের পদকর্তা বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীতে শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। 'গাহাসত্তসঈ', 'অমরুশতক' 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়,' 'সুক্তি-মুক্তাবলী,' 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি,' প্রভৃতি প্রাকৃত-সংস্কৃত সংগ্রহগ্রন্থগুলিতে নায়িকার বয়ঃসন্ধি ও নবযৌবনের যে বর্ণনা পাই তাহাই বিদ্যাপতি কর্তৃক রাধার বয়ঃসন্ধি ও যৌবনাগমের বর্ণনায় লক্ষ্য করি।

শ্রীমতী রাধার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় কবি বিদ্যাপতি পূর্ববর্তী (সংস্কৃত) কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের নবযৌবনের কথা পাই, বয়ঃসন্ধির উল্লেখ নাই। অবশ্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের জন্ম হইতে যৌবনের প্রেমলীলা ও বিরহ সব কিছুই আছে।

রূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্যের আদেশে বৈষ্ণব অলংকারশাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে বয়ঃসন্ধির সংজ্ঞা দিয়াছেন—"বাল্য-যৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে"—'বাল্য ও যৌবনের সন্ধি (মিলনকে) বয়ঃসন্ধি বলা হয়'। মধুর-রসে বয়ঃসন্ধির মাধুর্য্য উদ্দীপন বিভাবের কাজ করে।

বয়ঃসন্ধিতে প্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশোভা—

যাস্তিঃ শ্যামলতাং বিমুচ্য কপিশচ্ছায়াং স্মরক্ষাপতে-
রুত্থাজ্ঞালিপি-বর্ণপংক্তি-পদবীমাপ্নোতি রোমাবলী।

বাঞ্ছত্যুচ্ছলিতং মনাগভিনবাং তারুণ্য-নীরচ্ছটাং
লব্ধা কিঞ্চিদধীরমক্ষিশফর-দ্বন্দ্বঞ্চ কংসদ্বিষঃ ॥
(উজ্জ্বলনীলমণি :—উদ্দীপন-বিভাব-প্রকরণম্ ।)

—'কৃষ্ণের রোমাবলী পিঙ্গলত্ব ত্যাগ করিয়া শ্যামত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। মনে হয় যেন উহা মদন-রাজার আজ্ঞা-লেখের অক্ষরশ্রেণীর সাম্যপ্রাপ্তি করিয়াছে। অভিনব তারুণ্যের জলসেক পাইয়া বুঝি আবার নেত্র-শফরীদ্বয়ও উচ্ছলিত হইতে বাঞ্ছা করিতেছে।'

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিজাত রমণীয়তা—

বাদ্যং কিঙ্কিণিমাহরত্যুপচয়ং জ্ঞাত্বা নিতম্বো গুণী
স্বস্য ধ্বংসমবেত্য বষ্টি বলিভির্যোগং তনুর্মধ্যম্ ।
বক্ষঃ সাধুফলদ্বয়ং বিচিনুতে রাজোপহারক্ষমং
রাধায়াস্তনুরাজ্যমঞ্চতি নবে ক্ষৌণীপতৌ যৌবনে ॥"
(উঃ মঃ উদ্দীপন বিভাব প্রঃ ১০—১৩)

—'নবযৌবনরূপ রাজা শ্রীরাধার দেহরূপ রাজ্য পাইলে (কাঞ্চীযুক্ত) নিতম্ব নিজের বৃদ্ধি জানিয়া উল্লাসসহকারে কিঙ্কিণিবাদ্য করিতে লাগিল। ক্ষীণ মধ্যদেশ নিজের ধ্বংস সম্ভাবনায় ত্রিবলীর সহিত মিলন করিতে ইচ্ছা করিল। বক্ষঃ যৌবনরাজ্যকে উপহার দিবার যোগ্য দুইটি উত্তম ফল আহরণ করিল।'

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবিগণও রাধাকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধি বা ইষদুভিন্নযৌবনের মনোহারিণী বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত-প্রাকৃত কবি এবং জয়দেব, বিদ্যাপতি ও রূপগোস্বামীর কাছ হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবিগণ রাধা ও কৃষ্ণকে অলৌকিক নায়ক-নায়িকা বলিয়া মনে করিলেও লৌকিক-প্রেমের আদর্শেই রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা করিয়াছেন।

ভ্রুবোঃ কাচিৎ লীলা পরিণতিরপূর্বা নয়নয়োঃ
স্তনাভোগো ব্যক্তস্তরুণিমসমারম্ভসময়ে।
ইদানীমেতস্যাঃ কুবলয়দৃশঃ প্রত্যহময়ং
নিতম্বস্যাভোগো নয়তি মণিকাঞ্চীমধিকতাম্ ॥"
(রাজোকস্য—সদুক্তিকর্ণামৃত ২।২।২)

—'যৌবনসমারম্ভে সরোজনয়না সেই নায়িকার ভ্রূ দুইটির অপূর্ব লীলা, নয়ন দুইটির অপূর্ব পরিণতি, স্তনাভোগ ব্যক্ত, ইদানীং তাহার নিতম্ব-প্রদেশ মণিময় কাঞ্চীকে অধিক বলিয়া যেন ত্যাগ করিতেছে।'

"পদ্‌ভ্যাং মুক্তাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাং
শ্রোণীবিম্বং ত্যজতি তনুতাং সেবতে মধ্যভাগঃ।
ধত্তে বক্ষঃ কুচসচিবতামদ্বিতীয়ং চ বক্ত্রং
তদ্‌গাত্রাণাং গুণবিনিময়ঃ কল্পিতো যৌবনেন॥'

(রাজশেখরস্য—সদুক্তিকর্ণামৃত ২।২।৪)

—"পদযুগল চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়াছে, লোচনদ্বয়ে তাহা আশ্রয় করিয়াছে, শ্রোণীবিম্ব তনুতা ত্যাগ করিয়াছে, মধ্যভাগ (কটিদেশ) এখন তাহাকে সেবা করিতেছে, বুক এখন কুচযুগের সচিবতা গ্রহণ করিয়াছে, ফলে মুখ এখন অদ্বিতীয়, এইভাবে যৌবন আসিয়া তাহার গাত্রসকলের গুণবিনিময় করিয়া দিয়াছে।"

এইগুলির সহিত নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধার তুলনা করিতে পারি। বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি ঠিক এই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন।

সৈসব জোবন দরসন ভেল।
দুহু পথ হেরইত মনসিজ গেল॥
মদন কিতাব পহিল পরচার।
ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইহ্নিকে খীন উন্‌কে অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফের উহ্নকে নেল॥
চরণ চলন গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব॥
নব কবিশেখর কি কহিতে পার।
ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার॥"[১] (বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

১ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখো—বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৩, পদকল্পতরু. ৮২।

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসও ঠিক এইভাবেই শ্রীরাধার যৌবনের আবির্ভাব বর্ণনা করিয়াছেন।

উলসল উরথল অব ভেল রে
আয়ত হোয়ত নয়ান রে।
গতি অতি ত্বরিত সমাপল রে
শৈশব কয়ল পয়ান রে।
তোরে নিবেদলোঁ শুন সখি অব রে
চিরদিন হৃদয়ক দন্দা রে।
বালা বাঢ়ল দারিদ টুটব রে
মিলাওব শ্যামরচন্দা রে।
হাস অধর পাশ মিলিত রে
রতিপতি অনুবন্ধা রে।
উর্নমিত নিতম্ব সুললিত রে
ভাষা অতি ভেল মন্দা রে।
কেশপাশদিগ কালিম রে
শ্রবণে লেল অবতংস রে।
জ্ঞানদাস কহ নব তনুরুহ রে
মনমথ গাড়ল বংশ রে।”[১]

চৈতন্যোত্তর যুগের আর এক জন বৈষ্ণব কবি 'দীনবন্ধু' শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করিয়াছেন—

শশিমুখী তেজি সরল দিঠি ভঙ্গিম
ইবে ভেল বঙ্কিম দীঠ।
মতি গতি চঞ্চল হসই মনোহর
বচন সুধা সম মীঠ॥
সজনি কাহা ধনি শীখল রঙ্গ।
কুচযুগ দরশি হরষি পুন আদরে
ঘন ঘন ঝাঁপই অঙ্গ॥
সহচরি করে ধরি কৈতবে ছল করি
পুছই রতিরস ভাতি।

১ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখো—বৈঃ পঃ পৃঃ ৩৭৩

মনসিজ সাধে আধে পুন হাসই
মদন মদালসে মাতি ॥
তিলে কত বেরি খসই নিবিবন্ধন
বিগলিত কুন্তলপাশ।
দীনবন্ধু ভণ নিরখি নাহ মন
মনমথ জেন পরকাশ॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৯৫৫)

বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির কবিতায় অর্থাৎ শৈশবের পর যৌবনের প্রথম আগমনে শ্রীরাধার যত প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের কথা পাই তাহার অনেক জিনিষই বিচ্ছিন্নভাবে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সংগ্রহগ্রন্থগুলির 'বয়ঃসন্ধি' ও 'নবযৌবনার' বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিমূলক একটি পদ—

"চরণ কমল কদলী বিপরীত।
হাস কলা সে হরএ সাঁচীত ॥
কে পতিআওব এহু পরমান।
চম্পকেঁ কএল পুহবি নিরমাণ ॥
এরে মাধব পলটি নিহার।
অপরূপ দেখিব জুবতি অবতার ॥
কূপ গভীর তরঙ্গিনী তীর।
জনমু সেমার লতা বিনু নীর ॥
চহকি চহকি দুই খঞ্জন খেল ॥
কাম কামান চান্দ উগি গেল ॥
উপর হেরি তিমিরেঁ করু বাদ ॥
ধমিলেঁ কএল তাকর অবসাদ ॥
বিদ্যাপতি ভন বুঝ রসমন্ত।
রাএ সিবসিংহ লখিমাদেবি কন্ত ॥[১]

'গাহাসত্তসঈ'তেও নায়িকার বয়ঃসন্ধির উল্লেখ দেখিতে পাই।

জহ জহ উব্বহই বহু ণবজোব্বণ-মণহরাই অঙ্গাইং।
তহ তহ সে তণুআঅই মজ্‌ঝো দইও অ পড়িবক্‌খো ॥"
(গাহাসত্তসঈ ৩।৯২)

---

১ হরেকৃষ্ণ মুখো—[illegible] পঃ পৃঃ ৭৫।

—'যেমন যেমন বধূ (তদীয়) নবযৌবনে মনোহর অঙ্গসমূহ বহন করিতে থাকে, তদীয় শরীরের মধ্যভাগ, প্রিয়জন ও (সপত্নী) রূপী শত্রুসকল তেমন তেমন কৃশ হইতে থাকে।'

সদুক্তিকর্ণামৃতে সংগৃহীত শতানন্দ কবির একটি কবিতায় নায়িকার বয়ঃসন্ধির চমৎকার বর্ণনা মিলে—

'গতে বাল্যে চেতঃ কুসুমধনুষা সায়কহতং
ভয়াদ্বীক্ষ্যেবাস্যাঃ স্তনযুগমভূন্নির্জিগমিষু।
সকম্পা ভ্রূবল্লী চলতি নয়নং কর্ণকুহরং
কৃশং মধ্যং ভুগ্না বলিরলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ॥'

(শতানন্দস্য—সদুক্তিক ২।২।৫)

—'বাল্য গত হইলে চিত্ত কামের কুসুমধনু দ্বারা সায়কাহত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া ইহার স্তনযুগ ভয়েই যেন নির্গত বা নিষ্ক্রান্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে, ভয়ে ভ্রূবল্লী কম্পিত হইতেছে, নয়ন কর্ণকুহরের দিকে চলিতেছে, মধ্যভাগ কৃশ হইয়া গিয়াছে, বলি বক্রতা লাভ করিয়াছে, নিতম্বযুগল অবসন্ন হইয়াছে।'[1]

'যৌবনশিল্পি-সুকল্পিত-নূতনবেশ্ম বিশতি রতিনাথে।
লাবণ্য-পল্লবাঙ্কৌ মঙ্গলকলসৌ স্তনাবস্যাঃ॥

('কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ঃ' ১৫৪)।

—'রতিনাথ (মদন) যৌবনশিল্পীর দ্বারা কল্পিত নূতন গৃহে (দেহে) প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই নায়িকার স্তন দুইটি লাবণ্যপল্লবাঙ্কিত মঙ্গল-কলসের ন্যায় বোধ হইতেছিল।'

যূনাং পুরঃ সপদি কিংচিদুপেতলজ্জা
বক্ষো রুণদ্ধি মনসৈব ন দোর্লতাভ্যাম্।
প্রৌঢ়াঙ্গনাপ্রণয়কেলিকথাসু বালা
শুশ্রূষুরন্তরথ বাহ্যমুদাস্ত এব॥'

(শ্রীহনুমতঃ, সদুক্তিকর্ণামৃত ২।১।৩)

—'বালা (তরুণী) যুবজনের সম্মুখে হঠাৎ ঈষৎ লজ্জাশীলা হইয়া মনে মনে বক্ষ আবৃত করিতেছে কিন্তু বাহু দুইটি দিয়া আবৃত করিতেছে না। প্রৌঢ়া রমণীদের প্রণয়লীলার কথা শুনিতে উৎসুক কিন্তু বাহিরে উদাসীনার মত ব্যবহার করিতেছে।'

---

১ অহমহমিকাবদ্ধোৎসাহং রতোৎসবশংসিনি............
বলয়তি শনৈর্বালা বক্ষঃস্থলে তরলাং দৃশম্। (ধর্মাশোকদত্তস্য, সদুক্তিক ২।১।৪)

॥ বৈষ্ণব পদসাহিত্যে পূর্বরাগ ও অনুরাগ ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব তত্ত্বের রস-ভাষ্য। বৈষ্ণব কবিগণ রসপূর্ণ ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবদের মতে এই রাধাকৃষ্ণ-প্রেম অপ্রাকৃত ভাব-বৃন্দাবনের সামগ্রী। এই অলৌকিক প্রেম প্রকাশ করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবিগণ লৌকিক নরনারীর প্রেমের দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রাচীন কবিদের কাব্যধারা ও প্রেম-প্রকাশের রীতিকে অবলম্বন করিয়াছেন। বৈষ্ণবদের 'মধুর-রস' লৌকিক অলংকারশাস্ত্রের শৃংগার-রসেরই নামান্তর। চৈতন্যভক্ত রূপ গোস্বামী বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁহার 'উজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থে এই মধুর রসের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণ অলংকারশাস্ত্রের 'শৃংগার'-রসের স্থায়িভাব রতির অর্থকে সম্প্রসারিত করিয়া 'কৃষ্ণরতিতে' পরিণত করিয়াছেন এবং এই ভগবদ্বিষয়িনী রতি কিভাবে প্রেমে (প্রেমভক্তিরসে) পরিণতি লাভ করে এবং সেই প্রেম কিভাবে বিকাশের ধারা অবলম্বন করিয়া পরস্পর আত্মনিবেদন পর্য্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাও দেখাইয়াছেন। রূপ গোস্বামী এই প্রেমের আরম্ভ হইতে পরিণতি পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি কিন্তু প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়াছেন, এমন কি পারিভাষিক শব্দগুলিও পূর্বসূরিদের কাছ হইতে লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। প্রেমের প্রতিটি স্তর আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখাইব তিনি পূর্ববর্তীদের নিকট কতখানি ঋণী। রূপগোস্বামীর প্রদর্শিত পথেই চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তৃগণ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রেমের প্রত্যেকটি স্তরের পদ পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে। প্রাক্-চৈতন্যযুগেও পদাবলী রচিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে জয়দেবই পদাবলী-সাহিত্যের প্রবর্তক। তবে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই পদাবলী-সাহিত্য পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্য ছিলেন মধুর-রসের উপাসক।

বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে মুখ্যভাবে 'মধুররস' বা শৃংগাররস বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব আচার্যগণের মতে এই মধুররস বা শৃংগাররস বা উজ্জ্বলরস দুই প্রকার—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। রূপ গোস্বামী বলেন—

যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥

—উজ্জ্বলনীলমণিঃ-শৃংগারভেদ-প্রকরণ ১৫।২

—'নায়িকা ও নায়কের সংযুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যেভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত হয়, তাহাকেই বিপ্রলম্ভ বলা হয়। ইহা কিন্তু সম্ভোগেরই উন্নতি-কারক।'

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন,—

"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্ধতে"॥

(ভারতমুনিকৃতশ্লোক—উ. ম. তে উদ্ধৃত)

—'যেমন কষায়িত বস্ত্রাদিতে পুনর্বার রঞ্জন করিলে আরও উজ্জ্বলতার বৃদ্ধি হয়, সেই রকম বিপ্রলম্ভ ছাড়া সম্ভোগ পুষ্টি লাভ করে না।'

বিপ্রলম্ভ শৃংগার চারি প্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস।

এই পূর্বরাগেই প্রেমের প্রথম সঞ্চার হয়। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ ইহাকে ('**First Flame of Love**') বলিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রেও শৃংগার রসকে ঠিক এইভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ 'শৃংগাররস' বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন—'বিপ্রলম্ভোঽথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো মতঃ'। (সা. দ. ৩।১৮৪)

—এই শৃংগার রস দুই প্রকার—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

"যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোঽসৌ॥

(সাহিত্য-দর্পণে ৩।১৮৫)

—'যেখানে (শৃংগারে) নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ প্রবল হইলেও প্রতিবন্ধক থাকায় মিলন হয় না তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলা হয়।'

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার চারি প্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, ও করুণ। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে 'করুণ' এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, তাহার স্থানে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' দেখা যায়।

পূর্বরাগের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন—

'শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষো যোঽপ্রাপ্ত পূর্বরাগঃ স উচ্যতে।"

(সাহিত্য-দর্পণ ৩য়, পরিচ্ছেদ ৩।১৮৬)

—'গুণশ্রবণ ও রূপদর্শন হেতু পরস্পর অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার মিলন না হইলে যে অবস্থাবিশেষ তাহাকেই পূর্বরাগ বলে।'

পূর্বরাগকেই প্রেমের প্রথম পদক্ষেপ বা 'প্রেমে পড়া' বলা যায়। এই পূর্ব-রাগে নায়ক-নায়িকার অবস্থার দশ প্রকার ভেদ দেখা যায়। যেমন পরস্পরের প্রতি অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, সম্প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু। মৃত্যুবর্ণনা শৃংগাররসের পরিপন্থী। সেইজন্য মহাকবিগণ নায়ক-নায়িকার মৃত্যুর আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন বা ইঙ্গিত দিয়াছেন। পূর্বরাগ বিপ্রলম্ভশৃংগার বা বিরহের অন্তর্গত সুতরাং বিরহের দশটি দশাই ইহাতে ঘটিতে পারে। বৈষ্ণবরসশাস্ত্রকার রূপ গোস্বামী পূর্বরাগের সংজ্ঞা দিতে গিয়া ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

রতির্যা সংগমাৎ পূর্বং দর্শন-শ্রবণা-দিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥

(উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গার-ভেদ প্রঃ ১৫।৫,)।

—'নায়িকা ও নায়কের মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণাদি হইতে জাত যে রতির আবির্ভাব হয় তাহাকে পূর্বরাগ বলে। পূর্বরাগের দশ দশা—লালসা উদ্বেগ, জাগর্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ বর্ণনা করিলেও শ্রীরাধার অনুরাগই বিশেষভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন আলংকারিকগণ পূর্বরাগের প্রাথমিক অবস্থাকে নব অনুরাগ বলিয়াছেন আর এই পূর্বরাগ ক্রমশঃ "গাঢ়তা" অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে অনুরাগ বলিয়াছেন। অনুরাগকে প্রেমের দ্বিতীয় অবস্থা বা গাঢ় অবস্থা বলা চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অনুরাগ শব্দই প্রয়োগ করা হইয়াছে। বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে বলা হইয়াছে, যে রাগ নিত্য নবত্ব দান করিয়া অনুভূতিকেও নিত্য নবত্ব দান করে তাহাকেই অনুরাগ বলে। এই অনুরাগ তিন প্রকার—রূপানুরাগ (রূপ দেখিয়া প্রেমের গাঢ়তা-প্রাপ্তি), আক্ষেপানুরাগ ও অভিসারানুরাগ।

অনুরাগো ভবেৎ ত্রিধা রূপাদাক্ষেপতঃ ক্রমাৎ।
অভিসারানুগশ্চ জায়ন্তে রসিকৈর্জনৈঃ॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

(পদকল্পতরুর অনুরাগ প্রকরণে উদ্ধৃত)

নন্দকিশোর দাসের 'রস-কলিকায়' অনুরাগ চারি প্রকার ধরা হইয়াছে।

'অনুরাগের লক্ষণ হয় চারি প্রকার।
উল্লাস, আক্ষেপ, রূপ অভিসার আর।"[১]

উল্লাসানুরাগকে পৃথক্‌ভাবে ধরা হইয়াছে। 'আক্ষেপানুরাগ' ও 'অভিসারানুরাগ' পরে আমরা পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিতেছি।

প্রাচীন কাব্যাদিতে দেখা যায় পূর্বরাগ নানা রকমে হইতে পারে—সাক্ষাৎ দেখিয়া, নাম শুনিয়া, ছবি দেখিয়া ও স্বপ্নে দেখিয়া।

সাক্ষাৎদর্শন, যেমন—'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার সাক্ষাৎ।

চিত্রে দর্শন, যথা, 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' অগ্নিমিত্রের মালবিকা-দর্শন।

স্বপ্নে দর্শন, যথা,—'হরিবংশে' অনিরুদ্ধের উষার রূপদর্শন।

ইন্দ্রজালে দর্শন—ইন্দ্রজালে দৃষ্ট কোন নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎদর্শনেব অভিলাষ।

গুণশ্রবণও নানাভাবে হইতে পাবে—

দূতীমুখে গুণশ্রবণ, বন্দীর নিকট গুণশ্রবণ—দূত ও বন্দী মুখে নলদময়ন্তীব গুণশ্রবণ। সখীর নিকট হইতে গুণশ্রবণ—'মালতী-মাধব' নাটকে সখীব নিকট হইতে মদয়ন্তিকাব এবং বুদ্ধবক্ষিতাব নিকট হইতে মকবন্দেব গুণশ্রবণ।

সঙ্গীতে শ্রবণ—বীণা, বংশীযোগে নাম, গুণাদি শ্রবণ; সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহগ্রন্থে এইগুলিব উদাহবণ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া আছে। রূপ গোস্বামীর সংকলিত 'পদ্যাবলী'তেও এইগুলির আলোচনা করা হইযাছে। বৈষ্ণব কবিগণ নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ ও নাযিকা-শ্রেষ্ঠা শ্রীবাধার অনুরাগ বর্ণনায় এইগুলি হইতেই ভাবধারা গ্রহণ কবিয়াছেন।

আমরা পূর্বতন ভাবতীয় প্রেম কবিতা হইতে শ্লোক চয়ন করিয়া বৈষ্ণব প্রেমকবিতার সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আলোচনা করিয়া আমাদের বক্তব্য প্রমাণ কবিতেছি।

হালের 'গাহাসত্তসঈ'র (গাথাসপ্তশতী) দুইটি কবিতায় দেখি বরের নাম-শ্রবণে ভবিষ্যদ্বধূর বোমাঞ্চেব উদয় হইযাছে।

"গিজ্‌জন্তে মঙ্গল-গাইআহিং বরগোত্ত-দিন্ন-অন্নাএ।
সোউং ব ণিগগও উঅহ হোন্ত-বহূআএ রোমঞ্চো" ॥

(গাহাসত্তসঈ—৭।৪২)

১ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য নন্দকিশোর দাসের 'রসকলিকা', পৃঃ ১৪৭

—'দেখ শুভবিবাহের সময় গায়িকারা যখন মঙ্গলসূচক গান গাহিতেছিল, তখন সেই গানে বরের নাম শ্রবণ করিয়া ভবিষ্যদ্বধূর শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল।'

'জই সো ণ বল্লহো বিঅ গোত্তগহণেণ তস্‌স সহি কীস।
হোহি মুহং তে রবি-অর-ফংস-বিসদং ব তামরসং" ॥

(গাহাসত্তসঈ ৪।৪৩)

—'হে সখি, সে যদি তোমার প্রিয় না হইবে, তবে তাহার নামগ্রহণে তোমার মুখ রবিকরস্পর্শে বিকাশিত পদ্মের মত প্রতীয়মান হইবে কেন'। এখানে নায়কের নাম শ্রবণে নায়িকার পূর্বরাগ বা নব-অনুরাগ বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইহার সহিত বৈষ্ণব-পদাবলীর চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদটির তুলনা করা চলে। কৃষ্ণনাম-শ্রবণে শ্রীরাধার মনে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে।

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"[১]

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ)—কত যে কলাবতী যুবতী সুমুরতি
নিবসতি গোকুল মাহ।
হরি অব রহসি রভসে পুন কাহুকে
কুটিল নয়নে নাহি চাহ॥
সুন্দরী, অতয়ে করিয়ে অনুমান।
শুভখণে স্বামী- বরত তুহুঁ ছোড়লি
নারি বরত নিল কান॥
তুয়া নিজ নাম গাম ঘন গাবই
সো এক আখর রঙ্ক।
শুনইতে রাতি রতন রতি রাতুল
চমকই তোহারি আতঙ্ক॥
তুয়া গুণগাম নাম কত গাবই
অবেকত মুরলি নিশান।

১ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত বৈঃ পঃ পৃঃ ৪৫

সহচরি কোরে ভোরি তোহে ডাকই
গোবিন্দদাস পরমান ॥ —গোবিন্দদাস[১]

কালিদাস 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে সাক্ষাৎদর্শনে হর-পার্বতীর পূর্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন।

'হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনেন" ॥

—কুমারসম্ভব ৩।৬৭

—'হরও (শিব) চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশির মত কিঞ্চিৎ ধৈর্য হারাইয়া বিম্বফলতুল্য অধরযুক্ত উমার মুখে তিনটি লোচন (অভিলাষ সহকারে) প্রদান করিলেন।' এখানে পার্বতীকে দেখিয়া শিবের পূর্বরাগের উদয় হইয়াছে দেখা যায়।

আবার,

"বিবৃন্বতী শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরৎবালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্য্যস্ত-বিলোচনেন ॥"

—কুমারসম্ভব ৩।৬৮

—'পার্বতীও বিকসিত নব কদম্বপুষ্পের ন্যায় (রোমাঞ্চিত) অংগগুলির দ্বারা ভাব (রতিভাব) প্রকাশ কবিতে করিতে লজ্জা-বিভ্রান্ত মুখটিকে বাঁকাইলেন।'

এখানে শিবকে দেখিয়া পার্বতীর অনুরাগ প্রকাশ করা হইয়াছে।

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাংগযষ্টি-
নিক্ষেপনায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥

—(কুমারসম্ভব ৫।৮৫)

—'তাঁহাকে (শিবকে) দেখিয়া স্বেদগাত্রী ও কম্পমানা শৈলরাজতনয়া (পার্বতী) নিক্ষেপের জন্য পদ উত্তোলন করিলে, পথাবরোধকারী পর্বতের দ্বারা আকুলিত নদীর মত যাইতেও পারিলেন না, অবস্থান করিতেও সক্ষম হইলেন না।' তুলনীয়—বিদ্যাপতির পদ,—"রহই ন পারিয়ে চলই ন পারি।"

---

১ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৫৮৪

কালিদাসের 'শাকুন্তল' নাটকে দেখা যায়—

'দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষতঃ ইত্যকাণ্ডে
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী
শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমানাম্' ॥

(শাকুন্তলে—দ্বিতীয় অংক)।

—'কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সেই তন্বী (শকুন্তলা) কুশঘাসে চরণ ক্ষত হইয়াছে বলিয়া বিনা কারণেই থামিয়া পড়িল, এবং গাছের শাখায় বল্‌কল (বসন) আসক্ত না হইলেও বসন মোচনের জন্য মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।' এখানে দুষ্যন্তকে দেখিয়া শকুন্তলার নব অনুরাগ দেখান হইয়াছে। রাজশেখর 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটকে রাজা ও কর্পূরমঞ্জরীর সাক্ষাৎদর্শনজাত পূর্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার সহিত বলরাম দাসের একটি পদের তুলনা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখিয়া শ্রীরাধার অনুরাগাতিশয় বর্ণিত হইয়াছে।

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মুরতি মরকত অভিনব কাম ॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে ॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরুভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী ॥
মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়।
পরাণ কেমন করে কি কহব কায় ॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে
বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে ॥[১]

---

১ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, ৭৩০ পৃষ্ঠা

এখানে নায়িকাকে দেখিয়া নায়কের অনুরাগ বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন একটি প্রাচীন শ্লোকে দেখি—

যত্রৈতা লহরীচলাঞ্চলদৃশো ব্যাপারয়ন্তি ভ্রুবং
যৎ তত্রৈব পতন্তি সন্ততমমী মর্মস্পৃশো মার্গণাঃ।
তচ্চক্রীকৃতচাপমঞ্চিত-শরপ্রেঙ্খৎকরঃ ক্রোধনো
ধাবত্যগ্রতঃ এব শাসনধরঃ সত্যং সদাসাং স্মরঃ॥

—"যেস্থানে এই তরঙ্গ-চঞ্চল দৃষ্টিসমূহ ভ্রূযুগলকে নিয়োজিত করে, সেখানেইত মর্মভেদী বাণগুলি পতিত হয়, সত্যই ক্রুদ্ধ মদন সজ্জিতশরাসন হস্তে তাহাদের অগ্রেই ধাবিত হয়।"

বৈষ্ণব পদাবলীতে এই ভাবের বহু পদ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—

হমে হসি হেরলা থোরা রে।
সফল ভেল সখি কৌতুক মোরা রে॥
হেরি তহি হরি ভেল আনে রে।
জনু মনমথে মন বেধল বানে রে॥
লখন ললিত তনু গাতে রে।
মন ভেল পরসিঅ সরসিজ পাতে রে॥
বর তনু পসরল বিন্দু রে।
নেউছি নড়াওল সনখত ইন্দু রে॥
কাঁপল পরম রসালে রে।
মনসিজ গলতহি জপেলু তমালে রে॥
বিদ্যাপতি কবি ভানে রে।
করত কমলমুখি হরি সাবধানে রে॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৮৩)

নব-অনুরাগে প্রেম-বৈক্লব্যের ইঙ্গিত সংস্কৃত প্রকীর্ণকবিতায় দেখা যায়। সদুক্তিকর্ণামৃতে ভোজদেবের সভাকবি ছিত্তপের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। বিরহিণী নায়িকার অবস্থা সম্পর্কে সখীদের মধ্যে আলোচনা হইতেছে।

'কিং বাতেন বিলঙ্ঘিতা ন ন মহাভূতার্দিতা কিং ন ন
ভ্রান্তা কিং ন ন সংনিপাত-লহরী-প্রচ্ছাদিতা কিং ন ন।
তৎ কিং রোদিতি মুহ্যতি শ্বসিতি কিং স্মেরং চ ধত্তে মুখং
দৃষ্টঃ কিং কথমপ্যকারণরিপুঃ শ্রীভোজদেবোঽনয়া॥ (ছিত্তপস্য)
(সদুক্তিকর্ণামৃত ৩।৬।৪)

—'অপদেবতার হাওয়া লাগিয়াছে কি? না না। দুষ্ট ভূতে পাইয়াছে কি? না না। মাথা খারাপ হইয়াছে কি? না না। সন্নিপাত ব্যাধির ঝোঁক লাগিয়াছে কি? না না। তবে কেন কাঁদিতেছে, মূর্ছা যাইতেছে, হাঁপাইতেছে, মুখ হাসাহাসি করিতেছে? তাহা হইলে কি বলিতে পারি শ্রীভোজদেব মেয়েটির নজরে পড়িয়া অকারণে শত্রুতা সাধিতেছে।"

ইহারই পূর্বরূপ দেখি গাহাসত্তসঈর একটি পদে। নায়িকার সখী কোন পুরুষকে বলিতেছে—

"অবলম্বহ মা সংকহ ণ ইমা গহলঙ্ঘিআ পরিব্ভমই।

অথক্ক-গজ্জিউব্ভন্ত-হিথ-হিঅআ পহিঅ-জাআ॥" (গাহাসত্তসঈ, ৪।৮৬)

—"এই রমণীকে ধর, কোন আশংকা করিও না, সে কোন গ্রহাভিভূতা হইয়া ভ্রমণ করিতেছে না। এই পথিক-জায়ার হৃদয় হঠাৎ মেঘগর্জনে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ত্রস্ত হইয়াছে।'

উক্ত পদের ছায়া অবলম্বন করিয়া বংশীবদন কয়েকটি পদ লিখিয়াছেন। যমুনাতীরে কদম্বতলায় অকস্মাৎ কৃষ্ণের দেখা পাইয়া রাধার আত্মবিস্মৃতি এবং ভূতে পাইয়াছে বলিয়া তাহার চিকিৎসা। এখানে পূর্বরাগবিধুরা রাধার প্রেমবৈক্লব্য দেখান হইয়াছে। কাহিনীতে বংশীবদনের মৌলিকত্ব দেখা যায়। সখী গিয়া রাধার অবস্থা প্রবীণা গোপীকে জানাইতেছে।

"দিন দুই চারি নারি আঁখি মেলাইতে
তোমরা আসিয়া দেখ একি আচম্বিতে।
কেহ কিছু জানে তার পায় করো সেবা
না জানিয়ে রাইরে পাইয়াছে কোন দেবা।
কদম্বের তলে কিবা মূরুতি দেখিয়া
গীম মুড়ি মুড়ি রাই পড়ে মুরুছিয়া।
বংশীবদনে কয় সেইখানে নিয়ে
চাইতে চিন্তিতে রাই পাছে বা না জীয়ে।"

(গীতচন্দ্রোদয় পৃ ১৪৬)

স্বপ্নদর্শনে পূর্বরাগের কথা উল্লেখ করিয়াছি। 'কর্পূর-মঞ্জরী'তে স্বপ্নদর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

জাণে পঙ্করুহাণণা সিবিণএ মং কেলিসেজ্জাগঅং
কন্দোট্টেণ তড়ত্তি তাড়িউম্মণা হত্থন্তরে সংঠিআ।

তা কোড্ডেণ মএ বি ঋত্তি ধরিআ চিল্লে বরিলঞ্চলে
তং মোত্তূণ গঅং চ তীঅ সহসা ণট্ঠা খু ণিদ্দাঅমে ॥

—কর্পূর-মঞ্জরী (তৃতীয়া জবনিকা)

—'আমার মনে হয় যে আমার স্বপ্নে সেই পংকজনয়না কর্পূরমঞ্জরী আমার বাহু হইতে এক হাত দূরে দাঁড়াইয়া ছিল এবং হঠাৎ নীলপদ্মের দ্বারা আমাকে তাড়না করিতে ইচ্ছা করিল, সেই সময় আমি কেলিশয্যায় শায়িত ছিলাম। আমিও ব্যগ্রতাবশতঃ তাহার উত্তরীয়ের শিথিল অঞ্চল ধারণ করিলাম, কিন্তু আমার হাতে ইহাকে ত্যাগ করিয়া সে হঠাৎ প্রস্থান করিল, এই সময়ে হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।'

ইহার সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর জ্ঞানদাসের শ্রীরাধার 'স্বপ্নে কৃষ্ণদর্শন' পদটির তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছে—

মনের মরম কথা তোমারে কহিযে হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই। (বৈ. প. পৃ. ৩৭৬)

এখানে স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার মনে অনুরাগের সৃষ্টি হইয়াছে। বড়ুচণ্ডীদাসের পদে স্বপ্নে রাধার কৃষ্ণদর্শন বর্ণনা করা হইয়াছে।

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী স্বপন শুন তোঁ বসী
সব কথা কহি আরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদম তলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥" (বৈ. প. পৃ. ৩৭)

তুলনীয়—

"প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে বসে বসে যেন কেহ
সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে"

—রবীন্দ্রনাথ, যৌবন স্বপ্ন : কড়ি ও কোমল

উদ্ধবদাসের একটি পদে শ্রবণ-জনিত রাধার পূর্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে।

পহিলে শুনিলুঁ অপরূপ ধ্বনি
কদম্বকানন হৈতে।
তার পর দিনে ভাটের বর্ণনে
শুনি চমকিত চিতে॥

আর একদিন মোর প্রাণসখি
কহিলে যাহার নাম।
গুণিগণগানে শুনিলুঁ শ্রবণে
তাহার এ গুণগ্রাম॥
সহজে অবলা তাহে কুলবালা
গুরুজন জ্বালা ঘরে।
সো হেন নাগরে আরতি বাঢ়য়ে
কেমনে পরাণ ধরে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দঢ়াইলুঁ
পরাণ রহিবার নয়।
করহ উপায় কৈছে মিলয়
দাস উদ্ধবে কয়॥"

চণ্ডীদাসের পদেও এই কথা দেখিতে পাই—

"হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি॥
হরি হরি এমন কেনে বা হৈল।
বিষম বাড়ব আনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল॥" ইত্যাদি—চণ্ডীদাস।
(পদকল্পতরু, ১৪৩)

ইন্দ্রজালে কোন নায়িকাকে দেখিয়া নায়কের চিন্তা, এখানে পূর্বরাগের 'চিন্তা' নামক দশা বর্ণনা করা হইয়াছে—

কথমীক্ষে কুরঙ্গাক্ষীং সাক্ষাল্লক্ষ্মীং মনোভুবঃ।
ইতি চিন্তাকুলঃ কান্তো নিদ্রাং নৈতি নিশীথিনীম্॥" (মালতী-মাধবে)
—সাহিত্যদর্পণে ৩য় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত (১৮-৬)

—'কন্দর্পদেবের আরাধ্যা লক্ষ্মীস্বরূপা সেই হরিণনয়নীকে কি চাক্ষুষ দর্শন করিব—এই চিন্তায় আকুল হইয়া (নায়ক) কান্ত বিনিদ্ররজনী যাপন করিল।'
তুঃ—"তড়িত-বরণী হরিণ-নয়নী নাহিতে দেখিনু ঘাটে। (চণ্ডীদাস)

নায়িকার হৃদয়ে নব প্রেমের সঞ্চার 'গাহাসত্তসঈ'র (গাথাসপ্তশতী) একটি কবিতায় প্রকাশ করা হইয়াছে। কোন নায়ক তাহার সখাকে বলিতেছে—

"পেচ্ছই অলদ্ধলক্‌খং দীহং ণীসসই সুন্নঅং হসই।
জহ জম্পই অফুডত্থং তহ সে হিঅঅটিঠঅং কিংপি॥'

—গাহাসত্তসঈ ৩।১৬

—"যখন যুবতী লক্ষ্য বিনা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, শূন্য হাসি (অকারণ) হাসিতেছে এবং অস্পষ্টার্থভাবে কি যেন আলাপ করিতেছে, তখন মনে হয় তাহার হৃদয়ে কি যেন সংস্থিত রহিয়াছে।" ইহার সহিত বৈষ্ণবপদাবলীতে রাধার পূর্বরাগের (চণ্ডীদাসের) পদটির তুলনা করা যাইতে পারে।

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথানি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি॥
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥ (পদকল্পতরু, ৩০)

ইহার সহিত আমরা অমরুকৃত একটি প্রেম-কবিতার তুলনা করিতে পারি সখী নায়িকাকে প্রশ্ন করিতেছে—

অলসবলিতৈঃ প্রেমার্দ্রার্দ্রৈর্মুহুর্মুকুলীকৃতৈঃ
ক্ষণমভিমুখৈর্লজ্জালোলৈর্নিমেষপরাঙ্‌মুখৈঃ।

হৃদয়নির্হিতং ভাবাকূতং বমদ্ভিরেবেক্ষণৈঃ
কথয় সুকৃতী কোঽয়ং মুগ্ধে ত্বয়াদ্য বিলোক্যতে ॥

(অমরুকস্য, সদুক্তিক ২।৩৭।৩)

—'তোমার এই চাহনির দ্বারা—যে চাহনি আলস্যমাখা, প্রেমনীরে সিঞ্চিত পলে পলে মুকুলীকৃত; ক্ষণে ক্ষণে অভিমুখে লজ্জাচঞ্চলভাবে প্রসারিত, পলকবিহীন, এবং যে চাহনি তোমার দেহস্থিত ভাবাকৃতি উদ্গিরণ করিতেছে, এই চাহনিতে বল কোন্ সে সুকৃতী যাহাকে তুমি বার বার দেখিতেছ।" ইহার অনুরূপ ভাব গাহাসত্তসঈতে (গাথাসপ্তশতী) লক্ষ্য করা যায়। কুমারীর কোন সখী তাহার পিতৃস্বসাকে বলিতেছে।

'হিঅঅটিঠঅসস্ দিজ্জউ তণুআঅন্তিং ণ পেচ্ছহ পিউচ্ছা
হিঅঅটিঠওম্হ কংতো ভণিউং মোহং গআ কুমরী ॥'

(গাহাসত্তসঈ ৩।৯৮)

—'হে পিসিমা, এই কুমারীকে তাহার হৃদয়স্থিত জনের হস্তেই সমর্পণ কর। সে যে কৃশ হইতেছে ইহা কি তোমরা লক্ষ্য করিতেছ না।' 'আমার হৃদয়স্থিত জন কোথায়' এই বলিয়া সেই কুমারী মোহগ্রস্ত হইয়াছে।

নব অনুরাগিনী কোন নায়িকা নায়কের নিকট পত্রদ্বারা অনুরাগাতিশয় প্রকাশ করিতেছেন।

জং জং পুলএমি দিসং পুরও লিহিঅ ব্ব দীসসে তত্তো।
তুহ পড়িমাপড়িবাড়িং বহই ব্ব সঅলং দিসাঅক্কং।

—(গাথাসপ্তশতী ৬।৩০)

—'যে যে দিকে আমি দৃষ্টি প্রদান করি, সেই সেই দিকে তোমাকে সমুখে যেন লিখিত (চিত্রিত) দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দিক চক্রই যেন তোমার প্রতিমা বহন করিতেছে।'

'গাহাসত্তসঈ'র কোন নায়িকা নিজের অনুরাগাধিক্য প্রকাশ করিতেছে আর সেই সংগে অত্যনুরক্ত নায়কের কথাও বলিতেছে।

জং জং সো ণিজ্ঝাঅই অঙ্গোআসং মহং অণিমিসচ্ছো।
পচ্ছাএমি অ তং তং ইচ্ছামি অ তেণ দীসন্তং ॥ (গাহা ১।৭৩)

—"আমার যে যে অঙ্গের দিকে সে (নায়ক) অনিমেষলোচনে চাহিয়া থাকে, আমি (নায়িকা) সেই সেই অংগ (লজ্জার উদয়ে) প্রচ্ছাদিত করি। আবার তাহা দ্বারা দৃশ্যমান হউক (আমার অভিলাষের জন্য) তাহাও ইচ্ছা করি।"

এইগুলির সহিত আমরা চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদের তুলনা করিতে পারি।

চণ্ডীদাস—

'কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
সখির সহিতে জলেকে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয়॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিনু
কহিলুঁ সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর
সদাই হিয়ায় জাগে॥

জ্ঞানদাস—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ (বৈ. প. পৃ ৩৭৯

তুলনীয়ঃ রবীন্দ্রনাথ—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলনে॥
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে যায় তব দেহ পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।

পূর্বরাগের একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ একটি কথায় কবি বিদ্যাপতি রাধার মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

"এক সর সব দিশ দিখিঅ কাহ্ন।" (বিদ্যাপতি ২৪৩)

—'সবদিকে একমাত্র কানাইকেই দেখি, আর কিছু দেখিতে পাই না।'

"দরসনে লোচন দীঘল ধার" (বৈঃ পঃ ৮৩ পৃঃ)

"যেদিকে পসারি আঁখি দেখি শ্যামময়"

তুঃ—(গোবিন্দদাস)—

"লোচনহি শ্যামর বচনহি শ্যামর
শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয়ে মণি শ্যামর
শ্যামর সখি করু কোর"। (বৈ. প. পৃ. ৬৬৫)

ইহার সহিত তুলনা করুন—

'স্থাবর-জঙ্গম দেখে না, দেখ তার মূর্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি।"

—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ)

তুলনীয়—

"আমি তারে খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।"

॥ গীতবিতান ॥ রবীন্দ্রনাথ

'গাহাসত্তঈ'র (গাথাসপ্তশতী) একটি কবিতায় নায়িকার অপরূপ রূপলাবণ্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

"জস্স জহিং বিঅ পঢ়মং তিস্সা অঙ্গম্মি নিবডিআ দিট্‌ঠী।
তস্স তহিং চিঅ ঠিআ সব্বঙ্গং কেণ বি ণ দিট্‌ঠং॥"

—গাথাসপ্তশতী ৩।৩৪

—"তাহার (নায়িকার) যে অংগে যাহার দৃষ্টি প্রথমতঃ পতিত হইয়াছে, সেই অংগেই তাহার সেই দৃষ্টি লাগিয়া রহিয়াছে। কাজেই কেহই তাহার সকল অংগ দেখিতে পারে নাই।"

ইহার সহিত জ্ঞানদাসের পদটির তুলনা করা যাইতে পারে।

'দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অংগে এত রূপ নয়নে না ধরে॥' (বৈ প. ৩৮২ পৃ.)

গোবিন্দদাসের একটি পদে রাধার পূর্বরাগের প্রায় সমস্ত দিকই বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাই।

সজনি মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
কুলবতী তিন পুরুখে ভেল আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি॥
পহিলে শুনিলোঁ হাম শ্যাম দুই আখর
তৈখনে মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কো ঐছে মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥
না জানিয়ে কো ঐছে পটে দরশায়লি
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি॥
গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন সুন্দরী
অতয়ে করহ বিশোআস।
যাকর নাম মুরলী রব তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ॥ (বৈ. প. পৃ. ৫৭৬)

"দরশনে উনমুখী দরশন সুখে সুখী
আঁখি মোর নাহি জানে আন।
যাঁহা যাঁহা পড়ে দিঠি তাঁহা অনিমেখে দুটি
সে রূপমাধুরী করে পান।"

—শ্যামদাস, বৈ. প পৃ. ৫৬৫

অমরুর একটি শ্লোকে নায়িকার নব অনুরাগের বর্ণনা দেখা যায়।

তদ্বক্ত্রাভিমুখং বিনমিতং দৃষ্টিঃ কৃতা পাদয়ো-
স্তস্যালাপকুতূহলাকুলতরে শ্রোত্রে নিরুদ্ধে ময়া।
পাণিভ্যাঞ্চ তিরস্কৃতঃ সপুলকঃ স্বেদোদ্গমো গণ্ডয়োঃ
সখ্যঃ কিং করবানি যান্তি শতধা যৎকঞ্চুকে সন্ধয়ঃ॥

(অমরুকস্য, সদুক্তিকঃ ২।৪৬।৪)

—"তাহার (নায়কের) মুখের সামনাসামনি হইলে মুখ নামাইয়াছি এবং আমার দৃষ্টি পায়ের দিকে নিযুক্ত করিয়াছি, তাহার বাক্য শুনিতে উৎসুক

হইলে আমার কর্ণদুইটি আচ্ছাদিত করিয়াছি, গণ্ডস্থলে পুলক দেখা দিলে হাত দিয়া তাহা ঢাকিয়া দিয়াছি, কিন্তু সখীগণ, যখন আমার কাঁচুলি শতধা ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, তখন আমি কি করিব ।"

এই পদটিকে অনুসরণ করিয়া বিদ্যাপতি শ্রীরাধার পূর্বরাগের বর্ণনা করিয়াছেন ।

অবনত আনন কএ হম রহলিহু
বারল লোচন চোর ।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনুসে চাঁদ চকোর ॥
ততহু সঞে হঠে হঠি মোঞে আনল
ধএল চরণ পর রাখি ।
মধুকর মাতল উড়এ ন পারএ
তইও পসারএ পাঁখি ।
মাধবে বোললি মধুরস বানী
সে শুনি মুহু মোঞে কান ।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ফুল ধনু পঁচ বান ॥
তনুকে পসেদে পসাহনি ভাসলি
পুলক হু তইসন জাগু ।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহুক বলআ ভাগুঁ ।
ভন বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো
বোলল বোল না যায় ।
রাজা সিব সিংহ রূপনরাঅন
সামর সুন্দর কায় ॥ (বৈ. প. পৃ. ৮২)

'গাহাসত্তসঈর' প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে অনুরাগ প্রকাশের যে রীতি দেখি তাহারই প্রতিধ্বনি শুনি বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদাবলীতে ।

'কং তুংগথণুক্খিত্তেণ পুত্তি দারট্ঠিআ পলোএসি ।
উন্নামিঅ-কলস-ণিবেসিঅগ্‌ঘ-কমলেণব্ব মুহেণ ॥
—গাহাসত্তসঈ ৩।৫৬ ।

'হে পুত্রি, উন্নমিত কলসদ্বয়ের উপর নিবেশিত পূজাপদ্মের মত তোমার তুংগস্তনদ্বয়ের উপর মুখ রাখিয়া, দ্বারে দাঁড়াইয়া তুমি কাহাকে অবলোকন করিতেছ।'

কোন একটি কবিতায় দেখি দূতী নায়ক-সমীপে নায়িকার প্রণয়াতিশয় ব্যক্ত করিতেছে।

'ধীরাবলম্বিরীঅ বি গুরুঅণ-পুরও তুমম্মি বোলীণে।
পড়িও সে অচ্ছি-ণিমীলেণ পম্হট্‌ঠিও বাহো।

—গাহাসত্তসঈ ৪।৬৭

—'তুমি চলিয়া গেলে পর গুরুজনের সমুখে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া স্থির থাকিলেও তাহার (নায়িকার) অক্ষি-নিমীলন ঘটিলে পক্ষ্মস্থিত বাষ্প (অশ্রু) পতিত হইল।"

বলরাম দাসের পদেও শ্রীরাধার ঠিক এই অবস্থা দেখা যায়।

"শুনইতে কানহি আনহি শুনত
বুঝাইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদ গদ উত্তর না নিকসই
কহইতে সজল নয়ান।" (বৈ. প. ৭২৯ পৃ.)

'গাহাসত্তসঈ'র কবিতাগুলির মধ্যে নায়িকার অপূর্ব রূপ-লাবণ্যের কথা রসপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। নিম্নের এই কবিতাটিতে নায়িকার সৌন্দর্য্যাতিশয় বর্ণিত হইয়াছে।

'কহঁ সা ণিব্বণ্ণিজ্জই জীঅ জহালোইঅম্মি অঙ্গম্মি
দিট্‌ঠী দুব্বল-গাই ব্ব পঙ্কপড়িআ ণ উত্তরই॥' —গাহা ৩।৭১

"যাহার (যে কোন ব্যক্তির) দৃষ্টি সেই নায়িকার যে অঙ্গে পতিত হয়, তাহার সেই দৃষ্টি পঙ্ক-পতিতা দুর্বল গাভীর মত সেই অঙ্গ হইতে আর উত্থিত হয় না, তাহার সমগ্র শরীরের সৌন্দর্য্য কেমন করিয়া বর্ণনা করা যায়।"

ইহার সহিত বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের এই বিখ্যাত পদটির তুলনা করিতে পারা যায়। বৈষ্ণব কবিও এইসুরে কথা বলিতেছেন।

আলো মুঞি কেন গেলুঁ যমুনার জলে।
ছলিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ॥ (পদকল্পতরু ১২৩)

আবার, 'সেঅচ্ছলেন পেচ্ছঅ তনুএ অঙ্গম্মি সে অমাঅন্তং
লাবণ্ণং ওসরই তিবলি-সোবাণ-বত্তীএ॥

(গাথাসপ্তশতী ৩।৭৮)

"দেখ, তাহার (সেই রমণীর) শরীর-লাবণ্য তাহার কৃশ অঙ্গে পরিমাপিত হইতে না পারিয়া যেন স্বেদচ্ছলে ত্রিবলীরূপ সোপান পংক্তিদ্বারা অপসৃত হইতেছে।"

ইহার সহিত ভক্তকবি গোবিন্দ আচার্য্যের একটি পদের তুলনা করা যায়।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরুছা পায়॥"

(পদকল্পতরু ৯৫২, বৈ. প. পৃ. ২৯২)

কালিদাস 'মেঘদূত' কাব্যে নায়িকার অপূর্ব রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাৎ যুবতীবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।

(মেঘদূত, উত্তরমেঘ ২২)

"সে (যক্ষপ্রিয়া), তন্বী, শ্যামা, কুন্দদন্তা, পাকা তেলাকুচার মতো রক্তাধরা, মাঝা ক্ষীণ, চকিতহরিণদৃষ্টি, নিম্নোদরী, নিতম্বভারে মন্দগতি এবং স্তনভারে আনত, সেখানে তাহাকে দেখিলেই মনে হইবে যেন সে তরুণীদের মধ্যে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি।" ইহার সহিত জয়দেব গোস্বামীর কৃত শ্রীরাধিকার রূপবর্ণনা স্মরণ করা যায়।

'প্রাকৃত-পৈঙ্গলে'র একটি পদে নায়িকার রূপ-লাবণ্যের বর্ণনা নাই।

"তরল-কমল-দল-সরি-জুঅণঅণা
সরঅ-সমঅ-সসি-সুসরিস-বঅণা।
মঅগল-করিবর-সঅলস-গমণী
কমণ সুকিঅফল বিহি গঢ়ু রমণী॥" (প্রাকৃত-পৈঙ্গল)

"চঞ্চল কমলদল সদৃশ যাহার নয়নযুগল, শরৎকালীন চন্দ্রের আনন, মদমত্ত করিবরের মত অলসগমনা, কোন্ সুকৃতির (পু বিধাতা সেই রমণীকে গড়িয়াছেন।"

"বন্ধুকদ্যুতি বান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধমধুকচ্ছবি- ।
র্গণ্ডে চণ্ডি, চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনং ॥"

(গীতগোবিন্দ ১০ম সর্গ)

"হে চণ্ডি, তোমার অধর বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় (লাল), কপোলে মহুয়াপুষ্পের শ্রী, নয়ন নীলপদ্মকে লজ্জা দেয়।"

বড়ু চণ্ডীদাসের পদটিতে অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়।

কমলবদনা রাধা হরিণনয়নী।
আনত কপাল তার আধশশি জিনী॥
কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল॥
তিলফুল জিণী নাসা কম্বুসম গলে।
কনক যুথিকামালা বাহুযুগলে॥
কমলকলিকা সম তার পয়োভারে।
ডমরুসদৃশ মধ্য নাভি গম্ভীরে॥
গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে।
চরণযুগল থলকমলে আকারে॥
করিরাজ জিনি বাধা করিল গমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাম্বুলখণ্ড)

সংস্কৃত প্রকীর্ণ-কবিতার সংগ্রহগুলিতে তরুণী নারীর চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বৈষ্ণব-পদাবলীতে (শ্রীকৃষ্ণের) পূর্বরাগে শ্রীরাধার বর্ণনাও অনুরূপ ভাবে দেওয়া হইয়াছে। চৈতন্যোত্তর যুগে রাধার রূপবর্ণনা ক্রমশ কমিয়া গিয়াছে। কেননা, বৈষ্ণব কবিগণ সখীর ভাব অবলম্বন করিয়া রাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন।

গাহাসত্তসঈর একটি পদে আছে,—

পত্তণিঅম্বপ্‌ফংসা ণ্‌হাণুত্তিণ্ণাএ সামলঙ্গীএ।
জলবিন্দুএহিঁ চিহুরা রুঅন্তি বন্ধস্‌স ব ভএণ॥ (গাহা—৬।৫৫)

"স্নানোত্তীর্ণা শ্যামলাঙ্গীর প্রাপ্তনিতম্বস্পর্শ চিকুরগুলি পুনরায় বন্ধনভয়ের জন্যই যেন জলবিন্দু দ্বারা রোদন করিতেছে।"

উক্ত পদের সহিত বিদ্যাপতির এই পদদুইটি স্মরণ করা যায়।

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখলুঁ সিনানক বেলা॥
চিকুর গলয়ে জলধারা।
বিথারল মোতিম ঝারা॥
বদন মুছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনয় মুকুর॥
তেই উদসল কুচজোরা।
পলটি বৈঠায়ল কনক কটোরা॥
নীবিবন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ সেস॥ (বৈ. প. পৃ. ৮০)

আবার—

যাইতে পেখলুঁ হম নাহলি গৌরী।
কথি সঞে রূপ ধনি আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহ জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা
অলকহি তীতল তঁহী অতি শোভা
অলিকুল কমলে বেড়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা
সিন্দুর মণ্ডিত পঙ্কজ পাতা।
সজল চীর রহ পয়োধর সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হীমা॥
ও লুকি করইতে চাহে কি দেহা।
অবহুঁ ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা॥
ঐছে ফেরি রস না পায়ব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনে লাগল ভাব ওরূপ নেহারী॥ (বৈ. প পৃ. ৮১)

চণ্ডীদাসের পদেও ইহার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই।

নাহিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে
পড়েছে চিকুর রাশি।
কালিয়া আঁধার কনক চাঁদার
স্মরণ লইল আসি॥

আবার, সত্তসঈর কোন পদে দেখি—

মগ্‌গং চ্চিঅ অলহন্তো হারো পীণুন্নআণঁ থণআণং।
উব্বিগ্‌গো ভমই উরে জমুণাণইফেণপুঞ্জব্ব॥ (গাহাসত্তসঈ ৭।৬৯)

—"পীনোন্নত স্তনযুগলের পথ লাভ করিতে না পারিয়া হার যমুনা নদীর ফেনপুঞ্জের ন্যায় বুকের উপর যেন উদ্বিগ্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।"

ইহার সহিত বিদ্যাপতির পদটির তুলনা করা যায়—

পীন পয়োধর অপরূপ সুন্দর
উপর মোতিমহার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার॥

অথবা বড়ু চণ্ডীদাসের—

গিএ গজমুতীহার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচ যুগল উপরে।
হঁআ সমান আকারে সুরেশ্বরী দুই ধারে
পড়ে যেন সুমেরু শিখরে॥

প্রভৃতি স্মরণ করা যাইতে পারে।

গোবর্ধনাচার্য্যের 'আর্য্যাসপ্তশতীতে' তরুণী রমণীর সৌন্দর্য্য-বর্ণনা দেখা যায়।

পূর্ববর্তী ভারতীয় কবিগণ পূর্বরাগ-বিধুরা নায়িকার অপূর্ব বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বর্ণনায় নায়িকার শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিবর্তনই লক্ষ্য করি।

গাহা-সত্তসঈর নায়িকা পূর্বরাগের বিরহে সন্তপ্তা হইয়া বলিতেছে—

নিদ্দং লহন্তি কহিঅং সুণন্তি খলিঅক্‌খরং ণ জম্পন্তি,
জাহিং ন দিট্‌ঠো সি তুমং তাও চিঅ সুহঅ সুহিআও॥

(গাহা-সত্তসঈ ৫।১৮)

—"হে সুভগ, যে রমণীরা তোমাকে দেখে নাই, তাহারাই সুখী (আছে), কেননা তাহারা নিদ্রা যাইতে পারে, অপরের কথা শুনিতে পারে এবং তাহাদিগকে স্খলিতাক্ষরে কথা বলিতে হয় না।"

এই পদটির ছায়া অবলম্বন করিয়া পদকর্তা গোবিন্দদাস নিম্নলিখিত পদটি রচনা করিয়াছেন।

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম শরে জরজর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনী, জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥
সুনয়নি কহত কানুঘন শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশ রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জ্বলু আগি॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত
চপলজীবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতি রস মরিয়াদ॥ (পদকল্পতরু ২৩৪)

'গাহাসত্তসঈর' কোন পদে দেখি—

দূতী নায়ককে নায়িকার নিকট লইয়া যাইবার জন্য নায়িকার বিরহ বর্ণনা করিতেছে।

বালঅ দে বচ্চ মরই বরাঙ্গী অলং বিলম্বেণ।
সা তুজ্‌ঝ দংসণেণ বি জীবেজ্জই ণত্থি সংদেহো।
(গাহা ৫।৮৭)

—'হে বালক (অজ্ঞ), শীঘ্র চল, হতভাগিনী সেই নায়িকা মারা যাইতেছে, বিলম্বের প্রয়োজন নাই, তোমার দর্শন ঘটিলেই সে বাঁচিয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।'

'সদুক্তিকর্ণামৃতে' অমরসিংহের নামে প্রচলিত একটি পদে আছে—

কুচৌ ধত্ত কম্পং নিপততি কপোলঃ করতলে
নিকামং নিঃশ্বাসঃ সবলমলকং তাণ্ডবয়তি।
দৃশঃ সামর্থ্যানি স্থগয়তি মুহুর্বাষ্পসলিলং
প্রপঞ্চোঽয়ং কিঞ্চিত্তব সখি হৃদিস্থং কথয়তি॥

(সদুক্তিকর্ণামৃত ২।২৫।১)

'তোমার কুচযুগ কম্পিত হইতেছে, কপোল করতলে নিপতিত হইতেছে, নিঃশ্বাস বায়ু সরল অলককে প্রবলভাবে সঞ্চালিত করিতেছে, মুহুর্মুহুঃ বাষ্প-সলিল তোমাব দৃষ্টিকে নিরুদ্ধ করিতেছে, এই সকল প্রপঞ্চ হে সখি, তোমাব হৃদয়স্থিত ভাবকেই বলিয়া দিতেছে।'

'সূক্তিমুক্তাবলী'র একটি কবিতায় অনুরূপ ভাব দেখি।

শ্বাসেষু প্রীথিমা মুখং করতলে গণ্ডস্থলে পাণ্ডিমা
মুদ্রা বাচি বিলোচনেঽশ্রুপটলং দেহে চ দাহোদয়ঃ।
এতাবৎ কথিতং যদস্তি হৃদয়ে তস্যাঃ কৃশাঙ্গ্যাঃ পুনঃ
তজ্জানাসি ননু ত্বমেব সুভগ শ্লাঘতা স্থিতিস্তত্র যা॥

(সূক্তিমুক্তাবলী ৪৪।৮)

—'তাহার শ্বাসসমূহে দীর্ঘ বিস্তৃতি, মুখ করতলে, গণ্ডস্থলে পাণ্ডিমা, বাক্যে মুদ্রা অর্থাৎ বাক্য যেন অবরুদ্ধ, চক্ষুতে অশ্রুবাশি, দেহে দাহের উদয়, এই পর্যন্ত তো মুখে বলিলাম সেই কৃশাঙ্গীর হৃদয়ে যাহা আছে, হে সুভগ, তাহা একমাত্র তুমিই জান, সেখানে যাহা আছে তাহাই একমাত্র শ্লাঘ্য'।

শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে উদ্ধৃত একটি কবিতায় দেখি—

গোপায়ন্তী বিরহজনিতং দুঃখমগ্রে গুরূনাং
কিং ত্বং মুগ্ধে নয়নবিসৃতং বাষ্পপুরং রুনৎসি।
নক্তং নক্তং নয়নসলিলৈরেষ আর্দ্রীকৃতস্তে
শয্যোকান্তঃ কথয়তি দশামাতপে দীয়মানঃ।

(শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি ১০৯৫)

"গুরুজনদের অগ্রে বিরহজনিত দুঃখ গোপন করিতে করিতে, হে মুগ্ধে, কেন তুমি নয়ন-বিগলিত বাষ্প-প্রবাহকে রুদ্ধ করিতেছ, রাত্রিতে রাত্রিতে নয়ন-সলিলের দ্বারা আর্দ্রীকৃত এই যে তোমার শয্যাপ্রান্ত যাহা তুমি রৌদ্রে দিয়াছ, তাহাই তোমার দশার কথা বলিয়া দিতেছে।"

রূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে অনুরূপভাবেই শ্রীরাধার বর্ণনা করিয়াছেন।

এইগুলির সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগে বিধুরা শ্রীরাধার চিত্র স্মরণ করিতে পারি :

গোবিন্দদাস— নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বয়ন সঘন অবলম্ব॥
খেনে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক মুকুলে ভরু অঙ্গ॥
এ ধনি মোহে না করু আন ছন্দ।
জনলুঁ ভেটলি শ্যামর চন্দ॥
ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদন সব কহই॥
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল॥
আন ছলে অঙ্গন আন ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত।
দূরে রহু গৌরব গুরুজন লাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ।”

(বৈ. প. পৃ. ৫৭৫, পদকল্পতরু, ৭০)

আবার—

রাধামোহন দাস— কি তুঁহু ভাবসি রহসি একান্ত।
ঝর ঝর লোচনে হেরসি পন্থ॥
কহ কহ চম্পক গোরী।
কাঁপসি কাহে সঘন তনু মোড়ি॥
ঘাম কিরণ বিন্দু থামরি অঙ্গ।
না জানিয়ে কাহুক প্রেম তরঙ্গ।
জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বাসে।
বিশোয়াস করু রাধামোহন দাসে॥

(শ্রীশ্রীপদামৃতমাধুরী, পৃঃ ৫৫)

অথবা,

চণ্ডীদাসের পদ— এ সখি সুন্দরী কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয়॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়ে উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি॥
মৌন করিয়া তুমি কিবা ভাব মনে
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে॥

(শ্রীশ্রীপদামৃতমাধুরী পৃঃ ৫৬)

সূক্তিমুক্তাবলীতে নায়িকার পূর্বরাগের বিরহের ভিতর দেখিতে পাই—

ত্বাং চিন্তা-পরিকল্পিতং সুভগ সা সম্ভাব্য রোমাঞ্চিতা
শূন্যালিঙ্গন-সঞ্চলদ্ভুজযুগেনাত্মানমালিঙ্গতি।
কিঞ্চান্যদ্বিরহব্যথাপ্রশমনীং সংপ্রাপ্য মূর্চ্ছাং চিরাৎ
প্রত্যুজ্জীবতি কর্ণমূলপতিতে ত্বন্নামমন্ত্রাক্ষরৈঃ॥

(সূক্তিমুক্তাবলী, ৪৪।২৩)

"হে সুভগ, চিন্তা-পরিকল্পিত তোমাকে (উপস্থিত) মনে করিয়া সেই (রোমাঞ্চিতা) বালা শূন্যালিঙ্গনে প্রসারিত হস্তদ্বারা নিজেকে আলিঙ্গন করে, আরও কি বলিব, অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিরহ-ব্যথা-প্রশমিনী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া আবার কর্ণমূলে তোমার নাম-মন্ত্রাক্ষর পতিত হইলেই পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে।"

বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই ভাবটির সাক্ষাৎ মিলে, প্রিয়ের বা প্রিয়ার নাম-মন্ত্রাক্ষর কানে প্রবেশ করিলে বিরহী বা বিরহিণীর সকল বিরহ-ব্যাধি-মূর্চ্ছা অপনীত হয়।

গৌরপদাবলীতেও দেখি শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ-বিরহে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণ কৃষ্ণ-নাম-গুণগান গাহিয়া তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতেন।

এই ধারারই পরিণতি পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখি—

গোবিন্দদাস— গুরুজন অবুধ মুগধমতি পরিজন
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনি মনি মন্ত্রমহৌষধি
লোচনে লাগল সমাধি॥
খেনে খেনে অঙ্গ- ভঙ্গ তনু মোড়ই
কহত ভরমময় বাণী।

শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি ॥ (বৈ. প. পৃ. ৫৭৯)

আবার—

গোবিন্দদাস— তহি এক সুচতরি তাক শ্রবণ ভরি
পুনপুন কহে তুয়া নাম।
বহুখনে সুন্দরী পাই পরাণ ফেরি
গদগদ কহে শ্যাম শ্যাম ॥
নামক অছু গুণ না শুনিয়ে ত্রিভুবন
মৃতজন পুন কহে বাত।
গোবিন্দদাস কহ ইহ সব আন নহ
যাই দেখহ মঝু সাথ ॥ (বৈ. প. পৃ. ৬৫১)

কালিদাসের 'কুমার-সম্ভবে' দেখি যে—

শিবের প্রতি অনুরাগিনী উমা স্বপ্নদর্শনে ও প্রতিকৃতি-দর্শনে বিরহ-বিনোদন করিতেছেন।

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুদ্ধত।
ক্ব নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা ॥

(কুমার সম্ভব ৩।৫৭)

'রাত্রির তিন প্রহর যখন কাটিয়া গিয়াছে তখন আমার সখী (পার্বতী) একবার চক্ষু বুজিয়া অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে।

'নীলকণ্ঠ, কোথায় যাও'—এই কথা অস্ফুটভাবে বলে আর যে নাই তাহার যেন গলা জড়াইয়া ধরে।'

'গাহাসত্তসঈর' নায়িকা পূর্বরাগের বিরহে অনুরূপ আচরণ করিতেছে দেখা যায়।

সঅণে চিন্তামইঅং কাউণ পিঅং ণিমীলিঅচ্ছীএ।
অপ্পাণো উবউঢ়ো পসিঢলবলআহি বাহাহিং ॥ (গাহাসত্তসঈ ২।৩৩)

—'চোখ বুজিয়া শয্যার উপর (সেই রমণী) নিজের প্রিয়তমকে চিন্তান্বিত করিয়া (বিরহে) প্রশিথিল বলয়যুক্ত বাহুদ্বারা নিজেকেই আলিঙ্গন করিতেছে।'

বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই ভাবটি পাওয়া যায়—

গোবিন্দদাস— মাধব কি কহব ধনিক সন্তাপ।
চীতহু তুয়া দরশন দুর আপ ॥

বিরহক বেদনে সো বরনারী।
নিরজনে বিরচই মুরতি তোহারি॥
দারুণ দৈব ততহি঺ লাগ নেল।
লিখইতে আন আন ভৈ গেল॥
লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ॥
হেরি হেরি সুন্দরি পড়লহি ধন্দ॥
ভাঙু ধনুয়া ভেল লোচন বাণ।
অঙ্গে অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান॥
পুন কিয়ে লিখিব যতন করি তোয়।
ভীতক চীতপুতলি ভেল সোয়॥
গোবিন্দদাস কহই করি সেবা।
শুনইতে সো ভেল মরকত দেবা॥

(বৈষ্ণব-পদাবলী, পৃষ্ঠা ৬২০)

কবি রাজশেখর নায়িকা "কর্পূর-মঞ্জরী"র পূর্বরাগের বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন।

সহ দিঅহণিসাহিং দীহরা সাসদণ্ডা
সহ মণিবলএহিং বাহধারা গলন্তি।
তুহ সুহঅ বিওএ তীঅ উব্বিংবিরীএ
সহ তণুলআএ দুব্বলা জীবিআসা॥

—রাজশেখর, কর্পূরমঞ্জরী, ২য় জবনিকা (২।৯)

—"দিনরাত্রি তাহার দীর্ঘশ্বাস পতিত হয়, মণিময় বলয় ও বাষ্পধারা বিগলিত হয়, হে সুভগ, তোমার বিয়োগে উদ্বেগিনী তাহার তনুলতা ও জীবনের আশা উভয়ই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে॥"

বৈষ্ণব কবিগণ পূর্বরাগ-বিধুরা শ্রীরাধার অবস্থাও ঠিক এইভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন—

অসিত পক্ষের শশী যেন দিনে দেখি।
শ্রাবণের ধারা যেন ঝরে দুই আঁখি॥
ধরণী শয়নে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
উঠিতে বসিতে নারে কাঁপে কলেবর॥

কোকিলের গান যেন কুলিশ সমান।
জৈমিনি জৈমিনি বলে মুন্দে দুনয়ান॥
ফুকরি কান্দিতে তার নাহিক শকতি।
তোমা বিনে জীবন সংশয় রসবতী॥
বলরাম বলে যদি দেখিবে রাধারে।
অবিলম্বে ব্রজপুরে কর আগুসারে॥ (বৈ. প. পৃঃ ৭৫৬)

সদুক্তিকর্ণামৃতে উল্লিখিত রাজশেখরের একটি পদে দেখি—বিরহিণী নায়িকাকে যোগিনী বলা হইয়াছে।

'আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনং চেদমিদং চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিং বা বিয়োগিন্যসি॥
—কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ৪১৬, সদুক্তিক ২।২৫।২

—'তোমার আহারে বিরতি, সমস্ত বিষয়গ্রামে পরা নিবৃত্তি, আর তোমার নাসাগ্রে নয়ন, মন একতান, এই তোমার মৌন, এই যে অখিল বিশ্ব তোমার শূন্য বলিয়া আভাত হইতেছে, হে সখি, আমাদের বল, তুমি কি তাহা হইলে যোগিনী হইলে, না বিয়োগিনী হইলে।'

চণ্ডীদাসের রাধাও ঠিক অনুরূপ আচরণ করিয়াছেন।

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নতারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥ (পদকল্পতরু ৩০)

সদুক্তিতে উদ্ধৃত লক্ষ্মীধর কবিরও একটি পদে পূর্বরাগবিধুরা নায়িকার অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে দেখা যায়—

'যদ্দৌর্বল্যং বপুষি মহতী সর্বতশ্চাস্পৃহা য-
ন্নাসালক্ষ্যং যদপি নয়নং মৌনমেকান্ততো যৎ।

একাধীনং কথয়তি মনস্তাবদেষা দশা তে
কোঽসাবেকঃ কথয় সুমুখি ব্রহ্ম বা বল্লভো বা ॥

—সদুক্তিক ২।২৫।৫

—"দেহে তোমার দৌর্বল্য, সবদিকেই মহতী অস্পৃহা, তোমার নয়ন নাসালক্ষ্য, তোমার একান্ত মৌনভাব, তোমার এই দশা বলিয়া দিতেছে, 'একাধীন' হইল তোমার মন। কে সেই এক, বল, হে সুমুখি, সে কি ব্রহ্ম না বল্লভ ?"

গোবর্ধন আচার্য্যের আর্য্যাসপ্তশতীতে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক একটি কবিতায় রাধার পূর্বরাগের বিরহ বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্লোকটি পূর্বেই একবার উল্লেখ করা হইয়াছে।

'গায়তি গীতে শংসতি বংশে বাদয়তি সা বিপঞ্চীষু।
পাঠয়তি পঞ্জরশুকং তব সন্দেশাক্ষরং রাধা ॥

(—আর্য্যাসপ্তশতী ২১১)

"হে কৃষ্ণ, রাধা তোমার সন্দেশাক্ষর (অর্থাৎ কৃষ্ণ এইরূপ, এই রকম তাঁহার রূপগুণ) গীতে গান করিতেছেন, বংশীতে বলিতেছেন, বীণায় বাজাইতেছেন, তাঁহার খাঁচার শুক পাখীকে পড়াইতেছেন।"

শরণ হইতেছেন জয়দেবের সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ কবি। তাঁহার একটি শ্লোক পাওয়া যায় "পদ্যাবলীতে"। শ্লোকটি বৈষ্ণব-প্রেম-কবিতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই কবিতার সহিত পার্থিব প্রেম-কবিতার কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না।

মুরারিং পশ্যন্ত্যাঃ সখি সকল-মঙ্গং ন নয়নং
কৃতং যচ্ছৃন্বন্ত্যা হরি-গুণগণং শ্রোত্র-নিচিতম্।
সমং তেনা-লাপং সপদি রচয়ন্ত্যাঃ সুখময়ং
বিধাতুর্নৈবায়ং ঘটন-পরিপাটি-মধুরিমা ॥

(—পদ্যাবলী ২৩৫)

"সখি, যখন আমি মুরারিকে দর্শন করি তখন বিধাতা আমার সকল অঙ্গকেই নয়ন করিয়া দেন না কেন ? যখন আমি হরির গুণগানের কথা শুনি তখন আমার সকল অঙ্গকেই কর্ণ করিয়া দেন না কেন ? যখন আমি তাঁহার সহিত আলাপ করি, তখন সহসা আমার সকল অঙ্গকে মুখময় করেন না কেন ? বিধাতার এই সংঘটন-সমূহ ভাল নহে।"

সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত অমরুর একটি শ্লোকে দেখি—

ন জানে সংমুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি প্রিয়ে।
সর্বাণ্যঙ্গনি মে যান্তি শোত্রতামুত নেত্রতাম্॥

(সদুক্তিক—২।৯৭।৫)

—"প্রিয়তম সামনে আসিয়া প্রিয় কথা বলিলে আমার সমস্ত অঙ্গ কেন কর্ণ বা চক্ষুতে পরিণত হয় না, জানি না।"

এইগুলির সহিত—"পদ্যাবলী"তে সংকলিত একটি বৈষ্ণব পদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার মত।

বিলোক্য কৃষ্ণং ব্রজবামনেত্রা:
সর্বেন্দ্রিয়ানাং নয়নত্বমেব।
আকর্ণ্য তদ্বেণু-নিনাদভঙ্গী-
মৈচ্ছন্ পুনস্তা শ্রবণত্বমেব॥ (পদ্যাবলী ১৫৫)

—"ব্রজরমণীগণ কৃষ্ণকে দেখিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির নয়নত্ব ইচ্ছা করিয়াছিল এবং তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়া তাহারা ইন্দ্রিয়-গুলিকে শ্রবণত্ব আশা করিয়াছিল।"

বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে 'জ্ঞানদাস' প্রকাশ করিয়াছেন—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগে থির নাহি বান্ধে॥

(হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বৈষ্ণব পদবলী পৃষ্ঠা ৪০০)

আবার—

'যে দেখিবে কৃষ্ণানন তারে করে দ্বিনয়ন
বিধি হইয়া হেন অবিচার॥"

চৈ: চ:॥ (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

"কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥ (চৈ: চ: আদি ৪র্থ)

লোচনদাস—

যমুনার জলে যাইতে সজনী
কালারূপ দেখিয়াছি।
সবে দুটি আঁখি দিয়াছে বিধাতা
রূপ নিরখিব কি ॥

মহাকবি কালিদাসও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

তা রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্যো
নার্য্যো ন জগ্মু র্বিষয়ান্তরাণি।
তথা হি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং
সর্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥ (রঘু ৭।১২)

—"সেই নারীগণ রাঘবকে (অজকে) তৃষ্ণার্ত নয়ন দ্বারা যখন পান করিতেছিল তখন অজকে ছাড়িয়া আর কোন দিকে দৃষ্টি গেল না। যেন তাহাদের অপরাপর সকল ইন্দ্রিবৃত্তি দৃষ্টিকে আশ্রয় করিল।"

বৈষ্ণব পদাবলীতে জয়দেবের অপরিসীম প্রভাব। কোন কোন বৈষ্ণব কবি জয়দেবের শ্লোকের অনুবাদ করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন, আবার কেহ বা ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' আদিরস ও ভক্তি-রসের সহজ মিতালি লক্ষ্য করা যায়। জয়দেব পদরচনায় সংস্কৃত কবিদের অনুসরণ করিয়াছেন।

"নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়-সমীরম্ ॥
সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥"

—গীতগোবিন্দে (বৈঃ পঃ পৃ ৯)

(রাধার সখী কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহ বর্ণনা করিতেছেন—)

"রাধা চন্দন ও চন্দ্রকিরণের নিন্দা করিতেছেন, যাহারা স্বভাবশীতল তাহারা অগ্নিবৎ-জ্বালা বিস্তার করিতেছে। তিনি এই দুর্দেবে অধীর হইয় উঠিয়াছেন, মলয় পবনকে চন্দনতরুকোটরস্থিত সর্পগণের সঙ্গহেতু বিষম বলিয়া মনে করিতেছেন। মাধব, তোমার বিরহে রাধা অতিশয় কাতর হইয়াছেন এবং মদনের বাণ-বর্ষণের ভয়েই যেন তোমাতে লীন হইয় গিয়াছেন।"

ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

নিন্দঅ চন্দন পরিহর ভূসন।
চাঁদ মানএ জনি আগী।
'অথবা—
চন্দন গরল সমান।
সীতল পবন হুতাসন জান॥
হেরই সুধা-নিধি সুর।
নিসি বৈঠলি সুবদনি ঝুর॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ১২৭)

'গীতগোবিন্দের' একটি কবিতায় কৃষ্ণের মদনাবেগ প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় কাব্যরীতিতে কবি জয়দেব কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। শ্লোকটি নিশ্চয়ালংকারের উদাহরণ হিসাবে বহুস্থলে উদ্ধৃত।

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যাঽনঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি॥
(গীতগোবিন্দ ৩।১১)

(কৃষ্ণ মদনকে বলিতেছে)—

"আমার হৃদয়ে মৃণালের হার, বাসুকি নহে, গলায় নীলপদ্মের পত্রাবলী, গরলের আভা নয়; অঙ্গে শ্বেতচন্দন ভস্ম নয়, পার্শ্বে আমার প্রিয়া নাই, তবে কেন হে অনঙ্গ, তুমি আমাকে হর-ভ্রমে প্রহারের জন্য ক্রোধে ছুটিয়া আসিতেছ।"

ইহার সহিত বিদ্যাপতির একটি পদের তুলনা করুন।

কবি যেন জয়দেবের উক্ত পদটিকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন। পদটিতে রাধার মদনের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে। মদন শিবকে পুষ্পবাণে (কামবাণে) পীড়িত করিয়াছিল।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হমারি।
হম নহ সঙ্কর হুঁ বরনারী॥
নহি জটা ইহ বেনিবিভঙ্গ।
মালতি মাল সিরে নহ গঙ্গ॥

মোতিমবন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুরবিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ উরে মনিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি কমল ইহ নহএ কপাল॥
বিদ্যাপতি কহ এহন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জপঙ্ক॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ১১৫)

প্রাচীন তামিল সাহিত্যে দেখা যায়, নাম্ম আড়বার (**Namma Alvar**) মধুর রসের পদ লিখিয়াছেন।

তাঁহার একটি পদে বিরহিনী নায়িকার পালনকারিনী মাতৃস্থানীয়া এক মহিলা নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

"রূপে গুনে শীলে সে যে গো তোমারি সমতুল।
তব দরশন আশে দিবা-নিশি সে ব্যাকুল॥
হে নিঠুর, দেখা দাও, দেখা দাও,
কিবা নিশি, কিবা দিশি, কিছু নাহি জানে।
সদাই বিভোর তব রূপ গুণ গানে॥
শীতল তুলসী গন্ধে মত্ত তার প্রাণ।
করিবে চক্রধারী কত দুঃখ দান॥
(—শ্রীযতীন্দ্ররামানুজ দাসের অনুবাদ)[১]

'কৃষ্ণ-কথামৃতে'ও এই ধরণের পদ দেখা যায়।

ইহাদের সহিত গোবিন্দাসের পদটির তুলনা করিতে পারি

গোবিন্দদাস—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥

১ বো. শ. প. পৃ. ১৬২ (বিমানবিহারী মজুমদার)

সজনি অব কি করবি উপদেশ
কানু-অনু-রাগে তনু মন মাতল
না গুণে ধরম লবলেশ॥
নাসিকা হো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদন না লয়ে আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি তরজনে গুরুজন গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহি঺ এক মনোরথ জনি হয়ে অনরথ
পূছত গোবিন্দদাস।

(বৈষ্ণব পদাবলী পৃষ্ঠা ৬০৩)

রূপ গোস্বামী রাধা-কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিবার জন্যই 'পদ্যাবলী' নাম দিয়া একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে বহু প্রাচীন শ্লোক তিনি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণ উক্ত গ্রন্থের পদগুলিকে অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন দেখা যায়। রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের পূর্বরাগ হইতে ভাবোল্লাস পর্য্যন্ত সমস্ত পর্য্যায়ই উহাতে দেখা যায়।

কৃষ্ণকে প্রথমে দেখিয়া রাধা সখীকে প্রশ্ন করিতেছেন 'ও কে'। রাধার চিত্তে প্রেমের প্রথম পদক্ষেপ দেখা যায়।

ভ্রূবল্লিতাণ্ডবকলামধুরানন-শ্রীঃ
কঙ্কেলিকোরক-করম্বিত-কর্ণপূরঃ।
কোঽয়ং নবীননিকষোপলতুল্যবেশঃ
বংশীরবেন সখি মাম-বশী-করোতি॥

—পদ্যাবলী ১৫৮

—'হে সখি, নবীন নিকষপ্রস্তরের মত বেশধারী কোন একজন—যাহার মুখ ভ্রূবল্লির নর্তনের জন্য মধুরশ্রী ধারণ করিয়াছে, যে অশোক পুষ্পের কলিকাকে কর্ণভূষণ করিয়াছে—বংশীরবে আমাকে অবশ করিয়া দিয়াছে।"

জ্ঞানদাসের একটি পদে দেখি—কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে।

দেখে এলাম তারে দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥
বেঁধেছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতিকুল নাহি গেল রাখা ॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হেলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥
গৃহকর্ম করিতে এলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের নেহ ॥

(বৈষ্ণব পদাবলী ৩৮২ পৃঃ)

ইহার সহিত লোচনদাসের পদটির তুলা করুন। কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার পূর্বরাগ।

যমুনার জলে, যাইতে সজনি
কালা রূপ দেখিয়াছি।
সবে দুটি আঁখি, দিয়াছে বিধাতা,
রূপ নিরখিব কি ॥
পশিলে মোর মনে, নব জলধর,
নামিছে তরুর মূলে।
দেখিতে দেখিতে, হেদে আচম্বিতে,
দু-আঁখি ভরল জলে ॥
ইন্দ্রধনু জিনি, চূড়ার টালনি,
উড়িছে ভ্রমরা জাল।
আঁখি পালটিয়া না পেলুঁ দেখিতে,
ঘোমটা হইল কাল ॥
বিজুরি বলিয়া রহিলুঁ ভাবিয়া,
অনুখন রূপ হেরি।
কদম্ব হেলনে বংশী আলাপনে,
চাহিতে চেতন চুরি ॥

নাহি পরিচয় বংশী সবে কয়
এ কি হল পরমাদ।
ও রাঙ্গাচরণে, নূপুর হইতে
লোচনদাসের সাধ॥

(শ্রীশ্রীপদামৃতমাধুরী পৃঃ ১০৫)

আলো মুঞি কেন গেলুঁ যমুনার জলে।
ছলিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ॥

—জ্ঞানদাস (বৈষ্ণব পদাবলী পৃঃ ৩৭৯)

ইহার সহিত আমরা প্রাচীন কবির লিখিত একটি পদের তুলনা করিতে পারি। নায়িকার চিত্তে প্রেমের সূচনা বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাচীন কবি ও বৈষ্ণব কবি একই সুরে কথা বলিতেছেন।

বারংবার-মনেকধা সখি ময়া চূতদ্রুমাণাং বনে
পীতকর্ণদরীপ্রণালবলিতঃ পুংস্কোকিলানাং ধ্বনিঃ।
তস্মিন্নদ্য পুনঃ শ্রুতিপ্রণয়িনি প্রত্যঙ্গ-মুৎ-কম্পিতং
তাপশ্চেতসি নেত্রয়োস্তরলতা কস্মাদকস্মান্মম॥

—সদুক্তিকর্ণামৃত ২।৫।১

"বারংবার আমি সখি, বহুভাবে আম্রতরুর বনে কর্ণগহ্বর পথে কোকিলের ধ্বনি পান করিয়াছি, আজ সেই ধ্বনি কানে পৌছিতেই কেন অকস্মাৎ আমার প্রত্যঙ্গ উৎকম্পিত হইতেছে, চিত্তে তাপ জন্মিতেছে, নেত্রযুগলের তরলতা দেখা দিয়াছে।"

ভবভূতির 'মালতী-মাধব' নাটকে দেখি—

(মালতীর প্রতি সখীর উক্তি)

"পাণ্ডুক্ষামং বদনং হৃদয়ং সরসং তবালসং চ বপুঃ।
আবেদয়তি নিতান্তং ক্ষেত্রিয়রোগং সখি হৃদন্তঃ"॥

—"তোমার বদন মলিন ও ক্ষীণ, হৃদয় রসপূর্ণ, শরীর অলসতাপূর্ণ, সখি, তোমার অন্তর অত্যন্ত ক্ষেত্রিয় রোগকে প্রকাশ করিতেছে।"

সখীগণ শ্রীরাধাকে প্রশ্ন করিতেছেন—নিশ্চয়ই তুমি শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত হইয়াছ।

কামং বপুঃ পুলকিতং নয়নে ধৃতাস্রে
বাচঃ সগদ্গদপদাঃ সখি কম্পি বক্ষঃ।
জ্ঞাতং মুকুন্দমুরলীরব-মাধুরী তে
চেতঃ সুধাংশুবদনে তরলী-করোতি॥

(—পদ্যাবলী ১৮১)

'হে সখি, তোমার শরীর রোমাঞ্চিত, নয়ন দুইটি অশ্রুপূর্ণ এবং বক্ষঃ কম্পিত হইতেছে,—হে চন্দ্রবদনী, বোঝা যাইতেছে মুকুন্দের মধুর বংশীধ্বনি তোমার চিত্ত তরঙ্গিত করিতেছে।"

অদ্য সুন্দরি কলিন্দনন্দিনী-
তীরকুঞ্জভুবি কেলি-লম্পটঃ।
বাদয়ন্ মুরলিকাং মুহুর্মুহু-
র্মাধবো হরতি মামকং মনঃ॥

(—কস্যচিৎ, পদ্যাবলী ১৬৫)

—"হে সুন্দরি, অদ্য যমুনাতীরস্থ কুঞ্জে সেই কেলি-লম্পট মাধব মুহুর্মুহুঃ মুরলীধ্বনি করিয়া আমার মন হরণ করিতেছে।"

ইহার সহিত বড়ুচণ্ডীদাসের একটি পদের তুলনা করা যায়।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মোঁ আউলাইলোঁ রান্ধন॥

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বংশীখণ্ড)

তুলনীয় (রবীন্দ্রনাথ)—

ওগো কে যায় বাঁশরী বাজায়ে
আমার ঘরে কেহ নাই যে।
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে
তার আকুল পরাণ বিরহের গান
বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে।

সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবন ডালা সাজায়ে,
ওই বাঁশিস্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়
আমি কেন থাকি হায় রে। ॥ কড়ি ও কোমল ॥

গুজরাটের ভক্তকবি নরসিংহ মেহতা পঞ্চদশ শতাব্দে আভির্ভূত হন। তিনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অনেকগুলি পদ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত পদে পূর্বরাগ, আক্ষেপ প্রভৃতির সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।[১]

কেম জাওঁ জল যমুনাং ভরবা
বাঁঘল ভীএ বৈঁধানীরে।
কামনগারো নেপ নচারে
লটকে হুঁ লোভানীরে।

—"কেমন করিয়া যমুনায় জল ভরিতে যাইব।

বাঁশী আমাকে অন্তরে বিঁধিয়াছে, লোভনীয়ার চোখ নাচিতেছে, আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি।"

বাঁসলভী বাই মারে বহালে
মন্দির মাং ন রহে বায়রে
ব্যাকুল থইলে বহালানে,
জোবাশুং করুং উপায় রে।

—"আমার দয়িত বাঁশী বাজাইয়াছে, আমি আর রহিতে পরিতেছি না, এত ব্যাকুল হইয়াছি আমি। তাহাকে দেখিবার কি উপায় করি।"

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ—

বাঁশরি ধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে
উতল প্রাণ উতরোয়। —ভানুসিংহের পদাবলী—

এই সমস্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, ভারতীয় কবিগণ বহুপূর্বেই নায়ক-নায়িকার "পূর্বরাগ" "অনুরাগ" অবলম্বন করিয়া

১ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—ষো. শ. পদাবলীর ভূমিকা (পৃঃ ১৯৩-১৯৪)

কাব্য-কবিতা রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ এই সমস্ত উপাদান অবলম্বন করিয়া রাধাকৃষ্ণের 'পূর্বরাগ' 'অনুরাগ' বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতীয় প্রেম-কবিতার ধারাই বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায় অনুসৃত হইয়া অপূর্ব সুষমা-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতে দেখা যায় লৌকিক নরনারীর প্রেমকে অবলম্বন করিয়া রচিত কতকগুলি 'প্রেম-কবিতাকে' 'বৈষ্ণব কবিতা' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা ও ভারতীয় প্রেম-কবিতার মধ্যে প্রথম অবস্থায় স্বর্ণ ও লৌহের মত কোন স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য ছিল না। এই পার্থক্য বা ভেদরেখা টানা হইয়াছে অনেক পরে। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের পদাবলীতে এই মিশ্র সুরের আভাস পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ও বড়ুচণ্ডীদাসের পদাবলীতে সাহিত্যের আদিরস ও ভক্তিরস উভয়ই দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই এই ভেদরেখা স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা লৌকিক প্রেম-কবিতা হইতে আলাদা হইয়া যায়।

রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত পদে রাধার পূর্ব-রাগের বিরহের দশমী দশার বর্ণনা দেখা যায়। পদটি পূর্বকালীয় কোন কবি কর্তৃক রচিত।

> পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূত-নিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
> ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বয়ম্।
> তদ্‌বাপীষু পয়স্তদীয়-মুকুরে জ্যোতি-স্তদীয়াঙ্গনে
> ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়-বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽস্তু নিলঃ॥

(—ষাণ্মাসিকস্য, পদ্যাবলী ৩৩৬)

—"আমার এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি করুক, পঞ্চ মহাভূতও স্ব স্ব বিভাগে প্রবেশ করুক—তথাপি বিধাতাকে অবনত মস্তকে প্রণতি করিয়া এই একটি মাত্র বরই প্রকটভাবে যাচ্ঞা করিতেছি যে কৃষ্ণের অবগাহনদীর্ঘিকাতে আমার দেহস্থিত জলাংশ, তাঁহার দর্পণে জ্যোতিরংশ, তদীয় অঙ্গনের আকাশে মদীয় আকাশাংশ, তাঁহার যাতায়াত পথে পৃথিবী এবং তালব্যজনে আমার দেহস্থিত বায়ুর অংশ প্রবিষ্ট হউক।"

উক্তপদের ভাব অবলম্বন করিয়া গোবিন্দদাস রাধার পূর্বরাগের বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন।

> যাহাঁ পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
> তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥

যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছে মিলই যব গোকুলচন্দ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি।
সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

(বৈঃ পঃ পৃঃ ৬৪৭)

—শ্রীমতী বলিতেছেন যে কৃষ্ণবিরহ ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যায়, যদি আমি মরণের মধ্যে দিয়া গোকুলচাঁদকে পাই। মৃত্যু হইলে পঞ্চভূতের গঠিত নশ্বর দেহ পঞ্চভূতেই ত মিলায়? আমার দেহের মৃত্তিকা যেন সেই স্থানের মৃত্তিকা হয় যাহার উপর দিয়া আমার প্রাণনাথ তাঁহার কোমল চরণ ফেলিয়া চলিয়া যান। যে সরোবরে তিনি নিত্য স্নান করেন, আমার দেহের জল-পদার্থ যেন সেই সরোবরের জল হয়। যে দর্পণে প্রাণকান্ত নিজের মুখ দেখেন, আমার দেহের তেজ-অংশ যেন তাহাতে জ্যোতি হয়। যে তালবৃন্ত দিয়া প্রভু আপন অঙ্গে বীজন করেন, আমার দেহের বায়বীয় অংশ যেন সেই তাল-বৃন্তের মৃদু অনিল হয়, আর যেখানে সেই নবঘন শ্যাম গগনে নবমেঘের মত ভ্রমণ করেন, আমার দেহের আকাশাংশ যেন সেই স্থানে গগনরূপে বিরাজ করে।

বৈষ্ণব-পদাবলীর 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' ও আক্ষেপানুরাগ

বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের মতে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার চারি প্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস।

প্রেম-বৈচিত্ত্য বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের এক অপূর্ব সৃষ্টি। প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রে ইহার পৃথক্ উল্লেখ দেখা যায় না।

প্রাচীন কাব্যাদিতে দেখা যায়, নায়িকা অনুরাগের আধিক্যবশতঃ অনুপস্থিত প্রিয়কে নিজেকে বা স্বজনকে নিন্দা করিতেছে। তাহাকে আক্ষেপানুরাগ বলা চলে। ("আক্ষেপানুরাগ" বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মধ্যে পড়ে। কেননা ইহা পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্য্যায়ে ধরা হয়।) আবার গাঢ় অনুরাগ অপরূপ ভাবে প্রকাশ পাইলে 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' বলা চলে, তবে বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' বিশেষ দ্যোতনা লাভ করিয়াছে।

বৈষ্ণব-রস-শাস্ত্রকার রূপ গোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থে বলিয়াছেন—"প্রেমবৈচিত্ত্য-সংজ্ঞস্তু বিপ্রলম্ভঃ" ('প্রেমবৈচিত্ত্যকে বিপ্রলম্ভ বলা হয়',)। —(উঃ মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।১৫১)

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।"

—উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গার ভেদ প্রঃ ১৫।১৪৭

—"প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবে প্রিয়তমের সন্নিকটস্থ থাকিয়াও বিরহ-ভয়োত্থ যে আর্তি, তাহাকে 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' বলে।" প্রেমোৎকর্ষকে স্থায়ী অনুরাগ বলা হয়। স্থলবিশেষে অনুরাগ কোনও অনিবার্য বিলাস-বৈভবে সমৃদ্ধ হইয়া পার্শ্ববর্তী প্রিয়জনকেও হারাইয়া দেয়। 'বৈচিত্ত্য' অর্থে ব্যাকুলতা বা বেদনা, মিলনের মধ্যেও বিরহের সুর। প্রিয়তম কৃষ্ণের নিকট থাকিয়াও শ্রীরাধার অন্তর বিরহের বেদনায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সহিত 'বৈচিত্র্য' শব্দটির কোন সম্পর্ক নাই। রূপ গোস্বামী ইহার দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন।

আভীরেন্দ্রসুতে স্ফুরত্যপি পুরস্তীব্রানুরাগোত্থয়া
বিশ্লেষজ্বর-সম্পদা বিবশধীরত্যন্ত-মুদ্‌ঘূর্ণিতা।
কান্তং মে সখি দর্শয়েতি দশনৈরুদ্‌গৃর্ণশষ্পাঙ্কুরা
রাধা হন্ত তথা ব্যচেষ্টত যতঃ কৃষ্ণোঽপ্যভূদ্বিস্মিতঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ ১৫।১৪৮)

(বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন)—

"অহো, ব্রজেন্দ্রনন্দন সমুখেই বিরাজমান থাকিলেও শ্রীরাধা পৌঢ় অনুরাগ-জনিত আতিশয্যে বিবশ-বুদ্ধি হইয়া মহাঘূর্ণাগ্রস্ত হইলেন এবং 'হে সখি, প্রাণেশ্বরকে একটিবার দেখাও'—এই বলিয়া দন্তে তৃণাঙ্কুর ধারণ করিয়া এরূপ চেষ্টাই করিলেন যাহাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বিস্মিত হইলেন।"

বৈষ্ণব-কবিগণ এই ভাব অবলম্বন করিয়া রাধা-কৃষ্ণের ‘প্রেম বৈচিত্ত্য’ বর্ণনা করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের একটি পদে দেখি—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥[১] (বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৫)

পরিপূর্ণ মিলনেও বিচ্ছেদের আশঙ্কা বর্তমান। ইহা গাঢ় প্রেমের এক-প্রকার স্বভাব। বিরহের এই প্রচ্ছন্নসুর ধ্বনিত হয় বলিয়াই ইহাকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়।

কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকে আছে, রাজা দুষ্যন্ত হংসপদিকার গান শুনিয়া ইষ্টজন-বিরহ না থাকিলেও অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছেন। শকুন্তলাকে ভুলিলেও সে স্মৃতির মর্মে লাগিয়া আছে।

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি॥

—শাকুন্তলে, পঞ্চম অঙ্কে (৫।২)

—‘রম্য দৃশ্য দেখিয়া ও মধুর শব্দ শুনিয়া সুখাবস্থিত প্রাণীও যে উৎকণ্ঠিত হয়, তাহার কারণ নিশ্চয়ই অজ্ঞাতসারে তাহার চিত্ত ভাবে স্থিরত্বপ্রাপ্ত গত জন্মের ভালবাসা স্মরণ করিতে থাকে।’

সুখমগ্ন ব্যক্তির চিত্তে বিচ্ছেদের আশংকা বর্তমান থাকে। মিলনের মাঝেও বিচ্ছেদের সুর—

“দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।” (চণ্ডীদাস)

---

১ চণ্ডীদাস—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বাও।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গাও॥ —ইত্যাদি

(বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা—৫৫)

শ্রীরাধার প্রেম-বৈচিত্ত্য—

রসবতি বৈঠি রসিকবর পাশ।
রোই কহই ধনি বিরহ হুতাশ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহজলধি কত পঁওরব হাম॥
নিকটহি নাহ না হেরই রাই।
সহচরি কত পরবোধই তাই॥
কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি ভোর॥ —গোবিন্দদাস

(বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা—৬০২)

শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে উপবেশন করিয়াও অনুরাগবশতঃ তাঁহাকে যেন শ্রীরাধা দেখিতে পাইতেছেন না, অমনি বিরহে হা হুতাশ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বৈচিত্ত্য—

আর কিয়ে কনক কষিল তনু সুন্দর
দরশ পরশ মঝু হোয়।
উর পর পাণি হানি খিতি শুতল
আকুলকণ্ঠে ঘন রোয়॥
সজনি না বুঝিয়ে প্রেম-তরঙ্গ।
রাইক কোরে চমকি হরি বোলত
কব হব তাকর সঙ্গ॥
আর কিয়ে শ্রবণে শুনব হাম তাকর
সো প্রিয় মধুরিম ভাষ।
নয়নহি বয়নচান্দ কিয়ে হেরব
কৌমুদি হাসবিকাস॥
রাইক কোরে কানু ঐছে বিলপই
ব্রজবনিতাগণ হাস।
প্রেমক রীত বুঝই সংশয় ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস॥

—গোবিন্দদাস (বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা—৬০২)

রবীন্দ্রনাথ—

"প্রিয়তম, আমি বিরহিণী
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে।" —দীনাঃ-মহুয়া।

আবার—

"বিরহবিধুর নয়নসলিলে মিলনমধুর লাজে"

—অনন্তপ্রেমঃ-মানসী। (রবীন্দ্রনাথ)

আগেই বলিয়াছি সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' বলিয়া প্রেমের কোন বিভাগ কল্পিত হয় নাই। সংস্কৃত কাব্যে প্রেমের চিত্রের অঙ্কণে দেহের প্রাধান্যই দেখা যায়। কালিদাস ও ভবভূতির কাব্যে প্রেম দেহমুখ্য অবস্থা হইতে দেহাতীত অবস্থায় যাত্রা করিয়াছে, প্রেম সেখানে অন্তর্মুখীন হইয়াছে। অনেক পরবর্তীকালে বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার প্রেম-বৈচিত্ত্য ও ভাব-সম্মিলন কল্পনায় দেহাতীত প্রেমের মহিমময় ঐশ্বর্য প্রকাশ পাইয়াছে। বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার এই ভাবটি কালিদাস ও ভবভূতি হইতে যাত্রা করিয়া বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার মধ্যে পূর্ণ-বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং পরে রবীন্দ্রনাথেও আসিয়া পৌছিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কালিদাস তাঁহার 'ঋতু-সংহারে' বসন্ত-বর্ণনার সময় বলিয়াছেন—

"সমীপবর্ত্তিষ্বধুনা প্রিয়েষু
সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্য্যঃ॥" (ঋতুসংহারে ৮ম শ্লোক)

—(এই বসন্তকালে) 'আপন প্রিয়তম নিকটে থাকা সত্ত্বেও রমণীরা কেমন যেন সমুৎসুক, উৎকণ্ঠিত ও বিরহাতুরবৎ হইয়া উঠিয়াছে।'

ইহার সহিত উপরে উল্লিখিত রূপ গোস্বামীর 'প্রেম-বৈচিত্ত্যে'র সংজ্ঞা তো একই কথা।

ভবভূতির মধ্যে দেখি প্রেমে বিরহ-মিলন-বোধ ভাবাবেগে একাকার হইয়া গিয়াছে।

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥

(—উত্তররামচরিত ১ম অঙ্ক)

—"বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না এ সুখ না দুঃখ, আমি প্রমাদগ্রস্ত ন' নিদ্রিত, আমার শরীরে বিষসঞ্চার হইতেছে না মদ্যপানজনিত মত্তত আবির্ভূত হইতেছে। যখনই তোমার গাত্রস্পর্শ হইতেছে তখনই বিহ্বলত' উৎপাদন করিয়া কি অদ্ভুত বিকার আমার চৈতন্য কখনো বিলুপ্ত কখন প্রবুদ্ধ করিতেছে।"

ভবভূতির "অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োঃ" ইত্যাদি কবিতাটির ভাব দেহধর্মকে ত্যাগ করিয়া ঊর্ধে উঠিয়াছে। কবিতাটি অন্য প্রসঙ্গে একবার উদ্ধৃত করিয়াছি। এই কবিতাদ্বয়ের ভাব ও বৈষ্ণব কবিতার 'প্রেমবৈচিত্ত্য' রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে রূপ পাইয়াছে, প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, বৈষ্ণব-কবিতা যেন প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ—

"তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহিনি
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে।" (—দীনা—মহুয়া)

"তার পাশে আছি তবু নির্বাসন।"
(—মেঘদূত—লিপিকা)

আবার—

সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই তো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ দুঃখ নহে॥" (—রবীন্দ্রনাথ

এই প্রেমোৎকর্ষ বা প্রেম-বৈচিত্ত্য অনেক সময় আক্ষেপের দ্বারাও প্রকা' করা যাইতে পারে। তাই আক্ষেপানুরাগও প্রেম-বৈচিত্ত্যের মধ্যে পড়ে তবে 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' ও 'আক্ষেপানুরাগ' এক কথা নয়। আক্ষেপানুরাগ প্রেম বৈচিত্ত্যের একটি দিক। আক্ষেপের দ্বারা গাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করা আক্ষেপানুরাগের আসল কথা। কৃষ্ণপ্রেমে বিধুরা রাধার আক্ষেপের অ' নাই। এই আক্ষেপ নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। এই আক্ষেপানু রাগেও বিরহের সুর শোনা যায় বলিয়া ইহাকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মধে ধরিতে হয়।

অজ্জ মএ তেণ বিণা অণুহুঅ-সুহাই সংভরন্তীএ।
অহিণব-মেহাণং রবো ণিসামিও বজ্ঝপডহো ব্ব॥

(গাহাসত্তসঈ ১।২৯)

—'(বর্ষাসময়ে) আজ তাহার বিরহে আমি পূর্বানুভূত সুখরাশির কথা স্মরণ করিয়া নবমেঘের শব্দকে যেন বধ্য-পটহের শব্দরূপে শুনিতেছি।'

আবার, ভরিমো সে গহিআর-ধুঅ-সীস-পহোলিরালউলিঅং
বঅণং পরিমল-তরলিঅ-ভমরালি-পইণ্ণ-কমলং ব॥

(গাহাসত্তসঈ ১।৭৮)

—(চুম্বনার্থ) অধর গৃহীত হইলে, মস্তক কম্পন সহকারে ও কুণ্ডল প্রঘূর্ণনে আকুলিত ভ্রমরবৃন্দের দ্বারা প্রকীর্ণ একটি কমলের মত তাহার বদন স্মরণ করি।

সদুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গারপ্রবাহে কর্ণাটদেবের একটি কবিতা আছে, তাহাতে দেখা যায় নায়ক পূর্বানুভূত সুখের উল্লেখ করিতেছে।

মুখং জ্যোৎস্না-লোক-প্রসরধবলাক্ষং ক নু ময়া
পুনর্দ্রষ্টব্যং তৎস্মিত-মধুর-মুগ্ধাল্পদশনম্।
ক সা শ্রব্যা বাণী বিজিত-কলহংসীকলরুতা
বিলাসা বীক্ষ্যন্তাং ক চ সহভুবো ধীর-ললিতাঃ॥

(সদুক্তিক ২।৯২।২)

—'কবে আমি আবার সেই জ্যোৎস্নালোকের মত ধবল অক্ষিযুক্ত মুখ দেখিতে পাইব, যে মুখে মুগ্ধ ও মধুর মৃদু হাস্যহেতু দন্তগুলি অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল। কলহংসীর মধুর রবকে লজ্জা দেয় এমন মধুর বাক্য আর কবে শুনিব। আর কবেই বা ধীরললিত বিভব দেখিতে পাইব?'

কোন অজ্ঞাতনামা কবির একটি পদ সদুক্তিতে দেখিতে পাই। নায়ক নায়িকার সহিত পূর্বে যে সুখ অনুভব করিয়াছে তাহার রোমন্থন করিতেছে।

স্খলল্লীলালাপং বিনিপতিত-কর্ণোৎপলদলং
স্রবৎস্বেদক্লিন্নং সুরতবিরতিক্ষামনয়নম্।
কচাকর্ষক্রীড়াসরলধবলশ্রোণিসুভগং
কদা তদ্দ্রষ্টব্যং বদনমবদাতং মৃগদৃশঃ॥ (সদুক্তিক ২।৯২।৫)

—"সেই মৃগনয়নার শুভ্র মুখ কবে দেখিব—যে মুখ হইতে বিলাসালাপ ক্ষরিত হইতেছে, যেখানে নয়ন দুইটি সুরতকেলির পর ম্লান হইয়া গিয়াছে, যে মুখ

স্বেদক্ষরিত হওয়ায় মলিন হইয়া গিয়াছে, কেশকর্ষণ হেতু সরল ও ধবল ভ্রূযুক্ত হওয়ায় সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।"

বিশ্বনাথ কবিরাজের একটি শ্লোকে দেখি নায়ক প্রবাসে গিয়া সহচরের নিকট নায়িকার সুখস্মৃতি বর্ণনা করিতেছে। পদটি তাঁহার "সাহিত্য-দর্পণের" তৃতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত (৩।১৬৪)।

মযি সকপটং কিঞ্চিৎ ক্বাপি প্রণীত-বিলোচনে
কিমপি নয়নং প্রান্তে তির্য্যগ্‌বিজৃম্ভিততারকম্।
স্মিতমুপগতামালীং দৃষ্ট্বা সলজ্জমবাঞ্চিতম্
কুবলয়দৃশঃ স্মেরং স্মেরং স্মরামি তদাননম্॥

—'কোনও গোপন স্থান হইতে (নায়িকা) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কেবল দুইটি নয়ন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, নয়নের তারকাযুগল ঈষৎ বক্র ভাবে বিস্ফারিত হইয়াছিল এবং সখীকে অল্প হাসিতে দেখিয়া লজ্জায় অবনত অথচ মৃদু হাসিতে পূর্ণ আননের কথা আমার বার বার মনে পড়িতেছে।'

সদুক্তিতে বিদ্যা কবির একটি শ্লোকে দেখি, নায়িকা সখীকে বলিতেছে—নায়কের সঙ্গে পূর্বে যে সুখ অনুভব করিয়াছি তাহা বলিবার আমার ক্ষমতা নাই। পদটি 'সাহিত্য-দর্পণে'ও (৩।৭) উদ্ধৃত হইয়াছে।

ধন্যাসি যৎ কথয়সি প্রিয়সঙ্গমেপি
নর্মস্মিতং চ বদনং চ রসং চ তস্য।
নীবীং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েন
সখ্যঃ শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি॥

(বিদ্যায়াঃ), (সদুক্তিক ২।১৪০।২)

'—হে সখী, তুমিই ধন্য, প্রিয়সঙ্গমে সেই সুরতের সময়েও তুমি স্থিরভাবে মিষ্টকথা বলিতে পার। কিন্তু আমার প্রিয়তম যখন নীবীবন্ধে করস্পর্শ করেন, তখন যদি আর কোন কথা আমার স্মরণ থাকে।'

ইহার সহিত আমরা গোবিন্দদাসের পদটির তুলনা করিতে পারি।

নবঘন কিরণ বরণ নব নাগর
মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়নকোণে মদন জাগায়ল
মৃদু মৃদু হাসি বিভোর॥

সজনি কি কহব রজনি আনন্দ।
স্বপনবিলোকন কিয়ে ভেল দরশন।
মঝু মনে লাগল ধন্দ॥
উর পর কমলপাণি অবলম্বনে
দূরে করল আনোআন।
নিবিহক বন্ধ বিমোচন নাগর
কি করল কিছুই না জান॥
তৈখনে মদন কুসুমশর হানল
জরজর জীবন মোর।
গোবিন্দ দাস কহ গৌরি আরাধন
বিফল কি যাইবে তোর॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৯৯)

সদুক্তিকর্ণামৃতের এই শৃঙ্গার-প্রবাহে অচলকবির একটি পদে ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশিত হইয়াছে। নায়িকা পূর্বানুভূত সুখের উল্লেখ করিতেছে।

হর্ষাশ্রুপূরিত বিলোচনয়া ময়াস্য
কিং তস্য তৎসখি নিরূপিতমঙ্গমঙ্গম্।
রোমাঞ্চ-কঞ্চুক-তিরস্কৃত-দেহয়া বা
জ্ঞাতানি তানি পরিরম্ভসুখানি কিংবা॥

(সদুক্তিকঃ ২।১৪০।২, অচলস্য)

—"হে সখি, আজ কি আমি আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার সমস্ত অঙ্গ লক্ষ্য করিয়াছি কিংবা রোমাঞ্চ-কঞ্চুকের দ্বারা আবৃত দেহ লইয়া আমি কি সেই কেলিসুখ ভাল করিয়া জানিতে পারিয়াছি।"

বিদ্যাপতির পদেও ঠিক এই ভাবই দেখি।

করে কর ধরি জে কিছু কহল
বদন বিহসি মোর।
জৈসে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কমল কোর॥
রামা হে সপতি করহু তোর।
সোই গুনবতি গুণ গনি গনি
না জানি কি গতি মোর॥

গলিত বসন লুলিত ভূসন
ফুয়ল কবরি ভার।
আহা উহু করি জে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরি পার॥
নিভৃত কেতনে হরল চেতনে
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভন বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৯৫, বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

আপন শিরোরুহ করে পরশায়ল
সময় বুঝায়ল সাজে॥
করকমলে মুখ কমল লুকায়ল
আন সমুঝায়ল নাহ।
জ্ঞানদাস কহ তরুণি উন নহ
তৈছে কয়ল নিরবাহ॥ (বৈ. প. ৩৯৭)

তুলনীয়—চণ্ডীদাস :—

আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে। (বৈ. প. পৃ. ৫২)

অভিসারের সাধনা বা প্রস্তুতি

'গাহাসত্তসঈ'র একটি পদে দেখি অন্ধকারে অভিসারে যাইতে হইবে বলিয়া নায়িকা ঘরে বসিয়া অন্ধকারে যাওয়ার সাধনা করিতেছে।

"অজ্জ মএ গন্তব্বং ঘণন্ধআরে বি তস্স সুহঅস্স।
অজ্জা ণিমীলিঅচ্ছী পঅপড়িবাড়িং ঘরে কুণই।"

(গাহাসত্তসঈ ৩।৪৯)

—'আজ আমাকে ঘন অন্ধকারে সেই সুভগের (প্রিয়ের) অভিসারে যাইতে হইবে', এই ভাবিয়া সেই উত্তম মহিলা চোখ মুজিয়া নিজের ঘরেই পদ-পরিপাটি (আসা-যাওয়া) অভ্যাস করিতেছে।

ইহারই পরবর্তী রূপ দেখিতে পাই "কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ে" উদ্ধৃত একটি কবিতায়। পদটি জহ্লনের সূক্তি-মুক্তা-বলীতেও উদ্ধৃত।

"মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দসঞ্চারকং
গন্তব্যা দয়িতস্য মেঽদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
আজানূদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছ্রাল্লব্ধপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি॥" (কবীন্দ্রবঃ ৫১৯)

—'পঙ্কিল পথে মেঘান্ধতমসার ভিতরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আজ আমাকে প্রিয়ের বাসভবনে যাইতে হইবে', এই ভাবিয়া এক মুগ্ধা রমণী নূপুরকে জানু পর্যন্ত উঠাইয়া লইয়া নয়ন দুইটিকে করতলে ভাল করিয়া ঢাকিয়া অতিকষ্টে পদস্থিতি লাভ করিয়া নিজের ঘরেই পথে (যাওয়ার) অভ্যাস করিতেছে।

পদকর্তা গোবিন্দদাস এই ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরাধার অভিসারে যাওয়ার 'দুশ্চর সাধনার' ইঙ্গিত দিয়াছেন একটি বিখ্যাত পদে।

"কণ্টক গাড়ি কমল-সম-পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনি জাগি॥
করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আসে।
কর-কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥"

পদকল্পতরু ১৯।১০০১, (বৈ. প. পৃ. ৬০৮)

উপরের দুইটি প্রাচীন কবিতার সহিত গোবিন্দদাসের পদটির ভাবের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, তিনটিই যেন আকারে-প্রকারে একই কথা বলিতেছে; হরি, মাধব, প্রভৃতি শব্দ থাকা না থাকায় কিছু পার্থক্য হইতেছে না।

বিদ্যাপতির পদেও অনুরূপ ভাব দেখিতে পাই।

"হেরহ পছিম দিস কখন হোয়ত নিস
গুরুজন নয়ন নিহারি।
বিনু কারণ গৃহ করহ গতাগত
মুদি নয়ন অরবিন্দা।
পুলকিত তনু বিহসি অকামিক
জাগি উঠলি সানন্দা॥"

(বিদ্যাপতি ৯৪, মিত্র-মজুমদার)

দিবাভিসার

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে "দিবাভিসার" সম্বন্ধে বহু কবিতা দেখা যায়। গাহাসত্তসঈতে একটি পদ আছে—

গিরিসোত্তো ত্তি ভুঅংগং মহিসো জীহাই লিহই সংতত্তো।
মহিসস্‌স কণ্‌হবথরো ত্তি সপ্পো পিঅই লালং॥ (গাহা ৬।৫১)

—("গ্রীষ্মের সন্তাপে) সন্তপ্ত মহিষ গিরির স্রোত মনে করিয়া সর্পকে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতেছে, এবং সর্পও কৃষ্ণ প্রস্তরের নির্ঝর মনে করিয়া মহিষের মুখের লালা পান করিতেছে।"

এখানে দূতী নায়িকাকে ইঙ্গিতে জানাইতেছে যে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে জনশূন্য স্থানে অভিসার করা সম্ভবপর। 'সত্তসঈ'র অপর একটি পদে আছে—

"অহিণব-পাউস-রসিএসু সোঁহই সামাই এসু দিঅহেসু।
রহস-পসারিঅ-গীবাণ ণচ্চিঅং মোর-বুন্দাণং॥"

(গাহাসত্তসঈ ৬।৫৯)

—'বর্ষার নতুন মেঘের গর্জনে শ্যামায়মান দিনগুলিতে আনন্দবশত উল্লসিতগ্রীব ময়ূরবৃন্দের নৃত্য শোভা পাইতেছে।' এখানে দূতী নায়িকাকে বলিতেছে, দিনের বেলাতেই সংকেতস্থান অভিসার-যোগ্য হইয়াছে।

সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত সুভট কবির একটি পদে বর্ষাকালোচিত দিবাভিসারের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

"অবলোক্য নর্তিত-শিখণ্ডিমণ্ডলৈ-
র্নবনীরদৈর্নিচুলিতং নভস্তলম্।
দিবসেপি বঞ্জুলনিকুঞ্জমিত্বরী
বিশতি স্ম বল্লভবতংসিতং রসাৎ॥"

(সদুক্তিক ২।৬৩।১, সুভটস্য)

—'ময়ূরমণ্ডলের নৃত্যপ্রবর্তক নবীন মেঘের দ্বারা নভস্থল আবৃত দেখিয়া অভিসারিকা দিবসেই রসবশে বল্লভভূষিত বঞ্জুলকুঞ্জে প্রবেশ করিল।' ইহার সহিত গোবিন্দদাসের বর্ষাকালোচিত দিবাভিসারের পদটির তুলনা করা যাইতে পারে।

গোবিন্দদাস—"গগনহি নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥
ঐছন জলদ কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজগামিনি হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥"

(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ১২।৯৯৪)

সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত কালিদাস কবির একটি পদে বর্ষাকালোচিত দিবাভিসারের চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়। দিনের বেলাতেই শ্যামায়মান পর্বতকন্দরে শবরী অভিসার করিতেছে।

"দিবাপি জলদোদয়াদুপচিতান্ধকারচ্ছটা-
জটালিত-তটীমিমাং বিশতি বিস্মরন্তী ভয়ম্।
তমালতরু-মণ্ডিতাবটনিরস্তভানুদ্যুতিং
ধৃতাভিসরণব্রতা শবরসুন্দরী কন্দরীম্॥" (সদুক্তিক ২।৬৩।৩)

—'দিনের বেলাতেই অভিসারোদ্যতা শবররমণী গিরিকন্দরীতে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রবেশ করিতেছে—যে কন্দরীর তটভাগ মেঘের আবির্ভাবে অন্ধকাররূপ জটাজালে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং যেখানে সূর্য্যের কিরণ তমালতরুর দ্বারা নিরস্ত হইয়াছিল।'

'প্রাকৃত-পৈঙ্গলের' একটি পদে আছে, গ্রীষ্মের খর মধ্যাহ্নে স্বয়ং-দূতী নায়িকা পথিককে স্বগহে অভিসার করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে।

তরুণ তরণি তবই ধরণি পবণ বহা খরা
লগ ণহি জল বড মরুথল জণজিঅণহরা।
দিসই চলই হিঅঅ ডুলই হম ইকলি বহূ
ঘর ণহি পিঅ সুণহি পহিঅ মণ ইচ্ছই কহূ॥ প্রা. পৈ (১৯৩)

—"তরুণ (মধ্যাহ্নকালীন) সূর্য্য পৃথিবীকে তপ্ত করিতেছে, খর পবন বহিতেছে, কাছে জলও নাই, লোকজীবন অপহরণকারী দারুণ মরুস্থল একটি, চারিদিক যেন ঘুরিতেছে, হৃদয় দুলিতেছে, আমি ঘরে একেলা বধূ, প্রিয় ঘরে নাই, হে পথিক, শোন, আমার মন কি ইচ্ছা করে।"

আচার্য্য গোপীকের একটি পদে রাধাকৃষ্ণ-লীলার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। গুর মধ্যাহ্নে আগমণ করায় রাধার পদ তাপিত হইলে কৃষ্ণ তাহা মস্তকে এবং বক্ষে ধারণ করিতেছেন এবং মুখের বাতাসের দ্বারা শীতল করিতেছেন। পদটি সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে৭

মধ্যাহ্নে দ্বিগুণার্কদীধিতিদলৎসংভোগবীথী-পথ-
প্রস্থানব্যয়িতারুণাঙ্গুলিদলং রাধাপদং মাধবঃ।
মৌলৌ স্রকৃশবলে মুহুঃ সমুচিত-স্বেদে মুহুর্বক্ষসি
ন্যস্য প্রাণয়তি প্রকম্পবিধুরৈঃ শ্বাসোর্মিবাতৈ র্মুহুঃ॥

(সদুক্তিক ২।৬৩।৪)

—'(গ্রীষ্মের) মধ্যাহ্নে রাধার যে পদযুগলের অঙ্গুলিগুলি অভিসারের জন্য কুঞ্জ-পথে আসিবার সময় দ্বিগুণ সূর্য্যকিরণে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল সেই পদযুগল মাধব (কৃষ্ণ) তাঁহার মাল্য-শোভিত মস্তকে ও ঘর্মশীতল বক্ষে বার বার ধারণ করিতেছিলেন এবং কম্পমান নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বারা শীতল করিতেছিলেন।' এখানে গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে রাধার অভিসার সূচিত হইয়াছে। ইহার সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর গোবিন্দদাসের গ্রীষ্মকালোচিত দিবাভিসারের পদ দুইটি স্মরণ করা যাইতে পারে। কবি গোবিন্দদাস সংস্কৃত কবিতাটির ভাব-বিস্তার করিয়াছেন দেখা যায়। সেই সঙ্গে নূতন কিছু যোজনাও করিয়া দিয়াছেন। লৌকিক প্রেম-কবিতার আদর্শেই কবিতাটি রচিত দেখা যায়।

"মাথহিঁ তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহি কয়ল অভিসার॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু পরশ রসে পরবশ রসবতি
বিছুরল সবহুঁ বিচার॥
গুরুজন নয়ন পাশগণ বারণ
মারুত মণ্ডল ধূলি।
তা পয়ে মেলি চললি বর রঙ্গিণি
পন্থহি গেও সব ভুলি॥

যত যত বিঘিনি জিতলি অনুরাগিণি
সাধলি মনসিজ মন্ত্র।
গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝউ
হরি সঞে রসময় তন্ত্র ॥"

(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ২২।১০০৪)
(বৈ. প. পৃ. ৬১৫)

আবার,

"আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ করকমলে চরণযুগ মোছই
হেরই চির থির আঁখি ॥
পিরীতি মুরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে সব দুখ মীটল
সেই আপনে করু সেবা ॥
হিমকর শীতল নীরহি তীতল
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনিদলে মৃদু মৃদু বীজই
পুছই পন্থকি দুখ ॥
আঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বুল পুরি
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দদাস ভণ নিতি নব নৌতুন
রাইক অমিয়া সিনান ॥"

বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার দিবাভিসারের নূতন নূতন ছল বা পরিস্থিতির কল্পনা করিয়াছেন। যেমন, তীর্থাভিসার, কুজ্ঝটী-অভিসার ইত্যাদি।

॥ কুজ্ঝটী-অভিসার ॥

কামিনী নাহি হরি যামিনি জাগল
সঙ্কেত-কাননে যাই।
নিজ-গৃহে সুন্দরি রজনি উজাগরি
ভয়ে যাইতে নহি পাই ॥

দেখ দেখ সোই শর্বরী বিহানে।
কুজ্ঝটী তিমিরে বেঢ়ল ব্রজ-মণ্ডল
অনুকূল দৈব-বিধানে॥
অলখিতে সুন্দরী ছল করি নিকসল
গুরুজন কোই ন জানে।
দক্ষিণ-করে এক শোভে জল-ভাজন
চলতহি মাঘ-সিনানে॥
অচিরে কলাবতি কুঞ্জহি মিলল
নাগর নিরখি আনন্দ।
অমিলন-জনিত দুহুঁক দুখ দূরে গেল
উলসিত শেখর চন্দ॥ (চন্দ্রশেখর, বৈ. প. পৃ ১০০৯)

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে শ্রীরাধার অভিসার

বিষম বিধুন্তুদ বদনে পড়ল বিধু
বধূগণ বোলত রাম।
সবহুঁ বরজ জন দ্বিজগণে দেওত
রতন বসন অনুপাম॥
দশদিকে উঠল জয় জয় রোল।
কোই কোই গাওত কোই বাজাওত
নিকটহি না শুনিয়ে বোল॥
ঐছন সময়ে একেশ্বরি সাজল
হরি-সঙ্গম-সুখ সাধে।
যৌবন দান শ্যামধনে দেওত
দূর করি কুল মরিয়াদে॥
কুঞ্জ-ভবনে অনু- রাগিণি পৈঠল
কানু সঞে গলে গলে লাগ।
চন্দ্রশেখরে ভণে মঝু মনে এতি খণে
চাঁদে লাগল উপরাগ॥ (চন্দ্রশেখর, বৈঃ পঃ পৃঃ ১০০৯)

তিমিরাভিসারিকা (বা তিমিরাভিসার)

সংস্কৃত সাহিত্যে তিমিরাভিসার বর্ণনার ভিতর দেখিতে পাই, অভিসারিকা সব রকম কাল বা নীল বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া নিজেকে অন্ধকারের সহিত মিশাইয়া দিতে চাহিয়াছে, যাহাতে তাহাকে কেহ চিনিতে না পারে। অভিসারিকা প্রেমবশে শত বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া দয়িতের উদ্দেশ্যে প্রয়াণ করিয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখি শ্রীরাধা সর্বাঙ্গ নীলবসনভূষণে সজ্জিত করিয়া প্রাণাধিক কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য অভিসারে যাত্রা করিয়াছেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে তিমিরাভিসার সম্বন্ধে প্রাচীন কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। উমাপতি-ধরের একটি পদে আছে—

মৌলৌ শ্যামসরোজদাম নয়নদ্বন্দ্বেঽঞ্জনং কর্ণয়ো-
স্তাপিচ্ছপ্রসবঃ কপোলফলকে কস্তূরিকা-পল্লবঃ।
বিশ্বালোকবিলোপি নিন্দিতমপি প্রেয়োভিসারাশয়া
হৃষ্যদ্ভিঃস্মরদুর্বিনীতবণিতা-স্তোমৈস্তমো মন্যতে ॥

(সদুক্তিক ২।৬৪।২)

—"সেই নায়িকার মস্তকে নীলপদ্ম, নয়নদ্বয়ে কাজল, কর্ণে নীল ময়ূর-পুচ্ছ, কপোলপ্রদেশে মৃগমদ-পল্লব শোভা পাইতেছে। দয়িতের জন্য অভিসারের আশায় সমগ্র বিশ্ব অন্ধকারে আচ্ছন্নকারী নিন্দিত সেই আনন্দদানকারী তমকে মদনপীড়িতা সেই রমণী স্তবের দ্বারা তুষ্ট করিতেছে।" বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দদাস লিখিত তিমিরাভিসারের একটি পদে ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশিত হইয়াছে দেখা যায়।

"নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল-নিচোল ॥
সুন্দরি হরি-অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্যামরি
কুহু যামিনি ভয় ভাগি ॥

নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু শ্যামর সায়রে
লখই না পারই কোই॥
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
রাই চললি অভিসার॥"

(পদকল্পতরু ৭।৯৮৯, বৈঃ পঃ পৃঃ ৬১২)

সদুক্তিতে উদ্ধৃত আবন্তিকজহ্নু কবি রচিত একটি পদে দেখি, রমণী নীল বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া অভিসারে বহির্গত হইয়াছে।

"বাসো বর্হিণকণ্ঠমেদুরমুরো নিষ্পিষ্টকস্তূরিকা-
পত্রালীময়মিন্দ্রনীল-বলয়ং দোর্বল্লিরাসেবতে।
নির্ধান্তী চ লঘুস্খলৎপদমিদং ধান্তং যন্মন্যসে
তদ্যুনা মদিরাক্ষি কেন সুচিরাদারাধি পুষ্পায়ুধঃ।"

(সদুক্তিক ২।৬৪।৪)

—"তোমার কাপড় ময়ূর-কণ্ঠের মত মেদুর, বক্ষে মৃগমদের পত্রাবলী, ইন্দ্রনীল-বলয় বাহুলতায় শোভা পাইতেছে। হে মদিরাক্ষি, অভিসারে যাইবার সময় তোমার লঘু পদ স্খলিত হইতেছে, অন্ধকারকে তুমি অগ্রাহ্য করিতেছ তাহাতে মনে হয়, সেই যুবক বহুদিন ধরিয়া কামদেবের আরাধনা করিয়াছে।"

ইহার সহিত শশিশেখরের একটি পদের তুলনা চলে।

"আজি অদ্ভূত তিমির-রঙ্গ
আপনি না চিনি আপন অঙ্গ
নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ
অঙ্কুশ নাহি মান রি
সাজল ধনি শ্যাম-বিহার
শিথিলীকৃত কবরি-ভার
নীলোৎপল-রচিত হার
কণ্ঠহি অনুপাম রি॥

নীল বসন সোনার গায়
মেঘে কি বিজুরি লুকিয়া যায়,
মদন-দীপ পথ দেখায়
অনুরাগ আগুয়ান রি।" (বৈঃ পঃ পৃঃ ১০২৩)

গোবর্ধনাচার্য্যের 'আর্য্যাসপ্তশতী'তে কৃষ্ণাভিসারের একটি চমৎকার পদ পাওয়া যায়। নায়িকার সখী বলিতেছে—

দয়িত-প্রহিতাং দূতীমবলম্ব্য করেণ তমসি গচ্ছন্তী।
স্বেদচ্যুত-মৃগনাভির্দূরাদ্ গৌরাঙ্গি দৃশ্যসে। —আর্য্যাসপ্তশতী-২৮০

—"দয়িত-প্রেরিত দূতীর হাত ধরিয়া অন্ধকারে যাইতে যাইতে স্বেদহেতু মৃগমদ গলিত হওয়ায়, হে গৌরাঙ্গি, তুমি দূর হইতেই প্রকটিতা হইয়া পড়িয়াছ।"

ভক্তকবি গোবিন্দদাসের পদেও ঠিক এই ভাবটি লক্ষ্য করি।

"কি করব মৃগমদ লেপনে তোর।
কি ফল পহিরণ নীল নিচোল॥
শারদ চাঁদনি তুয়া মুখ হাস।
বিঘটল তিমির হোয়ব পরকাশ।
এ সখি ধরবি হামারি উপদেশ।
অব অভিসারহ হরিক উদেশ॥
আঁচরে ঝাঁপহ আনন চন্দ।
দূর কর মোতিম কিঙ্কিণী বন্ধ॥
নূপুর মুখ করি তূলক পুঞ্জ।
মন্থরগতি চলু কেলিনিকুঞ্জ॥
চলইতে চঙকি নগর পুর মাঝ।
জনি মণিকঙ্কণ-ঝঙ্কণে বাজ॥
তিমিরে পন্থ অব হোত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস অব সঙ্গে করি লেহ॥"

(বৈ. প. পৃ. ৬১২)

অমরু কবির একটি কবিতা সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইহ নিশি নিবিড়-নিরন্তর-কুচ-কুম্ভবিতয়দত্ত-হৃদয়ভরা।
রমণগুণ-কৃষ্যমাণা সংতরতি তমস্তরঙ্গিণীং কাপি॥

সদুক্তিকঃ ২।৬৪।৫ (অমরোঃ)

—"এই রাত্রিতে নিবিড় ও ঘন সন্নিবিষ্ট কুচকুম্ভদ্বয়ের দ্বারা প্রদত্ত ভারাক্রান্ত বক্ষে এবং কাঞ্চীদাম আকর্ষণকরতঃ কোন রমণী অন্ধকার-তরঙ্গে সাঁতার দিয়া পার হইতেছে।"

আচার্য্য ধোয়ীকের একটি পদে দেখি, কোন কামুক যেন অভিসাররতা নায়িকাকে সাভিলাষে বলিতেছে। পদটি সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত।

প্রয়াসি যচ্চক্র-কুণ্ডল-ধারয়া
বিপাটয়ন্তীব ঘনং নিশাতমঃ।
তদদ্য কর্ণায়ত-লোচনোৎপলে
ফলেগ্রেহিঃ কস্য মনোরথদ্রুমঃ॥ (সদুক্তিকঃ ২।৬৪।৪)

—"হে আকর্ণ-বিস্তৃত-লোচনপদ্মধারিনি, তুমি চক্রবৎ কুণ্ডলধারার দ্বারা রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত করিয়া (অভিসারে) যাইতেছ, তাহাতে মনে হইতেছে তুমি যেন কোন পুরুষের মনোরথ বৃক্ষের ফলস্বরূপ, (অর্থাৎ কাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে যাইতেছে?)।"

ইহার সহিত বিদ্যাপতি-রচিত শ্রীরাধার অভিসারের পদটির তুলনা করা চলে।

কহ কহ সুন্দরি ন কর বেআজ।
দেখিঅ আজ অপূরুব সাজ॥
মৃগমদপঙ্ক করসি অঙ্গরাগ।
কোন নাগর পরিণত হোঅ ভাগ॥
পুনু পুনু উঠসি পছিম দিশি হেরি।
কখন জাএত দিন কত অছি বেরি॥
নূপুর উপর করসি কসি থীর।
দৃঢ় কএ পহিরসি তমসম চীর॥
উঠসি বিহঁসি হঁসি তেজি আসার।
তোর মনভাব সঘন আঁধিয়ার॥
ভণই বিদ্যাপতি সুনু বর নারি।
ধৈরজ ধর মন মিলত মুরারি॥ (বৈ. প. পৃ. ১০১)

জ্যোৎস্নাভিসারিকা

গাহাসত্তসঈর একটি পদে দেখা যায়, সখী অভিসারে গমনোদ্যতা নায়িকাকে কিছু সময় অপেক্ষা করিতে বলিতেছে। এই পদটিতে আমরা জ্যোৎস্নাভিসারের সূচনা দেখিতে পাই। সংস্কৃত প্রকীর্ণ-কবিতায় ইহার পরবর্তী রূপ দেখিতে পাই।

গম্মিহিসি তস্স পাসং সুন্দরি মা তুরঅ বড্ঢউ মিঅঙ্কো।
দুদ্ধে দুদ্ধমিঅ চন্দিআই কো পেচ্ছই মুহং দে ॥ (গাহাসত্তসঈ ৭।৭)

—"হে সুন্দরি, তাহার (তোমার দয়িতের) পার্শ্বে যাইতে পারিবে, (কিন্তু) এত ত্বরার প্রয়োজন কি! চন্দ্র আরও বর্ধিত হউক (আকাশে উঠুক), দুগ্ধে দুগ্ধের মত চন্দ্রের আলোতে (চন্দ্রিকাতে) কে তোমার মুখ (চন্দ্রতুল্য) দেখিতে সমর্থ হইবে?"

এখানে জ্যোৎস্নাপূর্ণরাত্রিতে নায়িকার অভিসার বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পদটির সহিত বিদ্যাপতির পদটির তুলনা করা যায়।

আজ পুণিমা তিথি জানি মোয়ে ঐলিহু
উচিত তোহর অভিসার।
দেহজোতি সসিকিরণ সমাইতি
কে বিভিনাবএ পার ॥
সুন্দরি অপনহু হৃদয় বিচারি।
আঁখি পসারি জগত হম দেখলি
কে জগ তুঅ সম নারি ॥
তোহেঁ জনি তিমির হীত কএ মানহ
আনন তোর তিমিরারি।
সহজ বিরোধ দূর পরিহরি ধনি
চল উঠি জতএ মুরারি ॥
দূতীক বচন হীত কএ মানল
চালক ভেল পঁচবান।
হরি অভিসার চললি বর কামিনি
বিদ্যাপতি কবি ভান।" (বৈ. প. পৃ. ১০০)

প্রকৃত কবিতাটির দ্বিতীয় রূপ দেখিতে পাই সদুক্তি-কর্ণামৃতে উদ্ধৃত কোন অজ্ঞাতনামা কবির একটি কবিতায়।

মৌলৌ মৌক্তিকদাম কেতকদলং কর্ণে স্ফুটৎকৈরবং
তাডঙ্কঃ করিদন্তজঃ স্তনতটীকর্পূর-রেণূৎকরা।
কণ্ঠো নিস্তলতারহারবলয়ী শুভ্রং তনীয়োংশুকং
জ্যোৎস্নায়ামভিসারসংপদমিমাং পঞ্চেষুরপ্যঞ্চতি ॥"

(সদুক্তিকঃ ২।৬৫।৩)

—"মস্তকে মুক্তার মালা, কর্ণে শুভ্র কুমুদবৎ কেতকীদল, হস্তিদন্ত নির্মিত কর্ণাঙ্গুরীয়, স্তনাভোগ কর্পূররেণুর দ্বারা মণ্ডিত, কণ্ঠ তারহারযুক্ত মুক্তাহারে যুক্ত, শরীরে শুভ্র অম্বর, জ্যোৎস্নাতে অভিসারকারিণীর ইহার (এই নায়িকা) সঙ্গে পঞ্চবাণধারী মদন ধাবিত হয়।"

জ্যোৎস্নায় অভিসার করিতে হইলে শুভ্র (সাদা) বস্ত্রালংকার ধারণ করিতে হইবে। নায়িকা যাহাতে শুভ্র চন্দ্রের কিরণে সুর্লক্ষ্য হইয়া পড়ে সেইজন্য সমুচিত শুভ্র বেশাদি ধারণ করিবে। এই পদটির সহিত গোপাল দাসের জ্যোৎস্নাভিসারের পদটির তুলনা করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব কবি সাধারণ নায়িকার মতই শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা করিয়াছেন।

গোপালদাস—

কি কহব রাইকো হরি অনুরাগ।
নিরবধি মনহি মনোভব জাগ ॥
সহজে রুচির তনু সাজি কত ভাতি।
অভিসরু শারদ পুণমীকো রাতি ॥
ধবল বসন তনু চন্দন পুর।
অরুণ অধরে ধরু বিশদ কপূর ॥
কবরী উপরে করু কুন্দ বিথার।
কণ্ঠে বিলম্বিত মোতিম হার ॥
কৈরবে ঝাঁপল করতল কাঁতি।
মলয়জ চন্দন বলয়কো পাঁতি ॥
চান্দকি কৌমুদী তনু নহে চিন।
যৈছন ক্ষীর নীর নহে ভিন ॥
ছায়া বৈরী না ছোড়ল বাদ।
চরণে শরণ করু যামিনী আধ ॥

গোপালদাস কহে সুচতুরী গোরী।
নূপুর রসন তুলি মুখ পূরী॥" (বৈ. প. পৃ. ৭৭৩)

শ্রীরাধার দেহকান্তি ও জোৎস্নার মধ্যে ভেদ রহিল না, যেন ক্ষীর ও নীরে মিশিয়া গেল। সদুক্তিকর্ণামৃতের আর একটি পদেও এই ভাবটি দেখা যায়। পদটি কোন অজ্ঞাতনামা কবির রচনা।

"নবধৌত-ধবল-বসনাশ্চন্দ্রিকয়া সান্দ্রয়া তিরোগমিতাঃ।
রমণভবনান্যশঙ্কং সর্পন্ত্যভিসারিকাঃ সপদি॥" (সদুক্তিক: ২।৬৫।৪)

—'অভিসারিকাগণ নতুন ধোয়া কাপড় পড়িয়া গাঢ় চন্দ্রিকায় আচ্ছাদিত হইয়া এখন শঙ্কাশূন্য মনে নায়কের গৃহে যাত্রা করিতেছে।' সাদা কাপড় পরায় সাদা চাঁদের আলোয় অভিসারিকাদিগকে চিনিবার উপায় থাকিবে না।

বাণ কবি রচিত আর একটি কবিতাতে ঠিক এই ভাবটি দেখা যায়। পদটি সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত।

মলয়জপঙ্কলিপ্ততনবো নবহারলতাবিভূষিতাঃ
সিততরদন্তপত্র-কৃতবক্ত্ররুচো রুচিরামলাংশুকাঃ।
শশভৃতি বিততধাম্নি ধবলয়তি ধরামবিভাব্যতাং গতাঃ
প্রিয়বসতিং ব্রজন্তি সুখমেব মিথো নিরস্তভিয়োঽভিসারিকাঃ॥

বাণস্য (সদুক্তিক ২।৬৫।২)

—অভিসারিকাগণ সাদা চন্দনে শরীর লিপ্ত করিয়া, নব হারলতায় বিভূষিত হইয়া, শ্বেততর কর্ণ-ভূষণের দ্বারা মুখের শোভা বর্ধিত করিয়া, মনোরম শুভ্র বসন পরিধান করিয়া এবং চন্দ্র কিরণের দ্বারা ধরাতলকে ধবলিত করিলে অদর্শন প্রাপ্ত হইয়া, অতএব ভয়শূন্য মনে প্রিয়তমের বাসভবনে যাত্রা করিতেছে।"

গোবর্ধনার্য্যের আর্য্যাসপ্তশতীতেও শুক্লাভিসারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

জ্যোৎস্নাভিসার-সমুচিতবেশে ব্যাকোশ-মল্লিকোত্তংশে।
বিশসি মনো নিশিতেব স্মরস্য কুমুদত্সরুচ্ছুরিকা॥

(আর্যাসপ্তশতী ২৪৩)

(নায়ক নায়িকাকে বলিতেছে)—"হে জ্যোৎস্নারাত্রিতে অভিসারের উপযুক্ত বেশ-ধারিণি, হে বিকশিত-শুভ্র-মল্লিকা-পুষ্পধারিণি, শুভ্র কুমুদফুলের দ্বারা গঠিত মুষ্টিযুক্ত কামদেবের শাণিত ছুরিকার মত তুমি আমার মনে প্রবিষ্ট হইতেছ।"

বৈষ্ণব পদাবলীতেও ঠিক এইভাবে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে কয়েকটি বৈষ্ণব পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতির রচিত পদগুলি পূর্ববর্তী কবিদের রচিত পদগুলি হইতে আরও মনোরম ও সুষমামণ্ডিত হইয়াছে।

রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকে শুক্লাভিসারের উল্লেখ দেখা যায়।

চিকুর-তরঙ্গক- ফেণ-পটলমিব
কুসুমং দধতী কামম্।
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ
নর্ত্তিতুমতনুমবামম্॥
হরিমুপগচ্ছতি রাধা মধুর-বিহারা
মন্থর-পদগতি-লঘুলঘুতরলিত-হারা॥

(জগন্নাথবল্লভ নাটকে, ৪।৫১)

—"তরঙ্গায়িত কাল কেশরাশিতে ফেনপুঞ্জ সদৃশ শুভ্র পুষ্পরাজি ধারণ করিয়া শ্রীরাধা স্পন্দিত বাম-নয়নের ইঙ্গিতে যেন রতি-বিরহিত কামদেবকে নর্ত্তনের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। মধুর-লীলা-বিলাসিনী শ্রীরাধার পদ-সঞ্চারে বক্ষের মুক্তা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে।"

রূপ গোস্বামীর রচিত একটি পদেও জ্যোৎস্নাভিসারের উল্লেখ দেখা যায়।

ত্বং কুচবলি্গত-মৌক্তিক-মালা।
স্মিত-সান্দ্রীকৃত-শশি-কর-জালা॥

হরিমভিসর সুন্দরি সিত-বেশা।
রাকা-রজনিরজনি গুরুরেষা॥

পরিহিত-মাহিষ-দধিরুচি-সিচয়া।
বপুরর্পিত-ঘন-চন্দন-নিচয়া॥

কর্ণ-করম্বিত-কৈরব-হাসা।
কলিত-সনাতন-সঙ্গ-বিলাসা॥" গীতাবলী (২৫)

—"গতিবেগে তোমার মুক্তামালা স্তনমণ্ডলের উপর বিশৃংখল ভাবে দুলিতেছে। তোমার স্মিতহাস্য শশিকিরণকে নিবিড় করিয়া তুলিতেছে। সিত-বেশা (শুভ্রবেশধারিণী) সুন্দরী, হরির নিকট অভিসার কর। এই

পূর্ণিমা রজনী গুরুরূপে তোমাকে এই উপদেশই দান করিতেছে। পরিধানে মাহিষদধিরুচি শুক্ল বসন, দেহে অনুলিপ্ত শ্বেত চন্দন, আর শুভ্র কুমুদের কর্ণভূষণ তোমাকে সনাতন-সঙ্গ-বিলাসেই যোগযুক্ত করিতেছে।”

গোবিন্দদাস—

কুন্দকুসুমে ভরু কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥

চন্দন চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর॥

চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি অভিসার রভসরসে ভোরি॥

ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই॥

হেরইতে পরিজন লোচন ভূল।
রঙ্গপুতলি কিয়ে রসমাহা বুর॥

পুরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার॥

সুরত শিঙ্গার কিরিতি সম ভাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৬১১)

কবিশেখর—

কুন্দ কুমুদ গজমোতিম হার।
পহিরল হৃদয়ে ঝাঁপি কুচভার॥

থোরহি শশধর কিরণ বিথার
ঐছন সময়ে কয়ল অভিসার॥

চৌদিকে সচকিত নয়নে নেহার।
মদন-মদালসে চলই না পার॥

মিললি নিকুঞ্জে কুঞ্জনৃপ পাশ।
কহ কবিশেখর কেলিবিলাস॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৩০৭

দুর্দিনাভিসারিকা ॥ বর্ষাভিসার ॥

দুর্দিনাভিসারের কয়েকটি পদ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কালিদাসের 'মেঘদূতে' দুর্দিনাভিসারের উল্লেখ দেখা যায়। মহাকবি কালিদাসের নামে প্রচলিত 'ঋতু-সংহার' কাব্যে দুর্দিনাভিসারের একটি পদ দেখা যায়।

আভীক্ষ্ণমুচ্চৈ র্ধ্বনতা পয়োমুচা ঘনান্ধকারীকৃতশর্ব্বরীম্বপি।
তড়িৎপ্রভাদর্শিত-মার্গভূময়ঃ প্রযান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥"

(ঋতুসংহার ২।১০)

—"ঘন অন্ধকারাবৃত রজনীতে অভিসারিকাগণ নিরন্তর উচ্চশব্দে শব্দিত মেঘমালা কর্ত্তৃক সৃষ্ট বিদ্যুৎপ্রভার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অনুরাগান্ধ হৃদয়ে সংকেত স্থানে যাইতেছে।"

শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের একটি শ্লোকে দুর্দিনাভিসারের কথা পাই।

"জলধর নির্লজ্জস্ত্বং যস্ত্বং দয়িতস্য বেশ্ম গচ্ছন্তীম্।
স্তনিতেন ভীষয়িত্বা ধারাহস্তৈঃ পরামৃশসি ॥"

—'হে জলধর তুমি নিলর্জ্জ, যেহেতু দয়িতের গৃহে গমনকারিণী আমাকে মেঘগর্জনের দ্বারা ভয় দেখাইয়া তুমি জলধারারূপ হস্তের দ্বারা আমাকে স্পর্শ করিতেছ।'

ইহার সহিত আমরা সদুক্তিতে ধৃত ধরণীধরের একটি পদের সাদৃশ্য দেখি।

"প্রাণেশমভিসরন্তী মুগ্ধা পথি পঙ্কিলে স্খলন্তীব।
অবলম্বনায় বারাং ধারাসু হস্তং প্রসারয়তি ॥ (সদুক্তিকঃ ২।৬৬।৪)

—"অভিসারে নির্গতা মুগ্ধা পথের পঙ্কে পড়িতে পড়িতে যেন প্রাণাধিককে (দয়িতকে) ধরিতে যাইয়া অবলম্বনের জন্য জলধারার দিকে হাত বাড়াইতেছে।" সুভটকবির একটি পদে দুর্দিনে অভিসারিণী রমণীর একটি চমৎকার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সখী অভিসারিকাকে বলিতেছে—

পঙ্কে নূপুরশিঞ্জিতস্য গরিমা মগ্নঃ ক্বণন্মেখলা-
জল্পাকী জঘন-স্থলী জলমুচাং নাদৈর্নিষিদ্ধাধিকম্।
দোর্বল্লীবলয়াংশবশ্চ শমিতাঃ সৌদামিনী-বিভ্রমৈ-
র্বর্ষারাত্রিবিভূতিভিস্তব সখি ক্ষীণোন্তরায়ঃ ক্ষণাৎ ॥

(সদুক্তিকঃ ২।৬৬।১, সুভটস্য)

—"পঙ্কের মধ্যে নূপুর-শিঞ্জনের গরিমা ডুবিয়া গিয়াছে, মেঘের ডাকে শব্দ চাপা পড়িয়াছে, বিদ্যুৎ-চমকের দ্বারা লতার মতন হাতে বলয়ের মত কিরণসমূহ আবৃত হইয়াছে, হে সখি, বর্ষারাত্রির বিভূতিগুলির দ্বারা তোমার বিঘ্নগুলি মুহূর্তের মধ্যে ক্ষীণ হইয়াছে।"

সুভট কবির আর একটি কবিতায় আছে—

অসূচীসংচারে তমসি নভসি স্নিগ্ধজলদ-
ধ্বনিপ্রাজ্ঞংমন্যে পততি পৃষতানাং চ নিচয়ে।
ইদং সৌদামন্যাঃ কনকরমণীয়ং বিলসিতং
করালম্বং দূরাদবিনয়বতীনাং বিতনুতে॥ —সদুক্তিক: ২।৬৬।২

—"আকাশ যখন স্নিগ্ধ মেঘের ধ্বনি করিয়া নিজেকে প্রাজ্ঞ মনে করিতেছে, যেখানে সূচীরও সংচরণ হইতে পারে না এমন অন্ধকার, যখন বৃষ্টিবিন্দু পতিত হইতেছে, তখন সৌদামিনীর খেলার মতন মনোহর খেলা যেন দূর হইতে অভিসারিকাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে।"

ইহার সহিত রায় শেখরের রচিত বর্ষাভিসারের পদটির তুলনা করা যায়।

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম মোহনে একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপু।

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারব
জিবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥"

(বৈ. প. পৃ. ৩০৬ ; পদকল্পতরু. ৯৮৪)

রায় শেখরের এই পদটিতে শব্দচয়ন কৌশল ও হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ষা-প্রকৃতি যেন আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। বৈষ্ণব কবি সংস্কৃত কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। অভিসরণোদ্যতা শ্রীরাধার প্রেম-ব্যাকুলতাও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গোবিন্দদাস—

একে কুল কামিনি তাহে কুহু যামিনি ঘোর গহন-অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর হাম যাওব কোন পুর॥

(পদকল্পতরু ৯৭৯)

জগদানন্দের একটি পদে রাধার বর্ষাভিসার বর্ণনা করা হইয়াছে।

অবিরত বাদর বরিখন্ত দরদর
বহই তরলতর বাত।
বিষধর-নিকর ভরল পথ অরু কত
অজর বজর বিনিপাত॥
হরি হরি কৈছে চলব কুহু-রাতি।
না বুঝত কণ্টক সঙ্কট বাটহিঁ
মার গোঙারবর সাথি॥
যো পদ শরদ- কোকনদ দলহিঁ
ধূলি পরশে সীতকার।
উচ নীচ কিচ বীচ অব সো পদ
কৈছনে করব সঞ্চার॥
চলইতে চঙকি নগর পুরবাহির
গুরু দুরুজন দুরবার।
গতি অতি গোপত বেকত ভয়ে ভাবিত
জগদানন্দ নাচার॥ (বৈ. প. পৃ. ৮৭০)

এইগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথের পদের তুলনা করিতে পারি।

শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা।
নিশীথ যামিনী রে।
কুঞ্জ পথে সখি, কৈসে যাওব
অবলা কামিনী রে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত
ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুৎ পথতরু লুণ্ঠিত,
থর থর কম্পিত দেহ।
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
বরখত নীরদপুঞ্জ।
ঘোর গহন ঘন তাল তমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।
বোলত সজনী এ দুরুযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশি কাহে বজায়ত
সকরুণ রাধা নাম। (ভানুসিংহের পদাবলী)

আবার—

আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।—গীতাঞ্জলি (রবীন্দ্রনাথ)

অমরুর একটি পদ সদুক্তিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

ধাবতি চেতো ন তনুর্ধারাধৌতোধরো হৃদি ন রাগঃ।
ইহ রমণমভিসরন্ত্যাঃ স্খলতি গতির্নত্ববষ্টম্ভঃ॥ —সদুক্তিক ২।৬৬।৩

—"মন দৌড়াইতেছে, শরীর নহে, অধরের রাগ বারিধারায় ধৌত হইতেছে, কিন্তু হৃদয়ের নহে, প্রণয়ীর কাছে গমনশীলার গতি স্খলিত হইতেছে কিন্তু অবষ্টম্ভ আসিতেছে না।"

গাহাসত্তসঈর একটি শ্লোকে নায়িকার নীল কাপড় পরিয়া অভিসারের উল্লেখ দেখা যায়। দূতী নায়কের মনস্তুষ্টির জন্য বলিতেছে—

অজ্জাই ণীল-কঞ্চুঅভরিউব্বরিঅং বিহাই থণবট্টং।

জলভরিঅজলহরন্তরদরুগ্গঅং চন্দবিম্বং ব্ব॥ গাহাসত্তাসঈ ৪।৯৫

—"এই সুমহিলার স্তনপৃষ্ঠ নীলকুঞ্চক দ্বারা আবৃত হইয়াও অভিসার সময়ে উদ্বর্তিত হইয়া জলপূর্ণ নীল জলধরের মধ্য হইতে ঈষৎ উদ্‌গত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে।"

সদুক্তিতে উদ্ধৃত চন্দ্র-জ্যোতিষের একটি পদে দেখি (নায়িকার বয়োজ্যেষ্ঠা সখী অভিসারে গমনশীলা নায়িকাকে বলিতেছে)—

মৎপানাবপসব্যমর্পয় করং সব্যং চ কাঞ্চ্যাং কুরু

প্রোৎকুঞ্চাগ্রমমূ নিধেহি চরণাবুৎপঙ্কিলে বর্ত্মনি।

মা পুত্রি ত্রস পশ্য বর্ত্ম কতিচিদ্বিস্ফার্য্য চক্ষুঃ ক্ষণা-

ন্যাবল্লেঢ়ি তড়িল্লতা তত ইতঃ পিণ্ডাবলেহ্যং তমঃ॥

—সদুক্তিকঃ ২।৬৬।৫ (চন্দ্রজ্যোতিষঃ)

—"আমার হাতের মধ্যে তোমার ডান হাত রাখ, কাঞ্চীতে বাঁ হাত রাখ, উদ্‌গত পঙ্কযুক্ত পথে পায়ের আগা কুঞ্চিত কর (পা টিপিয়া চল), হে পুত্রি, ভয় পাইও না, পিণ্ডের মত (জমাট) অন্ধকারকে যখন বিদ্যুল্লতা অবলেহন করিতেছে তখন চোখ খুলিয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পথ দেখিয়া লও।"

এইগুলির সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতির দুর্দিনাভিসারের পদগুলির তুলনা করা যাইতে পারে। প্রাচীন কবি ও বৈষ্ণব কবি উভয়ের প্রেম-প্রকাশের একই রীতি।

বিদ্যাপতি—

"কাজর রঙ্গ বমএ জনি রাতি।
অইসন বাহর হোইতে সাতি॥
তড়িতহু তেজলি মিত আঁধিআর।
আসা সংসয় পরু অভিসার॥
ভল ন কএল মঞে দেল বিসবাস।
নিকট জোএন সত কাহুক বাস॥
জলদ ভুজঙ্গম দুহু ভেল সঙ্গ।
নিচল নিশাচর কর রসভঙ্গ॥

মন অবগাহএ মনমথ রোস।
জিবঞো দেলে নহি হোএত ভরোস॥
অগমন গমন বুঝএ মতিমান।
বিদ্যাপতি কবি এহু রস জান॥" (বৈ. প. পৃ. ১০২)

গোবিন্দদাসের পদ,—

"অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহিঁ মনোভব সিন্ধু॥
অব জনি সজনী করহ বিচার।
শুভখন ভেল পহিল অভিসার॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহিঁ পহিরায়হ নীল নিচোল॥
কী ফল উচ কুচ কঞ্চুকভার।
দূর কর সৌতিনি মোতিম হার॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি॥
চলইতে দীগ ভরম জনি হোয়।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়॥"

(বৈ. প. পৃ. ৬১২; পদকল্পতরু, ৬৪২)

তুলনীয়, রবীন্দ্রনাথ :—

বাদর বরখন নীরদ গরজন
বিজুলী চমক ঘোর
উপেখই কৈছে আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি মাধব মোর।
ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পহুঁ
বজরপাত যব হোয়,
তুহুঁক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম
ডর অতি লাগত মোয়।

অঙ্গ বসন তব ভীঁকত মাধব
　　　　ঘন ঘন বরখত মেহ
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকো লাগয়
　　　　কাহে উপখেবি দেহ।—(ভানুসিংহের পদাবলী)

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনায় কেবল যে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়াছেন তাহাই নয়, অনেক সময় সংস্কৃত কবিদের বর্ণনার রীতিও গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা করিতে গিয়া প্রাকৃত নায়িকার অভিসার বর্ণনার রীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

"করিবর রাজহংস জিনি গামিনি
চলিলহুঁ সংকেত গেহা
অমল তড়িত দণ্ড হেম মঞ্জুরি
জিনি অতি সুন্দর দেহা।"

এই পদে আমরা দেখি বিদ্যাপতি অভিসারিকা রাধার উৎকণ্ঠার বর্ণনা না দিয়া তাঁহার দেহের শোভার ও অলংকারশাস্ত্রোক্ত উপমার ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ আলংকারিক রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। সংস্কৃত কবিদের ও বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিয়া কবি গোবিন্দদাসও অভিসার বর্ণনায় আলংকারিক রীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

কঞ্জচরণযুগ যাবক-রঞ্জন
　　　　খঞ্জন-গঞ্জন-মঞ্জির বাজে।
নীল বসন মণি-কিঙ্কিণি রণরণি
　　　　কুঞ্জর-গমন দমন খিন মাঝে॥
　　　　সাজলি শ্যাম বিনোদিনি রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ তরঙ্গিণি রঙ্গিণি
　　　　মদন-মোহন মনো-মোহন ছাঁদে॥
　　　　ইত্যাদি (গোবিন্দদাস), (বৈ. প. পৃ. ৬১০)

পদটিতে ব্যতিরেকাদি অলংকার ও অনুপ্রাস প্রয়োগ ও ধ্বনি-ঝংকার লক্ষ্যনীয়।

গোবিন্দদাসের পদে দেখি, সহচরীরা দুর্যোগের ভয় দেখাইয়া শ্রীরাধাকে অভিসারে যাইতে নিষেধ করিতেছে।

মন্দির বাহির কঠিন কবাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি বাদর দরদর রোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত॥
দশদিশ দামিনি দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥
ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥ (বৈ. প. পৃ. ৬১৩,
পদকল্পতরু ৯৮০)

ইহার উত্তরে শ্রীরাধা যাহা বলিলেন সেই কথাটি গোবিন্দদাস একটি সংস্কৃত কবিতার ভাব লইয়া লিখিয়াছেন। কবিতাটি রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি কিন্তু বহু পূর্বেই রচিত হইয়াছে।

লজ্জৈবোদ্‌ঘাটিতা কিমত্র কুলিশোদ্বদ্ধা কবাটস্থিতিঃ
মর্যাদৈব বিলঙ্ঘিতা সখি পুনঃ কেয়ং কলিন্দাত্মজা।
আক্ষিপ্তা খলদৃষ্টিরেব সহসা ব্যালাবলী কীদৃশী
প্রাণা এব সমর্পিতাঃ সখি চিরং তস্মৈ কিমেষা তনুঃ॥"
(পদ্যাবলীতে ধৃত)

—"যখন আমি লজ্জাই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছি, তখন এস্থানে বদ্ধ কবাট থাকাতে আমার কি হইবে? যখন আমি মর্য্যাদা লংঘন করিয়াছি, তখন সামান্য যমুনা আমার কি করিবে? খলজনের দৃষ্টিই যখন অগ্রাহ্য করিয়াছি, তখন সর্পসকল আমার কি করিবে? যখন আমি তাঁহাকে প্রাণই সমর্পণ করিয়াছি তখন শরীর সমর্পণ করিব, তাহাতে আর কি কথা?"

গোবিন্দদাস—

কুলব্রত কঠিন কবাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু যব পঙরলুঁ
তাহে কি তটিনি অগাধা॥
সহচরি মঝু পরিগণ কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরি পাওল বোধ॥ (বৈ. প. পৃঃ ৬১৩,
পদকল্পতরু ৯৮৮)

উপরে উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের পদ দুইটির সহিত এই শ্লোকটি তুলনীয়,—

'ছিদ্রান্বেষণতৎপরঃ প্রিয়সখি প্রায়েন লোকো হধুনা
রাত্রিশ্চাপি ঘনান্ধকারবহলা গন্তুং ন তে যুজ্যতে'।
'মা মৈবং সখি বল্লভঃ প্রিয়তমস্তস্ত্যোৎসুকা দর্শনে
যুক্তাযুক্তবিচারণা যদি ভবেৎ স্নেহায় দত্তং জলম্‌'॥
(শার্ঙ্গধরপদ্ধতি ৩৬১৯)

॥ উন্মত্তাভিসারিকা ॥

কালিদাস তাঁহার 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের সপ্তম সর্গে 'অসমাপ্ত-প্রসাধনা' পুরনারীদের বর্ণনা করিয়াছেন। শিব বরবেশে সজ্জিত হইয়া হিমালয়ের পুরদ্বারে পৌঁছিলেন। উমার বর দেখিবার জন্য ঘরে ঘরে মেয়েদের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। মেয়েরা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া গবাক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। আভিসারিকা নারীর জীবনেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। অভিসারের

ব্যগ্রতাবশতঃ নারী প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া যাত্রা করে। তাহাকে ভ্রমাভিসার বা উন্মত্তাভিসার বলা চলে। সংস্কৃত সাহিত্যের এই ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার উন্মত্তাভিসার বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাসের 'কুমার-সম্ভবের' কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা কয়াচিদুদ্বেষ্টন-বান্তমাল্যঃ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ॥

(কুমারসম্ভব ৭।৫৭)

—"সুবিধামত স্থানে সর্বাগ্রে পৌছিবার জন্য কোন সুন্দরী এত তাড়াতাড়ি ছুটিল যে তাহার কবরীর বন্ধন উন্মুক্ত হইল এবং তাহা হইতে ফুলের মালা খসিয়া পড়িল, সে সেই শিথিল কেশপাশ না বাঁধিয়াই এক হাতে ধরিয়াই ছুটিল।"

বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিত-বামনেত্রা।
তথৈব বাতায়ন-সন্নিকর্ষং যযৌ শলাকামপরা বহন্তী॥

(কুমারসম্ভব ৭।৫৯)

—"অপর কোন রমণী বামনেত্র অঞ্জনাক্ত না করিয়াই তাড়াতাড়িতে দক্ষিণ নয়নে কজ্জল পড়াইয়া কজ্জল-শলাকাটি হাতে লইয়া গবাক্ষপার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল।"

অর্দ্ধাচিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্রশেষা॥"

(কুমারসম্ভব ৭।৬১)

—"তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইবার সময় কোন রমণীর অর্ধেক গাঁথা চন্দ্রহার (রশনা) হইতে মণিগুলি ঝড়িয়া পড়িতেছিল, শুধু তাহার অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মূলে ঐ হারের সূতাগাছটি তাহার হাতে রহিল।"

প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাগমেব।
উৎসৃষ্ট-লীলাগতি-রাগবাক্ষাদলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান॥

(কুমারসম্ভবম্ ৭।৫৮)

—"কোন রমণী প্রসাধিকার হাত হইতে চরণাগ্র টানিয়া লইয়া স্বভাবগত মন্দগতি ত্যাগ করিয়া দ্রুত গবাক্ষ পার্শ্বে যাওয়ায় সমস্ত পথটি অলক্তরঞ্জিত হইয়া উঠিল।"

'রঘুবংশে' কুমার অজকে দেখিবার জন্ত পুরনারীদের এই রকম ব্যস্ততা দেখা দিয়াছিল।

—"সাহিত্য-দর্পণে" একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় নায়িকা প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়াই এদিক ওদিক চাহিতেছে। ইহাকে ভ্রমাভিসারের পূর্বরূপ বলা যায়।

ধম্মিলমর্দ্ধমুক্তং কলয়তি তিলকং তথা শকলম্।
কিঞ্চিদ্বদতি রহস্যং চকিতং বিষ্বগ্ বিলোকতে তন্বী॥"

—সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (১৩৩)

—কেশপাশ অর্ধেক বন্ধন করা হইয়াছে, তিলকও অর্দ্ধেক লাগান হইয়াছে, এবং কথা বলিতে বলিতে তরুণী চকিত হইয়া এদিক ওদিক দেখিতেছে।

'সাহিত্যদর্পণে' একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক দেখি।

শ্রুত্বায়াস্তং বহিঃ কান্তমসমাপ্তবিভূষয়া।
ভালেহঞ্জনং দৃশোর্লাক্ষা কপোলে তিলকঃ কৃতঃ॥

—সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (১১৭)

—"প্রিয়তম বাহিরে আসিয়াছে শুনিয়া নায়িকা তাড়াতাড়ি মাথায় কাজল, চক্ষুতে অধররাগ ও কপোলে তিলক লাগাইয়া ফেলিল।"

গাহাসত্তসঈর একটি কবিতাতেও অনুরূপ ভাবের আভাস দেখিতে পাই। বেশ্যামাতা তাহার কন্যাকে প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়াই নায়কের গৃহে অভিসার করিতে বলিতেছে।

অসমত্তমণ্ডণা বিঅ বচ্চ ঘরং সে সকোউহল্লস্‌স।
বোলাবিঅ-হলহলস্‌স পুত্তি চিত্তে ণ লগ্‌গহিসি॥ (গাহাসত্তসঈ ১।২১)

—"হে পুত্রি, প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়াই কৌতূহলাক্রান্ত তাহার (প্রিয়জনের) গৃহে যাত্রা কর। যদি তাহার কৌতূহল চলিয়া যায়, তাহা হইলে তুমি তাহার চিত্তে স্থান নাও পাইতে পার"।

অশ্বঘোষের রচনাতেও এই ধরণের চিত্র পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব পদাবলীতেও অনুরূপ পদ পাই। শ্রীকৃষ্ণের অভিসারের সংকেত শুনিয়া শ্রীরাধা ব্যগ্রতাবশতঃ প্রসাধনে ভুল করিয়া বসিল। ইহাকেই 'উন্মত্তাভিসার' বলা হইয়াছে। গোবিন্দদাসের একটি পদে আছে শ্রীরাধা তাড়াতাড়িতে সাজ-সজ্জায় বিভ্রাট ঘটাইয়া ফেলিলেন।

গোবিন্দদাস—

মণিময় মঞ্জির যতনে আনি ধনি
সো পহিরল দুই হাত।

কিঙ্কিণি গীমহার বলি পহিরল
হার সাজাওল মাথ ॥
সুন্দরি অপরূপ পেখলুঁ আজ।
হরি-অভিসার ভরম ভরে সুন্দরি
বিছুরল সাজ বিসাজ ॥
ঘন আন্ধিয়ার রজনি জনি কাজর
গরজত বরিখত মেহ।
বিষধর ভরল দূতর পথ পাঁতর
একলি চললি তেজি গেহ ॥
চঢ়লি মনোরথে দোসর মনমথ
পন্থ বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দদাস কহই ব্রজনাগরি
ঐছনে ভেটলি কান ॥”

(পদকল্পতরু, ১০০৮, বৈ. প. পৃ ৬১৬)

শ্রীকৃষ্ণের ভ্রমাভিসার :

বল্লভদাস— সুন্দরি কৈছন আরতি তোর।
বিঘটিত ঘটিত সাজ নাহি জানল
ভূলল মাধব মোর ॥
বিপরীত চীর পহিরি হরি সাজল
দুহুঁ অঙ্গদ দুহুঁ কানে।
সীঁথি বলয় করি হাথে সাজাওল
কুণ্ডল মুদরিক ভানে।
কিঙ্কিণিজাল মাল করি পহিরল
হার সাজাওল হাতে।
চূড়ক সাজ করি চরণহি পহিরল
মঞ্জির পহিরল মাথে ॥
পুরুব উত্তর নাহি দীগ দিগন্তর
নব অনুরাগক লাগি।
বল্লভদাস কহ চঢ়ল মনোরথে
সঙ্কট দূরহি ভাগি ॥ (পদকল্পতরু ১০০৬, বৈ. প. পৃ. ৭০৩)

শ্রীরাধা প্রসাধন করিতেছিলেন এমন সময় শুনিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাড়ীর সামনে দিয়া যাইবেন অমনি প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া বাড়ীর দেউড়ীতে পায়চারী করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিবার ব্যগ্রতাবশত রাধার আর প্রসাধন শেষ হইল না। এই ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবি যশোরাজ খান একটি পদ লিখিয়াছেন।

যশোরাজ খান—এক পয়োধর চন্দন লেপিত
আরে সহজই গোর।
হিম ধরাধর কনক ভুধর
কোরে মিলল জোড়॥
মাধব তুয়া দরশন কাজে।
আধ পদচারি করত সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে
চাঁদ পুজল কাম॥
শ্রীযুত হুসন জগৎভূষণ
সেহ ইহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান॥ (বৈ. প. পৃ. ১০৫০)

বংশীবদন— রাই সাজে বাঁশী বাজে পড়ি গেও উল।
কি করিতে কিবা করে সব হৈল ভুল॥
মুকুরে আঁচড়ি রাই বান্ধে কেশভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার॥
করেতে নূপুর পরে জংঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ-পাতা॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা॥

বংশীবদনে কহে যাঙ বলিহারি।
শ্যাম-অনুরাগের বালাই লৈয়া মরি॥

পদকল্পতরু ১০০৯ বৈ প পৃ ১৬০

কবি গোবিন্দদাসের আর একটি পদে পাই, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধা ও গোপীগণ প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া সংকেতস্থানে অভিসারে যাইতেছেন।

বিসরি গেহ নিজঁহু দেহ
এক নয়নে কাজর রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কন একু,
একু কুণ্ডল ডোলনি।
শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
বিগলিত বেণি লোলনি।
তহিঁ বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পথে না গেলি
ঐছে মিলল গোকুল চন্দ
গোবিন্দদাস বোলনি। (বৈ. প. পৃ. ৬৩৭—৬৩৮)

কেবল যে বৈষ্ণব পদাবলীতেই 'অসামাপ্ত-প্রসাধনা'র চিত্র পাই তাহা নহে, মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ চিত্র দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও ইহার সন্ধান মেলে। আধুনিক যুগেও রবীন্দ্রনাথের রচনাতে ইহার জের দেখিতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ—

যেমন আছ তেমনি এসো, আর করো না সাজ।
বেণী না হয় এলিয়ে রবে, সিঁথে না হয় বাঁকা হবে,
নাই বা হল পত্রলেখার সকল কারুকাজ।
কাঁচল যদি শিথিল থাকে নাইকো তাতে লাজ।
যেমন আছ তেমনি এসো, আর করো না সাজ॥
এসো দ্রুত চরণ দুটি তৃণের পরে মেলে
ভয় করো না অলক্ত রাগ, মোছে যদি মুছিয়া যাক

নূপুর যদি খুলে পড়ে না হয় রেখে এলে
খেদ করো না মালা হতে মুক্তা খসে গেলে।
এসো দ্রুত চরণ দুটি তৃণের পরে ফেলে। —চিরায়মানা-ক্ষণিকা—

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে রাধাকৃষ্ণের রহস্যালাপ ও রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও সদুক্তিকর্ণামৃতের কয়েকটি কবিতায়। কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ের একটি পদে কৃষ্ণের রাধার গৃহে অভিসারের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। পদটি সদুক্তিকর্ণামৃতেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

গোপন মিলনের কামনায় কৃষ্ণ রাধার গৃহদ্বারে অভিসারে আসিয়াছে। গোপী তাহাকে প্রথমে আমল না দিয়া উপহাস করিয়া জেরা করিতেছে। তাহাতে কৃষ্ণ পর্য্যুদস্ত।

কোঽয়ং দ্বারি হরিঃ প্রযাহ্যুপবনং শাখামৃগেণাত্র কিং
কৃষ্ণোঽহং দয়িতে বিভেমি স্তুতরাং কৃষ্ণঃ কথং বানরঃ।
মুগ্ধেঽহং মধুসূদনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পান্বিতাম্
ইত্থং নির্ব্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ॥

(কবীন্দ্রবঃ-২১, সদুক্তিক ১।৫৬।২)

—'দ্বারে ও কে', 'হরি' 'উপবনে যাও, বানরের এখানে প্রয়োজন কি?' 'প্রিয়ে, আমি কৃষ্ণ'। 'বড় ভয় করিতেছে, বানর কি কাল হয়?' 'বোকা মেয়ে, আমি মধুসূদন'। 'যাও তবে ফুল ফুটিয়াছে যে লতায়'—এইভাবে প্রিয়ার দ্বারা বাক্যহারা হইয়া লজ্জিত হরি তোমাদের রক্ষা করুন।

সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত আর একটি পদে দেখি কৃষ্ণ গভীর রাত্রিতে অভিসার করিয়া রাধার নিকট আসিয়াছে। রাধার জেরার চোটে কৃষ্ণ পর্য্যুদস্ত।

কস্ত্বং ভো নিশি কেশবঃ শিরসিজৈঃ কিং নাম গর্ব্বায়সে
ভদ্রে শৌরিরহং গুণৈঃ পিতৃগতৈঃ পুত্রস্য কিং স্যাদিহ।
চক্রী চন্দ্রমুখি প্রযচ্ছসি ন মে কুণ্ডীং ঘটীং দোহিনী-
মিত্থং গোপবধূহৃতোত্তরতয়া দুঃস্থো হরিঃ পাতু বঃ॥

—সদুক্তিক ১।৫৬।৩

—'এত রাত্রে তুমি কে'? 'আমি কেশব'। 'মাথার কেশের দ্বারা আর কি গর্ব করিতেছে'? 'ভদ্রে, আমি শৌরি'। 'এখানে পিতৃগত গুণের দ্বারা

পুত্রের কি হইবে' ? 'চন্দ্রমুখী, আমি চক্রী', 'বেশ ত, তাহা হইলে তুমি আমাকে কলসী, ঘটী, দুধ দুহিবার ভাড় কিছুই দিতেছ না কেন' ? এইভাবে গোপবধূর (রাধার) লজ্জাজনক উত্তরদ্বারা দুঃস্থ হরি তোমাদের রক্ষা করুন'।

ডাঃ সুকুমার সেন তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধে (পৃষ্ঠা ৯৮) একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পদটিকে অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তীযুগে বৈষ্ণব পদ রচিত হইয়াছে। পদটীতে দেখা যায় কৃষ্ণ রাধার গৃহে আসিয়েছে, কিন্তু রাধা প্রশ্নবানে কৃষ্ণকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। রাধার কাছে কৃষ্ণ পরাভব স্বীকার করিয়াছে।

পদটি এই—কোঽয়ং হুঙ্কুরুতে হরিঃ গিরিগুহাং হিত্বাত্র হর্ম্যে কুতঃ
কান্তেঽহং মধুসূদনস্তদিহ কিং পদ্মালয়ং গচ্ছতু।
কৃষ্ণোঽস্মীতি গুণোঽতনুর্বদতি কিং শ্যামমূর্তিঃ প্রিয়ে
সোমাভাপরিখেদিতঃ কিমিতি সুস্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥"

—'কে এখানে হুঙ্কার করিতেছে ?' 'হরি'। 'গিরিগুহা পরিত্যাগ করিয়া এই গৃহে কেন' ? 'কান্তে, আমি মধুসূদন', 'তাহা হইলে এখানে কেন, সে কমলালয়ে যাউক'। 'আমি কৃষ্ণ'। অতনু গুণ কি করিয়া কথা বলে' ? 'প্রিয়ে, আমি ঘনশ্যাম'। 'তাহা হইলে কি চন্দ্রকিরণ হইতে ভীত ? '—এইভাবে পরিখেদিত সুস্মের হরি তোমাদের রক্ষা করুন।

বৈষ্ণব কবি ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ (আসল নাম নরহরি চক্রবর্ত্তী) উক্ত পদের ভাব ও রচনা-কৌশল অবলম্বন করিয়া রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক একটি পদ রচনা করিয়াছেন। এখানেও দেখিতেছি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কাছে পরাভব স্বীকার করিয়াছেন।

পদটি এই—

কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার।
হরি হাম জানি না কর পরচার॥
পরিহরি সো গিরিকন্দর মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওব মৃগরাজ॥
সো নহ ধনি মধুসূদন হাম।
চলু কমলালয় মধুকরি ঠাম॥
এ ধনি শুনহ হাম ঘনশ্যাম।
তনু বিনে গুণ কিয়ে কহে নিজ নাম॥

শ্যামমূরতি হাম তুঁহু কি না জান।
তারাপতি ভয়ে বুঝি অনুমান॥
ঘরহু রতন দীপ উজিয়ার।
কৈছনে পৈঠব ঘন আন্ধিয়ার॥
রাধারমণ হাম কহি পরচার।
রাকা রজনি নহ ঘন আন্ধিয়ার॥
পরিচয় পদ যবে সব ভেল আন।
তবহিঁ পরাভব মানল কান॥
তৈখনে উপজল মনমথ সুর।
অব ঘনশ্যাম মনোরথ পুর।[1] (বৈ. প. পৃ. ১৯৫)

রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণ রাধার গৃহে আসিয়া কবাট ঠেলিতেছেন। রাধা প্রথমে তাঁহাকে আমল না দিয়া প্রশ্নবানে জর্জ্জরিত করিতেছেন।

অঙ্গুল্যা কঃ কবাটং প্রহরতি কুটিলে মাধবঃ কিং বসন্তো
নো চক্রী কিং কুলালো ন হি ধরনিধরঃ কিং দ্বিজিহ্বঃ ফণীন্দ্রঃ।
নাহং ঘোরাহিমর্দী কিমসি খগপতি র্নো হরিঃ কিং কপীশো
রাধাবাণীভিরিত্থং প্রহসিতবদনঃ পাতু বশ্চক্রপাণিঃ॥
(পদ্যাবলী ২৮১)

—'অঙ্গুলি দিয়া কে কবাট ঠেলিতেছে?' 'কুটিলে, আমি মাধব'। 'কি বলিলে, বসন্ত?' 'না, চক্রী'। 'কি কুম্ভকার'? 'না, ধরনীধর'। 'কি দ্বিজিহ্ব ফণীন্দ্র?' 'না, আমি ভয়ঙ্কর অহিমর্দনকারী'। 'তাহলে তুমি কি খগপতি গরুড়'? 'না, আমি হরি'। 'কি, কপিপতি?'—এই ভাবে রাধাবাক্যের দ্বারা প্রহসিতবদন চক্রপাণি (কৃষ্ণ) তোমাদের রক্ষা করুন।

গোবিন্দদাস কবিরাজ রাধাকৃষ্ণের অভিসার বর্ণনা প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক রচনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়। বৈষ্ণব কবিগণ পূর্বকালীয় কবিদের কাছ হইতেই এইরূপ রচনা-রীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

১ পদটি পদকল্পতরুতেও আছে (৩৫০)

গোবিন্দদাসের পদ,—

আজু কৈছে তেজলি গেহ।
কে জানে কৈছন তোহারি সিনেহ॥
গুরুজন ভয়ে কি না কাঁপ।
ঘন আন্ধিয়ারে সবহুঁ দিঠি ঝাঁপ॥
কুহু কৈছে হেরলি রাতি।
মরমহি উয়ল মনমথ বাতি॥
দুতর পন্থ সঞ্চার।
চড়ল মনোরথে ইথে কি বিচার॥
একলি আওলি এত দূর।
আগহি আগে কুসুমশর শূর॥
আপে করই দুহুঁ কোর।
মীলল দুহুঁ জন তনু তনু জোড়॥
রাধামাধব ভাষ।
না বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস॥ (বৈ. প. পৃ. ৬১৭)

শ্রীকৃষ্ণ—আজ এই দুর্দিনে কেমন করিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলে।

শ্রীরাধা—কে জানে কেমন তোমার স্নেহ (তোমার প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ)।

শ্রীকৃষ্ণ—গুরুজনের ভয়ে কম্পিতা হইলে না?

শ্রীরাধা—ঘন অন্ধকার যে সকলেরই দৃষ্টি আবৃত করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ—অন্ধকার রাত্রে কি করিয়া পথ দেখিতে পাইলে?

শ্রীরাধা—মনমথ প্রদীপ উদিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ—দুস্তর পথ কিরূপে অতিক্রম করিলে?

শ্রীরাধা—মনোরথে চড়িয়া আসিলাম, ইহার আর বিচার কি?

শ্রীকৃষ্ণ—একাকিনী এত দূর আসিলে?

শ্রীরাধা—আগে আগে বীর মদন আসিয়াছে।

আপনা আপনি দুজনে দুজনকে কোলে করিল, দুই জনে মিলিত হইল, দেহে দেহ যুক্ত হইল, রাধামাধবের বাক্য, গোবিন্দদাস না বুঝিয় মুগ্ধ হইল।

বৈষ্ণব কবি পূর্ণানন্দও রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক একটি পদ রচনা করিয়াছেন।

এই বনে কংসের আজ্ঞা নাই বলে হরি।
রাই বলে এখনি ভাঙ্গিব ভারিভুরি ॥
কৃষ্ণ বলে স্বর্গমর্ত মোর অধিকার।
রাই বলে তোমায় জানি আভীর কুমার ॥
কৃষ্ণ বলে ব্রহ্মা ইন্দ্র দমন করি আমি।
রাই বলে নন্দের গোধন চড়াও তুমি ॥
কৃষ্ণ বলে গোবর্ধন ধরেছি কৌতুকে ॥
রাই বলে নন্দের বাধা বহিছ মস্তকে ॥
এ বোল শুনিয়ে কৃষ্ণ ভাবে মনে মনে।
কৃষ্ণকে বাঁধিল রাই আপন বসনে ॥
দেখিয়া স্থবল সখা দূরে পলাইল।
দাস পূর্ণানন্দের মনে আনন্দ বাড়িল ॥

বৈ. প. পৃ. ১০৩১

॥ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে মান ও কলহান্তরিতা ॥

পণ্ডিতগণ বলেন প্রেমের গতি কুটিল। অভিসারে নায়ক-নায়িকার সংক্ষিপ্ত মিলন হইল, প্রেম কিন্তু সরল পথে প্রবাহিত হইল না, বাম্যভাব অবলম্বন করিল। মান-অভিমানে প্রেমের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। প্রাচীনগণ বলেন—স্নেহ ব্যতীত ভয় হয় না, আর প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষাও সম্ভবে না, এই জন্য উভয়ের (নায়ক-নায়িকার) প্রেমপ্রকাশক হইতেছে এই মান-প্রকার। অনেক সময় সখীরা নায়িকাকে নায়কের প্রতি মান অবলম্বন করিতে প্ররোচনা দেয়। নায়িকাও কখনো বা নায়কের নিকট হইতে অনুনয়ের সুখ আস্বাদ করিতে মান অবলম্বন করিয়া বসে। অনেক সময় নায়কও মান করিয়া থাকে। সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যে নর-নারীর মান অবলম্বন করিয়া বহু কবিতা রচিত হইয়াছে।

আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার 'সাহিত্য-দর্পণে' লিখিয়াছেন।

"মানঃ কোপঃ স তু দ্বেধা প্রণয়েের্য্যাসমুদ্ভবঃ।
দ্বয়োঃ প্রণয়মানঃ স্যাৎ প্রমোদে সুমহত্যপি॥
প্রেম্ণঃ কুটিলগামিত্বাৎ কোপো যঃ কারণং বিনা॥"

—সাহিত্য-দর্পণে তৃতীয় পরিচ্ছেদ (১৯০)

—'পরস্পর অনুরাগী নায়ক-নায়িকার যে কোপ তাহাকে মান বলে। প্রণয় ও ঈর্ষ্যার কারণে মানের সৃষ্টি হয়। প্রেমের বক্রতা স্বভাবশতঃ বা অকারণে এই কোপ উপস্থিত হইত পারে।' মান দুই প্রকার—প্রণয়মান ও ঈর্ষ্যামান; 'মান' বিপ্রলম্ভ শৃংগারের অন্তর্গত। মানের চেষ্টামাত্র হইলেই সেইখানে মান বলা যাইবে না। অপরের মান ভাঙাইবার জন্য অনুনয় পর্যন্ত মানের স্থায়িত্ব না হইলে বিপ্রলম্ভ শৃংগার হইবে না। অর্থাৎ যেখানে মানের চেষ্টা অনুনয় পর্যন্ত স্থায়ী হইবে না, সেইখানে 'মানাখ্য' বিপ্রলম্ভ শৃংগার না হইয়া সম্ভোগাখ্য শৃংগারের অসূয়াখ্য সঞ্চারী ভাব হইবে। মান-ভঞ্জনের উপায় ছয় প্রকার, যেমন, সাম, ভেদ, দান, নতি, উপেক্ষা ও রসান্তর। প্রণয়াস্পদের প্রতি কোপ-অবলম্বনকারিণী নায়িকাকে মানিনী (বা অভিমানিনী) বলা চলে।

বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনায় প্রাকৃত নরনারীর প্রেম-বর্ণনার রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। 'অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাব-কুটিলা ভবেৎ'।[১] 'প্রেমের গতি সর্পের মত স্বভাবতই কুটিল।' তাই যথার্থ প্রেম যেখানে সেখানেও কোন কোন সময়ে কারণে বা অকারণে বক্রতা বা বাম্যভাব দেখা দেয়। তাই বৈষ্ণব কবিগণ নিত্যপ্রেয়সী হরিবল্লভাদের কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের অদাক্ষিণ্য (মান) বর্ণনা করিয়াছেন। মানের বর্ণনায় প্রেমের উৎকর্ষ সাধিত হয়। রূপ গোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥"

—উজ্জ্বল-নীলমণি, শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ (১৫।৭৪)

—"একস্থানে থাকিলেও এবং অনুরক্ত হইলেও নায়ক-নায়িকার স্ব স্ব অভিপ্রেত আলিঙ্গন, দর্শন, চুম্বন, প্রিয়ভাষণ প্রভৃতির প্রতিবন্ধক ভাবকে মান বলে।" মান দুই প্রকার—সহেতু (ঈর্ষ্যা মান) এবং নির্হেতু (অকারণ এবং কারণাভাস বা প্রণয়মান)। মানভঙ্গের উপায়—নির্হেতুমান নায়কের

১ উ. ম. শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণে উদ্ধৃত।

আলিঙ্গনাদির দ্বারাই স্বয়ং শান্ত হয়, সহেতু মান—সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা ও রসান্তরাদি দ্বারা উপশমিত হয়। মানোপশমের চিহ্ন—অশ্রু-বিসর্জন ও হাস্যাদি। শ্রীরাধা যে সময়ে কৃষ্ণ-প্রেমের উৎকর্ষতাবশত অদাক্ষিণ্য ভাব অবলম্বন করেন, সেই সময়ে শ্রীরাধাকে মানিনী বা অভিমানিনী বলা যায়।

'গাহাসত্তসঈর' এই কবিতাটিতে নায়িকার মান বর্ণনা করা হইয়াছে, নায়ক নায়িকার সখীদের বলিতেছে,—

"ণ বি তহ অণালবন্তী হিঅঅং দুম্মেই মাণিণী অহিঅং।
জহ দূর-বিঅম্ভিঅ-রোস-মজ্ঝত্থ-ভণিএহিং॥

গাহাসত্তসঈ ৬।৬৪

—"মানিনী আলাপ না করিয়া আমার হৃদয়কে যত অধিক কষ্ট না দিয়াছে অনেকদূর পর্যন্ত প্রকটিত গুরুকোপবিশিষ্ট উদাসীনবচনদ্বারা তদপেক্ষা বেশী কষ্ট দিয়াছে।"

ইহারই পরবর্তী ও পূর্ণতর রূপ দেখি বিদ্যাপতির একটি পদে। এখানে দেখি নায়ক-শিরোমণি কৃষ্ণ শ্রীরাধাকে অনুনয় করিতেছেন।

বদন চাঁদ তোর নয়ন চকোর মোর
রূপ অমিঅরস পীবে।
অধর মাধুরী ফুল পিয়া মধুকর তুল
বিনু মধু কত খন জীবে।
মানিনি মন তোর গঢ়ল পসানে
ককে ন রভসে হসি কিছু ন উত্তর দেসি
সুখে জাও নিসি অবসানে॥ (বিদ্যাপতি, বৈ. প. পৃ. ১০৮)

গাহাসত্তসঈর একটি পদে নায়কের মান বর্ণনা করা হইয়াছে। নায়ক মান করিয়া বসিয়া আছে, তখন নায়িকা তাহাকে বলিতেছে,—রাত্রিতে তোমার শয্যাপার্শ্ব হইতে যদি তোমার কান্তা উঠিয়া যায় তাহা হইলে তুমি আমার বেদনা বুঝিতে এবং মান করিয়া বসিয়া থাকিতে না।

ণ কুণন্তো ব্বিঅ মাণং ণিসাসু সুহ-সুত্তদরবিবুদ্ধাণ।
সুণ্ণইঅপাসপরিমুসণবেঅণং জই সি জাণন্তো॥ গাহাসত্তসঈ ১।২৬

—"রাত্রিতে সুখস্বপ্নগুঞ্জন-মধ্যে জাগরিত জনের জন্য প্রণয়ীর অভিসারে নির্গত স্বকান্তাদ্বারা শূণ্যীকৃত শয্যাপার্শ্বের প্রত্তরণাজনিত বেদনা যদি তুমি

বুঝিতে তাহা হইলে মান করিয়া থাকিতে না।[১] এখানে নায়িকার ঈর্ষ্যা-হেতু মান দেখা যায়।

'গাহাসত্তসঈ'র একটি কবিতায় নায়কের মান বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু নায়কের প্রণয়মান এমনিতেই ভঙ্গ হইয়াছে দেখা যায়; পদটি 'সাহিত্য-দর্পণে' (৩।২০২-৩) নায়কের মানের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত।

অলিঅপসুত্তঅবিণিমীলিঅচ্ছ দে সুহঅ মজ্ঝ ওআসং।
গণ্ডপরিউম্বণাপুলইঅঙ্গ ণ পুণো চিরাইস্সং॥ গাহাসত্তসঈ ১।২০

—'হে সুভগ, অলীক নিদ্রায় নিমীলিত নয়ন হইলেও তুমি তোমার গণ্ডচুম্বনে বিশেষভাবে পুলকিতাঙ্গ হইতেছ,, (শয্যা মধ্যে) আমাকে একটু স্থান দাও, আমার আর (ভবিষ্যতে) বিলম্ব হইবে না।'

সত্তসঈর আর একটি কবিতায় নায়ক-নায়িকা উভয়ের মান বর্ণনা করা হইয়াছে।

পণঅ-কুবিআণঁ দোণ্হ বি অলিঅ-পসুত্তাণঁ মাণইল্লাণং
ণিচ্চল-ণিরুদ্ধ-ণীসাস-দিণ্ণ-কণ্ণাণঁ কো মল্লো।' গাহাসত্তসঈ ১।২৭

—'প্রণয়কুপিত, কপটনিদ্রিত, মানাবলম্বনকারী দম্পতী যখন নিশ্চল ভাবে নিঃশ্বাস নিরোধ করিয়া পরস্পরের নিঃশ্বাস শব্দে কান দিয়া থাকে, তখন উভয়ের মধ্যে কে অধিকতর সমর্থ হয়, (অর্থাৎ মানত্যাগে কেহই সমর্থ নয়)।'

নায়িকার মান গাহাসত্তসঈর একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে নায়িকার প্রণয়মান দেখা যায়।

তহ মাণো মাণধণাএ তীঅ এমেঅ দূরমণুবন্ধো।
জহ সে অণুণীও পিও এক্ক-গ্গামো ব্বিঅ পউথো॥
গাহাসত্তসঈ ২।২৯

—মানধনা সেই প্রিয়ার মান অকারণে এতদূর পর্যন্ত অনুবন্ধ হইয়াছে যে, তাহার দয়িত তাহাকে অনুনয় করার পরেও একগ্রামে বাস করিয়াও প্রবাসীর মত হইয়া রহিয়াছে।

ইহার সহিত গোবিন্দদাসের একটি পদ স্মরণ করা যায়, শ্রীরাধা বলিতেছেন, বিনা অপরাধে মান করিয়া সব নষ্ট করিলাম।

১ তুলনীয় বিদ্যাপতি—একাহ শায়ন সখি সুতলয়ে অছল বালভ নিসি মোর।
না জানল কতিখন তেজি গেলয়ে বিছুরল চকোরা জোর
সুন সেজ হিয় সালয়ে রে পিয়াএ বিনু মরব মোয়ে আজি।

রোখে দোখলুঁ পিয়া বিনি অপরাধে।
না জানিয়ে এতকি পড়ব পরমাদে॥
রজনি প্রভাতে পুরব পরকাশ।
যামিনী জাগি আয়ল মঝুপাশ॥
শিতল তুলহ কর দেয়ল পায়।
মানে মুগধি হাম উপেখলুঁ তায়॥
কতরূপে বচন কহল সব মীঠ।
বদন ঝাঁপি হাম দেয়লুঁ পীঠ॥
পালটি হেরি হেরি পিয়া মোর গেল।
গোবিন্দদাস কহ মরমক শেল॥ বৈ. প. পৃ. ৬২৬

গাহাসত্তসঈর কোন পদে দেখি, নায়ক নায়িকার সম্মুখে অপর নারীর নাম উচ্চারণ করাতে নায়িকা অবলম্বন করিয়াছে। এখানে নায়িকার ঈর্ষ্যামান দেখা যায়।

গোত্তক্খলনং সোউণ পিঅঅমে অজ্জ তীঅ খণ-দিঅহে।
বজ্ঝ-মহিসস্স মাল ব্ব মণ্ডণং উঅহ পড়িহাই॥

গাহাসত্তসঈ ৫।৯৬

—'দেখ, আজ এই উৎসবের দিনে দয়িতের মুখে গোত্রস্খলন (অপর নারীর নাম) শুনিয়া এই রমণীর মণ্ডণ যেন বধ্য মহিষের গলায় প্রদত্ত মালার ন্যায় মনে হইতেছে।'

তুঃ উদ্ধবদাস—

শুন শুন নীলজ কান।
কৈছন মুরলিক গান॥
চন্দ্রাবলি বলি গীত।
এ কিয়ে চপল চরীত॥
শুনি ধনি কয়লহি মান।
কি করবি অব সমাধান॥ বৈ. প. পৃ. ৫০৭

প্রিয়তমের অনুনয়সুখ আস্বাদনের জন্য সখীরা নায়িকাকে মান অবলম্বন করিতে বলিতেছে। নায়িকা মান-গ্রহণে নিজের অক্ষমতা জানাইতেছে। এই ভাবটিকে প্রকাশ করা হইয়াছে সত্তসঈর একটি কবিতায়।

ণিদ্দাভঙ্গো আবণ্ডুরত্তণং দীহরা অ ণীসাসা।
জাঅন্তি জস্‌স বিরহে তেণ সমং কীরিসো মাণো।

গাহাসত্তসঈ ৪।৭৪

—'যাহার (আমার দয়িতের) বিরহে নিদ্রাভঙ্গ, পাণ্ডুরবর্ণতা ও দীর্ঘ-নিঃশ্বাস উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত কি করিয়া মান অবলম্বন করিব।'

বিদ্যাপতি—

"নয়নকো নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়াসঙ্গ দুখ মঝু পাশ॥" বৈ. প. পৃ. ১২৩

অমরুর একটি কবিতায় দেখি নায়িকা চাতুর্য্যের সহিত কৃতাপরাধ নায়কের উপর কোপ প্রকাশ করিয়া পীড়া দিতেছে।

একত্রাসনসংস্থিতিঃ পরিহৃতা প্রত্যুগমাদ্দূরত—
স্তাম্বুলায়নচ্ছলেন রভাসাশ্লেষোঽপি সংবিঘ্নিতঃ।
আলাপোঽপি নামিশ্রিতঃ পরিজনং ব্যাপারয়ন্ত্যান্তিকে
কান্তং প্রত্যুপচারতশ্চতুরয়া কোপঃ কৃতার্থীকৃতঃ॥ (অমরু ১৭)

—সাহিত্য-দর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদে (৭৭) উদ্ধৃত

—(সেই নায়িকা) দূর হইতে প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া কান্তের সহিত একত্র উপবেশন পরিহার করিল, তাম্বুল আনিবার ছলে গভীর আলিঙ্গন পরিহার করিল, নিকটে পরিজনদের ব্যাপৃত রাখিয়া কথাবার্ত্তারও সুযোগ নষ্ট করিল, এইভাবে কান্তের প্রতি অতি আদর দেখাইয়া চাতুর্য্যের সহিত সেই নায়িকা নিজের কোপ কৃতার্থ করিল। পদটি 'সাহিত্য-দর্পণে' ও সদুক্তিকর্ণামৃতে (২।৪৪।২) উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়।

অমরুকৃত একটি প্রাচীন শ্লোকে দেখি সখীদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়াও নায়িকা মান অবলম্বনে নিজের অক্ষমতা জানাইতেছে।

মুগ্ধে মুগ্ধতয়ৈব নেতুমখিলঃ কালঃ কিমারভ্যতে
মানং ধৎস্ব ধৃতিং বধান ঋজুতাং দূরে কুরু প্রেয়সি।
সখ্যৈবং প্রতিবোধিতা প্রতিবচস্তামাহ ভীতাননা
নীচৈঃ শংস হৃদি স্থিতো হি নমু মে প্রাণেশ্বরঃ শ্রোষ্যতি॥

(অমরু ৮২)

—"মুগ্ধে, কেন সরলভাবে এতদিন দিন যাপন করিলে, প্রিয়ের প্রতি মান অবলম্বন কর, ধৈর্য ধারণ কর, সরলতা দূর করিয়া দাও"—সখীদের কর্তৃক

এইভাবে প্ররোচিতা হইয়া ভীতাননা সেই নায়িকা তাহাদের বলিল—আস্তে আস্তে বল, হৃদয়স্থিত প্রাণেশ্বর শুনিয়া ফেলিবে।'

বৈষ্ণব প্রেম-গীতিকাতেও দেখি সখীরা শ্রীরাধাকে 'মান' অবলম্বন করিতে প্ররোচনা দিতেছে।

বিদ্যাপতি—

হমর বচন স্থন সাজনি।
মান করবি আদর জানি॥
জব কিছু পিয় পুছব তোয়।
অবনত মুখ রহবি গোয়॥
জব পরিহরি চলএ চাহি।
কুটিল নয়ানে হেরবি তাহি॥
জব কিছু দেখ আদর থোর।
ঝাপি দেখাওবি কুচক ওর॥
বচন কহবি কাঁদন মাখি।
মান করবি আদর রাখি॥
জব করে ধরি নিকট আনি।
উহু উহু কএ কহবি বানি॥
ভন বিদ্যাপতি সোই সে নারি।
মানক পিরীতি রাখিঅ পারি॥ বৈ. প. পৃ. ৯২

অমরুর আর একটি পদে দেখি, অভিমানিনী নায়িকা সখীকে বলিতেছে—

স্ফুটতু হৃদয়ং কামং কামং করোতু তনুং তনুং
ন সখি চটুল-প্রেম্না কার্য্যং পুনর্দয়িতেন মে।
ইতি সরভসং মানাটোপাদুদীর্য বচস্তয়া
রমণ-পদবী সারঙ্গাক্ষ্যা সশংকিতমীক্ষিতা॥

(অমরুকস্য ৭১) সদুক্তিকর্ণামৃত ২।৪৬৫

—'হৃদয় ফাটে ফাটুক, মদন (প্রেমাগ্নি) শরীরকে কৃশ করে করুক, সখি, চপল-প্রণয়ী দয়িতের (আমার) আর কোন প্রয়োজন নাই—এইভাবে কোপ-প্রকাশক বাক্য হঠাৎ প্রকাশ করিয়া হরিণ-নয়না (নায়িকা) শংকিত চিত্তে প্রিয়তমের আগমন পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।' পদটি সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইহার সহিত বৈষ্ণব কবি রূপ গোস্বামীর নিম্নস্থ পদটির তুলনা করা যায়।

তব চঞ্চল-মতিরয়মঘহন্তা।
অহমুত্তম-ধৃতি-দিগ্ধ-দিগন্তা॥
দূতি বিদূরয় কোমল-কথনম্।
পুনরভিধাস্যে নহি মধু-মথনম্॥
শঠ-চরিতোঽয়ং তব বনমালী।
মৃদুহৃদয়াহং নিজ-কুল-পালী॥
তব হরিরেষ নিরঙ্কুশ-নর্মা॥
অহমনুবদ্ধ-সনাতন-ধর্মা॥

(গীতাবলী), পদকল্পতরু ৫৩৩, বৈ. প. পৃ. ১৮০-১৮১

—দূতি, অঘাসুরহন্তা তোমার এই কৃষ্ণ অস্থিরচিত্ত। আমার অচঞ্চল ধৈর্য্যের কথা দিগন্তপ্রসারিত। দূতি, চাটুকার মধুসূদনকে দূর করিয়া দাও। আমি আর তাহার সহিত কোন কথা বলিব না। তোমার এ বনমালী শঠচরিত্র, আমি কোমলহৃদয়া, নিজ কুলে অবস্থিতা কুলনারী। তোমার হরি উচ্ছৃঙ্খলক্রীড়ারত। আমি সনাতন ধর্মে আস্থাশীলা (নিষ্ঠাবতী)।

অমরুর আর একটি শ্লোকে দেখি, অভিমানিনী নায়িকা নায়ককে বলিতেছে—

তথাভূদস্মাকং প্রথমা বিভিন্না তনুরিয়ং
ততো নু ত্বং প্রেয়ানহমপি হতাশা প্রিয়তমা।
ইদানীং নাথস্ত্বং বয়মপি কলত্রং কিমপরং
ময়াপ্তং প্রাণানাং কুলিশ-কঠিনানাং ফলমিদম্॥

অমরু ৮১, সদুক্তিক ২।৪৭।২

'আমাদের প্রথমে এমন হইয়াছিল এই তনু (তোমার তনুর সহিত) অভিন্ন ছিল। তাহার পর তুমি হইলে প্রেয়, আমি হইলাম হতাশা প্রিয়তমা, এখন আবার তুমি হইলে নাথ, আমরা সকলে হইলাম তোমার বণিতা। প্রাণটা কুলিশ-কঠিন হওয়ায় এই ফলই আমি লাভ করিলাম।'

গাহাসত্তসঈর অভিমানিনী নায়িকা নায়ককে বলিতেছে—

অপ্পত্ত-মন্নু-দুক্খো কিং মং কিসিঅত্তি পুচ্ছসি হসন্তো।
পাবসি জই চল-চিত্তং পিঅং জণং তা তুহ কহিস্সং॥

গাহাসত্তসঈ ২।৫৭

—'বিরহ-জনিত দুঃখ তুমি কখনো পাও নাই, তাই হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিতেছ, 'কেন আমি কৃশ হইয়াছি'। চপলচিত্ত প্রিয়জনকে যখন তুমি প্রাপ্ত হইবে, তখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।' চণ্ডীদাসের পদে দেখি মানিনী শ্রীরাধা ঠিক এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে গঞ্জনা দিতেছেন।

হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গণিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ।
জগভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিঁলু।
মৈলুঁ লাজে মিছা কাজে দগদগি হইলুঁ॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি মনোদুঃখে আর নানা কথা॥
শয়নে স্বপনে বন্ধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীনে যেন তোমার প্রেম নয়॥
ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥ বৈ. প. পৃ. ৫৬

'গাহাসত্তসঈ'র আর একটি পদে দেখি, প্রণয়কুপিতা নায়িকা নায়ককে বক্রোক্তি করিতেছে—

অজ্জঅ ণাহং কুবিআ অবউহসু কিং মুহা পসাএসি।
তুহ মন্নু-সমুপ্পাঅএণ মজ্ঝ মাণেণ বি ণ কজ্জং॥

গাহাসত্তসঈ ২।৮৪

—'হে অনভিজ্ঞ (বালক), আমি (তোমার উপর) কুপিত হই নাই, (আমাকে) আলিংগন কর, কেন আমাকে বৃথা প্রসন্ন করিতে চাহিতেছ? আমার পক্ষেও তোমার কোপ উৎপাদনকারী মান অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই।'

গাহাসত্তসঈর আর একটি পদে দেখি গাঢ় অনুরাগিনী নায়িকা কুপিত নায়ককে সখেদে বলিতেছে,—

'বালঅ তুমাহি অহিঅং ণিঅঅং বিঅ বল্লহং মহং জীঅং।
তং তই বিণা ণ হোহি ত্তি তেণ কুবিঅং পসাএমি॥' গাহাসত্তসঈ ৩।১৫

'—হে বালক (অজ্ঞ), আমার নিকট আমার নিজের জীবন তোমা হইতেও অধিকতর প্রিয়, সেই জীবন তোমা বিনা থাকিতে চাহে না, এই কারণে কুপিত তোমাকে প্রসন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছি।'

ইহার সহিত বিদ্যাপতির এই পদটির তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, 'তোমার জন্য আমার প্রাণ সংশয় হইয়াছে, তাই তোমাকে অনুনয় করিতেছি।'

গগন গরজ ঘন জামিনি ঘোর।
রতনহুঁ লাগি ন সঞ্চর চোর॥
এহনা তেজি অএলাঁহু নিঅ গেহ।
অপনহু ন দেখিঅ অপনুক দেহ॥
তিলা এক মাধব পরিহর মান।
তুঅ লাগি সংসয় পরল পরাণ॥ বৈ. প. পৃ. ১১১

বিশ্বনাথের 'সাহিত্য-দর্পণে' উদ্ধৃত একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে দেখি, কৃতাপরাধ নায়ককে নায়িকা তিরস্কার করিতেছে। পদটি সদুক্তিতেও পাওয়া যায়।

সার্ধং মনোরথশতৈস্তব ধূর্ত! কান্তা
সৈব স্থিতা মনসি কৃত্রিমহাবরম্যা।
অস্মাকমস্তি ন চ কশ্চিদিহাবকাশ-
স্তস্মাৎ কৃতং চরণপাত-বিড়ম্বনাভিঃ॥ সদুক্তিক—২।২৩।২

—'ওহে ধূর্ত, বিলাস-সম্ভোগের মনোবাসনার সহিত কপটভাবভঙ্গিমায় ধূর্ত নায়িকা তোমার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সেখানে যখন আমার কোন স্থান নাই, তখন আমার চরণে পতিত হইবার অভিনয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই।'

একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে দেখি অভিমানিনী নায়িকা নায়কের শরীরে ভোগাঙ্ক দর্শন করিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতেছে। এখানে ভোগচিহ্নের দ্বারা অনুমিত নায়িকার সহেতু মান বা ঈর্ষ্যামান দেখা যায়। পদটি 'সাহিত্যদর্পণে' উদ্ধৃত।[১]

নবনখপদমঙ্‌কং গোপয়স্যংশুকেন
স্থগয়সি পুনরোষ্ঠং পাণিনা দন্তদষ্টম্।

১ সা. দ. ৩য় পরিচ্ছেদ (১৯১)

প্রতিদিশমপরস্ত্রীসংগশংসী বিসর্পন্।
নব-পরিমলগন্ধঃ কেন শক্যো বরীতুম্॥ ১

স দ. (৩।১৯১)

—'নতুন নখরাঘাত অংগের বসনে আবৃত করিতেছ, অধরে দন্তাঘাত হাত দিয়া ঢাকিতেছ, কিন্তু বায়ু যে নতুন সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে তাহা কি করিয়া গোপন করিবে।'

অমরুকবির একটি কবিতা আছে; পদটি সদুক্তিকর্ণামৃতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। অভিমানিনী নায়ককে বলিতেছে।

ভবতু বিদিতং ভব্যালাপৈরলং প্রিয় গম্যতাম্
তনুরপি ন তে দোষোঽস্মাকং বিধিস্তু পরাঙ্মুখঃ।
তব যদি তথাভূতং প্রেম প্রপন্নমিমাং দশাং
প্রকৃতিচপলে কা নঃ পীড়া গতে হতজীবিতে॥'

সদুক্তিক—২।৪৭।৩

—'এখন আমি সবই বুঝিলাম, যথেষ্ট হইয়াছে, প্রিয়তম নিরর্থক বচনের প্রয়োজন নাই, এখন যাইতে পার, তোমার সামান্যমাত্র অপরাধ নাই, ভাগ্য (আমার প্রতি) বিমুখ, তোমার প্রবৃদ্ধ প্রেম যদি এই দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বভাবত চঞ্চল এই পোড়া প্রাণ গেলেও কোন ক্ষোভ নাই।'

এই গুলির সহিত বলরাম দাসের একটি পদের তুলনা করা যায়। এখানেও দেখিতে পাই শ্রীরাধা কৃতাপরাধ শ্রীকৃষ্ণের উপর অভিমান-করিয়া ভর্ৎসনা-বাক্য বর্ষণ করিতেছেন।

ধিক রহু মাধব তোহারি সোহাগ।
ধিক রহু যো ধনি তোহে অনুরাগ॥
চলহ কপট শঠ না কর বেয়াজ।
কৈতব বচনে অবহুঁ কিয়ে কাজ॥
সহজই অনলে দগধ ভেল অঙ্গ।
কাহে দেহ আহুতি বচন বিভঙ্গ॥
সো ধনি কামিনী গুণবতি নারী।
হাম নিরগুণি রতিরভসে গোঙারি॥
সেই পুরুব তুয়া হিয়অভিলাষ।
বঞ্চল ইহ নিশি যো ধনি পাশ॥

পুন পুন কাহে ধরসি মঝু পায়।
তুঁহু বহুবল্লভ তোহে না যুয়ায়॥
সিঁন্দূর কাজর ভালহি তোর।
ছল করি চরণে লাগায়সি মোর॥
কুহইতে রোখে অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ বলরাম ইহ প্রেমতরঙ্গ॥ বৈ. প. পৃ. ৭৪১

জ্ঞানদাস—(শ্রীরাধার উক্তি)

শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কী ফল আছয়ে এত পরিহার॥
পাওলুঁ তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লুঁ সরবস নিরমল কুল॥ বৈ. প. পৃ. ৪৩৮

সদুক্তিতে ভাবদেবীর একটি কবিতা আছে। নায়িকা নায়ককে অভিমান করিয়া বলিতেছে। এখানে নায়িকার মান-ভঞ্জনের জন্য নায়ক কর্তৃক নায়িকার পদ-ধারণও দেখা যায়।

কিং পাদান্তে পতসি বিরম স্বামিনো হি স্বতন্ত্রাঃ
কঞ্চিৎকালং ক্বচিদসি রতস্তেন কস্তেঽপরাধঃ।
আগস্কারিণ্যহমিহ যয়া জীবিতং ত্বৎবিয়োগে
ভর্ত্তৃপ্রাণাঃ স্ত্রিয় ইতি নন্থ ত্বং ময়ৈবানুনেয়ঃ॥

সদুক্তিক—২।৪৭।১

—বিমনা হইয়া কেন আমার পদান্তে পতিত হইতেছ। স্বামীরা হইল স্বতন্ত্র, কিছুকালের জন্য কোথাও তাহারা অভিরত হইয়াও থাকিতে পারেন, এ ব্যাপারে আর তোমার অপরাধ কি ? এখানে আমিই হইলাম অপরাধিনী—কারণ তোমার বিরহেও আমি বাঁচিয়া আছি। স্ত্রীগণ হইল ভর্তৃপ্রাণা, সুতরাং তুমিই হইলে আমার অনুমেয়।

এই পদটি রাধাপ্রেমের কবিতা বলিয়া রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলীতে' সংগৃহীত হইয়াছে।

'অথ রহসি অনুনয়ন্তং কৃষ্ণং প্রতি রাধা-বাক্যম্'।

কিন্তু কবিতাটি 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ে' বাক্‌কূট কবির নামে পাওয়া যায়।

অচল কবির একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে সদুক্তিতে। মানিনী নায়িকা সখেদে নায়ককে বলিতেছে।

যদা ত্বং চন্দ্রোভূরবিকলকলাপেশলবপু-
স্তদার্দ্রা জাতাহং শশধর-মণীনাং প্রকৃতিভিঃ।
ইদানীমর্কস্ত্বং খররুচিসমুৎসারিতরসঃ
কিরন্তী কোপাগ্নীনহমপি রবিগ্রাবঘটিতা। সদুক্তিক—২।৬৭।৫

—'যখন তুমি চন্দ্র ছিলে (চন্দ্রকলার ন্যায়) অবিকল কলাদ্বারা পেশল ছিল তোমার বপু—আমি ছিলাম তখন চন্দ্রকান্তমণি—চন্দ্রকান্তমণির স্বভাববশত আমি তখন দ্রবীভূত হইয়া যাইতাম; এখন তুমি হইলে সূর্য্য, খরকিরণের দ্বারা এখন সমুৎসারিত হয় তোমার রস, আমিও তাই এখন কোপাগ্নিবর্ষণকারিনী সূর্যকান্তমণির রূপে রূপান্তরিত হইয়াছি।[১]

ইহার সহিত চণ্ডীদাসের পদটির তুলনা করা যায়।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি)

যখন পিরীতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর হিয়ার উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধীনী তাহে কুলকামিনী
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ না জানি তবু ত আন
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোঁটা
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাস কয় কিবা তুমি কর ভয়
বঁধু তোর নহে অকরুণ॥ (বৈ. প. পৃ. ৫৫)

অমরুর একটি পদে দেখি সখীরা মানিনীকে প্রবোধ দিতেছে। পদটি সদুক্তিতেও উদ্ধৃত।

লিখন্নাস্তে ভূমিং বহিরনবরতঃ প্রাণদয়িতো
নিরাহারাঃ সখ্যঃ সততরুদিতোচ্ছূননয়নাঃ।
পরিত্যক্তং সর্ব্বং হসিতপঠিতং পঞ্জরশুকৈ-
স্তবাবস্থা চেয়ং বিসৃজ কঠিনে মানমধুনা। সদুক্তিক—১।৪৮।৩

১ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের অনুবাদ

—তোমার প্রাণপ্রিয় বাহিরে অনবরত মাটিতে আঁচর কাটিতেছে, সখীগণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে অনাহারে সর্বদা রোদন করিতেছে, খাঁচার শুকপাখীও হাস ও পাঠ ত্যাগ করিয়াছে—তোমারও এই অবস্থা, হে কঠিনে, মান ত্যাগ কর।

ইহার সহিত বৈষ্ণবকবি ভূপতিনাথের পদটির তুলনা করিতে পারি। পদটিতে দেখি সখীরা মানিনী শ্রীরাধাকে মানত্যাগে উপদেশ দিতেছে।

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল মাধাই॥
কিশলয় শয়ন উপেখি।
ভূমি উপর নখ লেখি॥
তেজ ধনি অসময় মান।
কানুক তুহুঁ সে নিদান॥—(ভূপতিনাথ)

(বৈ. প. ৮১৯ পৃ.)

সদুক্তিতে পাণিনি কবির একটি শ্লোক আছে। তাহাতে দেখি সখীরা মানবতী নায়িকাকে নায়কের অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য বলিতেছে।

'পাণৌ শোণতলে তনূদরি দরক্ষামা কপোলস্থলী
বিন্যস্তাঞ্জনদিগ্ধলোচন-জলৈঃ কিং ম্লানিমানীয়তে।
মুগ্ধে চুম্বতু নাম চঞ্চলতয়া ভৃংগঃ ক্বচিৎকন্দলী-
মুন্মীলন্নবমালতী-পরিমলঃ কিং তেন বিস্মর্য্যতে॥'

সদুক্তিক—২।৪৮।৫

—'হে ক্ষীণমধ্যা সুন্দরী, রক্তবর্ণ করতলে রক্ষিত তোমার ঈষৎকৃশগণ্ডস্থল অঞ্জনে মিশ্রিত নয়নজলে মলিন করিতেছ, কেন? হে মুগ্ধে, ভৃংগ চপলতাহেতু কখনো হয়ত কদলী পুষ্প চুম্বন করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহাতে কি প্রস্ফুট নব মালতীর সুগন্ধ বিস্মৃত হইতে পারে?'

বৈষ্ণবপদাবলীতেও দেখি সখীরা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে বলিতেছে।

অখিল-লোচন-তম তাপ বিমোচন
উদয়তি আনন্দকন্দে।
এক নলিন মুখ মলিন করয়ে যদি
ইথে লাগি নিন্দহ চান্দে—ইত্যাদি।

(পদকল্পতরু, ৪৮০)

নায়ক-নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তির (বাকোবাক্য) দ্বারা মান-প্রকাশের ও তজ্জন্য অনুনয়ের রীতি দেখা যায় সংস্কৃত-প্রাকত প্রকীর্ণ কবিতাগুলির মধ্যে। গাহাসত্তসঈর একটি কবিতায় পাই, নায়ক মানিনী নায়িকাকে অনুনয় করিতেছে।

পসিঅ পিএ কা কুবিআ সুঅণু তুমং পরঅণম্মি কো কোবো।
কো হু পরো ণাহ তুমং কীস অপুন্নাণ মে সত্তী ॥

গাহাসত্তসঈ ৪।৮৪

—(নায়ক) 'প্রিয়ে, প্রসন্ন হও', (নায়িকা) 'কে কুপিতা হইয়াছে', (নায়ক) 'সুতনু, তুমি কুপিতা হইয়াছ,' (নায়িকা) 'পরজনের প্রতি কোপ কিরূপে সম্ভব? (নায়ক)—'পর কে,? (নায়িকা)—'হে নাথ, তুমিই পর', (নায়ক)—'কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে? (নায়িকা)—আমার যেমন অপুণ্যের শক্তি।'

ইহার পরবর্তী রূপ পাই অমরুশতকের একটি শ্লোকে। পদটি সদুক্তিকর্ণামৃত (২।৪৪।১) ও সাহিত্য-দর্পণে ধৃত।

বালে নাথ বিমুঞ্চ মানিনি রুষং রোষান্ময়া কিং কৃতম্
খেদোঽস্মাসু ন মেঽপরাধ্যতি ভবান্ সর্বেঽপরাধা ময়ি।
তৎ কিং রোদিষি গদ্‌গদেন বচসা কস্যাগ্রতো রুদ্যতে
নন্বেতন্মম কা তবাস্মি দয়িতা নাস্মীত্যতো রুদ্যতে ॥ ৫০ ॥

সদুক্তিক ২।৪৪।১, সা. দ. ৩য় (৭৬)

—'হে বালা,' 'হে নাথ', 'মানিনী, ক্রোধ পরিত্যাগ কর' 'ক্রোধ করিয়া আমি কি করিয়াছি?' 'আমায় কষ্ট দিতেছ।' 'তোমার দোষ কিছুই না', সমস্ত অপরাধ আমারই', 'তাহা হইলে উচ্ছ্বসিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছ কেন?' 'কোথায় ক্রন্দন করিতেছি।' 'কেন আমার সমুখে,' 'আমি তোমার কে'? 'প্রিয়া'। 'প্রিয়া নহি, সেই জন্যই ত ক্রন্দন।'

সদুক্তিকর্ণামৃতের 'দেবপ্রবাহে' ভোজদেবের একটি কবিতায় শিব-পার্বতীর উক্তি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। হর কুপিতা পার্বতীর কোপ-শান্তির চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পার্বতীর উত্তরে শিব বাক্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন।

কস্মাৎ পার্বতি নিষ্ঠুরাসি সহজং শৈলোদ্‌ভবানামিদং
নিঃস্নেহাসি কুতো ন ভস্মপরুষঃ স্নেহং কচিন্নিন্দতি।

কোপস্তে ময়ি নিষ্ফলঃ প্রিয়তমে স্থাণৌ ফলং কিং ভবে-
দিত্থং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া শম্ভুঃ শিবায়াস্তু বঃ'।

সদুক্তিক—১।৭।১ (ভোজদেবস্য)

—'হে পার্বতী, তুমি এত নিষ্ঠুরা কেন?' ইহা তো পর্বত হইতে জাত ব্যক্তির পক্ষে অতি স্বাভাবিক।' 'আমার প্রতি স্নেহশূন্য হইয়াছ কেন?' 'ভস্মকঠোর ব্যক্তি কি স্নেহের (তৈলাদির) নিন্দা করেন?' 'প্রিয়তমে, আমার প্রতি তোমার কোপ নিষ্ফল।' 'স্থানুতে (কাঠের গুড়ি বা শিব) ইহার কোন ফল নাই,'—এইরূপে দয়িতা (পার্বতী) কর্তৃক বাক্যহারা শিব তোমাদের মঙ্গল করুন।

সদুক্তিকর্ণামৃতের আর একটি পদে দেখি কৃষ্ণ রাধার প্রশ্নের মুখের মত জবাব দিয়া রাধাকে বাক্যহীনা করিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণের দুর্ব্যবহারে রুষ্টা রাধা তাঁহাকে এইভাবে পরিহাস করিতেছেন।

বাসঃ সম্প্রতি কেশব ক ভবতো মুগ্ধেক্ষণে নন্বিদং
বাসং ব্রূহি শঠ প্রকামসুভগে ত্বদ্‌গাত্রসংশ্লেষতঃ।
যামিন্যামুষিতঃ ক ধূর্ত বিতনুর্মুষ্ণাতি কিং যামিনী
শৌরির্গোপবধূং ছলৈঃ পরিহসন্নেবংবিধৈঃ পাতু বঃ॥

সদুক্তিকর্ণামৃত ১।৫৬।৪

—'হে কেশব, এখন কোথায় তোমার বাস (অবস্থান)?' 'মুগ্ধেক্ষণে এই আমার বাস (বস্ত্র),' 'হে শঠ, বাসের (অবস্থানের) কথা বল'। 'হে প্রকাম-সুভগে, এ বাস (গন্ধ) তোমার গাত্রসংস্পর্শে জাত।' 'যামিনীতে কোথায় ছিলে?' 'যাহার তনু নাই এমন যামিনী কি চুরি করে?'—এইরূপে ছলে গোপবধূকে পরিহাস করিতেছিলেন যে কৃষ্ণ, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন।

পূর্বকালীয় কবিদের নিকট হইতে এই ধরণের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদ রচনার রীতি বৈষ্ণব কবিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরসূচক বহু পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা যায়।

ঘনশ্যামদাস কবিরাজের (নরহরি চক্রবর্তী) রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক একটি কবিতা আছে। রোষকষায়িতা রাধা জেরা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিপর্যস্ত করিতেছেন।

আজুক গমন কোন ধনী সেবি।
তুয়া বিনু আন নাহি অধিদেবী॥

এ হরি পুছিয়ে কোন নিবাস।
তোহারি পরশ বিনু নাহি অভিলাষ॥
পুছইতে এক কহসি পুন আন।
মান সঞে কিয়ে মতি করু দান॥
এ ধনি সো পুন তোহারি সমীপ।
অনুখন যৈছে অরুণ মণিদীপ॥
পশুপ স্বভাব রজনী কাঁহা দেল।
তোঁহারি পরশ লাগি গোকুলে ভেল॥
ঢীঠ বিভাবরী পুছিয়ে তোহে।
তহুঁ অরু তোঁহারি সঙ্গিনী যত হোয়ে॥
আজু তুয়া শুভখন কাঁহা গেলি।
তুহুঁ চিরজীবী আলি সঞে মেলি॥
শুনইতে কানুক ঐছন ভাষ।
সখী মুখ হেরি রাই মৃদু মৃদু হাস॥
তব ঘনশ্যাম দাস মহি লেখ।
অনুগত জন নাহি কবহুঁ উপেখ॥ বৈ. প. পৃ. ৭৯১

রাধা—আজি (কোথা হইতে) কোন্ ধনীর সেবা করিয়া আসিতেছ ?

কৃষ্ণ—তুমি ভিন্ন তো আমার অন্য কোন অধিদেবী নাই ?

রাধা—ওহে হরি, তোমার নিবাস জিজ্ঞাসা করিতেছি ?

কৃষ্ণ—(নিবাস ইচ্ছা অর্থে) তোমার স্পর্শ ভিন্ন তো অন্য অভিলাষ নাই।

রাধা—এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, অন্য উত্তর দিতেছ, সম্মানের সঙ্গে মতিও কি দান করিয়াছ ?

কৃষ্ণ—(মতি রত্ন অর্থে) সেতো তোমার নিকটেই অনুক্ষণ মণিদীপ জ্বলিতেছে।

রাধা—পশুপালকের স্বভাব, রজনী কোথায় দিলে (গত রাত্রিটা কাহাকে দান করিলে)

কৃষ্ণ—গোকুলে তোমার স্পর্শ লাগিয়া এইরূপ হইয়াছে।

রাধা—ধৃষ্ট, আমি বিভাবরীর কথা বলিতেছি।

কৃষ্ণ—(বিভাবরী সৌন্দর্য্যে,) লাবণ্যের ঔজ্জ্বল্য সে তো তুমি আর তোমার সখীগণই ঐ অভিধানের যোগ্যা।

রাধা—আজ তোমার শুভক্ষণ কোথায় গেল ?

কৃষ্ণ—তুমি আর তোমার সখীগণ মিলিয়া চিরজীবিনী হও। উহাই আমার শুভ সুযোগ।

কানুর এই সব কথা শুনিয়া রাই, সখীগণের মুখ চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ঘনশ্যাম দাস ভূমিতলে আঁচড় কাটিতে কাটিতে বলিলেন, অনুগত জনে কখনো উপেক্ষা করিও না।"

গোবর্ধনাচার্যের 'আর্য্যাসপ্তশতী'র একটি পদে দেখি, সখীরা অনুনয়কারী নায়কের উপর মান ত্যাগ করিতে নায়িকাকে উপদেশ দিতেছে।

'কোপাকৃষ্টভ্রূস্মর-শরাসনে সংবৃনু প্রিয়ে পততঃ।
ছিন্নজ্যামধুপানিব কজ্জলমলিনাশ্রুজলবিন্দূন্ ॥' ১৮৫।

—'হে সখী, তুমি কোপহেতু কামের শরাসনতুল্য ভ্রূযুগলকে আকুঞ্চিত করিয়াছ, জ্যামুক্তমধুকরের মত প্রিয়তমের উপর পতিত কজ্জল-মিশ্রিত অশ্রুবিন্দুকে সংবরণ কর।' 'অমরুশতকের' একটি শ্লোকে পাই (মানিনী) নায়িকাকে মান ত্যাগের জন্য নায়ক অনুনয় করিতেছে।

"কঠিনহৃদয়ে মুঞ্চ ভ্রান্তিং ব্যলীককথাশ্রয়াং
পিশুনবচনৈর্দুঃখং নেতুং ন যুক্তমিমং জনম্।
কিমিদমথবা সত্যং মুগ্ধে ত্বয়াদ্য বিনিশ্চিতং
যদভিরুচিতং তন্মে কৃত্বা প্রিয়ে সুখমাস্যতাম্ ॥"

(অমরুকস্য ৯৪)

—'কঠিনহৃদয়া, মিথ্যা করিয়া প্রচারিত আমার দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে ভ্রান্তি দূর কর, খলজনের কথায় এই লোককে (আমাকে) দুঃখ দেওয়া তোমার উচিত নয়। হে সরলে, তুমি কি সত্যই ইহা বিশ্বাস কর, অথবা, তাহা হইলে প্রিয়ে, আমার সম্বন্ধে তোমার যা অভিরুচি হয় তাই কর এবং তুমি সুখে থাক।'

ইহার সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর পদগুলি স্মরণ করা যাইতে পারে।

(মানিনী রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

বংশীবদন—

মানিনি করজোড়ে কহি পুন তোয়।
বিনি অপরাধে বাদ দেই ভামিনী
কাহে উপেখসি মোয় ॥

তুয়া লাগি সব নিশি জাগিয়া পোহাইলুঁ
একলি নিকুঞ্জক মাহ।
তোঁহারি বিয়োগে হাম বন মাহা লুঠলুঁ
তুঁহু রতিচিহ্ন কহ তাহা॥
গোকুল-মণ্ডলে কত যে কলাবতী
হাম নাহি পালটি নেহারি।
নিশি দিশি তুয়া গুণ ভাবিয়ে একমন
কি কহব কহই না পারি॥
কোপে কমলমুখি কছু নাহি শুনসি
তুয়া নিজ কিংকর হাম।
বংশীবদন অব কত সমুঝায়ব
কোপিনি কামিনী ঠাম॥ (বৈ. প. পৃ. ২৬০)

সদুক্তিতে উদ্ধৃত ডিম্বোক কবির একটি পদে নায়ক মানিনী নায়িকাকে মান ত্যাগের জন্য অনুনয় করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রিয়ে মৌনং মুঞ্চ শ্রুতিরমৃতধারাং পিবতু মে
দৃশাবুন্মীল্যেতাং ভবতু জগদিন্দীবরময়ম্।
প্রসীদ প্রেমাপি প্রশময়তু নিঃশেষমধ্বতী-
রভূমিঃ কোপানাং ননু নিরপরাধঃ পরিজনঃ॥

(সদুক্তিক: ২।৪৯।৩)

—প্রিয়ে, মৌনত্যাগ কর, আমার কর্ণ অমৃতধারা (তোমার বচন-সুধা) পান করুক। নয়ন দুইটি উন্মীলন কর, সমস্ত জগৎ নীলপদ্মময় হউক, প্রসন্ন হও, প্রেম (তোমার) সমস্ত বিরূপতা প্রশমিত করুক, তোমার এই সেবক (আমি) নিরপরাধ, (তোমার) কোপের যোগ্য নয়।

ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'র তৃতীয়াংকে দেখি রাম সীতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।"

—তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি আমার নয়নের কৌমুদী, তুমি আমার অঙ্গে অমৃত।"

কবি বৈষ্ণবকবি জয়দেবও শ্রীরাধার মান-ভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া অনুরূপ কথাই বলাইয়াছেন।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি-কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি-ঘোরম্।
স্ফুরদধর-সীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন-চকোরম্॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানম্॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি-যত্নম্॥ (বৈ. প. পৃ. ১৯)

—তুমি যদি একটু কথা কও, তাহা হইলে তোমার দশন-কৌমুদী অতি ভয়ানক (ক্রোধরূপ) অন্ধকার বিদূরিত করিবে। আমার নয়ন-চকোর তোমার মুখচন্দ্রমার প্রস্ফুরিত অধরসুধার জন্য তৃষিত হইয়া আছে। হে প্রিয়ে চারুশীলে, আমার প্রতি অকারণ মান পরিত্যাগ কর। কামানলে আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে, তোমার মুখকমলমধুর দ্বারা তাহা শান্ত কর। তুমি আমার ভূষণ, তুমি আমার জীবন, তুমি আমার সংসার-সাগরের রত্ন-স্বরূপ। অতএব তুমি আমার প্রতি সতত অনুরাগবতী থাক, ইহাই আমার হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

গাহাসত্তসঈর একটি কবিতায় আছে কোন প্রবীনা (সখী) নবীনা নায়িকাকে মান-ত্যাগের উপদেশ দিতেছে।

ণইউরসচ্ছহে জোব্বণম্মি অইপবসিএসু দিঅসেসু।
অণিঅত্তাসু অ রাঈসু পুত্তি কিং দড্ঢ-মাণেণ॥ গাহাসত্তসঈ ১।৪৫

—যৌবন নদীর জলোচ্ছ্বাসের মত ক্ষণস্থায়ী, দিনগুলিও চলিয়া যায় আর ফিরিয়া আসে না, এবং এই রাত্রিগুলিও আর ফিরিয়া আসে না, এই অবস্থায়, হে পুত্রী, পোড়া মানের দ্বারা কি ফল?

ইহার সহিত জ্ঞানদাসের একটি পদের তুলনা করিতে পারি। সখী মানিনী রাধাকে বলিতেছে—

জ্ঞানদাস— চিরদিন না রহে কুসুমে মকরন্দ।
পহরে না পাইয়ে দুতিয়াক চন্দ ॥
অহনিশি না রহে চন্দনরেহ।
ঐছন জানিয়ে যৌবন এহ ॥ (বৈ. প পৃ. ৪৩:)

তুঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ—

নারীর যৌবনধন, যারে কৃষ্ণ করে মন
সে যৌবন দিন দুই চারি।

(চৈঃ চঃ ২।২)

দম্পতী (নায়ক-নায়িকা) উভয়েই প্রণয়-কলহের জন্য মান করিয়া বসিয়া আছে। সখী উভয়ের প্রণয়রোষভংগের জন্য চেষ্টা করিতেছে। পদটি গাহাসত্তসঈতে পাই—

জীবিঅং অসাসঅং বিঅ ণ নিঅত্তই জোব্বণং অইক্কন্তং।
দিঅহা দিঅহেহিঁ সমা ণ হোন্তি কিং ণিট্ঠুরো লোও।

গাহাসত্তসঈ ৩।৬৭

—'মানুষের জীবন অচিরস্থায়ী, যৌবন একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না, এক অবস্থার (দিনগুলি অন্য অবস্থার) সমান নহে, তথাপি প্রেমানুভবে লোকে কেন যে নিষ্ঠুর হয় বলা যায় না।

'প্রাকৃত-পৈংগলের' একটি পদে দেখি ঈর্ষ্যাকাষিত নায়িকাকে সখী নায়কের হইয়া মান ত্যাগের জন্য অনুরোধ করিতেছে।

পরিহর মাণিণি মানং পেক্‌খহি কুসুমাই নীবস্স।
তুম্‌হ কএ খরহিঅও গেণ্‌হই গুডিআধণুং অ কির কামো ॥

প্রা. পৈ. ॥ ৬৭ ॥

—'হে মানিনি, মান ত্যাগ কর, কদম্বফুল ফুটিয়াছে দেখ, তোমার জন্য কঠিন হৃদয় কামদেব গুটিকাধনু (গুল্‌তী) ধারণ করিয়াছে।'

'প্রাকৃত-পৈঙ্গলের' আর একটি পদে দেখি বসন্তের সমাগমে সখী নায়িকাকে ঈর্ষামান ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছে।

সহি ফুল্ল কেসু অসোঅ চম্পঅ মঞ্জুলা
সহআর গন্ধলুদ্ধউ ভম্মরা।
বহ দক্‌খ দক্‌খিণ বাউ মানহ ভংজণা
মহুমাস আবিঅ লোঅলোঅণরংজণা ॥" প্রা. পৈ. ১৬৩

—হে সখি, কিংশুক, অশোক, চম্পক এবং মঞ্জুল বেতস ফুল ফুটিয়াছে, ভ্রমরকুল আম্রমুকুলের গন্ধে লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কামিনীদের মান-ভঞ্জনকারী চতুর দক্ষিণ পবন বহিতেছে, লোকলোচন-মুগ্ধকারী মধুমাস (বসন্ত) আসিয়া পড়িয়াছে।

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তুলনা করিতে পারি।

বনে এমন ফুল ফুটেছে
মান করে থাকা আজ কি সাজে।
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জমাঝে॥

ইহার সহিত বৈষ্ণব কবি রাধাবল্লভদাসের একটি পদের তুলনা করা যায়ঃ

ইহ মধুযামিনী ধনি ভেলি মানিনী
না হেরই নাহ বয়ান।
ইহ সুখসময় সবহুঁ বন ফুলময়
বিফল ভেল পাঁচবাণ॥
এ সখি অবহুঁ কি করব উপায়।
এ সুবদনি ধনি ও রসশিরোমণি
ভাগ্যে হোয়ত এক ঠায়॥
এত কহি সহচরি নাগর মুখ হেরি
ইঙ্গিত কয়ল নয়ানে।
বুঝি বরনাহ বাহু ধরি সাধয়ে
ঝটকই মানিনি মানে॥
করযোড়ি কানু চরণ ধরি সাধয়ে
কণ্ঠহি দেই পীতবাস।
সহচরিগণ তব রাই বুঝায়ত
কহ রাধাবল্লভ দাস॥ (বৈ. প. পৃ. ৭৮১)

গাহা-সত্তসঈর একটি গীতিকায় আছে কুপিতা নায়িকার দয়িতের প্রতি গৃহীত প্রণয়মান আপনা আপনিই শিথিল হইয়া যাইতেছে। নায়িকার সখী নায়ককে বলিতেছে।

দিঢ়মণ্ণুদূণিআএ বি গহিও দইঅম্মি পেচ্ছহ ইমাএ।
ওসরই বালুআমুট্ঠি উব্ব মাণো সুরসুরন্তো॥ গাহাসত্তসঈ ১।৭৪

—'দেখ, অত্যন্ত কোপবশত ব্যথিত হইয়া দয়িতের প্রতি সেই নায়িকা যে প্রণয়মান করিয়াছিল, সেই মান (দয়িতকে দেখিয়া) বালুকামুষ্টির মত ঝুর ঝুর করিয়া অপসৃত হইতেছে'।

গাহাসত্তসঈর আর একটি পদে দেখি কৃতাপরাধ নায়কের অনুনয় গ্রহণের জন্য সখী মানখিন্না নায়িকাকে (মানত্যাগ করিতে) বলিতেছে।

জং জং পিহুলং অংগং তং তং জাঅং কিশোঅরি কিসংতি।
জং জং তনুঅং তং তং পি ণিট্ঠিঅং কিংথ মাণেণ॥

গাহাসত্তাসঈ ৪।৯

—'হে কৃশোদরী, (তোমার শরীরের) যে যে অংশ স্থূল, সেই সেই অংশ কৃশ হইয়া গিয়াছে, আর যে যে অংগ (স্বভাবত) কৃশ (ক্ষীণ) সেই সেই অংগ কৃশতার শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থায় মানে কি ফল লাভ হইবে।'

তুঃ বিদ্যাপতি—

'জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তবে যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ-প্রেম কবহু জানি ছাড়ি।
দিনে দিনে চান্দ কলা সম বাড়ি॥
তুহুঁ যৈছে রসবতি কানু রস-কন্দ।
বড় পুণ্যে রসবতি মিলে রসবন্ত॥

—পদকল্পতরু ৬:, বৈ. প. পৃ. ৮৩

তুঃ রবীন্দ্রনাথ—

তব সখি যমুনে যাই নিকুঞ্জে
কাহে তয়াভাব দে
হমারি লাগি এ বৃন্দাবনমে
কহ সখি রোয়ব কে
ভানু কহে চুপি মান ভরে রহ
আও বনে ব্রজনারী
মিলবে শ্যামক থরথর আদর
ঝর ঝর লোচন বারি।

—ভানুসিংহের পদাবলী

উপরি-উক্ত সংস্কৃত-প্রাকৃত কবিতাগুলি পড়িলে পরোক্ষভাবে বহু বৈষ্ণব কবিতা মনে পড়ে, হয়তো সাক্ষাৎভাবে এইগুলি বৈষ্ণব কবিতার সহিত যুক্ত নাও হইতে পারে। এই সব কবিতার সহিত বৈষ্ণব কবিতার সাজাত্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

প্রাচীন সংস্কৃত-প্রাকৃত কবিতায় পাই মান-ভঞ্জনের জন্য নায়ক মানবর্তী নায়িকার পদধারণ করিতেছে। শ্রীরাধার মানভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মানিনী রাধার পদধারণ করিতেছেন—এই ধরণের বহু পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা যায়। বৈষ্ণব কবিগণ পূর্বতন কবিদের প্রেম-কবিতার রীতি অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া শ্রীরাধার পদ-ধারণ করাইয়াছেন।

গাহাসত্তসঈর একটি কবিতায় পাই, নায়ক মানিনী নায়িকার চরণে পতিত হওয়ায় মানের বিনাশ হইয়াছে। নায়িকার সখী সে কথা নায়ককে জানাইতেছে।

> ণেউর-কোডি-বিলগ্গং চিউরং দইঅস্স পাঅ-পডিঅস্স।
> হিঅঅং পউত্থমাণং উম্মোঅন্তি ব্বিঅ কহেহি॥' গাহাসত্তসঈ ২।৮৮

—"(নায়িকার) নূপুরের অগ্রভাগে সংলগ্ন (মানভঞ্জনের জন্য) পাদ-পতিত প্রিয়জনের কেশ উন্মোচন করিয়াই, (সেই নায়িকা) নিজের হৃদয় যে মানমুক্ত হইয়াছে তাহাই সূচিত করিতেছে।"

তুঃ বল্লভদাস—

> "করযোড়ি কানু চরণ ধরি সাধয়ে
> কণ্ঠহি দেই পীতবাস।"

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা-বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিগণ মান-ভঞ্জনের জন্য এই রীতিই গ্রহণ করিয়াছেন।

অমরুশতকের একটি পদে পাই নায়ক মানভঞ্জনের জন্য নায়িকার পদতলে পতিত হইয়াছে। পদটি 'সদুক্তিতেও' উদ্ধৃত।

> সুতনু জহিহি মৌনং পশ্য পাদানতং মাং
> ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবংবিধোঽভূৎ।
> ইতি নিগদতি নাথে তির্য্যগামীলিতাক্ষ্যা
> নয়নজলমনল্পং মুক্তমুক্তং ন কিঞ্চিৎ॥ ৩৪॥ সদুক্তি ২।৫০।৫

—'হে সুতনু, তোমার মৌন ত্যাগ কর, পাদানত আমার দিকে চাহিয়া দেখ, তোমার ত কোনদিন এইরকম কোপ ছিল না। নাথ এই কথা বলিলে

তির্য্যক্‌ভাবে ঈষৎ আমীলিতাক্ষী প্রচুর অশ্রুমোচন করিল, কিছুই বলিতে পারিল না।'

'প্রাকৃত-পৈঙ্গলের' একটি পদেও দেখা যায় নায়িকার মান-ভঞ্জনের জন্য নায়ক পাদ-পতিত হইতেছে। পদটি অবহট্‌ঠে লেখা।

"মাণিণি মাণহিঁ কাইঁ ফল, এও জে চরণ পড়ু কন্ত।
সহজে ভুঅঙ্গম জই ণমই, কিং করিএ মণি-মন্ত॥" ৬॥

—'হে মানিনি, যদি (তোমার) প্রিয়তম পায়ের উপর পড়িয়াছে তবে আর মান করিয়া কি লাভ? যদি ভুজঙ্গম (সাপ বা কামী ব্যক্তি) সহজেই শান্ত (বশীভূত) হয় তবে মণি তথা মন্ত্রের দ্বারা কি হইবে?'

তুঃ চন্দ্রশেখর—

"পায়ে পড়ল হরি পায়ে পড়ল হরি
পায়ে পড়ল হরি তোর।
সবে মিলি ঐছন বোলসি পুনপুন
কোই না বুঝিলি দুখ মোর॥"

বৈ. প. পৃ. ১০১৬

সত্তসঈর কোন নায়িকাকে সখী মান ত্যাগে উপদেশ দিতেছে।

পাঅ-পড়িঅং অহব্বে কিং দাণিং ণ উট্‌ঠবেসি ভত্তারং।
এঅং বিঅ অবসাণং দূরং পি গঅসস্ পেম্মস্‌স॥"

গাহাসত্তসঈ ৪।৯০

—'হে অনুচিতব্যবহারকারিণি, এখন পর্যন্ত তুমি পাদপতিত প্রিয় ভর্তাকে উঠাইতেছে না কেন? অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেমেরও ইহাই চরম সীমা।'

অমরুশতকের আর একটি শ্লোকে আছে নায়ক মানভঞ্জনের জন্য নায়িকার পায়ে ধরিতেছে। পদটি সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত দেখা যায়।

দূরাদুৎসুকমাগতে বিবলিতং সংভাষিণি স্ফারিতং
সংশ্লিষ্যত্যরুণং গৃহীতবসনে কোপাঞ্চিতভ্রূলতম্।
মানিন্যাশ্চরণানতি-ব্যতিকরে বাষ্পাম্বুপূর্ণং ক্ষণাচ্
চক্ষুর্জাতমহো প্রপঞ্চচতুরং জাতাগসি প্রেয়সি॥' ৪৫।

সদুক্তি ২।৫০।৪

—'প্রিয়তম অপরাধ করায় তাহার চক্ষু দুইটি নানারকম রূপ ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে—যখন সে (তাহার প্রিয়তম) বহুদূরে (আসিতেছে)

তখন ইহারা উৎসুক হয়, যখন সে কাছে আসে, তখন ইহারা অন্যদিকে বিবর্তিত হয়, সে কথা বলিলে ইহারা বিস্ফারিত হয়, সে আলিঙ্গন করিলে ইহারা রক্তবর্ণ ধারণ করে, বসন ধরিলে ইহারা ভ্রূ কুঞ্চিত করে, যখন সে কোপ শান্তির জন্য তাহার চরণে পতিত হয় তখন ইহারা বাষ্পজলে পূর্ণ হইয়া উঠে।[১]

এইগুলির সহিত বৈষ্ণব কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদগুলির তুলনা করিতে পারি।

"স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং সরসলসদলক্তকরাগম্॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনানলো হরতু তদুপাহিতবিকারম্॥
ইতি চটুলচাটুপটুচারু মুরবৈরিণো রাধিকামধি বচনজাতম্।
জয়তি পদ্মাবতীরমণ-জয়দেব-কবিভারতী-ভণিতমতিশাতম্॥"

(বৈ. প. পৃ ২০)

—মধুরভাষিণি, তুমি আদেশ দাও, আমার হৃদয়ের শোভাবর্ধক, স্থলকমলের শোভাহারী, রতিরঙ্গে পরম রমনীয় ঐ চরণকমল সরস অলক্তকরাগে রঞ্জিত করি। হে প্রিয়ে! কামবিষবিনাশক, আমার শিরোভূষণ তোমার ঐ পরমসুন্দর পদপল্লব এই মস্তকে স্থাপন কর, আমার অন্তর দারুণ মদনানলে জ্বলিতেছে। তোমার চরণস্পর্শ সে বিকার বিদূরিত করুক। রাধিকার প্রতি প্রযুক্ত মুরারির সুন্দর অনুরাগবাক্য-সম্বলিত পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবির এই আনন্দপ্রদ সঙ্গীত জয়যুক্ত হউক।

॥ কলহান্তরিতা ॥

দুর্জয় মানে অন্ধ হইয়া নায়িকা যখন অনুকূল নায়ককে প্রত্যাখান করে এবং পশ্চাত্তাপ ভোগ করে তখন তদবস্থ নায়িকাকে 'কলহান্তরিতা' বলে। বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে লিখিয়াছেন—

"চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা।
পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা॥"

সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩।৯১)

---

১ তুলনীয় কালিদাস—"অদ্যপ্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ।"
—কুমারসম্ভবম্।

—যে নায়িকা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রিয়ভাষী নায়ককে পরিত্যাগ করিয়া পরে অনুতপ্ত হয়, সে হইল 'কলহান্তরিতা।' বিশ্বনাথ তাঁহার পিতার লেখা একটি কবিতা 'কলহান্তরিতা' নায়িকার উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নো চাটুশ্রবণং কৃতং ন চ দৃশা হারোঽন্তিকে বীক্ষিতঃ
কান্তস্য প্রিয়হেতবো নিজ-সখী-বাচোঽপি দূরীকৃতাঃ।
পাদান্তে বিনিপত্য তৎক্ষণমসৌ গচ্ছন্ ময়া মূঢ়য়া
পাণিভ্যামবরুধ্য হন্ত সহসা কণ্ঠে কথং নার্পিতঃ॥ সা. দ. (৩।৯১)

'—তাহার অনুনয়-বিনয় শুনি নাই। নিকটে আনীত হার প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। তাহার হইয়া সখীদের অনুরোধও উপেক্ষা করিয়াছি, এমন কি চরণে পতিত হইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে আমি আমার হাত দুইটি তাহার কণ্ঠে স্থাপন করিয়া কেন তাহাকে নিবারণ করি নাই, হায় (আমি বড় মন্দভাগিনী)।'

ভারতীয় সাহিত্যে 'কলহান্তরিতা' নায়িকার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 'সদুক্তিকর্ণামৃতের' শৃঙ্গার-প্রবাহ-বীচিতে এ সম্বন্ধে পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে বৈষ্ণব কবিদের বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয় প্রেম-কবিতায় 'কলহান্তরিতার' কথা মিলিতেছে। বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার কলহান্তরিতা অবস্থার বর্ণনায় পূর্বকালীয় কাব্যরীতি অনুসরণ করিয়াছেন।

রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলায় কলহান্তরিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়া রূপ গোস্বামী পূর্বতন অলংকারশাস্ত্রের সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছেন।

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।
অস্যাঃ প্রলাপ-সন্তাপ-গ্লানি-নিঃশসিতাদয়ঃ॥

উজ্জ্বলনীলমণি নায়িকাভেদপ্রঃ (৫।৮৭)

—'যে নায়িকা সখীদের সামনে পাদপতিত প্রিয়তমকে ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করে, তাহাকে কলহান্তরিতা বলে। ইহার চেষ্টা প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘনিঃশ্বাস-ত্যাগাদি।'

বৈষ্ণব কবিগণ রূপগোস্বামীর প্রদর্শিত পথেই শ্রীরাধার কলহান্তরিতা অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

নায়িকার 'কলহান্তরিতা' অবস্থায় নায়কের সহিত মিলন সম্ভব নয় বলিয়া এই ভাবটি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মধ্যে পড়ে এবং বিরহের নানাবিধ চেষ্টাই ইহাতে দেখা যায়।

'গাহাসত্তসঈর নায়িকা অতিদুঃখের সহিত বলিতেছে 'আমার নিজের দোষেই এই কষ্ট ভোগ করিতেছি।'

"অব্বো অণুণঅ-সুহ-কঙ্খিরীঅ অকঅং কঅং কুণন্তীএ।
সরলসহাবো বি পিও অবিণঅমগ্গং বলন্নীও॥" গাহাসত্তসঈ ৪।৬

—'হায়! কি কষ্ট, দয়িতের নিকট হইতে অনুনয় সুখ আশা করিয়া আমি তাহার দ্বারা (প্রিয়ের দ্বারা) অকৃত অপরাধও কৃত বলিয়া ধার্য্য করিয়া সরলস্বভাব প্রিয়কেও জোর করিয়া অবিনয়মার্গে লইয়া গিয়াছি।'

ইহার সহিত গোবিন্দদাসের একটি পদের তুলানা করিতে পারি।

আকুল প্রেম পহিল নহি জানলু
সো বহু বল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জ্বলত পরাণ॥

—(গোবিদন্দদাস) পদকল্পতরু, ৪৩৩

আবার, গোবিন্দদাস—

রোষে দোখলুঁ পিয়া বিনি অপরাধে।
না জানিয়ে এত কি পড়ব পরমাদে॥ পদকল্পতরু ৪৬৯

গাহাসত্তসঈর আর একটি পদে দেখি নায়ক কলহান্তরিতা স্বপ্রিয়ার কথা সখার নিকট বলিয়া চিত্ত-বিনোদন করিতেছে।

আঅম্বন্ত-কবোলং খলিঅকৃখর-জম্পিরিং ফুরন্তট্ঠিং।
মা ছিবসু ত্তি সরোসং সমোসরন্তিং পিঅং ভরিমো॥'

গাহা ২।৯২

—'ঈষৎরক্তবর্ণকপোলবিশিষ্টা, স্খলিতাক্ষরে জল্পনকারিণী স্ফুরিতাধরা এবং 'আমাকে স্পর্শ করিও না' বলিয়া রোষসহকারে অপসরণকারিণী (আমার) প্রিয়াকে (আমি স্মরণ করিতেছি।'

এই ভাবের পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে বহুলভাবে লক্ষ্য করি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কলহ করিয়া প্রণয়কুপিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে এই ভাবেই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন দেখা যায়।

আরে মোর আরে মোর সোনার বন্ধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দুর॥
বদনকমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।
পায়ের নখের ঘায় হিয়া বিদারিত॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥

—চণ্ডীদাস (পদকল্পতরু ৩৯১, বৈ. প. পৃ ৫২)

গাহাসত্তসঈর একটি পদে দেখি সখীরা কলহকারিণী নায়িকাকে বলিতেছে। (নায়িকা দুর্জয়মানহেতু নায়ককে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাত্তাপ ভোগ করিতেছে।)

'পাওপডিও ণ গণিও পিঅং ভণন্তো বি অপ্পিঅং ভণিও।
বচ্চন্তো বি ণ রুদ্ধো ভণ কস্স কএ কও মাণো।' গাহাসত্তসঈ ৫।৩২

—'প্রিয়তম পাদপতিত হইলে তুমি তাহাকে গ্রাহ্য কর নাই, সে (প্রিয়তম) প্রিয় কথা বলিলেও তুমি অপ্রিয় কথা শুনাইয়াছ, সে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেও তাহাকে রোধ কর নাই, বল ত কাহার জন্য তুমি মান করিয়াছিলে।'

অমরুশতকেও ঠিক এই ভাবের একটি পদ পাওয়া যায়। পদটি 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সখীরা কলহান্তরিতা নায়িকাকে বলিতেছে।

"কর্ণে যন্ন কৃতং সখীজনবচো যন্নাদৃতা বন্ধুবাক্
যৎপাদে নিপতন্নপি প্রিয়তমঃ কর্ণোৎপলেনাহতঃ।
তেনেন্দুর্দহনায়তে মলজালেপঃ স্ফুলিঙ্গায়তে
রাত্রিঃ কল্পশতায়তে বিসলতাহারোঽপি ভারায়তে॥"

—সদুক্তিকঃ ২।৪০।১

—"দুর্জয় মানহেতু সখীদের কথা কানে তুলিলে না, বন্ধুজনের কথা অগ্রাহ্য করিলে, প্রিয়তম পদে পতিত হইলেও কর্ণোৎপলের দ্বারা তাহাকে আহত করিলে; সেই জন্যই এখন চন্দ্র দগ্ধ করিতেছে, চন্দনের প্রলেপ স্ফুলিঙ্গের মত মনে হইতেছে, রাত্রি শতযুগের মত মনে হইতেছে এবং মৃণালহারও ভারী বোধ হইতেছে।"

ইহার সহিত বৈষ্ণব পদগুলির তুলনা করিলে সহজেই উভয়ের সাদৃশ্য ধরা যায়। চন্দ্রশেখরের পদে আছে শ্রীরাধার মান-ভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ পদতলে পড়িয়াছেন কিন্তু মানে অন্ধ রাধা তাহাকে প্রত্যাখান করিয়া পশ্চাত্তাপ ভোগ করিতেছেন, সেইজন্য সখীরা অনুযোগ করিতেছে—

"কাহে তুহুঁ কলহ করি কান্ত সুখ তেজলি
অবশি বসি রোয়সি কি রাধে।
মেরু-সম মান করি উলটি ফিরি বৈঠলি
নাহ যব চরণ ধরি সাধে॥
তবহুঁ উহে নাগরি ভর্ত্সন করি তেজলি
মান বহু রতন করি গণলা।
অবহুঁ তুঁহুঁ ধরম পথ কাহিনি উগারসি
রোখে হরি বিমুখ ভই চললা॥
কাতরে তুয় চরণ-যুগ বেড়ি ভুজ-পল্লবে
নাহ নিজ শপতি বহু দেল।
নিপট কুটি-নাটি কটু কঠিনি বজরা-বুকি
কৈছে জিউ ধরলি কর ঠেল॥
অবহিঁ সব সহিনি তব নিকট নহি বৈঠব
করলি যদি এ হেন অবিচার।
চন্দ্রশেখরে কহে এ ধনি তুহুঁ অবোধিনি
করব অব কোন পরকার॥"

(বৈ. প পৃ. ১০১৬)

শশি-শেখরের পদেও অনুরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পদটির প্রশ্নের ভাষা (অর্থাৎ কৃষ্ণের অনুনয়-সূচক বাক্য) সংস্কৃত আর উত্তরের ভাষা (রাধার ভাষা) ব্রজবুলি-বাঙ্গালা, অর্থাৎ প্রাকৃত। এটিকে ভাষামিশ্র বলা যায়।

রাধে জয় রাজপুত্রি
মম জীবন-দয়িতে।
যাও যাও বঁধু যত বড় তুমি
জানা গেল তুয়া চরিতে।
কিঞ্চিদপি কম্মিরূপ-
রাধং নহি করোমি।

সঙ্কেত করি আন ঘরে যাহ
নিশি জাগিয়ে আমি ॥
মানং ময়ি মুঞ্চ প্রিয়ে
বচনং শৃণু ধীরে।
শুনিবার কিবা কাজ চিহ্ন
দেখা যায় সব শরীরে ॥
গতরাত্রৌ যদভূন্মম
দুঃখং শৃণু সরলে।
বধিরা হাম কিয়ে শুনায়সি
তাহে শুনায়বি বিরলে ॥
উচিতো নহি কোপো ময়ি
নিজ-কিংকরে মন্তে।
যাও যাও যত গুণনিধি বট
জানা গেল তব তত্ত্বে ॥
শাস্তিং কুরু দন্তৈর্দশ
কোপং ত্যজ রুচিরে।
তথা ফিরি যাহ পুন দংশিবে
সুখ পাবে বহু অচিরে ॥
কোপং ত্যজ পদমর্পয়
মৃদু কিশলয়শয়নে।
তোমা দরশনে শরীর জ্বলিছে
ফিরি যাহ তার সদনে ॥
কথিতং যদি নহি দাস্যসি
কিং তে কথয়ামি।
শশিশেখর কহে শুভঙ্কর
কিয়ে দেখহ স্বামি ॥" (বৈ. প. পৃ. ১০২৬)

গাহাসত্তসঈর একটি গীতিকায় দেখা যায়, সখী নায়ককে অনুরোধ করিবার জন্য কলহান্তরিতা নায়িকাকে উপদেশ দিতেছে।

জেণ বিণা ণ জিবিজ্জই অণুণিজ্জই সো কআবরাহো বি।
পত্তেবি ণঅর-দাহে ভণ কস্স ণ বল্লহো অগগী ॥ গাহাসত্তসঈ ২।৬৩

—"যাহাকে ছাড়া প্রাণ ধারণ করা যায় না, অপরাধ করিলেও তাহাকে অনুনয় করা উচিত। বলত, (অগ্নির দ্বারা) নগরদাহ সংঘটিত হইলেও অগ্নি কাহার না প্রিয়।"

গাহাসত্তঈর আর একটি পদে দেখি সখীরা কোপ-কলুষিতা নায়িকাকে খেদ করিতে নিষেধ করিতেছে।

কিং রুঅসি কিং অ সোঅসি কিং কুপ্পসি সুঅণু এক্কমেক্কস্স।

পেম্মং বিসং ব বিসমং সাহসু কো রুন্ধিউং তরই॥ গাহাসত্তসঈ ৬।১৬

—"হে সুতনু, কেন তুমি রোদন কর, কেনই বা শোক কর, আর কেনই বা প্রত্যেক লোকের প্রতি কোপ প্রকাশ কর, বলত, বিষের মত বিষম প্রেমকে কেই বা রোধ করিতে পারে।"

তুঃ—(মান) কয়লি তো কয়লি কলহে কাহে রোয়সি
বৈঠি বিরম তুহুঁ ভবনে।

সো কাঁহা যায়ব আপহিঁ আয়ব
পুনহি লোটায়ব চরণে॥ (চন্দ্রশেখর) বৈ. প. ১০১৭

অমরুর একটি পদে আছে, সখীরা কৃতমানা অথচ অনুতপ্ত নায়িকাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। পদটি সদুক্তিকর্ণামৃত ও কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পার্থিব প্রেমের কবিতাটিকে রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পদ্যাবলীতে কলহান্তরিতা রাধার প্রতি দক্ষিণ সখীর বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

এখানে দেখি পার্থিব প্রেমগীতি ও বৈষ্ণব প্রেমগীতির মিশ্রণ হইয়াছে।

"অনালোচ্য প্রেম্ণঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ-
স্ত্বয়াকাণ্ডে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ।
সমাকৃষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্ভাসুরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ॥"

সদুক্তিক ২।৪২।১, পদ্যাবলী—২৩০

—'হে মুগ্ধে, প্রেমের পরিণতি আলোচনা না করিয়া বন্ধুগণের কথা অনাদর করিয়া প্রিয়কান্তের উপরে মান করিয়াছিলে, তুমি নিজের হাতে বিরহাগ্নিতে উদ্দীপ্ত-শিখা অঙ্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছ এখন অরণ্য-রোদন করিয়া কি ফল হইবে।"

গোবিন্দদাস উক্ত কবিতাটির ভাব-বিস্তার করিয়া একটি পদ লিখিয়াছেন। পদটি একবার অন্যত্র উদ্ধৃত করিয়াছি।

শুনইতে কানু মুরলি রব মাধুরী
শ্রবণে নিবারলু তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন যুগ ঝাপলুঁ
তব মোহে রোখলি ভোর॥ ইত্যাদি

(বৈ. প. পৃ. ৬২৫, পদকল্পতরু—৪৩৫)

বহু বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে দেখিতে পাই, মানে অন্ধ হইয়া শ্রীরাধা পদানত শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং পরে সখীদের নিকট অনুশোচনা প্রকাশ করিতেছে। এই ভাবটি আমরা পূর্ব-কালীয় প্রেম-কবিতার ভিতরেও লক্ষ্য করি।

অমরুশতকের একটি পদে দেখি, অভিমানিনী নায়িকা সখীদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। পদটি সদুক্তিতে উদ্ধৃত।

সখি স সুভগো মন্দস্নেহো ময়ীতি ন মে ব্যথা
বিধিবিরচিতং যস্মাৎ সর্বো জনঃ সুখমশ্নুতে।
মম তু মনসঃ সন্তাপোঽয়ং জনে বিমুখেঽপি যৎ
কথমপি হতব্রীড়ং চেতো ন যাতি বিরাগিতাম্॥ সদুক্তিক ২।৪১।১

—সখি, সেই সুভগ আমার প্রতি মন্দস্নেহ হইয়াছে বলিয়া আমার কোন বেদনা নাই, সকল লোকেই ভাগ্যনির্দিষ্ট সুখভোগ করিয়া থাকে। আমার মনে কেবল এইটাই দুঃখ যে সেইজন (আমার প্রিয়) বিধুখ হইলেও আমার এই নির্লজ্জ হৃদয় তাহার প্রতি বিরাগ প্রাপ্ত হয় নাই।

সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত অমরু কবির একটি পদে দেখি নায়িকা কলহ করিয়া (মান করিয়া) দারুণ মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছে।

"নিঃশ্বাসা বদনং দহন্তি হৃদয়ং নির্মূলমুন্মূল্যতে
নিদ্রা নৈতি ন দৃশ্যতে প্রিয়মুখং নক্তংদিবং রুদ্যতে।
অঙ্গং শোষমুপৈতি পাদপতিতঃ প্রেয়াস্ত সংভাব্যতে
সখ্যঃ কং গুণমাকলয্য দয়িতে মানং বয়ং কারিতাঃ॥

সদুক্তিক ২।৪১।২

—'নিঃশ্বাস আমার বদন দগ্ধ করিতেছে, আমার হৃদয় মূলের সহিত উৎপাটিত হইতেছে, নিদ্রা আসে না, প্রিয়ের মুখ দেখিতে পাই না, দিনরাত্রি

শুধু কাঁদিতেছি, আমার অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, পাদপতিত প্রিয়কে উপেক্ষা করিয়াছি, সখীরা আমাতে কি গুণ দেখিয়া প্রিয়তমের প্রতি মান করাইয়াছিল।'

এই কবিতাটিকে রূপ গোস্বামী রাধাপ্রেমের কবিতা বলিয়া পদ্যাবলীতে গ্রহণ করিয়াছেন। 'ক্ষুভিত-রাধিকোক্তি' বা 'কলহান্তরিতা' রাধার উক্তি বলিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ভাবের বহু সাধারণ প্রেম-কবিতাকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার গীতিকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অমরুর প্রেম-কবিতার প্রসিদ্ধি অনেকেই স্বীকার করেন। আনন্দবর্ধনের 'ধন্যালোকে' অমরুর কয়েকটি প্রেম-কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন—"অমরু হইতে উদ্ধৃত এই কবিতাগুলি দেখিলে বোঝা যায়, প্রেমের তীব্রতা এবং সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্য প্রকাশে এই জাতীয় প্রেমের কবিতাই পরবর্তীকালের রাধা-প্রেম-কবিতার শুধু প্রাগ্‌রূপ নয়, অনেক স্থলে আদর্শরূপ।"

সদুক্তিতে অমরুর একটি পদ আছে, এখানে কবি প্রেমের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। কুপিতা নায়িকা বলিতেছে—

দহতি বিরহেঽঙ্গানীর্ষ্যাং করোতি সমাগমে
হরতি হৃদয়ং দৃষ্টঃ পৃষ্টঃ করোত্যবশাং তনুম্॥
ক্ষণমপি সুখং যস্মিন্ প্রাপ্তে গতে চ ন লভ্যতে
কিমপরমতশ্চিত্রং যন্মে তথাপি স বল্লভঃ॥ (সদুক্তিক ২।৪০।৫)

—আমার প্রিয় বিরহে অঙ্গ দগ্ধ করে, মিলনেও ঈর্ষ্যা উৎপাদন করে, দর্শনের দ্বারা হৃদয় হরণ করে, (শরীর) স্পর্শ করিয়া তনুকে অবশ করিয়া দেয়, এবং সে আসিলে বা চলিয়া গেলে ক্ষণমাত্রও সুখভোগ করিতে পারি না, ইহার অধিক কি আর আশ্চর্য্য হইতে পারে? তথাপি সে আমার প্রাণ-বল্লভ।"

তুঃ—শ্রীচৈতন্যদেবস্য—

"যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।" (শিক্ষাষ্টক ১০)

গাহাসত্তসঈর একটি কবিতায় আছে কোপকলুষ নায়ককে অনুনয় করিবার জন্য কলহান্তরিতা তাহার দূতীকে বলিতেছে। এখানে নায়িকা কর্তৃক দূতী-মুখে নায়ককে অনুনয় করার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

দুই তুমং বিঅ কুসলা ককৃখড-মউআই জানসে বোল্লুং।
কণ্ডূইঅ-পণ্ডুর জহ ণ হোই তহ তং করেজ্জাস্থ॥ গাহা ২।৮১

—"দূতী, তুমি বড়ই কুশলা, কি প্রকারে কর্কশ ও মধুর বাক্য বলিতে হয় তাহা তুমি জান। কিন্তু দেখিও যেন তাহাকে (আমার দয়িতকে) কণ্ডূরিত অথচ পাণ্ডুরবর্ণ (কণ্ডূর মত) করিয়া না তোল।"

তুঃ বাঙ্গালী বিদ্যাপতি—

"হরি বর গরবী গোপমাঝে বসই।
ঐসে করবি জৈসে বৈরি ন হসই॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।
আজ বুঝব সখি তুআ চতুরাই॥" বৈ. প. পৃ. ১০৯

বৈষ্ণব পদেও দেখা যায় রাধার দুর্জয় মানে খিন্ন হইয়া কৃষ্ণ আর রাধার নিকট আসিতেছেন না। তখন রাধা সখী-দূতীকে পাঠাইতেছেন কৃষ্ণকে অম্লমধুর বাক্যে আনয়ন করিবার জন্য।

সিংহ (ভূপতির) একটি পদে দেখি, শ্রীরাধা দুর্জয়মানে অন্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কৃষ্ণ নিজের বিরহার্ত্তি প্রকাশ করিয়া বৃন্দা সখীকে অনুরোধ করিতেছেন, রাধার সহিত মিটমাট করাইয়া দিবার জন্য।

সিংহ (ভূপতি)—

মদন কুঞ্জপর বৈঠল মোহন
বৃন্দাসখি মুখ চাই।
যোড়ি যুগলকর মিনতি করত কত
তুরিতে মিলায়বি রাই॥
হাম পর রোখি বিমুখ ভৈ সুন্দরী
যবহুঁ চললি নিজ গেহা।
মদন হুতাশনে মঝু মন জারল
জিবনে না বান্ধই থেহা॥
তুঁহু অতি চতুরি- শিরোমণি নাগরি
তোহে কি শিখায়ব বাণী।
তুঁহু বিনে হমারি মরম নাহি জানত
কৈছে মিলায়বি জানি॥

চন্দন চান্দ পবন ভেল রিপুসম
বৃন্দাবন বন ভেল।
মউর কোকিল কত ঝঙ্কার দেয়ত
মুঝ মনে মনমথ শেল ॥
ছল ছল নয়ন বয়ন ভরি রোয়ত
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
হা হা সো ধনি হামে না হেরব
সিংহ ভূপতি রস গায় ॥ পদকল্পতরু ৪৭৭,

বৈ. প. পৃ. ৭৮৩

নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণও দূতীর পদধারণ করিতেছে শ্রীরাধার কৃপালাভ করিবার জন্য।

॥ পদাবলী সাহিত্যে 'উৎকণ্ঠিতা' ॥

বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার 'সাহিত্যদর্পণে' বলিয়াছেন—

আগন্তুং কৃতচিত্তোঽপি দৈবান্নায়াতি চেৎ প্রিয়ঃ।
তদানাগমদুঃখার্তা বিরহোৎকণ্ঠিতা তু সা ॥

সা. দ. ৩য় পরিচ্ছেদ ৩.৯৫

—'আসিবার সংকল্প করিয়াও যাহার দয়িত দৈবহেতু আসিতে পারে নাই, দয়িতের অনাগমনে দুঃখার্তা সেই স্ত্রীকে 'বিরহোৎকণ্ঠিতা' বা উৎকণ্ঠিতা বলে।'

প্রিয়তমের না আসার কারণ সম্বন্ধে যে নায়িকা চিন্তা করিতে থাকে এবং নিজেও বিরহদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, সেই নায়িকাকে 'উৎকণ্ঠিতা' বলে। নায়িকার এই 'উৎকণ্ঠিতা' অবস্থা তাহার প্রেমের বিভিন্ন অবস্থাতেও সম্ভব। মানের বিরতির পর নায়ক আসিবে বলিয়া যদি না আসে তখন নায়িকার মনে উৎকণ্ঠা জাগিতে পারে, আবার নায়ক প্রবাসে গেলে নায়িকার মনে নানা রকম উৎকণ্ঠা দেখা যায় এবং সে খেদ প্রকাশ করিতে থাকে। কিংবা পরাধীনতার জন্য নায়ক-নায়িকার মিলনে বাধা হইলে নায়িকা অন্তরের খেদ ও আক্ষেপ প্রকাশ করিতে থাকে। 'বাসকসজ্জা' দশায় নিরপরাধ নায়ক সংকেত করিয়াও আসিতে পারে না তখন নায়িকার মনে উৎকণ্ঠার ভাব জাগিতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নায়কের প্রতি নায়িকার প্রেমের

বিভিন্ন অবস্থাতেই নায়িকার উৎকণ্ঠিতা দশা আসিতে পারে। নায়িকার উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকে বিরহের সুর, তাই নায়িকার এই মনোভাবকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মধ্যে ধরিতে হইবে। প্রাচীন সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যে উৎকণ্ঠিতা সম্বন্ধে বহু শ্লোকাদি রচিত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই নায়িকার বিভিন্ন প্রেমদশা আলোচনা করিবার সময় উৎকণ্ঠিতার পরিচয় পাইয়াছি।

বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠিতা দশা সম্বন্ধে বহু পদ রচিত হইয়াছে দেখা যায়। নিরপরাধ কৃষ্ণ আসিবেন বলিয়া সংবাদ দিয়াও কোন কারণে রাধার কুঞ্জে আসিতে পারিলেন না, শ্রীরাধা প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অনাগমের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কুলবধূ রাধার পক্ষে কৃষ্ণের সহিত মিলনের বহু বাধা ছিল, অথবা কৃষ্ণ কোন গুরুতর কারণে রাধার নিকট আসিতে পারিলেন না, সেই সময়ে রাধার হৃদয়ে দারুণ উৎকণ্ঠা জাগিল। প্রেমের এই অবস্থায় স্থাপিত রাধাকে উৎকণ্ঠিতা বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ সাধারণ রমণীর মতই শ্রীরাধার হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্বকালীন প্রেমকবিতার আদর্শেই বৈষ্ণব কবিগণ রাধাপ্রেম-গীতিকা রচনা করিয়াছেন। তবে বৈষ্ণবতত্ত্ব-দৃষ্টির প্রভাবে পদাবলীতে বর্ণিত উৎকণ্ঠিতা রাধার চিত্র আরও মনোরম ও হৃদ্য হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রকার রূপগোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে বলিয়াছেন।

> অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
> বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥
> অস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথুর্হেতুতর্কণম্।
> অরতির্বাষ্পমোক্ষশ্চ স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ ॥
>
> —উ. ম. নায়িকাভেদ-প্রঃ (৫।৭৯।৮০)

—'দয়িত বহু সময় ধরিয়া না আসিলে যে নায়িকা উৎসুকা হইয়া থাকেন, ভাববেত্তা কবিগণ তাঁহাকেই বিরহোৎকণ্ঠিতা বলেন। ইহার চেষ্টা হৃত্তাপ, বেপথু, অনাগমনের হেতুচিন্তা, দুঃখ, অশ্রুপাত এবং নিজের অবস্থা নিবেদন।'

বৈষ্ণব কবিগণ রূপ গোস্বামী প্রদর্শিত এই রীতি অবলম্বন করিয়া শ্রীরাধার 'উৎকণ্ঠিতা' দশা বর্ণনা করিয়াছেন।

'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে একটি প্রাচীন সংস্কৃত পদ আছে। নায়কের অনাগমন সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা করিয়া নায়িকা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে ও শেষে খেদ প্রকাশ করিতেছে।

কিং রুদ্ধঃ প্রিয়য়া কয়াচিদথবা সখ্যা মমোদ্বেজিতঃ
কিংবা কারণ-গৌরবং কিমপি যন্নাদ্যাগতো বল্লভঃ।
ইত্যালোচ্য মৃগীদৃশা করতলে বিন্যস্য বক্ত্রাম্বুজং
দীর্ঘং নিঃশ্বসিতং চিরঞ্চ রুদিতং ক্ষিপ্তাশ্চ পুষ্পস্রজঃ॥

সা. দ. ৩য় (৩।৯৫)

—'অন্য প্রেয়সী কর্তৃক সে (আমার প্রিয়) কি রুদ্ধ হইয়াছে? অথবা আমার সখী কি তাহাকে অপ্রসন্ন করিয়াছে, অথবা কোন বিশেষ কার্য্যে কি খুবই ব্যস্ত যে প্রিয়তম আসিলেন না—এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া সেই হরিণনয়না করতলের উপর মুখ রাখিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং সমস্ত ফুলমালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।'

ইহার সহিত রূপ গোস্বামীর একটি গীতের তুলনা করা যায়।

কিমু চন্দ্রাবলিরনয়গভীরা।
অরুণদমুং রতি-বীরমধীরা॥
অতিচিরমজনিরজনিরতিকালী।
সঙ্গমবিন্দত নহি বনমালী।
কিমিহ জনে ধৃত-পঙ্ক-বিপাকে।
বিস্মৃতিরস্য বভূব বরাকে॥
কিমুত সনাতন-তনুরলঘিষ্ঠম্।
রণমারভত সুরারিভিরিষ্টম্॥ গীতাবলি (২৭),

পদকল্পতরু, ৩৬৪

—'দুর্নয়-গভীরা কুটিলা চক্রান্তকারিণী চঞ্চলা চন্দ্রাবলী কি রতি-রণবীর শ্রীকৃষ্ণকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। বহুক্ষণ গত হইল, রজনী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, বনমালী আমার সঙ্গে মিলিত হইলেন না। শেষে কি এই কলঙ্কিনী হতভাগিনীকে বিস্মৃত হইলেন? অথবা সেই সনাতনতনু শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের অভীষ্ট পূরণের জন্য দৈত্যগণের সঙ্গে সুদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।'

সদুক্তিকর্ণামৃতে কালিদাসনন্দীর একটি পদ আছে, পদটিতে কবি বিরহোৎ-কণ্ঠিতার একটি স্পষ্ট চিত্র আঁকিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গচ্ছামি কুত্র বিদধামি কিমত্র কস্মিং-
স্তিষ্ঠামি কঃ খলু মমাত্র ভবেদুপায়ঃ॥
কর্ত্তব্যবস্তুনি ন মে সখি নিশ্চয়োঽস্তি,
ত্বাং চেতসা পরমনন্যগতিঃ স্মরামি॥ সদুক্তিকঃ ২।২৭।৩

—'কোথায় যাইব, কি করিব, কোথায় অবস্থান করি, আমার কি উপায় হইবে। সখি, কর্ত্তব্যকর্মেও আমার মন নাই, কেবল অনন্যগতি হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি।'

কবি বিদ্যাপতির একটি পদে বিরহিণীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে।

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥ পদকল্পতরু, ১৬০৩

'প্রাকৃত-পৈঙ্গলের' অবহট্‌ঠে লিখিত একটি পদে বর্ষার আগমনে নায়কের জন্য নায়িকার উৎকণ্ঠা দেখা যায়। নায়িকা সখীকে বলিতেছে।

ফুল্লা নীবা ভম ভমরা দিট্‌ঠা মেহা জলসমলা।
ণচ্চে বিজ্জু পিঅসহিআ আবে কন্তা কহু কহিআ॥ ৭১॥

—'হে প্রিয়সখি, কদম্ব ফুটিয়া গিয়াছে, ভ্রমরগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, জলশ্যামল মেঘ দেখা দিয়াছে, বিদ্যুৎ নাচিয়া বেড়াইতেছে, বল, আমার প্রিয় কখন আসিবে?'

ইহার সহিত বড়ুচণ্ডীদাসের একটি পদ স্মরণ করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধিকার বিরহোৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে নিম্নলিখিত পদটিতে—

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরেঁা মো কদমতলে বসী।
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতে না পাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞি দেখিতেঁ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সবে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকারডালে॥

মোঞ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিরহখণ্ড

"প্রাকৃত-পৈঙ্গলের" আর একটি কবিতায় অনুরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ষাগমে নায়িকা সখীর নিকট নায়কের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে, পদটি অর্বাচীন অপভ্রংশে বা অবহট্‌ঠে লেখা।

গজ্জে মেহা নীলকারউ সদ্দে মোরউ উচ্চা রাবা।
ঠামা ঠামা বিজ্জু রেহই পিঙ্গা দেহউ কিজ্জে হারা।
ফুল্লা নীবা পীবে ভম্মরু দক্‌খা মারুঅ বীঅংতাএ
হংহো হঞ্জে কাহা কিজ্জউ আও পাউস কীলন্তাএ॥ ১৮১॥

—'নীল মেঘ গর্জন করিতেছে, ময়ূর উচ্চ রব করিতেছে, স্থানে স্থানে পিঙ্গলবর্ণা বিদ্যুৎ শোভা পাইতেছে এবং মেঘের গায়ে মাল্য রচনা করিতেছে, কদম্ব ফুল ফুটিয়াছে, ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, চতুর বায়ু বহিতেছে, হে সখী, বল দেখি কি করা যায়? বর্ষা ঋতু ক্রীড়া করিতেছে।'

ইহার সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের পদটি তুলনা করা যায়।

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে নয়ন ঝুরএ॥
পাখী জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথা
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে যথা॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহ, বৈ. প. পৃ. ৪২

গাহাসত্তসঈর নায়িকা মামীকে (সখী) বলিতেছে, বসন্ত আসিয়াছে, কিন্তু প্রিয় কার্য্যব্যপদেশে দূরে রহিয়াছে। নায়কের জন্য নায়িকার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতাটিতে।

দিট্‌ঠা চুআ অগ্‌ঘাইআ সুরা দক্‌খিণাণিলো সহিও।
কজ্জাইং ব্বিঅ গরুআই মামি কো বল্লহো কস্‌স॥ গাহা ১।৯৭

—'আম্রমুকুল দেখা দিয়াছে, সুরার গন্ধ পাওয়া গিয়াছে, বসন্তের বাতাসও স্পর্শ করিলাম, কিন্তু মামি, তাহার কর্তব্যই বড় হইল, কেই বা কাহার প্রিয়।'

'প্রাকৃত-পৈঙ্গলের একটি অবহট্‌ঠে লেখা পদে দেখি বসন্তের সমাগমে নায়িকা নায়কের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে। নায়িকা সখীকে বলিতেছে—

বহই মলঅবাআ হন্ত কম্পন্ত কাআ
হণই সবণরন্ধা কোইলালাবন্ধা।
সুণিঅ দহং দিহাসুং ভিঙ্গঝংকারভারা
হণই হণই হঞ্জে চংড চংণ্ডাল মারা॥ ১৬৫ ॥

—'ময়লবায়ু বহিতেছে, হায়, শরীর কাঁপিতেছে, কোকিলের আলাপ কর্ণরন্ধ্রে আঘাত হানিতেছে, দশদিকে ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা যাইতেছে, হে সখী, অত্যন্ত ক্রোধী, চণ্ডালের ন্যায় নিষ্ঠুর মদন আঘাত হানিতেছে, আঘাত হানিতেছে।'

ইহার সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের একটি পদের তুলনা করিাত পারি। পদটিতে বসন্তের সমাগমে কৃষ্ণের জন্য রাধার উৎকণ্ঠার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

চারি দিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
আম্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে
লাগে বিষবাণঘাএ॥
চান্দ সুরুজের ভেদ না জানো
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্ন বিণি মোর এবেঁ এক খণ
এক কুল যুগ ভাএ॥
মাধবি মাস সাধ বিধি বাধল
পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দখিণ পবন নহি ভায়ত
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, রাধাবিরহখণ্ড

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' একটি পদে শ্রীকৃষ্ণের অনাগমনে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার ভাবটি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্॥
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা॥

গীতগোবিন্দে ৭।৩

—'কথিত সময় বহিয়া গেল, হরি ত আসিলেন না, আমার এই অমল রূপযৌবন বিফল হইল। সখীগণ আমায় বঞ্চনা করিয়াছে, হায়! আমি কাহার শরণ গ্রহণ করিব?'

রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীর একটি পদে দেখি 'পূর্বরাগবিধুরা'রাধা সখীর নিকট নিজের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে।

হন্ত কান্তমপি তং দিদৃক্ষতে
মানসং মম ন সাধু যৎকৃতে।
ইন্দুরিন্দুমুখি, মন্দমারুত-
শ্চন্দনং চ বিতনোতি বেদনাম্ ॥ কস্যচিৎ

পদ্যাবলী—১৭১।

—'হায়, আমার মন সেই কান্তকে (কৃষ্ণকে) দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, যে জন্য আমার ভাল লাগিতেছে না, হে ইন্দুমুখী, চন্দ্র, মৃদুমন্দ পবন এবং চন্দন আমার বেদনা উপশম করিতে পারিতেছে না।'

পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত উক্ত পদটি লৌকিক প্রেম-কবিতার সহিত একই সুরে একই কথায় রচিত হইয়াছে। অথবা বলিতে পারি, সাধারণ প্রেম-গীতিকাই বৈষ্ণব কবিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পদটিতে ভক্তির সুর ধ্বনিত হয় নাই। ইহার সহিত এই সাধারণ প্রেমের কবিতাটির তুলনা করিতে পারি।

কালো মধুঃ কুপিত এষ চ পুষ্পধন্বা
ধীরা বহন্তি রতিখেদহরাঃ সমীরাঃ।
কেলীবনীয়মপি বঞ্জুল-কুঞ্জমঞ্জু
র্দূরে পতিঃ কথয় কিং করণীয়মদ্য ॥

বিশ্বনাথ কবিরাজের স্বকৃতশ্লোক, সা. দ. (২।১৬)

—'বসন্তকাল প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং কামদেব কুপিত হইয়াছেন, রতিশ্রম দূর করিতে মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছে। অশোকবন রমণীয় হইয়াছে এবং ক্রীড়া করিবার জন্য ক্ষুদ্র বন রহিয়াছে। কিন্তু পতি প্রবাসে রহিয়াছে, সখি, কি করিব, বল।'

এখানে প্রাকৃত নায়িকার বসন্তকালোচিত উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। অথবা পতি প্রবাসে থাকায় অন্য নায়কের জন্য নায়িকার উৎকণ্ঠাও হইতে পারে।

পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত বৈষ্ণব পদটির (১৭১) সহিত এই পদটির বিশেষ

কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। পদ দুইটি যেন সমসূত্রেই গ্রথিত। দেখা যাইতেছে প্রাকৃত নায়িকাই ধীরে ধীরে 'রাধাভাবে' পরিণত হইয়াছে।

'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উদ্ধৃত রুদ্রট কবির নিম্নোল্লিখিত এই পদটিতে নায়িকার উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। নায়িকা সখীকে বলিতেছে, নিশ্চয়ই সে (নায়ক) অন্য রমণী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জন্যই আসিতেছে না। পদ্যাবলীতে (২১৩) 'অথ উৎকণ্ঠিতা' বলিয়া রাধা-প্রেমের কবিতা হিসাবে এই পদটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সখীকে রাধা বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই অন্য রমণী কর্তৃক জিত হইয়াছে, তাই আসিতেছে না, এবং রাধারও উৎকণ্ঠা বাড়িয়া চলিয়াছে। পদটি কিন্তু সদুক্তিকর্ণামৃতে 'বিপ্রলব্ধার' উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। অতি সাধারণ মানবীয় প্রেম-কবিতাই বৈষ্ণব প্রেমকবিতায় পরিণত হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত এই প্রেমগীতিকায় প্রাকৃত প্রেম ও অপ্রাকৃত প্রেম স্বরূপ-বিলক্ষণ ছিল না।

সখি স বিজিতো বীণাবাদ্যে কয়াপ্যপরস্ত্রিয়া
পণিতমভবত্তাভ্যাং তত্র ক্ষপাললিতং ধ্রুবম্।
কথমিতরথা শেফালীষু স্খলৎকুসুমাস্বপি
প্রসরতি নভোমধ্যেঽপীন্দৌ প্রিয়েণ বিলম্ব্যতে॥ সদুক্তি ২।৩৯।৩
পদ্যাবলী—২১৩

—'সখি, সে (কৃষ্ণ বা দয়িত) বীণাবাদ্যে অপর কোন রমণী কর্তৃক পণে পরাজিত হইয়াছে, তাহা না হইলে শেফালিকা স্খলিত হইলেও এবং চন্দ্র মধ্য-গগনে উদিত হইলেও কেন প্রিয়তম বিলম্ব করিতেছেন।' ইহার সহিত বিদ্যাপতির পদটির তুলনা করিতে পারি। বিদ্যাপতির রাধাও সখীকে বলিতেছেন—

হরি বিসরল বাহর গেহ।
বসুহ মিলল সুন্দর দেহ॥
সানে কোনে আবে বুঝএ বোল।
মদনে পাওল আপন তোল॥
কি সখি কহব কাহতে ধাখ।
খখন্দে জও বা কতএ রাখ॥' বৈ. প. পৃ. ১০৪

—'হরি বাসর গৃহ (সঙ্কেত কুঞ্জের কথা) ভুলিয়াছে। পৃথিবীতে কোথাও তাহার সুন্দর দেহ (সুন্দরী নারী) মিলিয়াছে। সঙ্কেতের কথা এখন কি

প্রকারে বুঝিবে ? মদন আপনার তুল্য একজনকে অর্থাৎ কানাইকে পাইয়াছে অর্থাৎ মদন যেমন যাতনা দেয়, কানাইও তেমনি যাতনা দিল। কি কহিব সখি, কহিতে দুঃখ হয়। হেঁয়ালী যতই কর কত রক্ষা হইবে ?'

এইগুলির সহিত নরোত্তমদাসের একটি পদ স্মরণ করা যাইতে পারে।

বঁধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই
সাধে নিরমিলু আশাঘর রে।
কোন কুমতিনী মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর রে।
বঁধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বনাইলুঁ
সকলি বিফল ভেল মোয় রে।
না জানি বঁধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয় রে॥
এ গগন উপরে চাঁদ- কিরণ উদয় গো
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথি॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া খপুর পুরিল সই
পিয়া বিনে কার মুখে দিব গো।
এমন মালতী মালা বৃথাই গাঁথিলু গো
কেমনে রজনী গোঙাইব গো॥
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো
এখনো আছয়ে কার আশে।
ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইয়া চলিলুঁ গো
কহি ধায় নরোত্তম দাসে। বৈ. প. পৃ. ৫৫১

তুঃ—

শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা

দরশন দেহ সুন্দরী রাই।
তুয়া বিচ্ছেদে দারুণ দুখ পাই॥
আকুল বিকল প্রাণ কি হইল শরীরে।
কি করি বসিয়া বৃথা কালিন্দীর তীরে॥

কি করিব কোথা যাব নাহিক উপায়।
রাধার বিহনে মনে আন নাহি ভায়

ললিতাদাস। বৈ. প. পৃ. ১০৮৪

তুঃ— পথ চেয়ে মোর কাটল নিশি
লাগছে মনে ভয়
সকাল বেলা ঘুমিয়ে পড়ি
এমন যদি হয়।

— —

যদি বা তার পায়ের শব্দে
ঘুম না ভাঙে মোর
শপথ আমার তোরা কেহ
ভাঙাস নে ঘোর।

—রবীন্দ্রনাথ-গীতাঞ্জলী।

সাহিত্য-দর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটি প্রেম-কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটিতে বিরহিণী পরকীয়া নায়িকার উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে।

জ্বলতু গগনে রাত্রৌ রাত্রাবখণ্ডকলঃ শশী,
দহতু মদনঃ কিংবা মৃত্যোঃ পরেণ বিধাস্যতি।
মম তু দয়িতঃ শ্লাঘ্যস্তাতো জনন্যমলান্বয়া
কুলমমলিনং ন ত্বেবায়ং জনো ন চ জীবিতম্॥"

সা. দ. ৩য় পরিচ্ছেদ (৩।১০৯)

—'রাত্রিতে রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্র আকাশে উদিত হইয়া তাপ দিতে থাকে, কামদেব-ও জ্বালাইতে থাকে, মৃত্যু হইতে অধিক আর কি করিবে? আমার প্রিয়তম ও মাতাপিতা সকলেই জগতে প্রশংসিত এবং নিষ্কলঙ্ক কুল। এই কুলে কলঙ্ক লাগিবে না। কিন্তু আমারও জীবন রহিবে না।'

পরকীয়া নায়িকার এই কথাগুলি শ্রীরাধার মুখে বসাইয়া দিলে বেশ মানায়। ইহার সহিত চণ্ডীদাসের পদটির তুলনা করা যায়।

হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥

ভাবিতে গণিতে মোর তনু হইল ক্ষীণ।
জগভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিলুঁ।
মৈলু লাজে মিছা কাজে দগদগি হইলুঁ॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি মনো দুঃখে আর নানা কথা॥
শয়নে স্বপনে বন্ধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥
ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥

বৈ. প. পৃ. ৫৬

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বাসকসজ্জা

ভারতীয় সাহিত্যে 'বাসকসজ্জা' সম্বন্ধে বহু শ্লোকাদি রচনার রীতি প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত-প্রাকত সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সদুক্তিকর্ণামৃতে 'বাসকসজ্জা' সম্বন্ধে বিভিন্ন কবির রচিত কয়েকটি শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে দ্বাদশ শতাব্দের পূর্বেই এই রীতি প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার 'বাসকসজ্জা' অবস্থা সম্বন্ধে পদরচনা করিবার সময় এইসব পূর্বকালীয় কবিদের রচিত পার্থিব প্রেমকবিতাকে অনেক ক্ষেত্রে আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রিয়তম তাঁহার অবসর মত আসিবেন এই আশায় নায়িকা বাসগৃহ বা কুঞ্জাদি সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করে, বসনভূষণে নিজেকে মণ্ডিত করে এবং উৎকণ্ঠায় ঘর-বাহির করে কিন্তু দয়িত আসে না, এদিকে রাত্রিও প্রভাত হইয়া যায়। নায়িকা হতাশায় সাজসজ্জা ক্ষোভের সহিত ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। প্রিয়-মিলনের আশা বিফল হয়। নায়কের প্রতি প্রেমের এই অবস্থা বা দশাতে স্থাপিত নায়িকাকে 'বাসকসজ্জা' বলে।

সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ 'বাসকসজ্জার' সংজ্ঞা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন।

কুরুতে মণ্ডনং যস্যাঃ সজ্জিতে বাসবেশ্মনি।
সা তু বাসকসজ্জা স্যাদ্বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা॥

সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩।৯৪)

—'কুসুম-চন্দনাদির দ্বারা পরিবেশিত বাসর গৃহে সখিগণ যাঁহার প্রসাধনাদি কার্য করিয়া থাকে, প্রিয়সংগমে উদ্বেলিতা সেই স্ত্রীই 'বাসকসজ্জা'। বাসকের বা বাসগৃহাদির সজ্জা করে যে নায়িকা সেই বাসকসজ্জা বা বাসসজ্জা কিংবা বাসকের জন্য সজ্জা অর্থাৎ নায়কের ইচ্ছামত আগমনের জন্য সজ্জিতা নায়িকা।

বিশ্বনাথ উদাহরণ হিসাবে রাঘবানন্দের নাটকের একটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিদূরে কেয়ূরে কুরু, করযুগে রত্নবলয়ৈ-
রলং গুর্ব্বী গ্রীবাভরণলতিকেয়ং, কিমনয়া।
নবামেকামেকাবলিমপি ময়ি ত্বং বিরচয়ে
ন নেপথ্যং পথ্যং বহুতর-মনঙ্গোৎসববিধৌ॥

(সা. দ. (৩৯৪))

—'হে সখী, বাজুবন্ধ দূর কর। দুই হাতে কঙ্কণের কোনো প্রয়োজন নাই, গলায় এই হাঁসুলী অত্যন্ত ভারী, ইহার কি প্রয়োজন আছে? কেবল একাবলী হার গলায় পরাইয়া দাও, অনঙ্গের উৎসবে অলংকারের আধিক্য ঠিক নহে।' নায়কের আগমনে নায়িকা সজ্জা খুলিয়া লইতে বলিতেছে।

বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রকার রূপগোস্বামী ঠিক এই ভাবেই শ্রীরাধার 'বাসকসজ্জার' সংজ্ঞা দিয়াছেন।

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥
চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়া-সংকল্পো-বর্ত্ম-বীক্ষণম্।
সখীবিনোদবার্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ॥

উঃ মঃ নায়িকাভেদ প্রঃ (৫।৭৬।৭৭)

—'নিজ অবসরক্রমে প্রিয়তম আসিবেন, এই ভাবিয়া যিনি নিজদেহ ও বাসগৃহ সুসজ্জিত করেন, তিনিই 'বাসকসজ্জা।' ইহার চেষ্টা—কেলিবিনোদের সংকল্প, কান্তপথ-নিরীক্ষণ, সখীসহ বিনোদালাপ, এবং মুহুর্মুহু দূতীর প্রতি দৃষ্টিপাত ইত্যাদি।'

পীতাম্বরদাসের 'রসকলিকায়' ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে।

কান্তের সংকেতস্থানে উপস্থিত হইয়া।
তাম্বূল কর্পূর মালা সব নিয়োজিয়া॥

কৃষ্ণের বিলাস লাগি শয্যাদি করয়।
নানা গন্ধ পুষ্প তার চৌদিকে সাজায়॥
কুঞ্জমধ্যে কুসুমিত শয্যাদি করিয়া।
নানা ভূষা করি রহে কান্তপথ চাইয়া॥

রসকলিকা. পৃঃ ৩৪

ভরত মুনিও অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন—

—যা বাসবেশ্মনি সুকল্পিত-তল্পমধ্যে তাম্বূলপুষ্প-বসনগ্রহণে সুখজ্ঞা।
কান্তস্য সঙ্গমসুখং সমবেক্ষ্যমানা, সা নায়িকা প্রকথিতা খলু বাসকসজ্জা॥

—'যে নায়িকা সুসজ্জিত বা স্বগৃহে সুকল্পিত সজ্জা মধ্যে তাম্বুল পুষ্প ও বস্ত্র লইয়া কান্তের সহিত মিলনের আশায় অপেক্ষমানা সেই নায়িকাকে বাসকসজ্জিকা বলে।'

নায়িকার 'বাসকসজ্জিকা' দশায় প্রিয়তমের সহিত মিলন হয় না বলিয়া এই ভাবটি বিপ্রলম্ভ শৃংগারের মধ্যে ধরিতে হইবে। বিরহের চেষ্টাদিও ইহাতে দেখা যায়।

গাহাসত্তসঈর একটি গীতিকায় দেখি দূতী নায়কের নিকট নায়িকার 'বাসকসজ্জিকা' দশা বর্ণনা করিতেছে।

উজ্জাগরঅ-কসাইঅ-গুরুঅচ্ছী মোহ-মণ্ডণ-বিলক্খা।
লজ্জই লজ্জালুইণী সা সুহঅ সহীহি বি বরাঈ॥ গাহা ৫।৮২

—'হে সুভগ, আমাদের এই হতভাগিনী লজ্জাশীলা সখীর নয়নদ্বয় অতিজাগরণে আরক্ত ও ভারাক্রান্ত হইয়াছে, (সে) নিরর্থক মণ্ডণে বিধুরা হইয়া সখীদের নিকট লজ্জা অনুভব করিতেছে।'

এখানে দেখি নায়ক আগমন না করায় নায়িকা রাত্রি জাগিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং নয়নদ্বয়ও আরক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতে আচার্য গোপীকের একটি পদ আছে। তাহাতে দেখা যায় নায়িকা বেশভূষায় মণ্ডিত হইয়া এবং শয্যাদি রচনা করিয়া প্রিয়মিলনের আশায় অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু রাত্রি অতিক্রান্ত হইলেও প্রিয়তম আসিল না।

তল্পং কল্পিতমেব কল্পয়তি সা ভূয়স্তনুং মণ্ডিতাং
ভূয়ো মণ্ডয়তি স্বয়ং রতিপতে-রজীকরোত্যর্চনাম্।

গচ্ছন্ত্যাং নিশি মন্যতে ক্ষতিমিব দ্বারং চিরং সেবতে
লীলা-বেশ্মনি সা করোতি মদনক্লান্তা বরাকী ন কিম্ ॥
(গোপীকস্য)—সদুক্তিক ২।৩৭।১

—'সে (নায়িকা) তৈয়ারী করা বিছানা আবার পাতিতেছে, ভূষিত দেহকে পুনরায় মণ্ডিত করিতেছে, মদনের আরাধনা করিতেছে, রাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ায় নিজের ক্ষতি বিবেচনা করিতেছে, বহুক্ষণ ধরিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেছে ; সেই মদনক্লান্তা, বেচারী নায়িকা লীলাগৃহে কি না করিতেছে।'

সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত জয়দেব কবির একটি প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতাতে বাসকসজ্জা নায়িকার ভাবটি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পদটিতে নায়িকার বাহ্যিক বর্ণনার চেয়ে অন্তরের আবেগ-উৎকণ্ঠাই বেশী প্রকাশিত হইয়াছে দেখা যায়। সখী নায়ককে বলিতেছে—

অঙ্গেষ্বাভরণং তনোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সংচারিণি
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি ॥
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনা-সংকল্পলীলাশত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥
সদুক্তিক ২।৩৭।৪

—'বরতনু সেই নায়িকা অঙ্গের আভরণ বিস্তার করিতেছে, পাতার সঞ্চালনে তোমার আগমনের আশঙ্কা করিতেছে, শয্যা রচনা করিতেছে, বহুসময় চিন্তা করিতেছে, এইভাবে শয্যা তোলা-পারা ও নানারূপ আশা-আকাঙ্খায় ব্যগ্র থাকিয়া তুমি ছাড়া রাত্রি অতিবাহিত করিবে না।'

কবি প্রবরসেনের নায়িকা বলিতেছে—

অরতিরিয়মুপৈতি মাং ন নিদ্রা
গণয়তি তস্য গুণান্ ন দোষান্।
বিরমতি রজনী ন সংগমাশা
ব্রজতি তনুস্তনুতাং ন চানুরাগঃ ॥ (সদুক্তিক)—২।৩৭।৫

—'অরতি আসিতেছে কিন্তু আমার নিদ্রা আসিতেছে না, আমার মন তার গুণ-সমূহের গণনা করিতেছে দোষের নয়, রাত্রি বিরত হইতেছে, মিলনের আশা নহে, (আমার) শরীর কৃশতাপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু অনুরাগ নহে।' এখানে নায়িকার অন্তর্বেদনা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। পদটি

রূপ গোস্বামীর পদাবলীতে (২১৩) উৎকণ্ঠিতার (শ্রীরাধার) উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে লৌকিক প্রেমগীতিকা ও বৈষ্ণব প্রেমগীতিকার মিশ্রণ হইয়াছে। ইহার সহিত কানুরামদাসের পদটি স্মরণ করা যাইতে পারে। এই পদটিতে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্দির তেজি কানন মাহা পৈঠলুঁ
কানু মিলন প্রতিআশে।
আভরণ বসনে রঙ্গে সব সাজল
তাম্বুল কর্পূর বাসে॥
সজনি, সো মুঝে বিপরিত ভেল।
কানু রহল দূরে মনমথ আসি ফুরে
সো নাহি দরশন দেল॥
ফুলশর জরজর সকল কলেবর
কাতরে মহি গড়ি যাই।
কোকিল বোলে ডোলে ঘন জীবন
উঠি বসি রজনি গোঙাই॥
শীতল ভবন গরল সমান ভেল
হিমাচল বায়ু হুতাশ।
লোচন নীর থীর নাহি বান্দয়ে
কান্দয়ে কানুরাম দাস॥

বৈঃ পঃ পৃঃ ৪৫৬ ; পদকল্পতরু ৩৩৪

‘শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে’ উদ্ধৃত দামোদর গুপ্তের একটি সংস্কৃত শ্লোকে ‘বাসক-সজ্জিকার’ বর্ণনা দেখা যায়। শ্লোকটি মম্মট ভট্টের ‘কাব্য-প্রকাশেও’ উদ্ধৃত হইয়াছে।

অপসারয় ঘনসারং কুরু হারং দূর এব কিং কমলৈঃ।
অলমলমালি মৃণালৈরিতি বদতি দিবানিশং বালা॥

—শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি

—‘হে সখি, কর্পূর দূর করিয়া দাও, হার দূর কর, কমলে কি প্রয়োজন? মৃণালেই বা কি প্রয়োজন—এইরূপে সেই বালা দিনরাত্রি বলিতে থাকে।’ ইহার সহিত রূপগোস্বামীর ‘গীতাবলীর’ একটি পদের তুলনা করা যায়।

কোমল-কুসুমা-বলিকৃতচয়নং।
অপসারয় লীলা-রতি-শয়নং॥

শ্রীহরিণাদ্য ন লেভে শময়ে।
হন্ত! জনং সখি! শরণং কময়ে॥
বিধুত-মনোহর-গন্ধ-বিলাসং।
ক্ষিপ যামুন-তট-ভুবি পটবাসং॥
লব্ধমবেহি নিশান্তিমযামং।
মুঞ্চ সনাতন-সঙ্গতিকামম্॥ গীতাবলী (২৮)

—সখি! কোমল কুসুমসমূহ তুলিয়া যে রতিবিলাস-শয্যা পাতিয়াছিলাম, তাহা দূর কর, শ্রীহরি আজ সংকেত-সময়ে কুঞ্জে আসিবেন না। (হায় সখি!) এখন আমি কাহার শরণ লইব? মনোহর সুগন্ধি পটবাস:অর্থাৎ চুয়া-চুর্ণ প্রভৃতি যমুনাপুলিন-ভূমিতে নিক্ষেপ কর। রাত্রির শেষ যাম উপস্থিত হইয়াছে দেখ। সনাতন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ-আশা ত্যাগ কর। ইহার ভাব লইয়া দ্বিতীয় বলরাম দাস একটি পদ লিখিয়াছেন।

তেজ সখি কানু আগমন আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহি ডারহ যামুন পার॥

বৈ. প. পৃ. ৭৪১

কবি বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত একটি পদেও অনুরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

শংখ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনা পুলিনে সব ডার রে॥

বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধার 'বাসকসজ্জার' অবস্থা ঠিক এইভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীরাধা সখীদের সহায়তায় কুঞ্জগৃহ সাজাইয়া ও নিজেকে মণ্ডিত করিয়া এবং তাম্বুলাদি সজ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ আসিলেন না, রাধার অন্তর ব্যথিত হইল, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমে রাধার এই অবস্থাকে আমরা 'বাসকসজ্জা' দশা বলিতে পারি। পার্থিব প্রেমের কবিতায় বর্ণিত নায়িকার অনুরূপ দশাই রাধা-প্রেমের কবিতার ভিতরেও দেখিতে পাই। বৈষ্ণব কবিগণ পূর্বতন প্রেমকবিতার রীতি রাধা-প্রেমের বর্ণনায় গ্রহণ

করিয়াছেন। প্রাকৃত নারীর মতই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্ত সাজ-সজ্জা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এবং কৃষ্ণের অনাগমনে সাধারণ নারীর মতই তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতেছে।

রূপ গোস্বামী অনুরূপভাবেই শ্রীরাধার 'বাসক-সজ্জা' অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

কুসুমাবলিভিরুপস্কুরু তল্পম্।
মাল্যঞ্চামলমণিসরকল্পম্॥
প্রিয়সখি কেলি-পরিচ্ছদ-পুঞ্জম্।
উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জম্।
মণিসম্পূটমুপনয় তাম্বুলম্॥
শয়নাঞ্চলমপি পীত-দুকূলম্।
বিদ্ধি সমাগতমপ্রতিবন্ধম্।
মাধবমাশু সনাতন-সন্ধম্॥ গীতাবলী (২৬)

—'কুসুমাবলীর দ্বারা শয্যা রচনা কর। অমল অর্থাৎ উজ্জল মণিহার তুল্য মালা সজ্জিত কর। হে প্রিয়সখি, লীলা-বিলাসের উপযুক্ত উপকরণ-সম্ভার কুঞ্জে সত্বর স্থাপিত কর। মণিখচিত তাম্বুলাধার এবং পীতবসন শয্যার প্রান্তে রক্ষা কর। স্থিরমতি মাধব প্রতিবন্ধ রহিত হইয়া স্বচ্ছন্দে শীঘ্র কুঞ্জে আসিতেছেন।'

কবি বিদ্যাপতি শ্রীরাধার 'বাসকসজ্জার' দশা বর্ণনা করিতেছেন।

কুসুমে রচিত সেজা দীপ রহল তেজা
পরিমল অগর চন্দনে।
জবে জবে তুঅ মেরা নিফল বহলি বেরা
তবে তবে পীড়লি মদনে॥
মাধব তোরি রাহী বাসক-সজা।
চরণ সবদ চৌদিস আপএ কানে
পিয়া লোভে পরিণতি লজা॥
সুনিঅ সুজন নামে অবধি ন চুকএ ঠামে
জনি বন পসেরল হরী।
সে তুঅ গমন আসে নিন্দ আবে পাসে
লোচন লাগল দেহরী॥ বৈ. প. পৃ. ১০৪

কবি বিদ্যাপতি প্রাচীন কবিদের রীতি অনুসারেই শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

জ্ঞানদাসের পদেও 'বাসকসজ্জা' রাধার সুন্দর চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

অপরূপ রাইক চরীত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে ধনি সাজয়ে
পুন পুন উঠয়ে চকীত॥
কিশলয়শেজ বিছায়ই পুন পুন
জারত রতনপ্রদীপ।
তাম্বুল কর্পুর খর্পুর পুন রাখয়ে
বাসিত বারি সমীপ॥
মলয়জ চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম
পুন তেজত পুন লাই।
সচকিত নয়নে নেহারই দশদিশ
কাতরে সখিমুখ চাই॥
কিঙ্কিণি কঙ্কণ মনিময় আভরণ
পহিরত তেজত তাই।
সখিগণ হেরি কতহু পরবোধয়ে
জ্ঞানদাস কহ ধাই॥ বৈ. প. পৃ. ৪২৯

চণ্ডীদাসের পদেও শ্রীরাধার 'বাসকসজ্জার' ভাবটি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে—

বন্ধুর লাগিয়া সেজ বিছাইলুঁ
গাঁথিলু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ দীপ উজারলুঁ
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে এসব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইলুঁ গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে
মিলব বঁধুর সনে॥

পথ পানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রসশিরোমণি আসিব এখনি
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥ বৈ. প. পৃ. ৫০

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার তুলনা করিতে পারি। তাঁহার কবিতাটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে॥
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল
বসন্ত যাবে চলিয়া।
কত উদিবে তপন আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া॥
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া
তাই আমি বসে আছি রে।
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া॥
—বিরহ, কড়ি ও কোমল।

বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে বিপ্রলব্ধা

বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই 'বিপ্রলব্ধা' সম্বন্ধে কবিতা রচনার রীতি ভারতীয় সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল। বিপ্রলব্ধা শব্দের অর্থ প্রতারিতা বা বঞ্চিতা, সংকেত করিয়াও যখন নায়ক আগমন না করে, তখন নায়িকা শূন্য সংকেতস্থান দেখিয়া হতাশা বোধ করে এবং নিজেকে অবমানিতা

মনে করে। এইরূপ নায়িকাকে 'বিপ্রলব্ধা' বলা হয়। প্রাচীন অলংকার-শাস্ত্রকার বিশ্বনাথ বলেন—

প্রিয়ঃ কৃত্বাপি সংকেতং যস্যা নায়াতি সন্নিধিম্।
বিপ্রলব্ধা তু সা জ্ঞেয়া নিতান্তমবমানিতা॥

সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩।৯২)

—'সংকেত করিয়াও প্রিয় যাহার নিকটে গমন করে না, অত্যন্ত অবমানিতা সেই নায়িকাই 'বিপ্রলব্ধা'।

নায়িকার 'বিপ্রলব্ধা' দশাকে তাহার প্রেমের একটি অবস্থা বলা যায়। এই অবস্থা কিন্তু একান্তভাবে নায়িকাগত।

বৈষ্ণব কবিগণও শ্রীরাধার 'বিপ্রলব্ধা' অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সংকেত করিয়া আগমন না করিলে, শ্রীরাধা নিজেকে অবমানিতা মনে করিতেন। রাধার বিপ্রলব্ধা অবস্থা কৃষ্ণের প্রতি প্রেমে রাধার একটি অবস্থা বলা চলে।

রূপগোস্বামী তাঁহার 'উজ্জলনীলমণিতে' বলিয়াছেন—

'কৃত্বা সংকেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মণীষিভিঃ॥
নির্ব্বেদচিন্তাখেদাশ্রু-মূর্চ্ছানিঃশ্বসিতাদিভাক্॥'

উঃ মঃ নায়িকাভেদ প্রঃ (৫।৮৩)

—'সংকেত করিয়া যদি দৈবাৎ প্রাণবল্লভ না আসেন, পণ্ডিতগণ ব্যথিতান্তরা সেই নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা বলেন। ইঁহার চেষ্টা নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রুপাত, মূর্চ্ছা ও নিঃশ্বাসাদি।'

দেখা যাইতেছে রূপ গোস্বামী লৌকিক অলংকার-শাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া শ্রীরাধার 'বিপ্রলব্ধা' অবস্থা নির্ধারণ করিয়াছেন। কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী হইয়াও কৃষ্ণ সংকেতকুঞ্জে না আসিলে রাধা নিজেকে অবমানিতা মনে করিতেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের এই ভাব লইয়া বহু পদ রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ পূর্ববর্তী কবিদের রীতি অনুসরণ করিয়াই শ্রীরাধার বিপ্রলব্ধা অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

'সাহিত্য-দর্পণে' একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। নায়িকা দূতীকে হতাশার সহিত বলিতেছে, সে (নায়ক) আর আসিবে না, চল আমরা যাই। এরূপ প্রিয় যেন কাহারও না হয়।

উল্লিখিত কঙ্ককবির এই পদটি রূপ গোস্বামী 'বিপ্রলব্ধা' রাধার উদাহরণ হিসাবে পদ্যাবলীতে (২১৫) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কবি কঙ্ক কিন্তু সাধারণ নায়িকার 'বিপ্রলব্ধা' অবস্থা বর্ণনা করিবার জন্যই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। কাব্যরসের অতিরিক্ত কোন ভক্তিরস ছিল না। শ্রীরাধা বা শ্রীকৃষ্ণের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এখানে দেখা যাইতেছে সাধারণ নায়িকাই আস্তে আস্তে শ্রীরাধায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। পদটি এই—

উত্তিষ্ঠ দূতি, যামো যামো যাতস্তথাপি নায়াতঃ।
যাহতঃপরমপি জীবেজ্জীবিতনাথো ভবেত্তস্যাঃ॥ কঙ্কস্য
(সাহিত্য দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩।৯২) পদ্যাবলী—২১৫)

—হে দূতি, চল আমরা যাই, সংকেতকাল গত, তথাপি আমার (প্রিয়) আসিল না, ইহার পর যে জীবিত থাকে তাহার যেন এইরূপই প্রাণনাথ হয়।

বিদ্যাপতির একটি পদে এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে।

রিপু পঁচসর জনি অবসর
ইথে সরাসন সাজে।
হেরি সুন পথ ঘটী মনোরথ
কে জান কি হোইতি আজে॥
নিফল ভেলি জুবতী।
হরি হরি হরি রাতি তেজ হরি
পলটলি নহি দূতী॥
সাজি অভিসারা পড়ি আঁধিয়ারা
উগি জনু জা বোরা।
আরতি বেরা জগ্রো হো মেরা
নাথ গুন সুঅ থোরা॥ বৈ. প. পৃ. ১০৪

শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গার-প্রবাহে 'বিপ্রলব্ধা' সম্বন্ধে পাঁচটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। এইগুলিতে নায়ক সংকেত স্থানে না আসাতে নায়িকার খেদ, চিন্তা, অশ্রু প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়াছে দেখা যায়। কবি রুদ্রটের একটি পদে আছে—

যৎ সংকেতগৃহং প্রিয়েণ গদিতং সংপ্রেষ্য দূতীং স্বয়ং
তচ্ছূন্যং সুচিরং নিষেব্য সুদৃশা পশ্চাচ্চ ভগ্নাশয়া।
স্থানোপাসনসূচনায় বিগলৎসান্দ্রাঞ্জনৈরশ্রুভি-
র্ভূমাবক্ষর-মালিকেব লিখিতা দীর্ঘং রুদত্যা শনৈঃ॥

সদুক্তিক : ২। ৩৯। ৫

—'নিজেই দূতী পাঠাইয়া যে সংকেতস্থান প্রিয়তম বলিয়া দিয়াছিল, সেই স্থানে সুনয়না (নায়িকা) বহুক্ষণ অবস্থান করিল এবং পশ্চাৎ হতাশমনে আস্তে আস্তে বহু সময় রোদন হেতু বিগলিত কজ্জলমিশ্রিত অশ্রুধারা তাহার বসিবার স্থান সূচনা করিবার জন্যই যেন অক্ষরপংক্তি-রচনা ঘিরিয়া ফেলিল।' নায়ক না আসায় নায়িকা অশ্রুপাতের দ্বারা তাহার মনোব্যথা প্রকাশ করিতেছে।

সদুক্তিতে কবি রুদ্রটের আর একটি পদ আছে। পদটি এই—

সোৎকণ্ঠং রুদিতং সকম্পমসকৃৎ ধ্যাতং সবাষ্পং চিরং
চক্ষুর্দিক্ষু নিবেশিতং সকরুণং সখ্যা সমং জল্পিতম্।
নাগচ্ছত্যুপচিতেপি বাসকবিধৌ কান্তে সমুদ্বিগ্নয়া
তত্তৎকিঞ্চিদনুষ্ঠিতং মৃগদৃশা নো যত্র বাচাং গতিঃ।

সদুক্তিক—২।৩৯।৪

—অভিসারের সাজ-সজ্জা করা হইলে কান্ত আগমন না করায় সমুদ্বিগ্ন সেই মৃগনয়না (নায়িকা) উৎকণ্ঠায় রোদন করিল, বার বার কাঁপিতেছিল, বহুক্ষণ বাষ্পাকুল হইয়া চিন্তা করিল, করুণভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, সখীদের সহিত আলাপ করিল—এইভাবে (সে) আর কি কি করিল যাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

নায়ক অভিসারে না আসায় নায়িকার অবস্থা এই পদে বর্ণনা করা হইয়াছে।

রুদ্রটের আর একটি পদ আছে। মানবীয় প্রেমের এই কবিতাটিকে রূপগোস্বামী সামান্য পরিবর্তন করিয়া রাধা-প্রেমের কবিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পদটি পদ্যাবলীতে (২১৩) উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে।

সখি স বিজিতো বীণাদ্যুতে কয়াপি পরস্ত্রিয়া
পণিতমভবত্তাভ্যাং তত্মিন্নিশাললিতং ধ্রুবম্।

কথমিতরথা শেফালীষু স্খলৎকুসুমাস্বপি
স্থিতবতি নভোমধ্যে হ্রপীন্দৌ প্রিয়েন বিলম্বতে॥ সদুক্তিক ২।৩৯।৩,
পদ্যাবলী—২১৩

—'সখি সে (নায়ক) নিশ্চয়ই কোন অপর নারী কর্তৃক পাশাখেলায় বিজিত হইয়াছে এবং রাত্রি-বিলাস নিশ্চয়ই পণ করা হইয়াছিল, তাহা না হইলে কেমন করিয়া শেফালিকা ঝরিয়া পড়িলেও এবং চন্দ্র মধ্যাকাশে উঠিলেও প্রিয়তম এখনও বিলম্ব করিতেছে।'

এই পদটিতে নায়কের জন্য নায়িকার উৎকণ্ঠাও প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার সহিত বৈষ্ণবকবি চম্পতির এই পদটির তুলনা করা যায়।

শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ।
ধিক রহু ঐছন তোহারি সুনেহ॥
কাহে কহলি তুঁহু সঙ্কেত বাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ॥
কপট নেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস
কো কহে রসিক শেখর বরকান।
তুঁহু সম মুরুখ জগতে নাহি আন॥
মানিক ত্যজি কাঁচে অভিলাষ।
সুধাসিন্ধু ত্যজি খারে পিয়াস॥
ক্ষীরসিন্ধু ত্যজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে ছিযে তোহারি রভসময় ভাস॥
বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভান।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান॥ পদকল্পতরু, ৩৬৮

সদুক্তিতে আর একটি কবিতা আছে। কবিতাটি কোন অজ্ঞাত কবির রচনা। প্রিয় সংকেতস্থানে না আসাতে নায়িকা খেদ প্রকাশ করিতেছে।

জ্ঞাতং জ্ঞাতিজনৈঃ প্রধৃষ্টমযশো দূরংগতা ধীরতা
ত্যক্তা হ্রীঃ প্রতিপাদিতোহপ্যবিনয়ঃ সাধ্বীপদং প্রোজ্ঝিতম্।
লুপ্তা চোভয়লোকসাধুপদবী দত্তঃ কলঙ্কঃ কুলে
ভূয়ো দূতি কিমন্যদস্তি যদসাবদ্যাপি নাগচ্ছতি॥ সদুক্তিক ২।৩৯।২

—জ্ঞাতিকুল (আমার) অভিসার জানিয়াছে, অযশ প্রচারিত হইয়াছে, ধীরতা চলিয়া গিয়াছে, লজ্জা ত্যক্ত হইয়াছে, অবিনয় প্রকাশিত হইয়াছে, কুলে কলঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে, হে দূতি, আমার আবার অন্য কি আর বেশী হইবে যদি সে (মৎপ্রিয়) আজ না আসে।

এইগুলির পূর্বরূপ দেখি গাহাসত্তসঈর পদগুলিতে। গাহাসত্তসঈর নায়িকা নায়ককে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে। নায়ক সংকেত করিয়া না আসায় নায়িকা নিজেকে প্রতারিতা মনে করিতেছে।

উঅ নিচ্চল-নিপ্পন্দা ভিসিণী-পত্তম্মি রেহই বলাআ।
নিম্মল-মরগঅ-ভাঅণ-পরিট্‌ঠআ সংখসুত্তি বব ॥ গাহা ১।৪

—দেখ, পদ্মপত্রের উপর বলাকা নিশ্চল ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হইয়া শোভা পাইতেছে, যেন নির্মল মরকত-ভাজনের উপর শংখশুক্তি অবস্থিত রহিয়াছে।

গাহাসত্তঈর অপর একটি গীতিকায় বিপ্রলব্ধা নায়িকার বিরহবেদনা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। নায়িকার দূতী নায়ককে বলিতেছে—

এহিসি তুমং ত্তি ণিমিসং ব জগ্‌গিঅং জামিণীঅ পঢ়মদ্ধং
সেসং সংতাব-পরব্বসাই বরিসং ব বোলীণং ॥ গাহা ৪।৮৫

—"তুমি আসিবে এই মনে করিয়া সে (রমণী) রাত্রির প্রথমভাগ এক নিমেষের মত জাগিয়া কাটাইয়াছে, আবার তুমি না আসাতে (বিরহপরবশ হইয়া) সে যামিনীর শেষার্ধ বৎসরের মত (দীর্ঘ) মনে করিয়া অতিক্রম করিয়াছে।"

জয়দেবের "গীতগোবিন্দে" শ্রীরাধার বিপ্রলব্ধা অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্মরসমরোচিত-বিরচিত-বেশা।
গলিত-কুসুমদর-বিলুলিত-কেশা ॥
কাপি মধুরিপুনা
বিলসতি যুবতিরধিকগুণা। গীতগোবিন্দে গীত (১৪)

—রতিরণোচিত বেশে সজ্জিতা (আমা হইতে) অধিক গুণশালিনী কোন যুবতী মধুরিপুর সহিত বিলাসে মাতিয়াছে, তাহার কেশপাশ ঈষৎ শিথিল হইয়াছে, তাহা হইতে ফুলদল খসিয়া পড়িয়াছে।

রূপ গোস্বামীর 'গীতাবলীতে' শ্রীরাধার বিপ্রলব্ধা অবস্থার বর্ণনা দেখা যায়। শ্রীরাধার হৃদয়ের উৎকণ্ঠাও ধ্বনিত হইয়াছে। পদটি অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কোমল-কুসুমাবলী-কৃত-চয়নম্।
অপসারয় রতি-লীলা-শয়নম্ ৷
শ্রীহরিণাদ্য ন লেভে শময়ে।
হন্ত! জনং সখি! শরণং কময়ে॥
বিধৃত-মনোহর-গন্ধবিলাসম্।
ক্ষিপ যামুনতটভুবি পটবাসম্॥
লব্ধমবেহি নিশান্তিম-যামম্।
মুঞ্চ সনাতন-সঙ্গতি-কামম্॥ (গীতাবলী ২৮)

—সখি, কোমল ফুল তুলিয়া রতিলীলা শয্যা পাতিয়াছিলাম, তাহা দূর কর। শ্রীহরি আজ সংকেতসময়ে কুঞ্জে আসিলেন না। হায় সখি, আমি এখন কাহার শরণ লইব। মনোহর সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ যমুনাপুলিনে নিক্ষেপ কর। দেখ, রাত্রির শেষ যাম উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখের আশা ত্যাগ কর।

প্রাদেশিক ভাষায় বৈষ্ণব কবিগণ ঠিক এই রীতি অনুসরণ করিয়া শ্রীরাধার 'বিপ্রলব্ধা' অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

বড়ুচণ্ডীদাসের একটি পদে দেখি রাধা অতি খেদের সহিত বড়ায়িকে বলিতেছেন, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে (অন্য গোপীকে) লইয়া বৃন্দাবনে বিহার করিতেছে, সেই জন্যই কৃষ্ণ আসিতে পারেন নাই।

যে কাহ্ন লাগিয়া মো আন না চাহিলোঁ।
বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরুজনে
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআ রোষে
আন লঞা বঞ্চে বৃন্দাবনে। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহখণ্ড)

পদাবলী সাহিত্যে খণ্ডিতা

বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধার 'খণ্ডিতা' দশা লইয়া পদ লিখিবার বহুপূর্বে প্রাকৃত নায়িকার খণ্ডিতা অবস্থা সম্বন্ধে যে শ্লোকাদি রচিত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাকৃত সংস্কৃত-সংগ্রহগুলিতে উদ্ধৃত কবিতাগুলির মধ্যে। প্রাচীন সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রগুলিতে 'খণ্ডিতা' নায়িকার উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত

শ্লোকগুলিও প্রমাণ করে যে বৈষ্ণবদের আগেই 'খণ্ডিতা'র সম্বন্ধে পদ রচনা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। কালিদাসাদির কাব্যে খণ্ডিতার উদাহরণ মেলে। খণ্ডিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়া বিশ্বনাথ বলেন—

পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্যসংভোগচিহ্নিতঃ।
সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষ্যাকষায়িতা॥

সাহিত্য-দর্পণে, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩।৮৭)

—যাহার প্রিয় অন্য নায়িকার সংভোগ-চিহ্ন ধারণ করিয়া নিকটে আসে, ঈর্ষ্যান্বিতা সেই নায়িকাকে পণ্ডিতগণ 'খণ্ডিতা' বলিয়া অভিহিত করেন।

নায়িকা নায়কের জন্য রাত্রি জাগিয়া কাটাইল, নায়ক আসিল না নায়িকার নিকটে, আসিল পরদিন সকালে অন্য নায়িকার সম্ভোগ-চিহ্ন ধারণ করিয়া। তখন সেই নায়িকাকে 'খণ্ডিতা' বলা হয়। দেখা যাইতেছে নায়িকার খণ্ডিতা অবস্থা তাহার নায়কের প্রতি প্রেমের একটি দশা বা প্রেমের একটি স্তর মাত্র।

বৈষ্ণব পদাবলীতেও অনুরূপভাবেই শ্রীরাধার 'খণ্ডিতা' দশা বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্য মিলন কুঞ্জ সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না, শ্রীরাধা রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন, কৃষ্ণ পরদিন সকালে চন্দ্রাবলীর (প্রতিনায়িকার) কুঞ্জ হইতে সম্ভোগ-চিহ্ন ধারণ করিয়া রাধার কুঞ্জে আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি শ্রীরাধাকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে তিনি অন্য প্রেয়সীর সহিত রাত্রি যাপন করেন নাই। রাধা শ্লেষের সহিত বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি (কৃষ্ণ) সত্য গোপন করিতেছেন। রাধা তখন নিজেকে 'খণ্ডিতা' বলিয়া ভাবিতেছেন। আসলে শ্রীরাধার 'খণ্ডিতা' দশা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার প্রেমের একটি ভাব (অবস্থা) মাত্র। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই ভাবের বহু পদ রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণবরসশাস্ত্রকার রূপগোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণিতে' বলিয়াছেন,—

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা
এষা তু রোষ-নিঃশ্বাস-তূষ্ণীম্ভাবাদিভাক্ ভবেৎ॥

উঃ মঃ নায়িকাভেদপ্রকরণ (৫।৮৫)

—'পূর্ব-সংকেতিত করিয়া যে নায়িকার প্রিয়বল্লভ অন্য নায়িকার সহিত সম্ভোগের চিহ্ন ধারণ করিয়া প্রাতঃকালে আগমন করেন, তাঁহাকে 'খণ্ডিতা' বলে। ইহার চেষ্টা-ক্রোধ, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস, মৌনাদি ॥'

অন্যের সম্ভোগ চিহ্ন করিয়া ধারণ।
আসে প্রাতে প্রিয় যার,—খণ্ডিতা সে জন॥

(রসমঞ্জরী)

'খণ্ডিতা' অবস্থায় নায়িকার সহিত নায়কের মিলন সম্ভব নহে বলিয়া এই ভাবটি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মধ্যে পড়িবে, কারণ ইহাতে বিরহের সুর ধ্বনিত হয়। আসলে নায়িকার 'খণ্ডিতা' দশা তাহার প্রেমের একটি পর্য্যায়মাত্র। 'খণ্ডিতা' অবস্থাতেও নায়িকার বিরহের মত মূর্চ্ছাদি সংঘটিত হইতে পারে। 'সাহিত্য-দর্পণে খণ্ডিতার উদাহরণ হিসাবে একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। খণ্ডিতা নায়িকা সরসভঙ্গীতে নায়ককে বলিতেছে—

তদবিতথমবাদীর্যন্মম ত্বং প্রিয়েতি
প্রিয়জন-পরিভুক্তং যদ্দুকূলং দধানঃ।
মদধিবসতি মাগাঃ কামিনাং মণ্ডনশ্রী-
র্ব্রজতি হি সফলত্বং বল্লভালোকনেন॥

(সা. দ. ৩।৮৭)

—'তুমি আমার প্রিয়া' ইহা সত্যই বলিয়াছ, সেইজন্য প্রিয়জনের বস্ত্র পরিধান করিয়া আমাকে দেখাইতে আসিয়াছ। প্রেমিকার বেশভূষা প্রিয়াকে দেখাইলে সার্থক মনে হয়।

বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের একটি পদে দেখি নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নীলাম্বর পরিধান করিয়া আসিয়া পরদিন সকালে শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। পদটি নীলাম্বরের নামেও প্রচলিত।

রজনি উজাগর লোচনে কাজর
অধর ভেল তব শমরা।
নীল সরোরুহ সিন্দুরে মিলায়ল
মাণিকে বৈঠল যৈছে ভ্রমরা॥
মাধব চলহ কপট অনুরাগি।
সো পুণবতি তুহে যতনে আরাধল
যো রহু তুয়া মনে লাগি॥

যো মুখ হেরইতে খিন ভেল শশধর
সো মুখ কাজরে মলিন।
অরুণ নয়ান কপট অব রাখহ
প্রতি অঙ্গে রতিরণ চিন ॥
যত যত ভুবনে আছয়ে বরনাগরি
তা সম পুনবতি কোই
পীতাম্বর তুয়া নাম মিটায়ল
নীলাম্বর করু তোই ॥

বৈ. প. পৃ. ১০৭

'সাহিত্য-দর্পণের' তৃতীয় পরিচ্ছেদে আর একটি চমৎকার সংস্কৃত শ্লোক দেখা যায়। নায়িকা সোল্লুণ্ঠনভাষণের দ্বারা নায়ককে বলিতেছে।

অনলংকৃতোঽপি সুন্দর হরসি মনো মে যৎ প্রসভম্।
কিং পুনরলংকৃতস্ত্বং সম্প্রতি নখরক্ষতৈস্তস্যাঃ ॥

সাঃ দঃ ৩য় পরিচ্ছেদ (৩।৭৮)

—হে সুন্দর, তুমি ত বিনা আভরণেই আমার মন হরণ কর। আবার সেই নারীর নখক্ষতে ভূষিত হইবার কারণ কি ?

উক্ত পদটির সামান্য পরিবর্তন করিয়া রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব কবিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই পদের 'সুন্দর' শব্দের স্থলে 'মাধব' প্রয়োগ করা হইয়াছে।[১] এখানে দেখিতেছি পার্থিব প্রেমগীতিকা ও বৈষ্ণব প্রেমগীতিকা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

'গাহাসত্তসঈ' হইতেছে প্রেমের কবিতার সংগ্রহ। ইহাতে 'খণ্ডিতা' নায়িকার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

গাহাসত্তসঈর একটি পদে আছে, নায়ক অপর নায়িকার সুগন্ধ মাখিয়া নায়িকার কুশল প্রশ্ন করিতে আসিয়াছে। খণ্ডিতা নায়িকা ঈর্ষান্বিত হইয়া নায়ককে বলিতেছে।

আমজরো মে মন্দো অহব ন মন্দো জণস্স কা তত্তী।
সুহ-উচ্ছঅ সুহঅ সুঅন্ধঅন্ধ মা অদ্ধিঅং ছিবসু ॥ গাহা ১।৫১

১ অনলঙ্কৃতোঽপি মাধব। হরসি মনো সদা প্রসভম্
কিং পুনরলঙ্কৃতস্ত্বং সম্প্রতি নখরক্ষতৈস্তস্যাঃ ।। পদ্যাবলী—২১৯

—হে সুখপৃচ্ছক, হে সুভগ, হে সুগন্ধে (অপর নায়িকার) গন্ধযুক্ত আমার আমজ্বর ভালই হইয়া যাউক বা না যাউক, সে বিষয়ে লোকের চিন্তা কেন? তুমি জ্বরের গন্ধযুক্তাকে স্পর্শ করিও না।

সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত একটি কবিতায় দেখি, খণ্ডিতা নায়িকা কৃতাপরাধ নায়ককে ঠিক এই ভাবেই তিরস্কার করিতেছে।

সার্দ্ধং মনোরথশতৈস্তব ধূর্ত কান্তা
সৈব স্থিতা মনসি কৃত্রিমভাবরম্যা।
অস্মাকমস্তি ন চ কশ্চিদিহাবকাশ-
স্তস্মাৎ কৃতং চরণপাতবিড়ম্বনাভিঃ॥ সদুক্তিক ৩।৩২।২

পদ্যাবলী—২১৮

—'হে ধূর্ত, কৃত্রিমহাবভাবযুক্তা সেই কান্তা তোমার মনোরথের সহিত তোমার মনে অবস্থান করিতেছে, আমাদের সেখানে কোন স্থান নাই, এখন পাদপতনরূপ বিড়ম্বনার প্রয়োজন নাই।'

—পদ্যাবলীতে (২১৮) এই পদটিকে রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব কবিতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেও দেখি, প্রেম-গীতিকা হিসাবে উক্ত পার্থিব নারীর ও শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলীর উক্তি যেন একই সুরে বাঁধা।

সত্তসঈর আর একটি পদে দেখি, নায়ক অপরাধ করিয়া নায়িকার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। তখন 'খণ্ডিতা' নায়িকা কৌশলে তিরস্কার করিতেছে।

কিং দাব কআ অহবা করেসি কারিস্সি সুহঅ এত্তাহে।
অবরাহাণঁ অলজ্জির সাহসু কঅএ খমিজ্জন্তু॥

গাহাসত্তসঈ ১।১০

—হে সুভগ, যে সব অপরাধ তুমি করিয়াছ, এখনও করিতেছ, এবং পরে করিবে, হে নির্লজ্জ, তাহাদের মধ্যে তোমার কোন্ অপরাধগুলি আমি ক্ষমা করিতে পারি তাহা তুমি বল?

শশিশেখরের একটি পদে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য শ্রীরাধাকে অনুনয় করিতেছেন। কৃষ্ণ সংস্কৃত ভাষায় বলিতেছেন আর রাধা বাঙ্গালা ও ব্রজবুলিতে (প্রাকৃতে) উত্তর দিতেছেন। পদটি অন্য প্রসঙ্গে একবার উদ্ধৃত হইয়াছে।

রাধে জয় রাজপুত্রি	উচিতো নহি কোপো ময়ি
মম জীবনদয়িতে।	নিজ-কিংকরো মত্তে।
যাও যাও বঁধু যত বড় তুমি	যাও যাও যত গুণনিধি বট
জানা গেল তুয়া চরিতে ॥	জানা গেল তব তত্ত্বে ॥
কিঞ্চিদপি কস্মিন্নপ-	শান্তিং কুরু দন্তৈর্দশ
রাধং নহি করোমি।	কোপং ত্যজ রুচিরে।
সংকেত করি আন ঘরে যাহ	তথা ফিরি যাহ পুন দংশিবে
নিশি জাগিয়ে আমি ॥	সুখ পাবে বহু অচিরে ॥
মানং ময়ি মুঞ্চ প্রিয়ে	কোপং ত্যজ পদমর্পয়
বচনং শৃণু ধীরে।	মৃদুকিশয়ল-শয়নে।
শুনিবার কিবা কাজ চিহ্ন	তোমা দরশনে শরীর জ্বলিছে
দেখা যায় সব শরীরে ॥	ফিরি যাহ তার সদনে ॥
গতরাত্রৌ যদভূন্মম	কথিতং যদি নহি দাস্যসি
দুঃখং শৃণু সরলে।	কিং তে কথয়ামি।
বধিরা হাম কিয়ে শুনায়সি	শশিশেখর কহে শুভঙ্কর
তাহে শুনায়বি বিরলে ॥	কিয়ে দেখহ স্বামি।"

বৈ. প. পৃ. ১০২৬

সদুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গার-প্রবাহে 'খণ্ডিতা' সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা আছে। দেখা যাইতেছে, বহু পূর্ব হইতেই এই কবিতাগুলি প্রচলিত আছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটিকে রূপ গোস্বামী 'পদ্যাবলী'তে স্থান দিয়া বৈষ্ণব কবিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্মযোগেশ্বরের খণ্ডিতা নায়িকা কৃতাপরাধ নায়ককে তিরস্কারচ্ছলে বলিতেছে।

তব কিতব:কিমাভির্বাগ্ভিরভ্যর্ণচুত-
ক্ষিতিরুহি কলকণ্ঠালাপমাকর্ণয়ন্তী।
রজনিমহমলজ্জাহজাগরং পাংশুলানা-
মুষসি বিধস ন ত্বাং পাণিনাপি স্পৃশামি ॥ সদুক্তিক ২।২৩।১

—হে শঠ, তোমার এই কথার প্রয়োজন কি? নিকটবর্তী আম গাছের তলায় বসিয়া কোকিলের মধুরালাপ শুনিতে শুনিতে নির্লজ্জা আমি রাত্রি

কাটাইয়াছি। হে পাংশুলাদের উচ্ছিষ্ট, সকাল বেলায় আর তোমাকে হাত দিয়া ছুঁইব না।[১]

তুলনীয়— ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ওরে দাঁড়াও সরিয়া
ম্লান করিও না আর মলিন পরশে॥ —রবীন্দ্রনাথ

বাসুদেব কবির নায়ক ঈর্ষ্যাকষায়িতা খণ্ডিতা নায়িকাকে বলিতেছে।

কিংতে বাষ্পস্তিরয়তি দৃশো কিং সকম্পোধরস্তে
গণ্ডাভোগঃ কথয় কিমু তে কোপকেলীকষায়ঃ।
নির্মর্য্যাদে মম হি রজনী-জাগর-ক্লেশরাশে-
রেকঃ সাক্ষী স খলু মুরলাতীরবাণীরকুঞ্জঃ॥ সদুক্তিক ২।২৩।৪

—অশ্রু তোমার চক্ষুকে আচ্ছন্ন করিয়াছে কেন? তোমার অধরই বা কাঁপিতেছে কেন? তোমার কপোল দুটি বা ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়াছে কেন? অয়ি কঠিনে, আমার রাত্রিজাগরণের দুঃখের একমাত্র সাক্ষী সেই মুরলানদীর তীরবর্তী বেতসকুঞ্জ।" কোন সখী কৃতাপরাধ নায়কের হইয়া নায়িকার নিকট অনুরোধ করিতে আসিলে নায়িকা প্রত্যুত্তরে সখীকে দুই-চারি কথা শুনাইয়া দিল। আচার্য্যগোপীক এই ভাবটি একটি পদে প্রকাশ করিয়াছেন। পদটি সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত।

পাদান্তে পতিতঃ প্রিয়ঃ পততু ন প্রব্যক্তবাষ্পোদ্‌গমঃ
সংজাতঃ স ন জায়তাং ত্বমধুনা তদ্বক্তুমত্রাগতা।
একাহং তটিনীতটান্তবিটপাগারে যদা জাগরং
নাসীৎ কাপি সখী তদা ঘনতমঃস্তোমাবৃতায়াং নিশি॥
আচার্যগোপকস্য—সদুক্তিক ২।২৩।৬

—দয়িত পায়ের তলায় পড়িয়াছে? পড়ুক না, তাহার চোখে অশ্রু দেখা দিয়াছে, দিক না, তুমি এখন তাহার (নায়কের) কথা বলিতে আসিয়াছ কিন্তু আমি যখন একাকিনী নদীতীরে কুঞ্জে জাগিয়াছিলাম তখন ঘনান্ধকারপূর্ণ

---

[১] ভবানন্দ—(শ্রীরাধার উক্তি)

আরে মোর কালারে
না ছুঁইও না ছুঁইও রাধার অঙ্গ।
একে অবলা আমি, গোয়ার
রাখাল তুমি
পরশিয়া না কর কলঙ্ক॥ বৈ. প.: পৃ. ১০৮৪

রাত্রিতে তো কোন সখী আমার নিকট আসে নাই।' এইগুলির সহিত অনন্তদাসের একটি পদের তুলনা করা যায়।

চল চল মাধব করহ পয়ান।
জাগিয়া সকল নিশি আইলা বিহান॥
হাম বনচারি রহিয়ে একসরিয়া।
না করহ চাতুরালি তুহুঁ শতঘরিয়া॥
মিছই শপথি না করিহ মোর আগে।
কেমনে মিটাইবে ইহ রতিদাগে॥
যাহ চলি চঞ্চল না কর জঞ্জাল।
দগধ পরাণ দগধ কত বার॥
বিমুখ ভেল ধনি না কহই আর।
দাস অনন্ত অব কি কহিতে পার॥

বৈ. প. পৃঃ ২৪০ ; পদকল্পতরু—৪১১

খণ্ডিতা রাধাকে প্রসাদিত করিবার জন্য কৃষ্ণ অনুনয়-বিনয় করিতেছে। এবং পদতলে পতিত হইতেছে। গোবিন্দদাসের পদে এই ভাবটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরনি লোটাই।
দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব
তবহুঁ বিমুখি ভেল রাই॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত তুহুঁ ভালে জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি
হাম যায়ব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ॥
এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহি
তব নাহি হেরল বয়ান।
পামরি গোবিন্দ মিছই আশোয়াসল
রোই রোই চলু কান॥

বৈ. প. পৃ. ৬৭১ ; পদকল্পতরু ৪৩০

সদুক্তিকর্ণামৃতে অজ্ঞাতনামা কোন কবির রচিত একটি পদ আছে। খণ্ডিতা নায়িকা নায়কের শরীরে অন্যরতিচিহ্ন দেখিয়া সখেদে বলিতেছে।

হংহো কান্ত রহোগতেন ভবতা যৎপূর্বমাবেদিতং
নির্ভিন্না তনুরাবয়োরিতি ময়া তজ্জ্ঞাতমদ্য স্ফুটম্।
কামিন্যা স্মরবেদনাকুলহৃদা যঃ কেলিকালে কৃতঃ
সোত্যর্থং কথমন্যথা তুদতি মামেষ ত্বদোষ্ঠব্রণঃ॥ সদুক্তিক ২।২৪।১

—ওহে কান্ত, পূর্বে গোপনে তুমি আমাকে যে বলিয়াছিলে, আমাদের শরীর একই, তাহা ভালভাবে জানা গেল। মদনপীড়িত কামিনীদের দ্বারা কেলিকালে যাহা করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, তাহা না হইলে তোমার ওষ্ঠব্রণ দেখিয়া আমার হৃদয় পীড়িত হইবে কেন?

ইহারই পূর্বরূপ দেখি গাহাসত্তসঈর একটি পদে। ব্যাধপত্নী ব্যাধের অধর মক্ষিকাদষ্ট দেখিয়া অন্যনায়িকার রতিচিহ্ন ভাবিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া পড়িল।

মহুমচ্ছিআই দট্ঠং দট্ঠুণ মুহং পিঅস্স সূণোট্ঠং।
ঈসালুঈ পুলিন্দী রুক্খচ্ছাঅং গআ অন্নং॥' গাহা স ৭।৩৪

—মধুমক্ষিকাদষ্ট দয়িতের স্ফীত ওষ্ঠযুক্ত মুখ দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিতা ব্যাধপত্নী অন্য বৃক্ষচ্ছায়ায় চলিয়া গেল।

সদুক্তিকর্ণামৃতে অমরুকবির একটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটিতে দেখি নায়কের শরীরে অন্য যুবতীর রতিচিহ্ন দেখিয়া নায়িকা অতিদুঃখে মূর্চ্ছা যাইতেছে। এই পদটি 'অমরুশতকে' সাধারণ নর-নারীর প্রেমের কবিতা হিসাবে পাইয়া থাকি। রূপগোস্বামী এইটিকে 'বৈষ্ণব কবিতা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পার্থিব প্রেমকবিতা ও বৈষ্ণব প্রেমকবিতা এখানে একাকার হইয়া গিয়াছে। বলিতে পারি, লৌকিক প্রেমগীতিকাই বৈষ্ণব তত্ত্বদৃষ্টির প্রভাবে 'বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায়' (রাধা-কৃষ্ণলীলায়) পরিণত হইয়াছে। আবার, বৈষ্ণব কবিতার আস্বাদকালে পার্থিব প্রেমকবিতা স্মৃতিপথে উদিত হয়।

লাক্ষালক্ষ্মললাটপট্টমভিতঃ কেয়ূরমুদ্রা গলে
বক্ত্রে কজ্জল-কালিমা নয়নয়োস্তাম্বূলরাগোদয়ঃ।
দৃষ্টা কোপবিধায়িমণ্ডনমিদং প্রাতঃ প্রেয়সঃ
ক্রীড়াতামরসোদরে হৃমূজদৃশঃ শ্বাসাঃ সমাপ্তিং গতাঃ॥
সদুক্তিক ২।২৪।৪, পদ্যাবলী ২১৭

—'(নায়কের) কপালের দুইধারে অপর যুবতী প্রদত্ত লাক্ষার চিহ্ন, গলায় বলয়ের চিহ্ন, মুখে কাজলের কাল দাগ, নয়নদ্বয়ে তাম্বুলের রাগ, সকালবেলায় হরিণনয়না (নায়িকা) বহুক্ষণ ধরিয়া প্রিয়তমের এই কোপবিধায়ক (অন্য নায়িকা কর্ত্তৃক প্রদত্ত) ভূষণের দিকে তাকাইয়া থাকিলে হস্তস্থিত ক্রীড়াপদ্মেই তাহার শ্বাস যেন সমাপ্ত হইল।'

বৈষ্ণবকবি নরহরি এইভাবেই রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত এই পদটি চণ্ডীদাসের নামেও প্রচলিত। শ্রীকৃষ্ণ অন্য যুবতীর চিহ্ন ধারণ করিয়া আসিলে শ্রীরাধা ঠিক পার্থিব নায়িকার মতই শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতেছেন।

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ ॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কালো।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে আজ ভালো ॥
অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥
চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দুরের দাগ আছে সর্বগায়
মোরা হলে মরি লাজে ॥
নীলকমল ঝামরু হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন রসবতী পেয়ে সুধানিধি
নিঙারি লয়েছে লেহ।
কুটিল নয়নে কহিছে সুন্দরী
অধিক করিয়া ত্বরা।
কহে চণ্ডীদাস আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা।

গাহাসত্তসঈর একটি পদে দেখি খণ্ডিতা নায়িকা সূর্য্যনমস্কারচ্ছলে প্রত্যুষাগত নায়ককে অম্লমধুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছে।

পচ্চূসাগঅ রঞ্জিতদেহ পিআলোঅ লোঅণান্দ।
অন্নত্তখবিঅ-সব্বরি ণহভূসণ দিণবই ণমো দে ॥ গাহা স ৭।৫৩

—'হে দিনপতি (সূর্য্য) তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রত্যুষে আগত হও, তোমার দেহ আরক্ত, তোমার প্রকাশ সকলের প্রিয়, তুমি লোচনানন্দদায়ক, তুমি অন্যত্র রজনী কাটাইয়াছ, এবং তুমি আকাশের ভূষণস্বরূপ।'

এখানে একপক্ষে 'সূর্য্য' অন্যপক্ষে 'ধৃষ্ট নায়ককে' লক্ষ্য করা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদে রাধার 'খণ্ডিতা' দশাটি চমৎকার ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥
বঁধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর বিন্দু মুনিমনোলোভা॥
খরনখদশনে অঙ্গ জরজর।
ভালে সে কঙ্কনদাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাড়ী কোঁচার বলনী
রমণী রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কোন কাজে॥
চারিদিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে॥ পদকল্পতরু ৪০৩

উমাপতিধরের একটি পদ আছে সদুক্তিকর্ণামৃতে। পদটিতে খণ্ডিতা নায়িকা নায়কের আচরণে নিজের খেদের কথা বলিতেছে। নায়িকা নায়ককে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে।

নিদ্রাচ্ছেদকষায়িতে তব দৃশৌ দৃষ্টির্মমালোহিনী
বক্ষো মুষ্টিভিরাহতং তব হৃদি স্ফূর্জন্তি মে বেদনাঃ।
আশ্চর্য্যং নবকুন্দকুড্মলশিখা তীক্ষ্ণৈরমীভির্নখৈঃ
প্রত্যঙ্গং তব জর্জরা তনুরহং জাতা পুনঃ খণ্ডিতা॥ সদুক্তিক ২।২৪।৫

(উমাপতিধরস্য)

—'তোমার (নায়কের) নয়ন দুইটি অনিদ্রাহেতু কষায়িত, আমার দৃষ্টি ক্রোধে রক্তবর্ণ, তোমার বক্ষ মুষ্টির দ্বারা আহত আর আমার হৃদয়ে বেদনা, আশ্চর্য্য যে তোমার শরীরের প্রতি অঙ্গ তীক্ষ্ণনখের দ্বারা নূতন কুন্দফুলের কুড়ির মত ক্ষত-বিক্ষত আর আমি এধারে 'খণ্ডিতা' হইলাম।'

ইহারই অনুরূপ একটি পদ দীনবন্ধুদাসের 'সংকীর্তনামৃতে' উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদটি ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। (ষো. শ. প., পৃ. ৪২৯-৪৩০)

ত্বৎপীনোরসি পাণিজক্ষতমিতো জাজ্বল্যতে মে মনঃ
ত্বদ্‌বিম্বাধরচুম্বিকজ্জলমিতঃ শ্যামায়িতং মে মুখম্‌।
যামিন্যাং মম জাগরাত্তব দৃশৌ শোণায়মানে ততো
দেহার্দ্ধং কিমু যাচসে হি ভগবন্নৈকৈব যন্নৌ তনুঃ॥

—'তোমার পীনবক্ষে নখের দাগ আর আমার হৃদয়ে জ্বালা ধরিতেছে, তোমার ঠোঁটে কাজলের দাগ, আর তাহাতেই আমার মুখ মলিন হইয়াছে, আমি তোমার আগমনের আশায় জাগিয়া রাত্রি কাটাইলাম আর তাহাতেই তোমার চোখ দুইটি লাল দেখাইতেছে। তুমি অর্ধাঙ্গ কেন প্রার্থনা করিতেছ, হে ভগবন্, তুমি আর আমি ত একই শরীর।'[১]

উপরি-উক্ত প্রাচীন পদ দুইটির ভাব লইয়া গোবিন্দদাস একটি পদ লিখিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি প্রাচীন লৌকিক কবিতার ভাববিস্তার করিয়াছেন। শ্রীরাধা এখানে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন।

নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি॥
অধরহি কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
হাম উজাগরি সারা রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম ভাতি॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুঁহু হাম একহি পরাণ॥

হামারি রোদন অভিলাষ।
তুহুঁক গদ গদ ভাষ॥
সবে নহে তনু তনু সঙ্গ।
হাম গৌরী তুঁহু শ্যাম অঙ্গ॥
অতএব চলহ নিজবাস।
কহতহি গোবিন্দদাস॥ পদামৃতসমুদ্র ১৮৪পৃঃ,
পদকল্পতরু ৪২৩

(১) তুঃ—

একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেঽত্যগাধে
একাসু-সংগ্রথিতমেব তনুদ্বয়ং নৌ।
কস্মিংশ্চিদেক-সরসীব চকাসদেক-
নালোত্থমব্জযুগলং খলু নীলপীতম্‌॥ —প্রেমসম্পুটঃ
(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত)

১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু দাস তাঁহার সংকীর্তনামৃতে একটি প্রাচীন সংস্কৃত কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখিয়াছেন যে কবি গোবিন্দদাস তাঁহার একটি বিখ্যাত পদ উক্ত সংস্কৃত কবিতাকে মূলস্বরূপ গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন। সংস্কৃত পদ

এবং গোবিন্দদাসের পদ উভয়ই এখানে প্রদত্ত হইল। 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' হইতে পদ দুইটি পাইয়াছি।

চূড়াচন্দ্রমণ্ডিতালকতটে সিন্দুরমুদ্রা শিখা
তব্বচ্চন্দন-মধ্য বিলসৎ কস্তুরিকালোচনম্।
তেন ত্র্যম্বকতৈব লোকদহনো দগ্ধঃ স মে মন্মথ-
স্তদ্দূরাৎ প্রণমাম্যমাধবমহো ত্বামপি দিগ্‌বাসসম্॥

যো. শ. প. (খণ্ডিতা) পৃ. ৪২৭-৪২৮

—(নায়ক অন্য যুবতীর রতিচিহ্ন ধারণ করিয়া আসিলে নায়িকা তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে) শিবের মত তোমার চূড়ায় চন্দ্র রহিয়াছে, কপালে সিন্দুর চিহ্নের শিখা, চন্দনের মধ্যে মৃগমদের চিহ্ন লাগায় লোচনের মত দেখাইতেছে, সেই হেতু তোমার অবস্থা লোকদগ্ধকারী শংকরের মত, সে আমার মনের মনসিজ (বাসনা) দগ্ধ করিয়াছে, সেই জন্য তোমাকে দূর হইতে প্রণাম, (শংকরের মত) তোমার দিগ্‌বসন।

কবি গোবিন্দদাস এই সংস্কৃত কবিতাকে মূল-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া নিম্নস্থ পদটি রচনা করিয়াছেন। সকাল বেলায় শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারীর উপভোগচিহ্ন ধারণ করিয়া শ্রীরাধার নিকট আসিলে শ্রীরাধা বিদ্রূপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শংকরের সঙ্গে তুলনা করিতেছেন।

আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
ভালহি সিন্দুরদহনা।
চন্দন চান্দ মাহা লাগল মৃগমদ
তাহে বেকত তিন নয়না।
মাধব, অব তুঁহু শংকর দেবা।
জাগর পুণফলে প্রাতরে ভেটনু
দূরহি দূরে রহু সেবা
চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম সম ভেল।
তোহারি দরশনে মঝু মনে মনসিজ
মনোরথ সঙ্গে জরি গেল॥

তবহুঁ বসন ধর কাঁহে দিগম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দদাস কহ ইহ পর অম্বর
গণইতে লেখি না লেখি ॥ (পদকল্পতরু ৪০৫)

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে শংকর বলিয়া বিদ্রূপ করিলে কৃষ্ণও প্রত্যুত্তরে শ্রীরাধাকে গৌরীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং বলিতেছেন, এখন এস আমরা হরগৌরীর মত একদেহ হই। গোবিন্দদাস এই ভাবের একটি পদ লিখিয়াছেন। গোবিন্দদাসের এই পদটির মূল যে একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক তাহা ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় দেখাইয়াছেন। সংস্কৃত কবিতা ও বৈষ্ণব কবিতা উভয়ই এখানে দেওয়া হইল।

গৌরী কেশরিমধ্যমা ত্রিনয়না রোষাকুলালোকনৈঃ
কাঠিন্যাদ্বিদিতাদ্রিরাজতনয়া কালী ভ্রুবোর্ভঙ্গতঃ।
ত্বং চণ্ডীতি বিলোক্য মানিনি কথং ন স্যামহং শঙ্করঃ
তস্মাৎ কামিনি শঙ্করে পশুপতাবর্ধমঙ্গমঙ্গীকুরু ॥

গো. শ. প. পৃ. ৪২৮

—'তুমি গৌরী, সিংহের মত ক্ষীণ-মধ্যা, রোষদৃষ্টি নিক্ষেপের জন্য ত্রিনয়না, কঠোরতা হেতু তোমার পর্বতরাজগৃহে জন্ম সুবিদিত, ভ্রূভঙ্গের জন্য তুমি কালী, হে মানিনি, তোমাকে চণ্ডী (কোপনা) দেখিয়া আমি কেননা শংকর হইব? তাহা হইলে হে কামিনি, সেই পশুপতি শংকরকে তোমার অর্ধাঙ্গ দান কর।'

কবি গোবিন্দদাসও শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া এই কথাই বলাইয়াছেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে শংকর বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে গৌরী বলিয়া অর্ধাঙ্গ দাবি করিতেছেন।

সহজই গোরি রোখে তিন লোচন
কেশরি জিনি মাঝা খীন।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে
শৈলসুতা কর চীন ॥
সুন্দরি, অব তুঁহু চণ্ডিবিভঙ্গ।
যব হাম শংকর তুয়া নিজ কিঙ্কর
দেওবি মোহে আধ অঙ্গ ॥

—সখি, প্রাতঃকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়া মিথ্যা কথা বলিতে ইহার (নায়কের) লজ্জা হয় না। মুখে লাগিয়া থাকা পোড়া কজ্জলের দাগেও (অন্য নায়িকার সংভোগচিহ্ন) এই ব্যক্তি (নায়ক) একটুও লজ্জিত হইতেছে না।

চণ্ডীদাসের পদেও ঠিক এই ভাবটি দেখি। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন্ লাজে আস॥
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কনের দাগ।
কোন্ কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ॥
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভায় হয়েছ ভূষিত॥
কপালে সিন্দুর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনি বিহনে তোমার আঁখি ছলছল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥

(পদকল্পতরু, ৩৯৩)

সদুক্তিকর্ণামৃতে অমরু কবির একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। নায়কের ধৃষ্টতা জ্ঞাত হইয়া রোষকলুষিতা নায়িকা তাহার বামচরণ নায়কের মস্তকে প্রদান করিল।

ততশ্চাভিজ্ঞায় স্ফুরদরুণগণ্ডস্থলরুচা
মনস্বিন্যা রূঢ়প্রণয়কলহাবিষ্টমনসা।
অহো চিত্রং চিত্রং স্ফুটমিতি লপন্ত্যাশ্রুকলুষং
রুষা ব্রহ্মাস্ত্রং মে শিরসি নিহিতো বামচরণঃ॥ সদুক্তি ২।২৩।৫

—"তাহার পর সেই মনস্বিনী (আমার) অপরাধ জ্ঞাত হইয়া দুর্জয় কোপে আবিষ্ট হইল এবং ক্রোধহেতু রক্তবর্ণ গণ্ডস্থল ধারণ করিয়া আশ্চর্য্য, 'তাহার অপরাধ স্পষ্ট' এই বলিয়া অশ্রুকলুষিত হইয়া ক্রোধে ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ তাহার বামচরণ আমার মস্তকে স্থাপন করিল।" বৈষ্ণবেরাও শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া শ্রীরাধার পদ ধারণ করাইয়াছেন। কোন বৈষ্ণব পদে দেখি রাধা কৃষ্ণের অঙ্গে পা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন।

"নিন্দ যায় ধনী চাঁদবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা।" (জগন্নাথ দাস)।
প্রেম-কবিতার এই রীতি বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত আছে দেখা যায়, কেবল বৈষ্ণবদের নিজস্ব সৃষ্টি নয়।

বৈষ্ণবেরেরাও ঠিক এই ভাবেই রাধার 'খণ্ডিতা দশা' বর্ণনা করিয়াছেন দেখিতে পাই। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' দেখি শ্রীকৃষ্ণ অন্য যুবতীর চিহ্ন ধারণ করিয়া শ্রীরাধার কাছে আসিলে রাধা কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা-বাক্য বলিতেছেন।

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্।
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্॥
কজ্জল-মলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্॥ গীতগো ১৭

—"হরি! হরি! মাধব, তুমি যাও, কেশব, তুমি যাও। কপট বাক্য আর বলিও না। পুণ্ডরীকাক্ষ, যে তোমার বিষাদ দূর করিবে, তাহারই অনুসরণ কর। সেই রমণীর কজ্জলমলিন নয়নচুম্বনে নীলিমরূপ ধারণ করিয়া তোমার অরুণাধর অঙ্গের অনুরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে।"

রূপগোস্বামীর গীতাবলীতে এই ভাবটিই লক্ষ্য করি।

হৃদয়ান্তরধিশয়িতম্।
রময় জনং নিজ-দয়িতম্॥
কিং ফলমপরাধিকয়া।
সম্প্রতি তব রাধিকয়া॥
মাধব পরিহর পটিম-তরঙ্গম্।
বেত্তি ন কা তব রঙ্গম্॥
আঘূর্ণতি তব নয়নম্।
যাহি ঘটীং ভজ শয়নম্॥

অনুলেপং রচয়ালম্।
নশ্যতু নখ-পদ-জালম্॥
ত্বামিহ বিহসতি বালা।
মুখর-সখীনাং মালা॥
দেব সনাতন বন্দে।
ন কুরু বিলম্বমলিন্দে॥
(গীতাবলৌ ২৯)

—"তোমার হৃদয়াধিষ্ঠিতা নিজ দয়িতার মনোরঞ্জন কর, এখন আর অপরাধিনী রাধার নিকট তোমার কোন্ প্রয়োজন? মাধব, প্রবঞ্চনা-চাতুর্য্য পরিত্যাগ কর, তোমার রঙ্গ কে না জানে? (রাত্রি জাগরণে) ঘুমে দুটি আঁখি ঢুলু ঢুলু, যাও, কিছুক্ষণ শয্যায় গিয়া ঘুমাও। অঙ্গে অনুলেপন মাখিয়া (তোমার প্রিয়তমার কৃত) নখক্ষতগুলি ঢাকিয়া ফেল। মুখরা যুবতী যত সহচরীদল

তোমাকে উপহাস করিতেছে। দেব সনাতন, তোমাকে প্রণাম। অলিন্দে আর বিলম্ব করিও না। (হে দেব, ভক্ত সনাতন তোমাকে প্রণাম করিতেছে)। তুমি আর শ্রীমতীকে মিথ্যাবাক্যে উত্যক্ত করিও না।” রূপ গোস্বামীর ‘পদ্যাবলী’তে অনুরূপভাবের একটি পদ আছে। পদটি এই—

শঠান্যস্যাঃ কাঞ্চীমণিরণিতমাকর্ণ্য সহসা
যদাশ্লিষ্যন্নেব প্রশিথিলভুজগ্রন্থিরভবঃ।
তদেতৎ কাচক্ষে ঘৃতমধুময়ত্বাদ্ বহুবচো
বিষেণাঘূর্ণন্তী কিমপি ন সখী মে গণয়তি॥”

পদ্যাবলী ২৬৩। (অমরুক ১৩)

—“হে শঠ! অপর কোনও বনিতার মেখলাস্থিত মণিশব্দ শুনিয়া যে আলিঙ্গন সময়ে তোমার বাহুবন্ধন শিথিল হইয়াছিল, তাহা আর কাহাকে বলিব। মিশ্রিত ঘি ও মধুর মত তোমার বচনের বিষে আমার প্রিয়সখীর মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। তোমার যে কি অভিপ্রায় তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই।”

অমরুর উক্ত পদটি ‘সাহিত্য-দর্পণে’[১] শঠ নায়কের উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে “অথ কৃষ্ণং প্রতি চন্দ্রাবলী-বাক্যম্” বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পার্থিব নরনারীর প্রেমের কবিতাকে “বৈষ্ণব কবিতা” বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্বকালীয় প্রেম কবিতার ধারা অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণব কবিরা বৈষ্ণব-প্রেমগীতিকা সৃষ্টি করিয়াছেন।

॥ পদাবলী-সাহিত্যে স্বাধীন-ভর্তৃকা ॥

পার্থিব প্রেমকবিতায় “স্বাধীন-ভর্তৃকা’ সম্বন্ধে বহু শ্লোকাদি রচিত হইয়াছে। কান্ত যে নায়িকার প্রেমে বশীভূত হইয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করে, সেই নায়িকাকে ‘স্বাধীন-ভর্তৃকা’ বলে। নায়ক সেই অবস্থায় নায়িকার নির্দেশমত বা নায়িকার রুচিকর কাজ করিয়া থাকে। নায়িকার বাহ্যিক শরীর-সৌন্দর্য বা বাহ্যিক অলংকারাদির বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। স্বাধীন-ভর্তৃকার অপর অর্থ ‘আক্রান্ত-নায়কা’—অর্থাৎ নায়ককে যে বশে রাখে।

১। সা. দ. ৩।৪৭

ভারতীয় কবিগণ এইভাবেই স্বাধীন-ভর্তৃকার বর্ণনা দিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যে ইহার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশ্বনাথ কবিরাজ লিখিয়াছেন—

কান্তো রতিগুণাকৃষ্টো ন জহাতি যদন্তিকম্।
বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীন-ভর্তৃকা ॥

সাহিত্য-দর্পণে, ৩য় পরিচ্ছেদ, (৩।৮৬)

—"রতিগুণে আকৃষ্ট হইয়া কান্ত যাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে না, যে নানাবিধ বিলাসে আসক্ত, সেই নায়িকা স্বাধীন-ভর্তৃকা।"

বৈষ্ণবেরা 'স্বাধীন-ভর্তৃকা' সম্বন্ধে পদ লিখিবার বহু পূর্বেই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে স্বাধীন-ভর্তৃকা সম্বন্ধে পদ রচিত হইয়াছে দেখা যায়। সদুক্তি-কর্ণামৃতের শৃঙ্গারপ্রবাহবীচিতে এই সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে দেখা যায়। নায়ক-নায়িকার প্রেমের এই অবস্থাকে সম্ভোগ শৃংগারের মধ্যে ধরিতে হয়। বৈষ্ণব কবিতাতেও রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলায় শ্রীরাধার 'স্বাধীন-ভর্তৃকা' দশা চিত্রিত হইয়াছে। প্রেমের যে অবস্থায় শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বশে রাখেন রাধার সেই দশাকে আমরা স্বাধীন-ভর্তৃকা দশা বলিতে পারি। বৈষ্ণব অলংকারশাস্ত্রে একইভাবে 'স্বাধীন-ভর্তৃকার' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীন-ভর্তৃকা।
সলিলারণ্য-বিক্রীড়া-কুসুমাবচয়াদিকৃৎ ॥

উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদ প্রঃ (৫।৯১)

—"দয়িত যে নায়িকার অধীন হইয়া সতত সমীপে অবস্থান করেন, সেই নায়িকাকেই 'স্বাধীন-ভর্তৃকা' বলে। ইহার চেষ্টা—জলকেলি, বনবিহার, কুসুমচয়নাদি।"

"সাহিত্য-দর্পণে" একটি প্রাচীন শ্লোক স্বাধীন-ভর্তৃকার উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। নায়িকা তাহার সখীকে বলিতেছে যে তাহার অলংকার ও হাবভাব কিছুই নাই তবু নায়ক অপর কোন রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করে না। নায়িকা নিজের সৌভাগ্য প্রকটিত করিতেছে।

অস্মাকং সখি বাসসী ন রুচিরে গ্রৈবেয়কং নোজ্জ্বলং
নো বক্রা গতিরুদ্ধতং ন হসিতং নৈবাস্তি কশ্চিন্মদ।

কিন্ত্বন্যেঽপি জনা বদন্তি সুভগোঽপ্যস্যাঃ প্রিয়ো নান্যতো
দৃষ্টিং নিক্ষিপতীতি বিশ্বমিয়তা মন্যামহে দুঃস্থিতম্ ॥

—সাহিত্য-দর্পণ (৩য় পরিচ্ছেদ। ৩।৮৬)

—হে সখি, আমার বেশ মনোরম নয়, কণ্ঠহারও উজ্জ্বল নয়, হাবভাব ব্যঞ্জক বংকিমগতিও আমার নাই, আমার হাসিও চিত্তাকর্ষক নহে এবং যৌবনাদিজনিত চিত্তবিকারও আমার নাই, কিন্তু অন্যান্য যুবতীগণ বলিয়া থাকে আমার প্রিয়তম সুন্দর অথচ আমি ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না।

নায়িকা নিজগুণে নায়ককে নিজের বশে রাখিয়াছে, দেখা যায়। 'সাহিত্য-দর্পণের' আর একটি শ্লোকে দেখা যায় নায়িকা এরূপভাবে নায়ককে বশীভূত করিয়াছে যে তাহাকে দিয়া নিজের বেশভূষা সম্পাদন করাইয়া লইতেছে। উল্লিখিত পদটি সদুক্তিকর্ণামৃতেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

পদটি এই—

স্বামিন্ ভঙ্গুরয়ালকং, সতিলকং ভালং বিলাসিন্ কুরু
প্রাণেশ ত্রুটিতং পয়োধরতটে হারং পুনর্যোজয়।
ইত্যুক্ত্বা সুরতাবসানসময়ে সম্পূর্ণচন্দ্রাননা
স্পৃষ্টা তেন তথৈব জাতপুলকা প্রাপ্তা পুনর্মোহনম্ ॥

(সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩।৭৪),
সদুক্তিক ২।৩৮।২ (রুদ্রটস্য)

—হে বিলাসী, স্বামী, অলক বন্ধন করিয়া দাও, কপোলে তিলক অঙ্কন করিয়া দাও। প্রাণনাথ, স্তনতটের উপর ছিন্নহার লাগাইয়া দাও। সুরতের পর চন্দ্রমুখী এই কথা বলিলে পর নায়কের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হইয়া আবার মোহগ্রস্তা হইল। এখানে দেখা যাইতেছে নায়িকা নায়ককে সম্পূর্ণভাবে আক্রান্ত করিয়াছে অর্থাৎ নায়িকাকে 'আক্রান্ত-নায়কা' বলা চলে।

গাহাসত্তসঈর একটি পদে দেখি শিব পার্বতীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার প্রিয়ভূষণ সর্পালংকার ত্যাগ করিয়াছেন। কোন নায়িকার সখী এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া নায়ককে উপদেশ দিতেছেন নায়িকার মনোমত কাজ করিবার জন্য।

পাণিগ্গহণে ব্বিঅ পব্বঈএ ণাঅং সহীহিঁ সোহগ্গং।
পসুবইণা বাসুই-কঙ্কণম্মি ওসারিএ দূরং ॥ গাহা স ১।৬৯

—পাণিগ্রহণে (বিবাহের সময়) শিবকে (নিজহস্তের) বাসুকিরূপ বলয়কে খুলিয়া ফেলিতে দেখিয়া সখীরা পার্বতীর সৌভাগ্য জানিয়া লইয়াছে।

গাহাসত্তসঈর একটি গাথায় আছে, কৃষ্ণ মুখের বাতাস দিয়া রাধার চক্ষুতে পতিত গরুর পায়ের ধুলি দূর করিয়া দিতেছেন। অন্যান্য গোপীদের চেয়ে রাধা যে কৃষ্ণের নিকট অধিকতর প্রিয়া ছিলেন তাহাও বোঝা যাইতেছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম অবলনে লিখিত এই কবিতাটি গাহাসত্তসঈর অন্যান্য প্রেম-কবিতার সহিত একই সুরে রচিত।

মুহ-মারুএণ তং কণ্হ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এআণ বল্লবীণং অন্নাণ বি গোরঅং হরসি ॥

(গাহাসত্তসঈ ১।৮৯)

—হে কৃষ্ণ, তুমি তোমার মুখের বাতাস দিয়া রাধিকার চক্ষু হইতে গোধূলি (গোরজ) অপনীত করিয়া অপরাপর এই গোপীদের গৌরব (গৌরতা) হরণ করিতেছ। এখানে দেখি একান্ত বশংবদ ও অনুরক্ত কৃষ্ণ রাধিকার সেবা করিতেছেন।

এইগুলির সহিত গোবিন্দদাসের একটি পদের তুলনা করিতে পারি।

ধনি ধনি রমণি শিরোমণি রাই।
নয়নক ওত করত নাহি মাধব
নিশি দিশি রস অবগাই ॥
করতলে কুঙ্কুমে ও মুখ মাজই
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোকনে পুন পুন হেরই
আকুল গদ গদ বোল ॥

লোচন খঞ্জনে অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতিমূল।
অতসি কুসুমসারি ললিত হৃদয়ে ধরি
কুপণ হেম সমতুল ॥
যাবক চীত চরণ পর লীখই
মদন পরাজয় পাত।
গোবিন্দদাস কহই ভালে হোয়ল
কানুক আরকত হাত ॥

বৈ. প. পৃ. ৬৫৪

নরোত্তম দাসের পদেও শ্রীরাধার 'স্বাধীন-ভর্তৃকা' দশার বর্ণনা দেখা যায়।

আনন্দে সুবদনী কছু নাহি জান।
বেশ বনায়ত নাগর কান ॥

তাম্বুল সাজি বদন মাহা দেল।
পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল ॥

সিন্দুর দেয়ল সীথি সঙারি। কোরে আগোরি রাখল হিয়া মাঝ॥
ভালহি মৃগমদ-পত্রক সারি॥ কো কহ তাকর মরমক কাজ॥
চিকুরে বনাওল বেণি ললীত। চির পরিপূরিত তুহুঁ অভিলাষ।
কুঙ্কুম কুচযুগে করল রচীত॥ হেরই নিয়ড়ে নরোত্তম দাস॥
যাবক লেখল রাতুল চরণে। বৈ. প. পৃ. ৫৫৮
জীবন নিছাই লেওল তছু শরণে॥

রূপ গোস্বামীর একটি পদেও দেখি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বেশ রচনা করিয়া দিতেছেন—

সিচয়মুদঞ্চয় হৃদয়াদল্লম্।
বিলিখাম্যদ্ভুত-মকরাকল্লম্॥
ইহ নহি সঙ্কুচ পঙ্কজ-নয়নে।
বেশং তব করবৈ রতি-শয়নে॥
রাধে দোলয় ন কিল কপোলম্।
চিত্রং রচয়াম্যহমবিলোলম্॥
তব বপুরত্র সনাতন-শোভম্।
জনয়তি হৃদি মম কঞ্চন লোভম্॥ (গীতাবলী ১১)

—'তোমার বক্ষোবসন কথঞ্চিৎ অপসারিত কর। আমি ঐ বক্ষে (ঘন চন্দন রসে) অদ্ভুত মকরাকার চিত্র অঙ্কিত করিব। পদ্মপলাশাক্ষি, ইহাতে সঙ্কোচ করিও না। তোমার রতিশয়নোচিত বেশ রচনা করিয়া দিতেছি। রাধে, চাঞ্চল্য প্রকাশ করিও না। আমি অত্যন্ত ধীরভাবে তোমার গণ্ডদেশে চিত্র রচনা করিতে চাই। তোমার এই চিরসুন্দর দেহ আমার হৃদয়ে কেমন একরূপ লোভের সঞ্চার করিয়াছে। —(পক্ষান্তরে সখীর ভূমিকায় সনাতন গোস্বামী রচিত তোমার অঙ্গশোভা।)

ইহার সহিত বলরামদাসের একটি পদের তুলনা করা যায়।

রাই মুখ-পঙ্কজ কুঙ্কুমে মাজল
বসনহি পুলক আগোর।
নিরমিত সিন্দুর যতনে নিবারই
নীঝর নয়নক লোর॥
এ সখি চতুর শিরোমণি কান।
নিরমজি উনমজি আরতিসায়রে
করল বেশ নিরমাণ॥

অঞ্জইতে লোচন ঢুনয়ন ছল ছল
করল ঘরম জল চোরি।
কত পরকারহিঁ কাঁপ নিবারল
লিখইতে উচ কুচ জোরি॥
বসন পরাইতে মুগধল নাগর
থম্বি রহল যব নাহ।
তব দিঠি কুঞ্চিত রঙ্গদেবি সখি
তহিঁ বলরাম মুখ চাহ॥ বৈ. প. পৃ. ৭৫১

সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত রুদ্রট কবির একটি কবিতায় আছে, নায়ক নায়িকার একান্ত বশংবদ হইয়া বেশভূষা রচনা করিয়া দিতেছে।

লিখতি কুচয়োঃ পত্রং কণ্ঠে নিয়োজয়তি স্রজং
তিলকমলিকে কুর্ব্বন্নারাদুদস্যতি কুন্তলান্।
ইতি চাটুশতৈর্বারং বারং প্রিয়াং পরিতঃ স্পৃশন্
বিরহবিধুরো নাস্যাঃ পার্শ্বং বিমুঞ্চতি বল্লভঃ॥ সদুক্তিক ২।৩৮।১

—'দয়িত (বল্লভ) তাহার (নায়িকার) পয়োধরে পত্রাবলী রচনা করিয়া দিতেছে, কণ্ঠদেশে মালা পরাইয়া দিতেছে, কপালে তিলক রচনা করিয়া দিয়া পাশের চুলগুলি সরাইয়া দিতেছে, এইভাবে বহুচাটুকারের দ্বারা প্রিয়াকে বারবার স্পর্শ করিতে করিতে বিরহবিধুর দয়িত তাহার (নায়িকার) পার্শ্ব ত্যাগ করে না।'

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দেও' অনুরূপ ভাব দেখিতে পাই।

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়ো-
র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভারম্।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা-
বিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ॥
গীতগোবিন্দ ১২।২৫

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

—পয়োধরে পত্রাবলি রচনা কর, গণ্ডদেশে চিত্র অঙ্কন করিয়া দাও, জঘনে কাঞ্চী পরাইয়া দাও, কেশভার মাল্যশোভিত কর, হস্তে বলয় পরাইয়া দাও,

পায়ে নূপুর দাও—এইভাবে কথিত হইলে প্রীত পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ) সেইরূপই করিলেন।

চন্দ্রশেখর ঠিক এই ভাবেই শ্রীরাধার স্বাধীন-ভর্তৃকা অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

কি করিলে মনসিজ- মত্ত মহোদ্ধত
দেখহ নয়ন পসারি।
ক্ষত-বিক্ষত ভেল মঝু কুচ মণ্ডল
নখর নিশানে তুহারি॥
নিরলজ অরু হাম কি কহব তোয়।
আপন মন্দিরে কৈছনে যাওব
ননদিনি কি কহব মোয়॥
মৃগমদ-চন্দন কর অনুলেপন
যৈছন নখ-পদ ছাপে।
আপন ভালাই চাহি বেণি বান্ধহ
চাঁচর চিকুর-কলাপে॥
রঙ্গিম যাবক আপন করে করি
দেহ মঝু পদ-যুগ-ধারে।
চন্দ্রশেখর কহে কান্তক করি বেশ
কামিনী গরব বিথারে॥ বৈ. প. পৃ. ১০২০

সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত সূর্য্যধর কবির নায়কও বলিতেছে—

এতাংস্তে ভ্রমরৌঘনীলকুটিলান্ বধ্নামি কিং কুন্তলান্।
কিং নস্যামি মধূক-পাণ্ডু-মধুরে গণ্ডেঽত্র-পত্রাবলীম্॥

সদুক্তিকর্ণামৃত ২।৩৮।৪ (সূর্য্যধরস্য)

—'এই ভ্রমরশ্রেণীর তুল্য নীল ও কুটিল তোমার কেশগুলি কি বাঁধিয়া দিব। মধূকপুষ্পের ন্যায় পাণ্ডুর অথচ মনোরম তোমার গণ্ডে কি পত্রাবলী করিয়া দিব।'

বৈষ্ণবেরাও ঠিক এইভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীরাধার 'স্বাধীন-ভর্তৃকা' অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

গোপালদাসের একটি পদে দেখি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বেশ রচনা করিয়া দিতেছেন।

সহচরি মেলি রাইতনু হেরই
শ্রমজল সকলি মিটাই।
শিথিলহি কবরি যতনে পুন বান্ধই
সিন্দুর কাজর পরাই॥
সজনী বিদগধ নাগর কান।
নিজ কৃত দেখি আপন সুখ মানই
রাই অধিন জন জান॥
দশনক রেখ তছু সবহুঁ মিটায়ই
কুঙ্কুমে নখরেখ পূর।
উচ করি চুচুক কঁচুক বনায়ই
আন চিহ্ন করু দূর॥
বসন ভূষণ দেই অঙ্গ সাজায়ত
পিন্ধায়ল নীলদুকূল।
গোপাল দাস- পহু মন ভূলল
নিজ গুণে ভেল অনুকূল॥ বৈ. প. পৃ. ৭৭৫

অনন্তদাসের একটি পদেও দেখি কৃষ্ণ রাধিকার বেশ-বিন্যাস করিতেছেন।

বিবিধ কুসুম আনিয়া নাগর
করল আমার বেশ।
বেণী বানাইয়া কবরী বান্ধিল
যতনে আঁচড়ি কেশ॥ বৈ. প. পৃ. ২৫৩

রূপ গোস্বামীর একটি শ্লোকে দেখা যায় কৃষ্ণ রাধার অঙ্গশোভা করিয়া দিতেছেন।

মকরী-বিরচনভঙ্গ্যা রাধা-কুচকলসমর্দনব্যসনী।
ঋজুমপি রেখাং লুম্পন্ বল্লববেশো হরির্জয়তি॥ পদ্যাবলী ২৫

—'মকরী রচনার ছলে রাধার পয়োধর মর্দনে বিলাসী যে বল্লববেশধারী হরি সরল রেখাগুলিকে লুপ্ত করিয়া দিতেছেন সেই হরি জয়লাভ করুন।'

পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোষিতভর্তৃকা

মিলন এবং বিরহ লইয়াই প্রেম, কিন্তু মিলনের চেয়ে বিরহেই প্রেমের স্বরূপ বেশী প্রকাশিত হয়। মিলনে প্রেমের তীব্রতা থাকিলেও বিরহেই যেন প্রেমের দীপ্তি ও প্রগাঢ়তা বেশী ফুটিয়া উঠে। বিরহেই প্রেমের চরম প্রকাশ। প্রেমের আস্বাদনে যেমন তীব্র সুখ আছে, তেমনি আছে তীব্র বেদনাও। বিরহের মধ্যে দিয়াই নায়ক-নায়িকা পরস্পরের ধ্যানে তন্ময়তা লাভ করে। শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত কবি ধর্মকীর্তির একটি পদে এই ভাবটি চমৎকাররূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

সংগম-বিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

(সদুক্তিক ২।৯১।৪)

—"তাহার (সেই নায়িকার) মিলন ও বিরহের মধ্যে বিরহই শ্রেয়ঃ কিন্তু সঙ্গম নহে, মিলনে সে আমার নিকট একা আর বিরহে সে বিশ্বব্যাপ্ত"। পদটি সাহিত্য-দর্পণের দশম পরিচ্ছেদেও (১০।৫২) উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে পার্থিব নায়কের বিরহ বর্ণনা করা হইয়াছে। রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে এই পদটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া বৈষ্ণব প্রেমগীতিকারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পদ্যাবলীতে পদটি 'তাং প্রতি সখীবাক্যম্' বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, (অর্থাৎ বিরহিণী শ্রীরাধাকে সখী বলিতেছে)। দেখা যাইতেছে সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত কবি ধর্মকীর্তির এই মানবীয় প্রেমের কবিতাই ধীরে ধীরে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-কবিতায় উন্নীত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে। (মানস সুন্দরী)

সংস্কৃত মহাকবিগণ নায়ক-নায়িকার বিরহ লইয়া বহু কাব্যাদি রচনা করিয়াছেন। কালিদাসের 'মেঘদূত'তো কেবল বিরহ লইয়া লেখা গোটা কাব্য। 'গাহাসত্তসঈ'র প্রেমকবিতার মধ্যে যে-গুলিতে বিরহ বর্ণনা করা হইয়াছে সেই-গুলিই যেন অধিকতর রমণীয় হইয়াছে। 'সদুক্তি-কর্ণামৃতে'ই নায়ক-নায়িকার বিরহ লইয়া লেখা বহু প্রকীর্ণ কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে।

বৈষ্ণবেরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিবার সময় পূর্ব-কালীয় কবিদের এই বিরহ-বর্ণনার রীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের মতে বিরহ বা প্রবাস বিপ্রলম্ভ শৃংগারের অন্তর্গত। প্রবাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন—

প্রবাসো ভিন্নদেশিত্বং কার্যাচ্ছাপাচ্চ সংভ্রমাৎ।
তত্রাঙ্গচেলমালিন্যমেকবেণীধরং শিরঃ॥
নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসরুদিত-ভূমি-পাতাদি জায়তে॥
(সাহিত্য-দর্পণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩।১৯৩)।

—যে বিপ্রলম্ভে নায়ক ও নায়িকা উভয়ের বা যে কোন একজনের নিজ কার্য উপলক্ষে, অভিশাপে অথবা রাজার অত্যাচারে প্রবাসে (বিদেশে) বাস করিতে হয় তাহাকে বিপ্রলম্ভ প্রবাস বলে। এই প্রবাসে হস্তপাদাদি অঙ্গ ও পরিধেয় বসন মলিন, শিরে একবেণী ধারণ, দীর্ঘশ্বাস, হাহুতাশ, ক্রন্দন, ভূমিতে শয়ন প্রভৃতির উৎপত্তি হয়।

এই প্রবাসে আরও দশ প্রকার মদনাবস্থা অনুভূত হয়—অঙ্গের সৌষ্ঠব-হীনতা, সন্তাপ, পাণ্ডুতা, কৃশতা, অরুচি, অধৃতি, অনালম্ব, তন্ময়তা, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃতি।

নায়ক বিদেশে (প্রবাসে) গেলে যখন কেবল বিরহিণী নায়িকার অবস্থা বর্ণনা করা হয় তখন সেই নায়িকাকে "প্রোষিত-ভর্তৃকা" বলে। সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ বলেন—

নানাকার্য্যবশাদ্ যস্যা দূরদেশং গতঃ পতিঃ।
সা মনোভবদুঃখার্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা॥
—সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩।৯৩)

—'নানা কার্য্য (বা শাপ ও সম্ভ্রম) উপলক্ষে যাহার পতি (প্রিয়) দূরদেশে অবস্থান করে কামপীড়িতা এইরূপ স্ত্রী 'প্রোষিতভর্তৃকা' বলিয়া কথিত হয়।'

এই প্রবাস প্রথমতঃ দুই প্রকার, বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক। কার্য্যজ প্রবাস বুদ্ধিপূর্বক (স্বেচ্ছাধীন) বলিয়া আবার তিন প্রকারের হইতে পারে,—ভাবী প্রবাস, ভবন্ প্রবাস ও ভূত প্রবাস।

"ভাবী ভবন্ ভূত ইতি স্যাৎ কার্য্যজঃ।" (সা. দ. ৩।১৯৫)

অন্য দুইটি (শাপজ ও সম্ভ্রমজ প্রবাস) অবুদ্ধিপূর্বক (নিজের ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না) বলিয়া তাহাদের তিন প্রকার অবস্থা দেখা যায় না।

ভাবী বিরহ (বা প্রবাস)—যখন নায়ক বা নায়িকার বিদেশ গমনের বার্তা প্রচারিত হয় তখন হয় ভাবী বিরহ।

ভবন্ বিরহ (বা প্রবাস)—যখন নায়ক বা নায়িকা বিদেশে চলিয়াছে বা বিচ্ছেদ সংঘটিত হইতেছে এবং মিলনের আশাও সুদূর-পরাহত হইয়াছে তখন হয় ভবন্ বিরহ।

ভূত বিরহ (বা প্রবাস)—নায়ক বা নায়িকা যখন বহুদিন বিদেশে গিয়াছে কিন্তু আসিব বলিয়াও আসিতেছে না তখন হয় ভূত বিরহ।

শাপজ ও সম্ভ্রমজ বিরহ অবুদ্ধিপূর্বক বলিয়া অর্থাৎ স্বাধীন না হওয়ায় কাল-বিভাগ দেখা যায় না।

বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রবাস বা বিরহ 'মাথুর লীলা' নামে পরিচিত। কেননা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরা যাত্রার ফলেই এই বিরহের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গিয়া নতুন লীলা আরম্ভ করিলেন। বৃন্দাবনে ছিল শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলা, এখন মথুরায় আরম্ভ হইল ঐশ্বর্যলীলা। গোটা জীবন প্রেমের চেয়ে অনেক বড়, তাই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ব্রজগোপীদের সহিত প্রেমলীলা ভাঙ্গিয়া দিয়া মথুরা প্রস্থান করিলেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য লীলাই ব্যক্ত হইয়াছে। যদিও বা কোথাও ঐশ্বর্যের প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও ঐ মাধুর্যলীলার পরিপুষ্টির জন্য। কৃষ্ণ-বিহনে সমগ্র বৃন্দাবনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সকলেই শোকে মুহ্যমান। শ্রীরাধার হৃদয়ও হাহাকার করিয়া উঠিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধার হৃদয়-বেদনা যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ এই অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ প্রেমের বর্ণনা করিতে গিয়া মানুষী ভাষা ও প্রাকৃত প্রেমেরই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। মিলন ও বিরহ—সুখ এবং দুঃখ—লইয়াই প্রেম।

চণ্ডীদাসও তাই বলিয়াছেন—

চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী
সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুঃখ যায় তার ঠাঁই॥

(পদকল্পতরু, ৮৭২)

কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলেন—প্রেমের আস্বাদ 'তপ্ত ইক্ষু চর্বণের ন্যায়', 'মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।' বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা যে মাথুরের হৃদয়-বিদারক মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাই তাহা সুদূর প্রবাসেরই অন্তর্গত।

এই মাথুর বা প্রবাস বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত। প্রবাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়া রূপ গোস্বামী বলেন—

"পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্যতেঃ॥"

(উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ ১৫।১৫২)

—"পূর্বে মিলিত নায়ক-নায়িকার দেশান্তরে (গ্রামান্তরে বা বনান্তরে) গমনাদিবশতঃ ব্যবধানকে প্রবাস বলে।"

সেই প্রবাস দুই প্রকার—"স দ্বিধা বুদ্ধিপূর্বঃ স্যাত্তথৈবাবুদ্ধিপূর্বকঃ"—বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক ভেদে প্রবাস দুই প্রকার।

(উ. ম. ১৫।১৫৪)

কার্য্যানুরোধে দূরে গমনকে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস বলে—"দূরে কার্য্যানুরোধেন গমঃ স্যাদ্‌বুদ্ধিপূর্বকঃ"। (উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রঃ (১৫।১৫৫) ।

এই বুদ্ধিপূর্বক প্রবাসও কিঞ্চিৎ দূর (অদূর) ও সুদূর ভেদে দ্বিবিধ।

"কিঞ্চিৎ দূরে সুদূরে গমনাদপায়ং দ্বিধা।" (উজ্জ্বলম ১৫।১৫৬) আবার সুদূর প্রবাসও "ভাবী", "ভবন্" ও "ভূত" ভেদে ত্রিবিধ।

"ভাবী ভবংশ্চ ভূতশ্চ ত্রিবিধঃ স তু কীর্ত্যতে (উজ্জ্বলম ১৫।১৫৮)

দেখা যাইতেছে সংস্কৃত রসশাস্ত্রের সহিত বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। একই দৃষ্টি-কোণ হইতে প্রবাস বা "মাথুর"কে দেখা হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা ভূত বিরহের যে সমস্ত মর্মস্পর্শী পদ পাই সেগুলি শ্রীরাধার বিরহের পদ। শ্রীকৃষ্ণের বিরহের পদ অতি সামান্য। অন্যান্য ব্রজবাসীর বিরহের পদও অতি সামান্য।

প্রিয়তম কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে রাধার দশা হইল "প্রোষিতভর্তৃকার" অবস্থা। রূপ গোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বল-নীলমণিতে' বলেন—

"দূরদেশগতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিত-ভর্তৃকা" (নায়িকা-ভেদ-প্রকরণ উঃ মঃ ৫।৮৯)

—'কান্ত দূরদেশে গমন করিলে তাহার নায়িকাকে প্রোষিত-ভর্তৃকা বলে।

এই প্রবাস বা মাথুরের দশটি দশা দেখা যায়।—

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশঃ॥"

উঃ মঃ শৃঙ্গার ভেদ প্র : ১৫।১৬৭

—অত্র (প্রবাসে) চিন্তা, জাগর, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু নামে দশটি দশা।

বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরহিণী রাধার এই দশ প্রকার দশার বর্ণনাই পাওয়া যায়। বলিতে গেলে বৈষ্ণব পদাবলীতে একটি মাত্র চিত্র পাই—তাহা 'বিরহিণী রাধার' চিত্র।

অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যের একটি শ্লোকে পাই, নন্দ প্রবজ্যা গ্রহণ করিয়া বনবাস করিতেছিলেন। নন্দপত্নী সুন্দরী তাঁহার বিরহে কৃশ হইয়া গিয়াছেন। এখানে 'প্রোষিতভর্তৃকা' সুন্দরীর 'ভূত বিরহ' দেখানো হইয়াছে।

তাভির্বৃতা হর্ম্যতলেঽঙ্গনাভিশ্চিন্তাতনুঃ সা সুতনুর্বভাসে।
শতহ্রদাভিঃ পরিবেষ্টিতেব শশাঙ্ক-লেখা শরদভ্রমধ্যে॥

(সৌন্দরনন্দ, ষষ্ঠ সর্গ)

—"গৃহমধ্যে সেই নারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া চিন্তাকৃশ সেই সুন্দরীকে দেখাইতেছিল যেন শরৎমেঘের অন্তরালে বিদ্যুন্মালা পরিবেষ্টিত চন্দ্রকলা।"

কালিদাসের মেঘদূতের একটি পদে দেখি, যক্ষের বিরহে যক্ষপত্নীর ঠিক এই অবস্থাই হইয়াছিল। এখানে প্রোষিত-পতিকা রমণীর ভূত বিরহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

"সাভ্রেঽহ্নীব স্থল-কমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥"

(যক্ষ মেঘকে বলিতেছে, তুমি আমার প্রিয়াকে দেখিবে যেন)—

'মেঘাচ্ছন্নদিনে স্থল-কমলিনী, ফুটিয়াও নাই, মুদিয়াও নাই।'

শাকুন্তলনাটকে কবি কালিদাস দুষ্মন্তের মুখ দিয়া শকুন্তলার বিরহাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি॥

শাকুন্তলে, ৭ম অঙ্কে

—'অত্যন্ত মলিন বসন পরিধানে, সংযমক্লেশে মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, কেশ একটিমাত্র বেণিতে বাঁধা শুদ্ধশীলা (শকুন্তলা) যেন অতিনিষ্ঠুর আমার সঙ্গে দীর্ঘকালের বিরহকে ব্রতরূপে পালন করিতেছে।'

অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দের আর একটি পদে নন্দের বিরহাবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে।

বনবাসসুখাৎ পরাঙ্মুখঃ প্রযিযাসা গৃহমেব যেন মে।
ন হি শর্ম লভে তয়া বিনা নৃপতিহীন ইবোত্তমশ্রিয়া ॥

(সৌন্দরনন্দ ৭ম সর্গ)

—'যেহেতু বনবাসসুখে আমি পরাঙ্মুখ, ঘরেই ফিরিতে চাই, তাহাকে ছাড়িয়া আমি স্বস্তি পাইতেছি না, উত্তম শ্রীহীন যেমন রাজা।'

ভবভূতির উত্তররামচরিতে রামের বিরহে সীতার বিরহিণী অবস্থার বর্ণনা দেখি। তমসা মুরলাকে বিরহক্লিষ্টা সীতার কথা বলিতেছেন—

পরিপাণ্ডুদুর্বল-কপোল-সুন্দরং
দধতী বিলোল-কবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্তিরথবা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী ॥ উত্তর-চরিতে ৩।৪

—"স্বভাব-সুন্দর কপোল দুইটি দুর্বল ও মলিন। মুখে চূর্ণ কুন্তল পড়িয়াছে। করুণার মূর্তি অথবা বিগ্রহবতী বিরহবেদনা সীতা বনে প্রবেশ করিতেছেন।" মেঘদূতের একটি পদে যক্ষপত্নীর বিরহ বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে ভূত বিরহের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। যক্ষ মেঘকে নিজের প্রিয়ার অবস্থা বলিতেছে।

তাং জানীয়াঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশির-মথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্। (উত্তরমেঘ ২।২৩)

—'(হে মেঘ), তাঁহাকে আমার প্রাণস্বরূপ জানিবে, বর্তমানে তাহার সহচর (আমি) দূরে থাকায় সে বিরহবিধুর চক্রবাকীর মত ব্যাকুল হইয়া আছে। এই দীর্ঘ সময়ে প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় ব্যথিত কোমলাঙ্গী ঐ বালা শিশির-ঘাতে বিবর্ণা পদ্মের মত অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।'

কবি ভবভূতি তাঁহার 'উত্তররামচরিতে' সীতার বিরহে রামের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। পদটিতে ভূত বিরহের উল্লেখ দেখা যায়।

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাক-প্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥

—'রামের বিরহ দুঃখ (করুণ রস) পুটপাকের তুল্য, যাহা গভীরতার জন্য অলক্ষ্য এবং অন্তরে গাঢ় বেদনাপ্রদায়ী।'

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাও কৃষ্ণ-বিরহে ঠিক এইভাবেই নিজের হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন। রাধা বড়ায়িকে বলিতেছেন।

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণি॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বংশীখণ্ড

গাহাসত্তসঈর বহু কবিতায় নায়ক-নায়িকার বিরহ- বর্ণনা দেখিতে পাই। নিম্নস্থ এই পদটিতে বিরহিণী নায়িকার মৃত্যুর আশংকা প্রকাশ করা হইয়াছে—

কিং ভণহ মং সহীও মা মর দীসিহই সো জিঅন্তীএ।
কজ্জালাও এসো সিণেহ- মগ্গো উণ ণ হোই॥ গা. স. ৭।১৭

—হে সখীগণ, তোমরা আমাকে কি বলিতেছ, মরিও না, জীবিত থাকিলে তাহাকে দেখিতে পাইবে—ইহা কার্য্য-পর্য্যালোচনায় অনুষ্ঠান-যোগ্য কথা,—ইহা স্নেহের পথ নহে।

বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখি, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে শ্রীরাধা বিরহবেদনায় মৃত্যু-মুখে উপনীত হইয়াছেন। সখীরা শ্রীরাধাকে বাঁচিয়া থাকিতে উপদেশ দিতেছেন। তখন শ্রীরাধা সখীদের বলিতেছেন।

তুঃ-শশিশেখর—

শমন ঔর রমণ

মোহে ভুলল রে প্রিয় সখি
করি কি উপায় বুদ্ধি বল না।
ইহ দিবস যামিনী
কৈছে বিরমায়ব
এতহু দুখে এত জীউ গেল না।

এ দুখ হেরি করুণা করি
বিদরে যদি বসুমতী
তবহু হাম পৈঠী তছু মাঝে।
শ্যাম গুণধাম
পরবাসে হাম পামরী
এ মুখ দরশায়ব কোন্ লাজে॥

বৈ. প. ১০২৮ পৃ

গাহাসত্তসঈতেও এই ভাবের দূতী-চাতুর্য্য দেখা যায়। দূতী যেন প্রসঙ্গত নায়ককে নায়িকার মরণ দশার কথা জানাইয়া দিয়া গেল।

ণাহং দুঈ ণ তুমং পিওত্তি কো অহ্ম এত্থ বাবারো।

সা মরই তুজ্ঝ অঅসো তেণ অ ধম্মক্খরং ভণিমো। গাহা স ২।৭৮

—'আমি (নিজে) দূতী নহি, তুমিও নায়িকার প্রিয় নহ, সুতরাং এই ব্যাপারে আমাদের কিছু করণীয় নাই। তবে সে মারা যাইবে, তোমারও অযশ হইবে। তাই (স্ত্রী-বধনিবারণের জন্য) এই ধর্মকথা বলিলাম।'

লৌকিক প্রেম-কবিতার এই দূতী-চাতুর্য্য বৈষ্ণব প্রেম-কবিতাতেও লক্ষ্য করি। দূতী-সখী মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট অতি চাতুর্য্যের সহিত বিরহে শ্রীরাধার মৃত্যুর আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার সহিত গোবিন্দদাসের একটি পদের তুলনা করিতে পারি। সখী-দূতী মথুরায় কৃষ্ণের নিকট রাধার অবস্থা নিবেদন করিতেছেন।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী—

কুঞ্জভবনে ধনি তুয়া গুণ গণি গণি
অতিশয় দুবরি ভেল।
দশমিক পহিল দশা হেরি সহচরি
ঘর সঞে বাহির কেল॥
শুন মাধব কি বলব তোয়।
গোকুল তরুণী নিচয় মরণ জানি
রাই রাই করি রোই॥

গোবিন্দদাস (বৈ. প. পৃ. ৬৫১)

[শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী—

অদয় তুয়া হৃদয় বিহি কুলিশ দিয়া গঢ়লহে
অতয়ে তুয়া বুঝিয়ে অছু কাজে।
তুয়া বিরহ-সন্নিপাতে ছুটল তছু নাটিকা
অবহুঁ বসি রহসি কোন্ লাজে॥

—চন্দ্রশেখর (বৈ. প. পৃ ১০১৯)

গাহাসত্তসঈর একটি পদে ভাবী বিরহ বর্ণনা করা হইয়াছে। নায়ক প্রবাসে যাইবে শুনিয়া নায়িকা ভগবতী নিশাদেবীকে আরাধনা করিতেছে

যাহাতে রাত্রি প্রভাত না হয়, তাহা হইলে আগামী কল্যও আসিবে না, আর নায়কেরও যাওয়া হইবে না।

কল্লং কিল খরহিঅও পবসিহিই পিঁওত্তি সুণ্ণই জণম্মি।
তহ বড্ঢ ভঅবই ণিসে জহ সে কল্লং বিঅ ণ হোই॥

(গাহাসত্তসঈ ১।৪৬)

—'লোকের নিকট শোনা যাইতেছে যে, কঠিন-হৃদয় আমার প্রিয় আগামী কল্যই প্রবাসে যাইবে (বিদেশে যাইবে), অতএব হে ভগবতী নিশাদেবী, তুমি সেই ভাবেই বর্ধিত হও যাহাতে তাহার (নায়কের) সেই কল্যই না আসে অর্থাৎ রাত্রি প্রভাত না হয় এবং তাহার প্রবাস-গমনও না ঘটে।'

কবি গোবিন্দদাস অনুরূপ ভাবের একটি পদ রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ মথুরা যাইবেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। অক্রুর আগামী কল্য কৃষ্ণকে লইয়া যাত্রা করিবেন। রাধা সখীদের বলিতেছেন, যোগিনী সাধনা ও কালিন্দী দেবীর আরাধনা করিবার জন্য যাহাতে রাত্রি প্রভাত না হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণেরও আর মথুরা যাওয়া ঘটিবেনা।

নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি যা সম
সো আওল ব্রজমাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ॥
সজনি রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায় যৈছে নহ পরভাত
মন্দিরে রহু বনমালী॥
যোগিনি চরণ. শরণ করি সাধহ
বাঁধহ যামিনী নাথে।
নখতর চান্দ বেকত রহু অম্বরে
যৈছে নহত পরভাতে॥
কালিন্দী দেবী সেবি তাহে ভাখহ
সো রাখউ নিজ তাতে।
কিয়ে শমন আনি তুরিতে মিলায়ব
গোবিন্দদাস অনুমাতে॥

(পদকল্পতরু, ১৬০২)

তুলনীয়—রবীন্দ্রনাথ

"সখি লো সখি লো নিকরুণ মাধব
মথুরাপুর যব যায়

*　　*　　*　　*

হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি
দূর দূর চলি গেল
অবসো মথুরাপুরক পন্থমে
ইতু যব রোয়ত রাধা ॥"

—ভানুসিংহের পদাবলী

তুলনীয়—গোপালদাস—
সজনী দখিন নয়ন কেনে নাচে।
খাইতে শুইতে আমি　　সোয়াস্তি না পাই গো
অমঙ্গল হব জানি পাছে ॥

—বৈ. প. পৃ. ৭৭৫

গাহাসত্তসঈর একটি কবিতায় ভাবী বিরহের একটি চমৎকার বর্ণনা দেখিতে পাই। নায়কের প্রবাস-গমনের বার্তা শুনিয়া নায়িকার সখীরা নায়ককে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে নায়িকা সখীদের বলিতেছে, নায়ক তাহার হৃদয়ে নিহিত আছে, দৈবও তাহার বিচ্ছেদ ঘটাইতে সমর্থ হইবে না। এখানে নায়িকার গাঢ় অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে—

রূঅং অচ্ছীস্থ ঠিঅং ফরিসো অংগেস্থ জম্পিঅং কণ্ণে।
হিঅঅং হিঅএ ণিহিঅং বিওইঅং কিং ইহ দেব্বেণ ॥　　গাহা ২।৩২

—'তাহার (নায়কের) রূপ আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে, অঙ্গে তাহার স্পর্শ অনুভব করিতেছি, তাহার জল্পিত মধুর বাক্যও যেন কর্ণে শুনিতেছি, হৃদয় (আমার) হৃদয়ে নিহিত মনে করিতেছি, দৈব আমাদের কি করিয়া বিচ্ছেদ ঘটাইবে।'

বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই ভাবের একটি পদ পাই। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের সংবাদ প্রচারিত হইলে শ্রীরাধা সখীদের বলিতেছেন—কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে

অধিষ্ঠিত আছেন, হৃদয় হইতে বাহির করিয়া না দিলে কি করিয়া তিনি মথুরায় যাইতে পারেন।

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনি রাই।
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
সে কথা তো কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দির গো
রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছানা হয়্যাছে গো
শ্যামচাঁদ ঘুমায়্যা রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া বাহির করিব গো
তবে তো শ্যাম' মধুপুরে যাবে।
শুনিয়া রাইয়ের কথা ললিতা চম্পকলতা
মনে মনে মানিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে হরষ হইল গো
ঘুচে গেল বিরহের ভয়॥

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বৈঃ পঃ)

তুঃ—

আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।
আমার আকাঙ্খা এমন আকুল
এমন সকল বাড়া এমন অকূল
এমন প্রবল বিশ্বে আছে আর। —রবীন্দ্রনাথ

গাহাসত্তঈর একটি পদে দেখি নায়িকা নায়কের ভাবী প্রবাস গমনে সখেদ উক্তি করিতেছে—

অব্বো দুক্করআরঅ পুণো বি তন্তিং করেসি গমণস্স।
অজ্জ বি ণ হোন্তি সরলা বেণীঅ তরঙ্গিণো চিউরা॥ গাহা ৩।৭৩

—'হে দুষ্কর-কর্মকারক, ইহা বড় দুঃখের কথা যে তুমি আবার বিদেশ গমনের কথা ভাবিতেছ। আজ পর্যন্তও আমার বেণীর তরঙ্গায়িত কেশরাশি স্বাভাবিক (সরল) হয় নাই।'

গাহাসত্তসঈর একটি পদে আছে, নায়ক আজই প্রবাসে গিয়াছে, আর আজই নায়িকার নিকট সবই শূন্য হইয়া গিয়াছে, পদটিতে ভবন্ বিরহের বর্ণনা করা হইয়াছে। নায়িকার হৃদয়ের হাহাকার যেন শোনা যাইতেছে। নায়িকা বিরহক্লিষ্টা হইয়া বলিতেছে —

অজ্জ ব্বেঅ পউত্থো অজ্জ ব্বিঅ সুণ্ণআইং জাআইং।
রথামুহ-দেউলচত্তরাইং অম্হ চ হিঅআইং॥ গাহা ২।৯০

—"সে (নায়ক) আজই প্রবাসে গিয়াছে, আর আজই গ্রামের রথ্যামুখ, দেবকুল (মন্দির) ও প্রাঙ্গণগুলি এবং আমাদের হৃদয়সমূহ শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

ইহার সহিত পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টকের একটি পদের তুলনা করা যায়।

(যেন বিরহবিধুরা শ্রীরাধা বলিতেছেন।)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেন মে॥ (পদ্যাবলী ৩২৪)

—'কৃষ্ণবিরহে আমার নিমেষ হইয়াছে যুগ, নয়ন হইয়াছে বর্ষা এবং জগৎ হইয়াছে শূন্য।'

শ্রীচৈতন্যের সাধনা রাধাভাবের সাধনা, কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার মত শ্রীচৈতন্যও বলিতেছেন কৃষ্ণ-বিরহে সবই তাঁর শূন্য হইয়া গিয়াছে।

গাহাসত্তসঈর আর একটি পদে আছে নায়ক প্রবাসে চলিয়া গেলে নায়িকার নিকট সবই যেন নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। দূতী নায়কের নিকট নায়িকার অবস্থা বর্ণনা করিতেছে। পদটিতে নায়িকার প্রণয়াতিশয়েরও প্রকাশ পাইয়াছে।

গেহং ব বিত্তরহিঅং নিজ্ঝরকুহরং ব সলিল-সুণ্ণবিঅং।
গোহণরহিঅং গোট্ঠং ব তীঅ বঅণং তুহ বিওএ॥ গাহা ৭।৯

—'তোমার বিরহে তাহার (নায়িকার) বদন ধনশূন্য গৃহের ন্যায়, জলশূন্য নির্ঝরকুহরের মত এবং গোধনশূন্য গোষ্ঠের মত দেখাইতেছে।'

এইগুলির সহিত বিদ্যাপতির এই পদটির তুলনা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরাধার নিকট সবই শূন্য হইয়া গিয়াছে। রাধার হৃদয়ের আর্তি যেন স্পষ্ট শোনা যাইতেছে। অথবা দূতী-সখী মথুরায় গিয়া কৃষ্ণের নিকট রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছে—

অব মথুরাপুর মাধব গেল।	কৈছে হাম যাওব যামুন তীর।
গোকুল মানিক কো হরি নেল ॥	কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর ॥
গোকুলে উছলল করুণা রোল।	সহচরি সঞে যাহাঁ করল ফুলবারি।
নয়নক জলে বহয়ে হিলোল ॥	কৈছনে জীয়ব তাহে নেহারি ॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।	বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী ॥	কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহ কান ॥

(পদকল্পতরু, ১৬৩৯)

অমরু শতকের একটি পদেও 'ভবন্' বিরহের অনুরূপ চিত্র পাইয়া থাকি। এই প্রাচীন সংস্কৃত কবিতাটি রূপ গোস্বামী তাঁহার পদ্যাবলীতে 'রাধা-বাক্য' বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রাকৃত প্রেম কবিতাই বৈষ্ণব প্রেম-গীতিকা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্রিয়সখৈরস্রৈরজস্রং গতং
ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তুং পুরঃ।
যাতুং নিশ্চিত-চেতসি প্রিয়তমে সর্বে সমং প্রস্থিতা
গন্তব্যে সতি জীবিতপ্রিয়সুহৃৎসার্থঃ কথং ত্যজ্যতে ॥

(সদুক্তিক ২।৫৪।১, পদ্যাবলী ৩১৮)

—বলয়গুলি প্রস্থান করিয়াছে, অজস্র অশ্রুর সহিত প্রিয় সখীরাও গিয়াছে, ক্ষণকালের জন্যও ধৈর্য্য নাই, চিত্ত পূর্বেই যাইবার জন্য উদ্যত, প্রিয়তম যাইতে কৃতসংকল্প হইলে সকলেই সাথে সাথে চলিল, তাঁহার যাওয়া যদি ঠিকই হয়, তবে প্রাণপ্রিয় সুহৃদের সঙ্গ আর কেন ত্যাগ করা।

প্রাচীন একটি প্রাকৃত কবিতায় 'ভবন্ বিরহের' সুন্দর বর্ণনা দেখা যায়, পদটি মম্মটের 'কাব্য-প্রকাশে' উদ্ধৃত হইয়াছে।

গরুঅণ-পরবস-পিঅ কিং ভণামি তুহ মন্দভাইণী খু অহং।
অজ্জ প্রবাসং বচ্চসি বচ্চ সঅং জ্জেব্ব সুণসি করণিজ্জং ॥

—হে প্রিয়, তুমি গুরুজনদের অধীন, তোমাকে আর কি বলিব, আমিই কেবল মন্দভাগিনী, আজই প্রবাসে যাইতেছ, যাও, ইহার পর যাহা শুনিবার তাহা শুনিবে (অর্থাৎ তোমার বিরহে আমার মৃত্যু হইবে)।

ইহার সহিত যদুনন্দন দাসের একটি পদের তুলনা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাইতেছেন সখাদের সঙ্গে লইয়া। শ্রীরাধা সংবাদ পাইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন :—

কিয়ে সখি চম্পক দাম বনায়সি
করইতে রভস বিহার।
সো বর নাগর যাওব মধুপুর
ব্রজপুর করি আন্ধিয়ার॥
প্রিয়তম দাম শ্রীদাম আর হলধর
এ সব সহচর সাথ।
শুনইতে মুরছি পড়ল সোই কামিনি
কুলিশ পড়ল জনু মাথ॥
খেণে খেণে উঠত খেণে খেণে বৈঠত
অবশ কলেবর কাঁপি।
ভণ যদুনন্দন শুনইতে ঐছন
লোরে নয়ন যুগ ঝাঁপি॥

পদকল্পতরু, ১৬১২

গাহাসত্তসঈর একটি পদেও 'ভবন্ বিরহের' কথা পাই। নায়ক আজই প্রবাসে যাত্রা করিয়াছে। নায়িকা বিরহ-বেদনায় আকুল হইয়া প্রবাস গমনের দিন গণনা করিতে গিয়া রেখায় রেখায় দেওয়ালের ভিত্তি পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। এখানে বিরহে নায়িকার অবধি-দিবস গণনারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

অজ্‌জং গওত্তি অজ্‌জং গওত্তি অজ্‌জং গওত্তি গণরীএ।
পঢ়মে ব্বিঅ দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহিং চিত্তলিও॥ গাহাসত্তসঈ ৩।৮

—'আজ সে (নায়ক) গিয়াছে, আজ সে গিয়াছে, আজ সে গিয়াছে— এইভাবে গণনা করিতে করিতে নায়িকা (প্রোষিত-পতিকা) দিবসের প্রথম ভাগেই ঘরের সমস্ত দেওয়ালগুলি (ভিত্তি) রেখায় রেখায় চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছে।'

গাহাসত্তসঈর আর একটি কবিতায় প্রোষিতপতিকার অবধিদিবস গণনার কথার উল্লেখ আছে। বিরহিণী নায়িকার সংকটজনক অবস্থা দেখিয়া সখীগণ নায়কের আগমন ত্বরান্বিত করিবার জন্য পথিককে সংকেত দিতেছে এবং নায়িকা কর্তৃক প্রদত্ত নায়কের প্রবাস-গমনের রেখাও মুছিয়া দিতেছে। কালিদাসের মেঘদূতেও দেখা যায় যক্ষপত্নী ফুলের সাহায্যে যক্ষের প্রত্যাগমনের দিন গুণিতেছে।

শেষান্ মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধে র্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীমুক্তপুষ্পৈঃ।
মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ॥ (মেঘদূতম্)

—"সে দেহলীতে সাজানো বিরহাবস্থার দিন গোনা ফুল হইতে মাটিতে ফেলা ফুল একটি একটি করিয়া গুণিতে তৎপর আছে। দিনের বেলায় প্রিয়া অনেক কাজে মন ফিরাইবার অবকাশ পায়, সুতরাং তুমি দিনের বেলায় দেখা করিও না, গভীর রাত্রিতে যখন মন ভোলাবার কোন পথ থাকে না তখনই তুমি সৌধবাতায়নে ভর করিয়া ঘরের মেঝেতে শোয়া তোমার সখীকে আমার বার্তা কহিও।"

গাহাসত্তসঈর একটি পদে পাই নায়িকা বিরহে দিবস গণনা করিতেছে—

হত্থেসু অ পাএসু অ অঙ্গুলি-গণণাই অইগআ দিঅহা।
এণ্হিং উণ কেণ গণিজ্জউ ত্তি ভণিউ রুঅই মুদ্ধা॥ গাহা ৪।৭

—হাতের ও পায়ের আঙ্গুল দিবস গণিতে গণিতে শেষ হইয়াছে, এখন আর কি ভাবে দিবস গণিবে এই বলিয়া মুগ্ধা কাঁদিতেছে।

এই প্রিয়-বিরহের এইরূপ দিবস গণনা প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণব কবির পদেই নানাভাবে দেখা যায়। বৈষ্ণব কবি প্রাচীন রীতি অনুসরণ করিয়াছেন দেখা যায়।

বিদ্যাপতির রাধা বলিয়াছেন—

কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়াওলুঁ
বিছুরল গোকুল নাম॥ পদকল্পতরু, ১৮৬২

আবার—(বিদ্যাপতি)—

এখন তখন করি দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গমায়ল
ছোড়লুঁ জীবন আশা॥ পদকল্পতরু, ১৮২৭

চণ্ডীদাসের পদে আছে—

আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়াইনু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ॥

গাহাসত্তসঈর পদে আছে—

ওহিদিঅহাগমাসংকিরীহিং সহিআহিং কুড্ডলিহিআও।
দোত্তিগ্নি তহিং বিঅ চোরিআএ রেহা পুসিজ্জন্তি॥ গা. স. ৩।৬

—'(প্রিয়তমের) বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের অবধি-দিবস নিকটবর্তী আশংকা করিয়া সখী (গৃহকুড্যে) লিখিত (দিবস-গণনার) রেখার দুই তিনটিকে অলক্ষিতভাবে পুঁছিয়া রাখিয়াছে।'

সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত কবি ধরণীধরের একটি কবিতায় ঠিক এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে দেখা যায়। সখী নায়কের নিকট নায়িকার বিরহ-দিবস গণনার কথা বলিতেছে।

পুনরুক্তাবধিবাসরমেতস্যাঃ কিতব পশ্য গণয়ন্ত্যাঃ।
ইয়মিব করজঃ ক্ষীণস্ত্বমিব কঠোরাণি পর্বাণি॥ সদুক্তিকঃ ২।৩২।৩

—"হে শঠ, দেখ, পুনঃপুনঃ কথিত অবধি-দিবস গণনা করিতে করিতে সে তোমার মত কঠোর হাতের আঙ্গুলের পর্বগুলি ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে।"

আর্য্যাসপ্তশতীর একটি পদে দেখি, প্রোষিতপতিকা নায়কের প্রবাস গমনের দিনগুলি দেওয়ালে রেখা টানিয়া গুণিতেছে এবং তাহার শরীরও ম্লান হইয়া আসিয়াছে। নায়িকার সখী নায়ককে বলিতেছে—

ত্বদ্‌গমনদিবস-গণনাবলক্ষরেখাভিরঙ্কিতা সুভগ।
গণ্ডস্থলীব তস্যাঃ পাণ্ডুরিতা ভবনভিত্তিরপি॥ আর্যাসপ্তশতী ২৬০

—হে সুভগ, 'তুমি এত দিন হইল বিদেশে গিয়াছ—' এই কথাটি জানিয়া রাখিবার জন্য উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত দেওয়াল-ভিত্তি তাহার (নায়িকার) গণ্ডস্থলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

ইহার সহিত বিদ্যাপতির পদের তুলনা করা যায়। বিদ্যাপতির রাধাও কৃষ্ণের আগমনের আশায় দিন গণিতেছেন দেখা যায়—

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল।

ভেল প্রভাত কহত সবহিঁ ।
কহ কহ সজনি কালি কবহিঁ ॥ (বিদ্যাপতি) (বৈ প. পৃ. ১২৩,
পদকল্পতরু, ১৮৬১)

নরনারায়ণ ভূপতি—

গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেষ ।
ভীত ভরিয়া গেল দিনে দিনে রেখ ॥
উপবন হেরি মূরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখিগণ সঙ্গ । (পদকল্পতরু, ১৯৪৪)

আবার, বিদ্যাপতি—

পদ অঙ্গুলি দেই খিতিপর লিখই
পানি কপোল অবলম্ব ॥ (বৈ. প. পৃ ১২৬)

গাহাসত্তসঈর মধ্যে বিরহ সম্বন্ধে আরও অনেক কবিতা পাওয়া যায়, যে গুলির সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর সাক্ষাৎ যোগ দেখা যায় না, কিন্তু যেগুলি পাঠ করিলে বৈষ্ণব পদাবলীর স্মৃতি মনে উদিত হয় এবং এই-গুলির সহিত পদাবলীর সাদৃশ্য সহজেই নজরে পড়ে।

গাহাসত্তসঈর কোন পদে আছে—নায়িকা নায়কের নিকট নিজের বিরহ-দুঃখ ব্যক্ত করিতেছে।

ণ মুঅন্তি দীহসাসং ণ রুঅন্তি চিরং ণ হোন্তি কিসিআও।
ধন্নাও তাও জাণং বহুবল্লহ বল্লহো ণ তুমং ॥ গা. স. ২।৪৭

—হে বহুবল্লভ, সেই সমস্ত রমণীরাই ধন্য যাহাদের তুমি প্রিয় নও,—তাহারা তোমার বিরহে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে না, বহুক্ষণ রোদনও করে না এবং কৃশও হয় না।

বিরহিণী রাধা বা গোপীরাও যদি এই রকম কথা বহুবল্লভ কৃষ্ণকে বলেন তবে ইহা তাঁহাদের মুখেও বেশ মানায়।

সত্তসঈর আর একটি গাথায় আছে, দুঃসহ বিরহ-বেদনায় ক্লিষ্টা হইয়া নায়িকা বলিতেছে—

জম্মন্তরে বি চলণং জীএণ খু মঅণ তুবং অচ্চিস্সং।
জই তং পি তেণ বাণেণ বিজ্ঝসে জেণাহং বিজ্ঝা। গা. স. ৫।৪১

—'হে মদন, জন্মান্তরেও আমি আমার জীবন দিয়া তোমার অর্চনা করিতে প্রস্তুত আছি, যদি তুমি তাহাকেও (আমার প্রিয়কেও) সেই বাণের দ্বারা বিদ্ধ কর যে বাণের দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করিয়াছ।'

পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদগুলির একটি আভাস ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

গাহাসত্তসঈতে রাধাকৃষ্ণ বা গোপীকৃষ্ণ প্রেম লইয়া কয়েকটি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে দেখা যায়। অন্যত্র কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছি। সেগুলির সহিত গাহাসত্তসঈর অন্যান্য প্রেম-কবিতার কোন মৌলিক পার্থক্য সহজে নজরে পড়ে না। কেবল 'রাধা', 'গোপী' বা 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি শব্দগুলি ছাড়া। মনে হয় যেন সব প্রেম-কবিতাই একসুরেই বাঁধা। আরও পরবর্তীকালে সংগৃহীত 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলের' প্রাকৃত-অবহটে্ঠ রচিত কবিতাগুলির সহিত বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার বর্ণনার ও সুরের মিল লক্ষ্য করা যায়। এই কবিতাগুলি পড়িলেই মনে হয়, বৈষ্ণব কবিগণ এইসব কবিতা হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন। আবার কয়েকটি প্রাচীন প্রেম-কবিতা বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার কেবল প্রাক্‌রূপই নয়, আদর্শ-রূপও বটে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার সাধারণ নর-নারীর প্রেম-গীতিকাকে বৈষ্ণব তত্ত্বদৃষ্টির আলোতে দেখিয়া রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের অলৌকিক প্রেম-গীতিকা হিসাবে ব্যাখ্যাত ও গৃহীত হইয়াছে। লৌকিক প্রেম-গীতিকাই ধীরে ধীরে বৈষ্ণব কবিতায় পরিণত হইয়াছে। আমরা এখানে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

নিম্নোদ্ধৃত "প্রাকৃত-পৈঙ্গলের" এই কবিতাটিতে নায়িকার বিরহ-বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। নায়ক প্রবাসে গিয়াছে, এদিকে দারুণ বসন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিরহক্লিষ্টা নায়িকা সখীর নিকট মনোবাসনা জ্ঞাপন করিতেছে—

> ভমই মহুঅর ফুল্ল অরবিন্দ, ণবকেসুকাণণ জুলিঅ।
> সব্বদেশ পিকরাব বুল্লিঅ, সিঅল পবণ লহু বহই॥
> মলঅ কুহরং ণববল্লি পেল্লিঅ।
> চিত্ত মণভবসর হণই, দূর দিগন্তর কন্ত।
> কিমপরি অপ্পউ করিহউ, ইম পরিপলিঅ দুরন্ত॥
>
> (প্রাকৃত-পৈঙ্গল, ১৩৫)

—"ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পদ্ম ফুটিয়াছে, নবীন কিংশুকবন ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। সবদিকে কোকিলের রব শোনা যাইতেছে, মলয় পর্বতের নতুন বেলফুলগুলিকে কাঁপাইয়া শীতল পবন মৃদু মৃদু বহিতেছে, মদনবান হৃদয়ে

আঘাত হানিতেছে, প্রিয়তম দূরদিগন্তে (প্রবাসে) রহিয়াছে, আমি কি করিয় নিজেকে ঠিক রাখি, এই দুরন্ত সময় আসিয়া গিয়াছে।"

ভক্তকবি গোবিন্দদাসের একটি পদে শ্রীরাধার বসন্ত-কালোচিত বিরহ ঠিক এইভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।

হৃদয় বিদারত মনমথ বান।	হেরইতে কুসুমিত কেলি নিকুঞ্জ।
কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম॥	শুনইতে পিকরব অলিকুল গুঞ্জ॥
জলু বিরহানল মন মাহা গোয়।	অনুভবি মালতী পরিমল এহা
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয়॥	কো জানে জীউ রহত ইহ দেহা॥
কাহে সমঝাওব মরমক খেদ।	জানইতে কানুক সো আশোয়াস।
মরত না জিয়ত কানু বিচ্ছেদ॥	চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস॥
যো মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ।	
পুন হেরব বলি তাহে পরবোধ॥	(বৈ. প. পৃ. ৬৪৩)

শশিশেখরের একটি পদে বিরহিণী রাধিকার হৃদয়ার্ত্তি যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন। বসন্তকাল আসিয়াছে, কৃষ্ণ-বিরহের বেদনায় শ্রীরাধার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ-মন্দ-বহনা।	সঙ্গ সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠলি গাওত হরি নামে।
হরি-বৈমুখ হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা॥	যৈখনে শুনে তৈখনে উঠে নব রাগিনী গানে॥
কোকিলাকুল কুহু কুহরই অলি ঝঙ্করু কুসুমে।	ললিতা ক্রোড়ে করি বৈঠত বিশাখা ধরে নাটিয়া।
হরি লালসে প্রাণ তেজব পাওব আন জনমে।	শশীশেখরে কহে গোচরে যাওত জীউ ফাটিয়া॥

(বৈ. প. পৃ. ১০২৮)

'প্রাকৃত-পৈঙ্গলের' একটি গাথায় আছে, নববসন্তের সমাগমে মদনপীড়িতা নায়িকা প্রিয়তমের ভাবী প্রবাস-গমনে খেদ প্রকাশ করিতেছে—

ণব মঞ্জুরি লিজ্জিঅ চুঅহ গাছে,
পরিফুল্লঅ কেসু ণআ বণ আছে।
জই এথি দিগন্তর জাইহি কন্তা,
কিঅ বম্মহ ণথি কি ণথি বসন্তা॥ (প্রাকৃত-পৈঙ্গল ১৪৪)

—"আমগাছে মুকুল ধরিয়াছে, নব কিংশুক ফুলে বন ভরিয়া গিয়াছে, যদি এই সময় হে প্রিয়, বিদেশে যাও, তবে কি মদন নাই, বসন্তও কি নাই।"

নিম্নোদ্ধৃত এই প্রাচীন কবিতাটিতে বসন্তের আগমনে বিরহিণী নায়িকা নিজের মরণের আশংকা প্রকাশ করিতেছে। পদটি সাহিত্য-দর্পণে উদ্ধৃত হইয়াছে।

রোলম্বাঃ পরিপূরয়ন্তু হরিতো ঝঙ্কার-কোলাহলৈ-
র্মন্দং মন্দমুপৈতু চন্দনবনীজাতো নভস্বানপি।
মাদ্যন্তু কলয়ন্তু চূতশিখরে কেলীপিকাঃ পঞ্চমং
প্রাণাঃ সত্বরমশ্মসারকঠিনা গচ্ছন্তু গচ্ছন্ত্বমী॥

সা. দ. ৩য় পরিচ্ছেদ (৩।১৮৭)

—'ভ্রমরের গুঞ্জনে দিগন্ত মুখরিত হউক, চন্দন বন হইতে মৃদুমৃদু বাতাস প্রবাহিত হউক, ঘরে ঘরে কোকিল বসন্তকাল বলিয়া প্রমত্ত হইয়া কুহুধ্বনি করিতে থাকুক এবং পাষাণের ন্যায় কঠিন প্রাণবায়ু শীঘ্র বাহির হইয়া যাউক।'

ইহার সহিত 'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত রঙ্ককবি রচিত একটি পদের তুলনা করা যায়। 'শ্রীরাধায়া বিলাপ': বলিয়া উদ্ধৃত এই পদটিতে 'রাধা' বা 'কৃষ্ণ' কাহারও উল্লেখ দেখা যায় না। মনে হয় সাধারণ প্রেম কবিতা হিসাবেই পদটি রচিত হইয়াছিল, পরে রূপ গোস্বামী রাধা-প্রেমের কবিতা বলিয়া এইটিকে গ্রহণ করিয়াছেন।

চূতাঙ্কুরে স্ফুরতি হন্ত নবে নবেঽস্মিন্
জীবোঽপি যাস্যতিতরাং তরলস্বভাবঃ।
কিং ত্বেকমেব মম দুঃখমভূদনল্পং
প্রাণেশ্বরেণ সহিতং যদয়ং ন যাতঃ॥ পদ্যাবলী ৩৩২

"হায়, নতুন নতুন আম্রমুকুল এখন দেখা দিয়াছে, তরলস্বভাব প্রাণও অতি শীঘ্র চলিয়া যাইবে কিন্তু আমার একমাত্র গুরু দুঃখ রহিয়া গেল যে এই প্রাণ প্রাণেশ্বরের সহিত যাইল না।"

কৃষ্ণ-বিরহে বিদ্যাপতির রাধাও বলিতেছেন—

অঙ্কুর তপনতাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবযৌবন বিরহে গোঙায়ব কি করব সে পিয়া নেহে॥ বৈ. প. পৃ ১২৫

—"রৌদ্রের তাপে অঙ্কুর যদি পুড়িয়া যায় তাহা হইলে জলভরা মেঘে কি

হইবে? এ নব যৌবন যদি বিরহে কাটে, তাহা হইলে দয়িতের স্নেহে কি হইবে।"

"প্রাকৃত-পৈঙ্গলের" আর একটি কবিতায় প্রোষিত-পতিকার বিরহ-বেদনার বর্ণনা দেখা যায়—

কাআ ভউ দুব্বরি তেজ্জি গরাস
খণে খণে জাণিঅ অচ্ছ ণিসাস।
কুহরব তার দুরন্ত বসন্ত
কি ণিদ্দয় কাম কি ণিদ্দঅ কন্ত॥ প্রা. পৈ. ১৩৪

—ভোজন (গ্রাস) ত্যাগ করিয়া তাহার (নায়িকার) শরীর দুর্বল হইয়া গিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে যে নিঃশ্বাস বহিতেছে তাহা জানা যাইতেছে। কোকিলের মধুর অথচ উচ্চধ্বনিতে বসন্ত দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মদন নির্দয়, না কান্ত নির্দয় বোঝা যাইতেছে না।

গাহাসত্তসঈতেও দেখি প্রোষিত-পতিকা কোন রমণী বসন্ত-সমাগমে নিজের দশমী দশার আশংকা প্রকাশ করিতেছে,—

মহমহই মলঅবাও অত্তা বারেই মং ঘরা ণেন্তীং
অঙ্কোল্ল-পরিমলেণ বি জো খু মও সো মও ব্বেঅ।
গাহাসত্তসঈ ৫।১৭

—"মলয় পবন সৌরভ বহন করিতেছে, শ্বশ্রূ আমাকে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে বারণ করিতেছে, কিন্তু অঙ্কোট বৃক্ষের পরিমলে যে মারা যাইবার সে মরিবে।"

গোবিন্দদাসের একটি পদে বসন্তাগমে রাধার বিরহ-বেদনা প্রকাশিত হইয়াছে—

আয়ত চৈত চীত কত বারব,
ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ, কুসুম শরে হানই,
কানু রহল দূর দেশ॥
মাধবি মালে সাধ বিধি বাধল,
পিককুল পঞ্চমগান।
দক্ষিণ পবন মোহে নাহে ভায়ত,
ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ। পদকল্পতরু, ১৮১৪

বর্ষাকালোচিত বিরহ—

—'প্রাকৃত-পৈঙ্গলে'র একটি পদে বর্ষাগমে নায়িকার (প্রোষিত-ভর্তিকার) বিরহ-বেদনা প্রকাশিত হইয়াছে দেখা যায়। বিরহিণী নায়িকা সখীকে বলিতেছে—

জং ণচ্চে বিজ্জু মেহং ধারা পংফুল্লা ণীবা সদ্দে মোরা।
বাঅন্তা মন্দা সীআ বাআ কম্পন্তা গাআ কন্তা ণ আ॥ প্রা. পৈ. ৮৯

—"বিদ্যুৎ নাচিতেছে, মেঘ আঁধার করিয়া রহিয়াছে, কদম্ব ফুল ফুটিয়াছে, ময়ূর শব্দ করিতেছে, শীতল বাতাস মন্দ মন্দ বহিতেছে—এই হেতু আমার শরীর কাঁপিতেছে, আমার দয়িত এখন-ও আসিল না।"

ভক্তকবি গোবিন্দদাসও ঠিক এই রীতিতেই বর্ষাগমে বিরহিণী শ্রীরাধিকার দুঃখ বর্ণনা করিয়াছেন—

মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদ পাঁতি।
নীরদ মূরতি নয়নে যব লাগয়ে
নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি॥
শাঙনে সঘনে গগনে ঘন গরজন
উনমত দাদুরি বোল।
চমকিত দামিনী জাগরি কামিনী
জীবন কণ্ঠহি লোল॥ (বৈ. প. পৃ. ৬৪৫)

বিদ্যাপতির একটি পদে কৃষ্ণ-বিরহে রাধার বর্ষাকালোচিত বিরহ বর্ণিত হইয়াছে।

বিরহিণী রাধা সখীকে বলিতেছেন—

হম ধনি তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ।
বরিসা পরবেশ পিয়া গেল দূরদেশ
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ॥
সজনি আজু শমন দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিগে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসএ মোয়॥ বৈ. প. পৃ. ১১২

প্রকৃত- পৈঙ্গলের আর একটি কবিতায় অনুরূপ ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ষাগমে মদনক্লিষ্টা নায়িকা বলিছেছে—

গজ্জউ মেহ কি অম্বর সামর
ফুল্লউ ণীব কি বুল্লউ ভম্মর।
এক্কউ জীঅ পরাহীণ অম্হ
কীলউ পাউস কীলউ বম্মহ॥ (১৩৬ প্রাকৃত-পৈঙ্গল)

—মেঘ কি গর্জন করে, আকাশ কি শ্যাম হইয়াছে? কদম ফুল কি ফুটিয়াছে, ভ্রমর কি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমার একলা জীবন পরাধীন, প্রাবৃষ ক্রীড়া করুক, মন্মথ ক্রীড়া করুক।

বড়ুচণ্ডীদাসের একটি পদে দেখি—বর্ষায় কদম্ব ফুটিয়াছে, রাধা বিরহ-কাতরা হইয়া বড়ায়িকে বলিতেছে—বর্ষা আসিল, কিন্তু কৃষ্ণের দেখা নাই—

ফুটিল কদম্ব ফুল ভরে নোয়াইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল॥
(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রাধাবিরহ)

গোবিন্দাসের একটি পদে রাধার বর্ষাকালোচিত বিরহবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে—

বাঙ্গালী বিদ্যাপতি—

গগনে গরজে ঘন ফুকরে ময়ূর।
একলি মন্দিরে হাম পিয়া মধুপুর॥
শুন সখি হামারি বেদন।
বড় দুখ দিল মোরে দারুণ মদন॥ ইত্যাদি
(বৈ. প. পৃ. ১২২)

গোবিন্দদাস—

উয়ল নবনব মেহ।
দূরে রহু শ্যামর দেহ॥
তহিঁ ঘন বিজুরি উজোর।
হরি রহু নাগরি কোর॥
চাতক পিউ পিউ বোল।
শুনইতে জিউ উতরোল॥
দাদুরি উনমত ভাষ।
বিরহিনি জিবন নৈরাশ॥

দারুণ পাউখ কাল।
জীবন ভেল জনজাল॥
ঐছন ভেল দুরদিন।
অম্বর রবিশশিহীন॥
কো কহ কানুক পাশ।
চলতহিঁ গোবিন্দদাস॥
(বৈ. পৃ. পৃ. ৬৫০)

গাহাসত্তসঈর একটি পদেও বর্ষাগমে নায়িকার হৃদয়-বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। নব-বর্ষার মেঘ-গর্জন শুনিয়া নায়িকার মৃত্যু আশংকা করিয়া নায়ক মেঘকে বলিতেছে—

গজ্জ মহং চিঅ উপরি সব্ব-থামেণ লোহ-হিঅঅস্‌স।
জলহর লম্বালইঅং মা রে মারেহিসি বরাইং॥ গাহাসত্তসঈ ৬।৬৬

—হে জলধর, তোমার সব শক্তি দিয়া লৌহবৎ কঠিন হৃদয় আমারই উপর গর্জন কর, কিন্তু রে মেঘ, বিরহে দীর্ঘ অলোকবিশিষ্টা হতভাগিনীকে (আমার প্রিয়াকে) মারিও না'

বর্ষাঋতুতে নরনারীর বিরহ- বেদনা আরও বাড়িয়া যায়, বর্ষাঋতুর সহিত যেন নরনারীর প্রেমের একটি নিবিড় যোগ আছে। ভারতবর্ষের সার্থক বিরহের কবিতা তাই বর্ষার কবিতা। বাল্মিকী, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবিগণ সার্থক বর্ষার কবিতা রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতাতে তাহাই দেখি।

অন্যান্য ঋতুর চেয়ে বর্ষাকালেই প্রিয়জন-বিরহ দুঃসহ হয়—এই ভাবটি গাহাসত্তসঈর একটি কবিতায় দেখি। প্রোষিতপতিকা বর্ষাগমে নিজের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া সখীকে দয়িত-সমাগম ঘটাইবার জন্য বলিতেছে—

সহি দুম্মেমস্তি কলম্বাইং জহ মং তহ ণ সেস-কুসুমাই।
ণুণং ইমেসু দিহসেসু বহই গুডিআ-ধণুং কামো॥ গা. স. ২।৭৭

—"হে সখী, বর্ষাকালের কদম্বকুসুমগুলি আমাকে যতদূর মনঃকষ্ট দেয় অন্য (অন্যান্য ঋতুতে প্রস্ফুটিত) কোন ফুলই তত ব্যথা দেয় না। বর্ষার এই দিনগুলিতে মদন নিশ্চয়ই কদম্বকুসুমতুল্য গুটিকা-নিপেক্ষকারী ধনুক ব্যবহার করিতেছে।" ইহার সহিত দ্বিজ নন্দের একটি পদের তুলনা করা যায়। শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—

দেখি সখি বরিষা রঙ্গ।
কোন অপরাধে আনাওল মনমথ
কাটিতে বিরহিণি অঙ্গ॥
চড়ি রহু কুও কদম্ব গজেন্দ্রহি
বান্ধল কেতকি তূণ।
ধরি ধনুরাজ সাজ করি নীরদ
গরজল সমরে নিপুণ॥

ধরি খরশান তড়িত অসি চঞ্চল
চমকহি বারই বার।
চাতক চয় জয় শংখ শবদ করু
দেখি সুখী শিখি পরিবার॥
মণ্ডুকগণ ঘন করু রণ বাজন
সারস হংস বিষাণ॥
পবনক অঙ্গ সঙ্গ করি উড়ত
নব বক পাঁতে নিশান॥
কো কহে নীর তীর জনু বরিখত
মূরছিত বিরহিণিবৃন্দ।
নাসা পরণে কেমনে ধনি বারব
আপশোসই দ্বিজ নন্দ॥ (শ্রীপদকল্পতরু ১৭৩৩)

বর্ষাকালে যে নরনারী মদন পীড়িতা হইয়া পড়ে তাহা কালিদাস 'মেঘদূতে' বলিয়াছেন—

"মেঘালোকে সুখিতোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষ- প্রণয়িণি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।" পূর্বমেঘ

—'মেঘ দেখিয়া সুখীর (প্রিয়ার সহিত যুক্ত ব্যক্তির) চিত্তও অন্যরকম হয়, যাহার গলা জড়াইবার জন্য ব্যাকুলতা সে দূরে থাকিলে তো কথাই নাই।'

বিদ্যাপতির (বা রায়শেখরের) একটি পদে শ্রীরাধার বর্ষাকালোচিত বিরহ অতি চমৎকারভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—

সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
কম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন- কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

(পদকল্পতরু ২৫।১।১৭৩৫)

'উত্তররামচরিতে'র একটি কবিতায় আছে সীতার বিরহে রাম বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতেছে—

হা হা দেবি স্ফুটতি হৃদয়ং স্রংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরত-জ্বালমন্ত-র্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিষ্যঙ্ মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি ॥

(উত্তররামচরিতে ৩।৩৮)

—'হায় দেবি (সীতা), বক্ষঃ ফাটিয়া যাইতেছে, শরীরের সন্ধিবন্ধন খুলিয়া যাইতেছে, জগৎ শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে, অবিশ্রান্ত জ্বালায় জ্বলিতেছি। অবসন্ন হইয়া শোকবিধুর অন্তরাত্মা যেন গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতেছে, অজ্ঞান চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতেছে, মন্দভাগ্য আমি কি করিব।'

রাজশেখরের "কর্পূর-মঞ্জরীতে" আছে, কর্পূরমঞ্জরী রাজার বিরহে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে এবং নিজের বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতেছে—

ণীসাসা হারলট্ঠিসরিস-পসরণা চন্দণুচ্ছোড়কারী
চণ্ডো দেহস্স দাহো সুমরণ-সরণা হাসসোহা মুহম্মি।
অঙ্গাণং পণ্ডুভাবো দিঅসসসিকলাকোমলো কিং চ তীএ
ণিচ্চং বাহপ্পবাহা তুঅ সুঅহ কএ হোন্তি কুল্লাহি তুল্লা ॥

কর্পূর-মঞ্জরী ২।১০

—"দীর্ঘ নিঃশ্বাস হারলতার মত প্রসারিত হইতেছে, চন্দন দেহ শোষণকারী, দেহের উত্তাপ প্রচণ্ড, মুখের হাসি স্মরণযোগ্য, আর দিবসের চন্দ্রকলার ন্যায় তাঁহার দেহের পাণ্ডুরতা, হে সুভগ, তোমার জন্য তাঁহার অবিরত বাষ্পপ্রবাহ যেন খালের জলধারার মত প্রবাহিত হইতেছে।"

ইহার সহিত জয়দেবের গীতগোবিন্দের একটি পদের তুলনা করা চলে, সখী কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহোদ্বেগ বর্ণনা করিতেছে,—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্॥
সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা॥ গীত ৮

—"রাধা চন্দন এবং চন্দ্রকিরণের নিন্দা করিতেছেন, যাহারা স্বভাবশীতল, তাহারা অগ্নিবৎ জ্বালা বিস্তার করিতেছে। তিনি এই দুর্দ্দৈবে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। মলয় পবনকে চন্দনতরু-কোটরস্থিত সর্পগণের সঙ্গহেতু বিষময় (সর্প নিঃশ্বাসে বিষাক্ত) বলিয়া মনে করিতেছেন। মাধব, তোমার বিরহে রাধা অতিশয় কাতরা হইয়াছেন এবং মদনের বাণ বর্ষণের ভয়েই যেন তোমাতে লীনা হইয়া গিয়াছেন।"

ভবভূতির 'মালতী-মাধব' ও 'উত্তররামচরিত' নাটকে নায়কের বিরহ-বিলাপের পরিচয় পাই। এই পদটি বৈষ্ণব কবি রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতেও উদ্ধৃত হইয়াছে অর্থাৎ বৈষ্ণব-কবিতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মূর্চ্ছাং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনুমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধি র্মর্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥

মালতী-মাধব, ৯।১২
উত্তররামচরিত ৩।৩১
পদ্যাবলী—৩২৫

—"তীব্র উদ্বেগে হৃদয় বিদলিত হইতেছে, কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত হইতেছে না, বিহ্বল শরীর মূর্চ্ছা অবলম্বন করিতেছে, কিন্তু চৈতন্য পরিত্যাগ করিতেছে না, মনের সন্তাপ শরীর দগ্ধ করিতেছে, কিন্তু একেবারে ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে না এবং মর্মচ্ছেদকারী বিধাতা প্রহার করিতেছেন বটে, কিন্তু একেবারে জীবননাশ করিতেছেন না।" মালতীর বিয়োগে মাধব সখা মকরন্দের নিকট অন্তরের বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতেছে।

'মালতী-মাধব' নাটকে আর একটি শ্লোক আছে। এই শ্লোকে মালতীর বিরহে মাধবের উন্মাদ দশার বর্ণনা দেখিতেছি। মাধব বায়ুকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে। পদটি 'পদ্যাবলীতে'ও উদ্ধৃত।

ভ্রময় জলদানম্ভোগগর্ভান্ প্রমোদয় চাতকান্
কলয় শিখিনঃ কেকোৎকণ্ঠান্ কঠোরয় কেতকান্।
বিহরিণি জনে মূর্চ্ছাং লব্ধা বিনোদয়তি ব্যথা-
মকরুণ! পুনঃ সংজ্ঞাব্যাধিং বিধায় কিমীহসে॥

—মালতী-মাধব ৩।৪২
পদ্যাবলী—৩২৬

—"হে মাহাত্ম্যশালী পূর্বদিগ্‌বর্তী বায়ু—তুমি জলপূর্ণ মেঘগুলি ভ্রমণ করাও, চাতকগণকে আনন্দিত কর, কেকারব করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত ময়ূরদিগকে নৃত্য করাও এবং কেতকীবৃক্ষগুলিকে বর্ধিত কর, কিন্তু বিরহী লোক মূর্চ্ছা লাভ করিয়া বেদনার শান্তি করিতে লাগিলে, হে নির্দয়, আবার তাহার সংজ্ঞা-রোগ জন্মাইয়া কি লাভ করিতে চাও।"

বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাসের একটি পদেও কৃষ্ণ-বিরহে রাধার উন্মাদ দশার বর্ণনা দেখি—

কানুক ঐছে দশা শুনি বিরহিণি
বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু করি খিতি-তলে মুরছলি
সখিগণ দ্বিগুণ বিষাদ॥
এক সখি তুরিতহি কোরে অগোরল
কহতহিঁ আওত কান॥
শুনইতে ঐছন বচন রসায়ন
পাওল জীবন দান॥

চেতন পাই হেরই পুন দশদিশ
অতি উতকণ্ঠিত হোই।
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ কহি ফুকরয়ে
অবহুঁ না আওল সোহি॥
রোয়ত হসত খসত মহি জোয়ত
পন্থহি নয়ন পসারি।
সহই না পারি জ্ঞান পুন তৈখনে
মথুরা নগর সিধারি॥

(পদকল্পতরু ১৮৪৯, বৈঃ পঃ পৃঃ ৪৫২)

ভবভূতির রচিত এই সাধারণ প্রেমের কবিতা দুইটিকে বৈষ্ণবরসশাস্ত্রকার রূপগোস্বামী তাঁহার পদ্যাবলীতে (৩২৫, ৩২৬) "শ্রীরাধায়া বিলাপঃ" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মানবীয় প্রেম কবিতাই অপার্থিব প্রেম-গীতিকায় উন্নীত হইয়াছে দেখা যায়। কবি ভবভূতি বৈষ্ণবদৃষ্টি লইয়া উক্ত কবিতা দুইটি লেখেন নাই। অতি সাধারণ প্রেমকবিতাই বৈষ্ণব কবিতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে দেখিতেছি।

ইহার সহিত পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত মাধবেন্দ্রপুরী রচিত একটি শ্লোকের তুলনা করা যায়।পদ্যাবলীতে 'শ্রীরাধায়া বিলাপঃ' বলিয়া পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

(শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-রচিত) পদ্যাবলী ৩৩১

—'ওগো দীনদয়াল স্বামী, ওহে মথুরানাথ, কবে দেখা দিবে, তোমার অদর্শনে কাতর হৃদয় যে মথিত হইতেছে, কি করি আমি।'

ইহার সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা-বিরহের পদের তুলনা করা যায়—

নরোত্তম—

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখী নহ ইহ গেল জানা॥
দাবদগধাধিক ছটফটি এহ।
এ ছার নিলাজ প্রাণ না ছাড়য়ে দেহ॥
কানু বিনে নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঙাব আমি এদিন সকল॥
এ বড় শেল মোর হৃদয়ে রহিল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল॥
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ গোঙারি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাঙ মরি॥
নরোত্তম যাই তথা জানুক তার মতি।
শ্যাম সুধা না মিলিলে সবার সেই গতি॥

(পদকল্পতরু ১৮৫৫)

সংস্কৃতের প্রকীর্ণ কবিতাসংগ্রহ পুস্তক-গুলিতে বিরহ বা প্রবাস সম্বন্ধে অনেকগুলি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গার-প্রবাহে বিরহিণী রমণী ও বিরহী নায়ক সম্বন্ধে বহু প্রকারের প্রকীর্ণ কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে দেখিতে পাই। এই সমস্ত কবিতার মধ্যে পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদগুলির একটা আভাস দেখা যায়।

ভাবী-প্রবাস—কোন অজ্ঞাতনামা কবির রচিত একটি পদে 'ভাবী প্রবাসের' উল্লেখ পাওয়া যায়—

মুগ্ধে প্রেষয় যামি যান্তি পথিকাঃ কালোবধিঃ কথ্যতা-
মুদ্বিগ্না কিমকাণ্ড এব ভবতী তূষ্ণীং কিমেবং স্থিতা।
পূর্বোক্ত্যোপরতাং প্রিয়েন দয়িতামাশ্লিষ্য তত্তৎকৃতং
দত্তো যেন সমস্ত-পান্থনিবহ-প্রাণান্তিকো ডিণ্ডিমঃ॥

সদুক্তি ২।৫১।৩

—'মুগ্ধে, প্রবাসে যাইব, অনুমতি দাও,' 'পথিকেরা তো যাইয়া থাকে, কতদিনে প্রবাস হইতে ফিরিবে বল,' 'তুমি উদ্বিগ্না হইয়া চুপ করিয়া আছ কেন?'—এইভাবে বলার পর দয়িতাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রিয় যাহা যাহা করিয়াছিল তাহাতে সমস্ত পথিককে প্রাণান্তকর ডিণ্ডিমবাদ্য দেওয়া হইয়াছিল।

রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতে **ভাবী প্রবাসের** উদাহরণ হিসাবে 'উদ্ধব-সন্দেশ' হইতে একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণের মথুরা গমন ঘোষিত হইলে কোন ব্রজগোপী তাঁহার সখীকে বলিতেছেন—'আমার দক্ষিণ নয়ন স্ফুরিত হইতেছে, নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল হইবে।' স্ত্রীলোকের দক্ষিণ অঙ্গ স্ফুরণ অমঙ্গলসূচক। ইহা প্রচলিত লোক-বিশ্বাস। সীতাহরণের সময় রাম-ও নানা অশুভ লক্ষণ দেখিয়াছিলেন (কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যে তাহার উল্লেখ দেখা যায়)

এষ ক্ষত্তা ব্রজনপতেরাজ্ঞয়া গোকুলে হস্মিন্
বালে! প্রাতর্নগরগতয়ে ঘোষণামাতনোতি।
দুষ্টং ভূয়ঃ স্ফুরতি চ বলাদীক্ষণং দক্ষিণং মে
তেন স্বস্তি স্ফুটতিচটুলং হন্ত ভাব্যং ন জানে॥

(উদ্ধব সন্দেশ ৬৭)

—হে অজ্ঞে, ব্রজনরপতির আজ্ঞায় আজ দ্বারপাল গোকুলে ঘোষণা করিতেছে প্রাতঃকালে মথুরা যাইতে হইবে, আবার অমঙ্গলসূচক আমার দুষ্ট দক্ষিণ নয়ন ত বার বার স্পন্দিত হইতেছে। হায়! কপালে কি আছে জানি না। দেশীয় ভাষায় লিখিত পদাবলীতেও ঠিক এই ভাব দেখি—গোবিন্দদাসের পদ—

না জানিয়ে কো মথুরা সঞে আয়ল
তাহে হেরি কাহে জিউ কাঁপি।
তবধরি দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি। পদকল্পতরু ১৬০০

বীরকবির এই পদটিতে ভাবী বিরহের একটি সুন্দর চিত্র দেওয়া হইয়াছে। নায়িকা নিজের মরণের আশংকা প্রকাশ করিতেছে।

কান্তে কত্যাপি বাসরানি গময় ত্বং মীলয়িত্বা দৃশৌ
স্বস্তি স্বস্তি নিমীলয়ামি নয়নে যাবন্ন শূন্যা দিশঃ।
আয়াতা বয়মাগমিষ্যথ সুহৃদ্‌বর্গস্য ভাগ্যোদয়ৈঃ
সংদেশো বদ কস্তবাভিলষিত-স্তীর্থেষু তোয়াঞ্জলিঃ ॥

(সদুক্তিক)২।৫২।১

—'হে কান্তে, দিন কতক চোখ বুজিয়া তুমি কাটাইয়া দাও', 'আচ্ছা আচ্ছা চক্ষু নিমীলন করিব যে পর্য্যন্ত না সমস্ত দিক শূন্য হইয়া যায়'। 'এই আমি আসিতেছি'। 'বন্ধুবর্গের ভাগ্যোদয়ের জন্য যাত্রা কর'। 'তোমার কোন অভিলাষ (সংবাদ) থাকিলে বল'। 'তীর্থে আমার জন্য তর্পণ করিবে অর্থাৎ আমি মরিয়া যাইব।'

'সদুক্তিকর্ণামৃতে' কালিদাস নন্দীর একটি পদে ভূত বিরহের চিত্র আছে। বিরহিণী রমণী সখীকে বলিতেছে

সখি মলয়জং মুঞ্চ ক্ষারং ক্ষতে কিমিবার্প্যতে
কুসুমমশিবং কামস্যৈতৎ কিলায়ুধমুচ্যতে।
ব্যজনপবনো মা ভূচ্ছ্বাসান্ করোতি মমাধিকা-
মুপচিতবলে ব্যাধাবস্মিন্ মুধা ভবতি শ্রমঃ ॥ সদুক্তিক ২।২৭।৪

—"সখি, মলয়জ চন্দন পরিহার কর, ইহা ক্ষতস্থানে ক্ষারের মত মনে হইতেছে, কুসুম তো অশিব, ইহাকে কামদেবের অস্ত্র বলা হয়। পাখার বাতাস দিও না, আমার দীর্ঘশ্বাস অধিকতর বাড়িয়া যায়, ক্রমবর্ধমান এই ব্যাধিতে তোমার সমস্ত শ্রম বৃথা হইবে।"

কবি শেখরের একটি পদেও বিরহিণী রাধার বিরহ-বেদনার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। সখী-দূতী কৃষ্ণকে অম্ল-মধুর ভাষায় বলিতেছে।

নিজ কর পল্লব অঙ্গে না পরশই,
শঙ্কই পঙ্কজ ভানে।
মুকুর তলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরী
শশী বলি হরই গেয়ানে ॥
মাধব দারুণ প্রেম তোহারি।
যো হাম হেরঁলু তেওঁ অনুমানলুঁ
ভাগে জীবই বর নারী ॥
চন্দন শীকর অনলকনা সম

দেহ উঠই বিথুকাই।
দীরঘ নিশ্বাস পবন দবে দাবই
জীবই কোন উপাই॥
কহ কবি শেখর ভালে তুঁহু নাগর
ভালে তুয়া প্রতি করু আশে।
আপন মরম জনে এতেক নিঠুরপণ
আন কি কাজ কি ভাষে॥ (বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা—৩২৩)

সদুক্তির শৃঙ্গার-প্রবাহে অজ্ঞাতনামা কোন কবির রচিত একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক দেখি। নায়কের বিরহে নায়িকার অবস্থার বর্ণনা দেখা যায় এই কবিতাটিতে। নায়িকার দশমীদশার বর্ণনাও পাই। অমরুশতকে (৭৮) এই পদটি দেখা যায়। রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে (৩৬৪) রুদ্রকবির নামে প্রচলিত এই পদটি "রাধাসখ্যা এব কৃষ্ণে সন্দেশঃ" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ রাধা-প্রেম গীতিকা ও লৌকিক প্রেম-গীতিকার সংমিশ্রণ হইয়াছে।

অচ্ছিন্নং নয়নাম্বু বন্ধুষু কৃতং চিন্তা গুরুভ্যোর্পিতা
দত্তং দৈন্যমশেষতঃ পরিজনে তাপঃ সখীষ্বাহিতঃ।
অদ্য শ্বঃ পরিনির্বৃতিং ব্রজতি সা শ্বাসৈঃ পরং খিদ্যতে
বিশ্রব্ধো ভব বিপ্রয়োগজনিতং দুঃখং বিভক্তং তয়া॥
(সদুক্তি ২।৩২।২), (পদ্যাবলী ৩৬৪)

দূতী নায়ককে বলিতেছে,—"অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত নয়নাম্বু আত্মীয়জনে সমর্পিত হইয়াছে। গুরুজনে চিন্তা সমর্পিত হইয়াছে, পরিজনে তাঁহার দুঃখ বিতরিত হইয়াছে। সখীজনে সংতাপ প্রদত্ত হইয়াছে, আজ বা কাল সে পরানির্বৃতি প্রাপ্ত হইবে, দীর্ঘ নিঃশ্বাসে খিন্ন হইয়াছে, অতএব নিশ্চিন্ত হও, সে কি বিয়োগজনিত দুঃখ ভাগ করিয়া দেয় নাই।"

বিদ্যাপতির রাধাও কৃষ্ণ-বিরহে বলিতেছেন—
পিয়া গেল মধুপুর হম কুলবালা। বিপথে পরল জৈছে মালতীমালা॥
কি কহসি কি পুছসি সুন প্রিয় সজনি। কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস। সুখ গেও পিআ সঙ্গ দুখ হম পাস॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি। সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥
(পদকল্পতরু, ১৬১৪)

তুলনীয়—রবীন্দ্রনাথ

বিসরল বিসরল সো অব বিসরল
বৃন্দাবন সুখসঙ্গ
নবনাগরে সখি নবীন নাগর
উপজব নব নব রঙ্গ।
ভানু কহত—অয়ি বিরহ কাতরা
মনমে বাঁধহ থেহ
মুগুধা বালা, বুজই বুঝলি-না
হমার শ্যামক নেহ। ভানুসিংহের পদাবলী।

গাহাসত্তসইর একটি গাথায় আছে, বিরহ-বিধুরা নায়িকা সখীদের নিকট নিজের দুঃসহ বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতেছে। বিরহে তাহার মৃত্যুর আশংকাও দেখা দিয়াছে। নায়কের আগমন ত্বরান্বিত করিবার জন্য নায়িকা চাতুর্য্যের সহিত সখীদের প্ররোচিত করিতেছে—

অহঅং বিওঅতণুঈ দুস্সহো বিরহাণলো চলং জীঅং।
অপ্পাহিজ্জউপি সহি জাণাসি তং চেব জং জুত্তং॥

(গাহাসত্তসঈ ৫।৮৬)

—'আমি (দয়িতের) বিরহে কৃশ হইয়াছি, বিরহের অনল দুঃসহ বোধ হইতেছে। জীবনও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে। হে সখি, যাহা এখন তুমি উপযুক্ত বলিয়া মনে কর, তাহাই আমাকে বল, (অর্থাৎ নায়ককে আনিবার জন্য যাও)।'

গাহাসত্তসঈর আর একটি পদে দেখি, বিরহিণী নায়িকা সখীকে নিজের বিরহ-বেদনার দুঃসহত্ব সম্বন্ধে বলিতেছে। মিলনের সময় যে জিনিষ আনন্দদায়ক হয়, বিরহে তাহাই বেদনাদায়ক হইয়া পড়ে। নায়ক যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব বিস্বাদ হইয়া যায়,—

পরিওস-সুন্দরাইং সুরএ সুলহন্তি জাই সোক্খাইং।
তাইং চিচঅ উণ বিরহে খাউগ্গিরাইং কীরন্তি। গা. স. ৭।৬৮

—'মিলনের সময় (রমণীরা) যে সকল সন্তোষ-প্রদানকারী সুখগুলি অনুভব করিয়া থাকে, বিরহে সেইগুলি ভুক্তবস্তুর বমনের মত বেদনাদায়ক বলিয়া মনে হয়।'

বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখি কৃষ্ণ-বিরহে রাধা সখীদের নিকট বলিতেছেন, কুঞ্জ-কুটির ও যমুনা-পুলিনে একদা কৃষ্ণের সহিত সুখ অনুভব করিয়াছিলাম, সেইগুলিতে এখন কৃষ্ণ-বিরহে কেন করিয়া যাইব।

কখন না জানি আমি বিচ্ছেদের জ্বালা। কে করিবে অনুখন ক্রন্দনের রোল॥
কে সহিবে ইহ সুখ হইয়া অবলা॥ কে হেরিবে শূন্য কদম্বক কোর।
মরিব মরিব সখি না রাখিব জীউ। কে যাওব ঐছন কুঞ্জক ওর॥
কে রাখিবে দেহ না হেরিয়ে সেই পীউ॥ নারিব নারিব প্রাণ রাখিতে নারিব।
কে রহিবে গোকুলে কে শুনিবে বোল। কহে বলরাম হাম আগে সে মরিব॥

—বলরাম দাস (পদকল্পতরু, ১৬১১)

বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে শ্রীরাধা বিরহে নিজের দুঃসহ বিরহ-বেদনা সখীদের নিকট প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার জীবনও যাইবার উপক্রম করিয়াছে। প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ না আসিলে রাধার যে মৃত্যু অনিবার্য্য তাহাও বৈষ্ণব কবিগণ রাধার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। মথুরায় যাইয়া কৃষ্ণকে আনিবার জন্য রাধা চাতুর্য্যের সহিত সখীদের জানাইতেছেন। মর্মজ্ঞা সখী-দূতীগণ মথুরায় কৃষ্ণের নিকট গিয়া রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। দূতী-সখীগণ কখনও পরুষভাবে কখনও বা নরম সুরে কৃষ্ণকে প্ররোচিত করিতেছেন, বৃন্দাবনে রাধার নিকট আসিবার জন্য। লৌকিক-প্রেমের কাব্যে সখী-দূতীর এই কার্য্যটি বহু পূর্বেই লক্ষ্য করি। নায়ক-নায়িকার প্রেমের বিরহ-মিলনে সখীদের এই ভূমিকা প্রাচীন ভারতীয় প্রেমকবিতার একটি বিশিষ্ট রীতি। নায়ক-নায়িকার প্রেম বিস্বাদ হইয়া যাইত সখী-দূতীরা যদি সাহায্য না করিত। প্রেমের বিভিন্ন পর্য্যায়ে সখীদূতীর উল্লেখ করিয়াছি। বৈষ্ণব কবিগণও পূর্বকালীয় কবিগণ-সৃষ্ট সখী-দূতী-চাতুর্য্য রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাতেও গ্রহণ করিয়াছেন।

'মহানাটকে'র একটি শ্লোকে বিরহের চমৎকার বর্ণনা দেখা যায়। পদটি সদুক্তিতে ধর্মপালের বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ॥ (সদুক্তিক: ২।৮৩।২)

—বিচ্ছেদের আশংকা করিয়া আমি কণ্ঠে হার পরিতাম না, এখন (প্রবাসে) আমাদের (আমার দয়িত ও আমি) উভয়ের মধ্যে নদী, সাগর ও পর্বত (ব্যবধান) রহিয়াছে।

কবি বিদ্যাপতি এই শ্লোকের ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া একটি পদ রচনা করিয়াছেন—

বিদ্যাপতি—

চীর চন্দন উরে হার ন দেলা। সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥

পদকল্পতরু, ১৬৭০

(রাধা বলিতেছেন)—যাহার সঙ্গে মিলনের বাধা হইবে আশংকা করিয়া আমি বক্ষে বস্ত্র, চন্দন ব্যবহার পরিতাম না। সে আজ নদী ও পর্বতের ব্যবধানে মথুরায় গিয়াছে।

প্রাচীন একটি সংস্কৃত শ্লোকে বিরহিণীর চমৎকার বর্ণনা পাই। পদটি 'সাহিত্যদর্পণের' তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশ্বনাথের পিতার রচিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

চিন্তাভিস্তিমিতং মনঃ করতলে লীনা কপোলস্থলী
প্রত্যুষক্ষণদেশ-পাণ্ডু-বদনং শ্বাসৈকখিন্নোঽধরঃ।
অন্তঃশীকর-পদ্মিনী-কিশলয়ৈর্নোপেতি তাপঃ শমং
কোঽস্যাঃ প্রার্থিত-দুর্লভোঽস্তি সহতে দীনাং দশামীদৃশীম্॥

সা. দ ৩য় পরিচ্ছেদে (৩।১৯৪)

(বিরহিণীর অবস্থা দেখিয়া সখী বলিতেছে)—চিন্তা করিতে করিতে আমার সখীর মন অচঞ্চল, করতলে রক্ষিত কপোল প্রভাতের বিবর্ণ চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুর, দীর্ঘনিঃশ্বাসে ইহার অধর ক্ষীণ হইয়াছে, জলার্দ্র কোমল পদ্মপত্রও উহার শান্তি বিধান করিতে পারিতেছে না, কে সেই প্রার্থিত দুর্লভব্যক্তি যাহার জন্য আমার প্রিয়সখীর এই অবস্থা।

গোবিন্দদাসের একটি পদেও বিরহের দশ অবস্থার বর্ণনা দেখা যায়—

অঙ্গে অনঙ্গ জর মরমে বিষম শর
কণ্ঠহি জীবন জারা।
করতলে বয়ান নয়ান ঝরু নীঝর
কুচযুগে কাজর হারা।
মাধব তুহু মধুপুর দূর দেশ।
ও অবলা চির বিরহে বেয়াধিনী
দশমী দশা পরবেশ।

বিগলিত কম্বু- বলয় কর কিশলয়
খণহি খণহি ক্ষীণ দেহা।
কো জানে কাঁতি তবহু নাহি ছুটত
জনু অবধিক শরীরেহা॥
তনুমন জোরি গৌরী তোহেঁ সোঁপল
কনয়জড়িত মণিরাজ।
গোবিন্দদাস ভণি কনয়া বিহনে মণি
কবঁহু না হৃদয়ে সাজ॥
(বৈ. প. পৃ. ৬৫১)

ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'র তৃতীয়াংকে একটি কবিতা আছে। তাহাতে দেখি সীতার করস্পর্শে রাম চেতনা লাভ করিতেছেন।

আলিম্পন্নমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈ- রন্তর্বা বহিরপি শরীরধাতূন্।
সংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়ন্নকস্মা- দানন্দাত্মপরবিধং তনোতি মোহম্॥
(উত্তররামচরিত, তৃতীয় অঙ্ক)

—সীতার (স্পর্শ) অমৃতময় প্রলেপে অন্ত ও বহিঃ শরীর ধাতুকে আলিপ্ত করিল এবং পুনরায় জীবিত করিয়া আনন্দহেতু মোহ বিস্তার করিল।

ইহার সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের একটি পদের তুলনা করিতে পারি। পদটিতে আছে কৃষ্ণের স্পর্শে রাধা জীবনলাভ করিতেছেন।

কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার। বিহড়িল আষ্ট ধাতু আয়িল তাহার॥
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, বাণখণ্ড

গীত-গোবিন্দের একটি পদে রাধার বিরহ-দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে—

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখী-মালাপি জালায়তে
তাপোপশ্বসিতেন দাবদহন-জ্বালা কলায়তে।
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত! হরিণী রূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ন্‌শার্দূলবিক্রীড়িতম্॥ গী গো. ৪।১০

—সখী কৃষ্ণকে বলিতেছে—তিনি (রাধা) গৃহকে অরণ্য মনে করিতেছেন, প্রিয় সখীদের সঙ্গ জ্বালা দিতেছে, নিঃশ্বাসের উত্তাপ অগ্নির শিখার মত মনে হইতেছে, হায় তোমার বিরহে সেই রাধা হরিণীর মত ছটফট করিতেছে, মদনও মৃত্যুতুল্য মনে করিতেছে। এখানে প্রোষিত-পতিকা রাধার দুঃখ নিবেদন করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবি জয়দেব প্রাচীন কাব্য-রীতিকে অনুসরণ করিয়া উক্ত কবিতাটি লিখিয়াছেন। ইহার সহিত আমরা এই প্রাচীন কবিতাটির তুলনা করিতে পারি। পদটি বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য-দর্পণে উদ্ধৃত হইয়াছে।

চন্দ্রায়তে শুক্লরুচাপি হংসো হংসায়তে চারুগতেন কান্তা।
কান্তায়তে স্পর্শসুখেন বারি বারীয়তে স্বচ্ছতয়া বিহায়॥

[সাহিত্য-দর্পণ, দশম পরিচ্ছেদ)

ইহার সহিত বৈষ্ণব পদাবলীতে উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের একটি কবিতার তুলনা করা যায়। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে রাধা দুঃখ-বেদনায় মুহ্যমান হইলেন। দূতী-সখী কৃষ্ণের নিকট রাধার উদ্বেগ ও জাগরণ দশা বর্ণনা করিতেছেন—

রীঝলি রাজ-নগর মাহা তোয়। রঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে মন মোয়॥
রসময় রাস-রসিক ব্রজনারী। রোই রোই তুয়া পন্থ নেহারি॥
রাধা রমণ রতন তুহু দূর। রবিজা-রোধে রমণীগণ ঝুর॥
রাকা রজনী রজনী-করজাল। রোই রোই বোলত মরমক শাল॥
ঋতুপতি-রাতি দিনহি দীনহীন। রসবতী জীবয়ে কৈছে রস বিন॥
রতিপতি রোখে রহিত রস-লেশ। রূপ নিরুপম রহ অবশেষ॥
রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস। রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

(পদকল্পতরু, ১৮৯৫)

"সদুক্তিতে' উদ্ধৃত উমাপতি ধরের একটি কবিতায় বিরহিণী নায়িকার চিত্র পাওয়া যায়। সখী নায়কের নিকট নায়িকার বিরহ বর্ণনা করিতেছে।

হারং পাশবদাচ্ছিনত্তি দহনপ্রায়াং ন রত্নাবলীং
ধত্তে কণ্টকশঙ্কিনীব কলিকাতল্পে ন বিশ্রাম্যতি।
স্বামিন্ সম্প্রতি সান্দ্রচন্দনরসাৎ পঙ্কাদিবোদ্বেগিনী
সা বালা বিসবল্লরীবলয়তো ব্যালাদিব ত্রস্যতি॥

সদুক্তিক: ২।৩৫।৫

—"সেই বালা হারটিকে পাশবৎ ছিঁড়িয়া ফেলে, জ্বালাময়ী রত্নাবলী ধারণ করে না, কলিকাশয্যাকে কণ্টকবৎ মনে করিয়া শয়ন করে না। হে স্বামিন্, সে এখন গাঢ় চন্দনরসকে পঙ্ক মনে করিয়া উদ্বেজিত হয় এবং মৃণাল বলয়কে সর্পবৎ ভয় করে। ইহার সহিত জয়দেবের গীত-গোবিন্দের পদটি স্মরণ করা যাইতে পারে।

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্। সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥
রাধিকা তব বিরহে কেশব। সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্॥
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥

—কেশব, তোমার বিরহে রাধা এমনই কৃশাঙ্গী হইয়া পড়িয়াছেন যে, স্তনোপরি বিন্যস্ত মনোহর হারকেও ভারবোধ করিতেছেন। গাত্রসংলিপ্ত সরল মসৃণ মলয়জ চন্দনকে তিনি বিষজ্ঞানে সভয়ে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

কবি গোবিন্দদাস কৃষ্ণবিরহে রাধার দুঃসহ বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন। সখী-দূতী কৃষ্ণকে বলিতেছে—

কৃষ্ণ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল
বৃন্দাবন বনদাব।
চন্দ মদ ভেল চন্দন কন্দন
মারুত মারত ধাব॥
কতয়ে আরধব মাধব॥
তোহে বিনু বাধাময়ি ভেল রাধা॥
কঙ্কণ কঙ্কণ কিঙ্কিণি শঙ্কিণী
কুণ্ডল কুণ্ডলি ভান।
যাবক পাবক কাজর জাগর
মৃগমদ মদ-করী মান॥
মনমথ মন মথে চঢ়ল মনোরথে
বিষম কুসুম-শর জোরি।
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতি খনে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরি॥

পদকল্পতরু, ১৮৯৩

বিরহের অবস্থায় নায়ক ও নায়িকা প্রিয়া বা প্রিয়কে স্বপ্নে দেখিয়া বিরহ-বিনোদন করিয়া থাকে। ভারতীয় প্রেম-কবিতার একটি প্রসিদ্ধ রীতি। কোন কোন সময়ে বিরহে নায়িকার বা নায়কের নিদ্রাও আসে না।

গাহাসত্তসঈর একটি পদে আছে নায়িকা দুঃসহ বিরহে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া সখীরা স্বপ্নে নায়ককে দেখিয়া বিরহ বিনোদন করিতে বলিতেছে। তাহাতে নায়িকা বলিতেছে, দয়িতের বিরহে নিদ্রাই আসে না, স্বপ্ন দেখিব কি করিয়া?

ধন্না তা মহিলাও জা দইঅং সিবিণএ বি পেচ্ছন্তি।
ণিদ্দ ব্বিঅ তেণ বিণা ণ এই কা পেচ্ছএ সিবিণং ॥

গাহাসত্তসঈ ৫।৯৭,

—'যাহারা প্রিয়জনকে স্বপ্নেও দর্শন করে সেই মহিলারা ধন্য, তাহার (নায়কের) বিরহে আমার নিদ্রাই আসে না, কে স্বপ্ন দেখিবে।'

এখানে দেখি বিরহে নিদ্রার অভাবে স্বপ্ন দর্শন দ্বারা চিত্ত-বিনোদন সম্ভবপর নহে বলিয়া নায়িকা সখীকে নিজের দুঃখ জানাইতেছে।

রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল-নীলমণিতে অনুরূপ একটি পদ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধা সখীদের বলিতেছেন। পদটি পদ্যাবলীতে ধন্য কবির নামে প্রচলিত।

যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তা সখি যোষিতঃ।
অস্মাকং তু গতে কৃষ্ণে নিদ্রাপি বৈরিণী ॥ পদ্যাবলী ৩২২

—'হে সখি, যাহারা দয়িতকে স্বপ্নে দর্শন করে সেই সমস্ত মহিলাই ধন্য, কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাওয়ায় নিদ্রাও আমাদের শত্রুতা করে, অর্থাৎ নিদ্রা না থাকায় স্বপ্নদর্শন ঘটে না।'

এখানে দেখিতেছি প্রাকৃত নায়িকা ও শ্রীরাধা একই সুরে কথা বলিতেছেন।

গাহাসত্তসঈর একটি পদে আছে, সখী নায়কের নিকট নায়িকার বিরহ-দুঃখ নিবেদন করিতেছে।

তুহ বিরহুজ্জাগরও সিবিণে বি ণ দেই দংসণ-সুহাইং।
বাহেণ জহালোঅণবিণোঅণং সে হঅং তং পি ॥ গা. স. ৫।৮৭

—'তোমার বিরহহেতু জাগরণ (নায়িকাকে) স্বপ্নে তোমার দর্শনজনিত সুখ দিতেছে না, যাহাও সামান্যমাত্র দূর হইতে সুখ-দর্শন—তাহাও নয়ন দুইটি বাষ্পে আচ্ছন্ন হওয়ায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে।'

কালিদাসের অভিজ্ঞান—শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে দেখি রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার বিরহ স্বপ্ন-দর্শনের দ্বারা এবং শকুন্তলার প্রতিকৃতি রচনা করিয়া বিনোদন করিতেছেন।

প্রজাগরাৎ খিলীভূতঃ তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি ॥

শাকুন্তলে ৬ষ্ঠ অংক

—(দুষ্মন্ত সখা বিদূষকের নিকট বলিতেছেন)—

'জাগরণহেতু তাহার (শকুন্তলার) সহিত স্বপ্নে মিলনও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বাষ্পও চিত্রগত ইহাকে দেখিতে দেয় না।' কালিদাসের মেঘদূতেও দেখি যক্ষের বিরহে যক্ষপত্নী চিত্র আঁকিয়া বিরহ বিনোদন করিতেছে।

"আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তি"। উত্তরমেঘ, ২৫

মেঘদূতের আর একটি শ্লোকে বিরহী যক্ষের স্বপ্ন-বিনোদন উল্লেখিত হইয়াছে—

মামাকাশ-প্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতো-
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসংদর্শনেন।
পশ্যন্তীনাং খলু বহুশো ন স্থলী-দেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরু-কিসলয়েষশ্রুলেশাঃ পতন্তি॥ —মেঘদূত

—(যক্ষ বলিতেছে) 'আমি স্বপ্নাবস্থায় কোনরূপে তোমায় লাভ করিয়া আলিঙ্গন করিতে আকাশে বাহু প্রসারণ করিলে পর আমার সেই অবস্থা দেখিয়া বন-দেবতাগণের মুক্তাফলের ন্যায় নয়নজল যে বৃক্ষপল্লবে পতিত হয় নাই এমন নহে।'

জ্ঞানদাসের পদে আছে, বিরহের আতিশয্যে রাধা স্বপ্ন দেখিতেছেন কৃষ্ণ আসিয়াছেন কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া বেদনায় উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া পড়িতেছেন—

স্বপনে দেখিলুঁ সোই মোর প্রাণনাথ।	যে দেশে পরাণবন্ধু সেই দেশে যাব।
সমুখে দাড়াঞা আছে যোড় করি হাথ॥	পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব॥
পুন না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি।	জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া।
কি করিব কোথা যাব কি উপায় করি॥	আসিবে তোমার বন্ধু সময় বুঝিয়া॥
পাইয়া পরাণ নাথ পুন হারাইলুঁ।	(পদকল্পতরু, ১৭১০)
আপন করম দোষে আপনি মরিলু॥	(বৈ. প. পৃ. ৪৫২)

—পূর্বরাগের বিরহাবস্থা বর্ণনা করিবার সময় স্বপ্ন সমাগমের মোটিফ্ বর্ণনা করিয়াছি। বিরহাবস্থায় স্বপ্ন-মিলন প্রাচীন ভারতীয় কবিতার একটি ধারা, বৈষ্ণব প্রেম গীতিকায়-ও দেখি বৈষ্ণব কবিগণ স্বপ্ন-মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্বপ্নমিলন 'গৌণ সম্ভোগের' মধ্যে ধরিতে হয়।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে দেখিতে পাই, বহু বৈষ্ণব কবি স্বপ্ন-মিলনের পর নিদ্রাভঙ্গে বিরহিণী রাধার খেদ বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্বপ্নসমাগম মোটিফ

(motif) (উপাদান-কারণ) আগেই সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল। কালিদাস তাঁহার 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে উমার তপস্যা প্রসঙ্গে এই ব্যাপারটির উল্লেখ করিয়াছেন। শ্লোকটি আর একবার উদ্ধৃত করিতেছি।

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগ্
অসত্যকণ্ঠার্পিত-বাহু-বন্ধনা॥ (কুমার সম্ভব)

—'রাত্রি তিন প্রহর কাটিয়া গিয়াছে তখন আমার সখী (পার্বতী) একটিবার চক্ষু বুজিয়া অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। 'নীলকণ্ঠ, কোথায় যাও,'— এই কথা অস্ফুটভাবে বলে, আর, যে নাই তাহার যেন গলা জড়াইয়া ধরে।'

প্রাগ্জ্যোতিষের কবি বসুকল্পের একটি কবিতা 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' দূতীবচনব্রজ্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। দূতী নায়কের নিকট নায়িকার অবস্থা নিবেদন করিতেছে।

খলু সারঙ্গাক্ষ্যাস্তদবিরল-রোমাঞ্চনিচয়ং
ত্বয়ি স্বপ্নাবাপ্তে স্নপয়তি পরঃ স্বেদবিসরঃ।
বলাকর্ষক্রুট্যদ্বলয়ঝঙ্কার-নিনাদৈর্
বিনিদ্রায়াঃ পশ্চাদনবরতবাষ্পাম্বুনিবহাঃ॥
কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের (সুভাষিতরত্নকোষ) দূতীবচনব্রজ্যা।

বৈষ্ণব কবিগণ সাধারণ পার্থিব নায়িকার মত শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে দুইটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

রামানন্দ বসু—(রাধা সখীকে বলিতেছেন)—

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি॥
শাঙন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন।
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিল মোড়াই।

আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিনা বাচিয়া বিকাই ॥
চমকি উঠিয়া জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিনু সেহো নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দুনয়ানে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিনী
কত রঙ্গ ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইলে তায় ॥ বৈ. প. পৃ. ১৮৮
পদকল্পতরু, ১৪৫

জ্ঞানদাস—

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামলবরণ দে তাহা বিনু আর কারো নই ॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়নরঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ডরোল মত্ত দাদুরী বোল কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝিণিকি বাজে ডাহুকী সে ঘন গরজে স্বপন দেখিনু হেন কালে ॥
নয়নে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল লেহ শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত ধিক্ রহু কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে পায়ে হাত সেই ছলে আমা কিন বিকাইলুঁ বোলে ॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণভূষিত অঙ্গ কামমোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয় ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোলে অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥
(বৈ. প. পৃ. ৩০৬, পদকল্পতরু, ১৪৪)

তুলনীয়—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন স্বপন দেখিনু হেন কালে
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে

কোন একটি মেয়ে ছিল, ভালবাসার কুঁড়ি-ধরা তার মন।
মুখচোরা সেই মেয়ে চোখে কাজল পরা
ঘাটের থেকে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। —রবীন্দ্রনাথ

সহিত্য-দর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশ্বনাথের নিজের রচিত একটি শ্লোক আছে। কবি বিরহাবস্থায় নায়িকার 'তপন'নামক দশার উল্লেখ করিতেছেন। প্রবাসী নায়কের প্রতি নায়িকার সখী বলিতেছে।

"শ্বাসান্ মুঞ্চতি, ভূতলে বিলুঠতি ত্বন্মার্গমালোকতে
দীর্ঘং রোদিতি, বিক্ষিপত্যত ইতঃ ক্ষামাং ভুজবল্লরীম্।
কিঞ্চ প্রাণসমান! কাঙ্‌ক্ষিতবতী স্বপ্নেঽপি তে সঙ্গমং
নিদ্রাং বাঞ্ছতি ন প্রযচ্ছতি পুনর্দগ্ধো বিধি স্তামপি।"

(সা. দ. ৩।১২১)

—'তোমার বিরহে সে (রমণী) অনবরত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে, ভূলুণ্ঠিত হইতেছে, পথপানে চাহিতেছে, বহুক্ষণ ধরিয়া রোদন করিয়া দুর্বল বাহু দুইটি অস্থিরভাবে নিক্ষেপ করিতেছে, প্রাণপ্রিয় আমার সহিত স্বপ্নে মিলন হইবে এই আশায় নিদ্রার আরাধনা করিলেও দুর্বিদগ্ধ বিধি তাহাও দিতেছে না।'

কবি বিদ্যাপতি বিরহবিধুরা শ্রীরাধার অনুরূপ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন একটি পদে—

সজল নয়ন করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিলে এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় দারুণ তাহে পুন ঐছন
দুরহি কয়ল মুরারি॥
সজনি কিয়ে কহব পরকার।
কি মোর করম ফলে পিয়া গেল দেশান্তরে
নিতি নিতি মদন ঝংকার॥
নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস্ পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যার কাছে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হও পিয়া পাশে উড়ি যাও
সব দুখ কহো তছু পাশে॥

আনি দেই মোর পিণ্ড রাখহ আমার জীউ
কো ইহ করুণাবান।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর চিত
তুরিতহি মীলব কান॥

(পদকল্পতরু, ১৬৪২)

প্রাচীন একটি প্রাকৃত শ্লোকে নায়িকার জড়তা দশা বর্ণনা করা হইয়াছে—

ভিসিণীঅল-সঅণীএ ঠিঅং সব্বং সুণিচ্চলং অঙ্গং।
দীহো ণীসাসোহরো এসো সাহেই জীঅই ত্তি পরং॥

সাহিত্য-দর্পণ ৩।১৮৬

—"নরম কমলপত্রের শয্যায় শায়িত ইহার সমস্ত অঙ্গ নিস্পন্দ, কেবলমাত্র ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে ইহাকে জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

ভক্তকবি নৃপতিসিংহ কৃষ্ণ বিরহে রাধার অনুরূপ অবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। দূতী মাধবকে বলিতেছেন—

নদী বহে নয়নক লোরে। মুরছি পড়ল তছু তীরে॥
মাধব তোঁহারি করুণা অতি বঙ্কা। তোহে নাহি তিরিবধ শঙ্কা॥
তৈখনে ক্ষীণ ভেল শ্বাসা। কোই নলিনী দলে করই বাতাসা॥
চৌদশী চাঁদ সমান। তুয়া বিনু শুন ভেল প্রাণ॥
কোই রোই রাই উপেখি। কোই শির ধুনি ধুনি দেখি॥
কোই সখী পরিখই শ্বাস। হাম ধায়লু তুয়া পাশ॥
পালটি চলহ নিজ গেহ। মনে গণি পুরব স্নেহ॥
নৃপতি সিংহ কবি ভাণ। মনে গুণি বুঝহ সিয়ান॥

(পদকল্পতরু, ১৯৪০)

একটি প্রাচীন শ্লোকে বিরহে নায়কের উন্মাদ দশা দেখিতে পাই। কবিতাটি 'সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথের নিজেরই রচনা।

ভ্রাতর্দ্বিরেফ! ভবতা ভ্রমতা সমন্তাৎ
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা মম বীক্ষিতা কিম্।
ব্রুষে কিমোমিতি সখে কথয়াশু তন্মে
কিং কিং ব্যবস্যতি কুতোহস্তি কীদৃশীয়ম্॥

(সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদে (৩।১৭১)

—হে প্রিয় সুহৃদ ভ্রমর, তুমি তো নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও, তুমি কি আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমাকে দেখিয়াছ) (গুঞ্জনধ্বনি শুনিয়া আনন্দে) তুমি কি দেখিয়াছ বলিয়া স্বীকার করিলে? শীঘ্র বল, তিনি কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছেন?

বিরহের এই উন্মত্ততায় থাকে প্রিয়সঙ্গ-তৃষ্ণা ও আত্মবিস্মৃতি।

এই উন্মাদদশার বিরহহেতু চিত্তের সম্মোহ উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় নায়িকার বা নায়কের অস্থানে হাসি, রোদন, গীত ও প্রলাপাদি দেখা দেয়। মদন-ক্লিষ্ট নায়ক বা নায়িকার চেতন-অচেতনে ভেদ থাকে না।

"মেঘদূতে" কালিদাস প্রিয়বিরহে যক্ষের অনুরূপ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

"কামার্তা হি প্রকৃতি-কৃপনাশ্চেতনাচেতনেষু"।"[১]

(মেঘদূত, পূর্বমেঘ)

কালিদাসের 'শাকুন্তল' নাটকেও আছে শকুন্তলার বিরহে রাজা ভ্রমরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

অক্লিষ্ট-বালতরু-পল্লবলোভনীয়ং, পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।

বিম্বাধরং স্পৃশসি চেৎ ভ্রমর প্রিয়ায়াস্তাং কারয়ামি কমলোদর-

—বন্ধনস্থম্॥ (শাকুন্তলে ষষ্ট)।

—'হে ভ্রমর, যদি তুমি পুনরায় আমার প্রিয়ার বিম্বাধর স্পর্শ কর তাহা হইলে তোমাকে আমি কমলিনীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিব—যে বিম্বাধর অমলিন নূতন তরুর নব পল্লবের মত লোভনীয় এবং যাহা আমি মিলনোৎসবে অতি যত্নের সহিত পান করিয়াছি।'

কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকের চতুর্থ অংকে আছে রাজা উর্বশীকে হারাইয়া পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, সেই সময় কয়েকটি গান রাজার মুখে দেওয়া হইয়াছে। ঐ গুলির মধ্যে রাজার বিরহ-দুঃখ প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

গোরোচনা-কুঙ্কুমবণ্ণা চক্কা ভণই।

মহবাসর-কীলন্তী ধণিআ ণ দিট্ঠী পই।

(বিক্রমোর্বশীয়, চতুর্থ অঙ্ক)

১। তুঃ—সজনি অদভুত প্রেমক রীত।
চিরবক অবধ ইহ নাহি জানত
কহতহিঁ কত বিপরীত।
রাধামোহন (বৈ. প. ৯২৭ পৃ.)

—'হে গোরোচনা-সদৃশ পিঙ্গলবর্ণ চক্রবাক, বসন্তবাসরে প্রিয়া আমার খেলা করিতেছিল, সেই নারী-কুলধন্যা প্রিয়তমাকে কি দেখ নাই।'

কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীচৈতন্যের অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়—

ভ্রমই গৌরাঙ্গ প্রভু বিরহে বিয়াকুল। হেরইতে সজনি লাগয়ে শেল।
প্রেম উনমাদে ভেল যৈছন বাউল॥ কাঁহা গেও সে সব আনন্দ কেল॥
খাবর জঙ্গম যাহে আগে দেখই। খেনে গড়াগড়ি কান্দে খেনে উঠে ধায়।
বরজ-সুধাকর কাঁহা তাহে পুছই॥ রাধামোহন কাহে মরিয়া না যায়॥

—রাধামোহন (বৈ. প. পৃ. ৯১০)

কবি বিদ্যাপতি বিরহক্লিষ্টা রাধার উন্মাদ দশা বর্ণনা করিয়াছেন। দূতী কৃষ্ণকে রাধার অবস্থা বলিতেছেন—

মাধব ও নব নাগরী বালা।
তুহুঁ বিছুরলি বিহি কটারলী
ভেলি নিমালিক মালা॥
সে যে সোহাগিনী দেহলি লাগনি
পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল লোচন না শুনে বচন।
ঢরি ঢরি পড়ু লোরা॥
তোঁহারি মুরলী সে দিগ ছাড়লি
ঝামুর ঝামর দেহা।
জনুসে সোনারে কষি কষটিক
তেজল কনক রেহা॥
ফুয়ল কবরী না বাঁধে সম্বরি
ধনি সে অবশ এতা।
কুথলী খুথলী ভুখলি দেখলি
সখিনী সঙ্গ সমেতা॥
উসসি উসসি পড়ু খসি খসি
আলি আলিঙ্গন চাহে।
যাকর বেয়াধি পরাধীন ওখধি
তাকর জীবন কাহে॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপতি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিতে
ভরম হইল যথা॥ পদকল্পতরু—১২১৮

তুলনীয়—

মুহুরবলোকিত-মণ্ডণলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥ (গীতগোবিন্দ)

বিদ্যাপতির পদে আছে—

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মাধাঈ।
ও নিজভাব ভাবহি বিসরল
আপন গুণ লুবুধাঈ॥ পদকল্পতরু—১৬৮৭

—'অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করিতে করিতে সুন্দরী মাধব হইল। আপন গুণে লুব্ধ হইয়া সে নিজের ভাব ও স্বভাব ভুলিয়া গেল।'

রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল-নীলমণিতে' বিরহ-বিধুরা রাধার উন্মাদ দশা বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ধব মথুরায় ফিরিয়া গিয়া কৃষ্ণকে রাধার বিরহজাত উন্মাদ ব্যাপার শুনাইতেছেন—

ভ্রমতি ভবনগর্ভে নির্নিমিত্তং হসন্তী
প্রথয়তি তব বার্তাং চেতনাচেতনেষু।
লুঠতি চ ভুবি রাধা কম্পিতাঙ্গী মুরারে
বিষমবিরহখেদোদ্গারিবিভ্রান্ত-চিত্তা॥

উঃ মঃ (শৃঙ্গার-ভেদ-প্রকরণ ১৫।১৭৫)

—হে মুরারি, তোমার দুঃসহ বিরহদুঃখের প্রাবল্যে ঘূর্ণিত-চিত্তা শ্রীরাধা কখনও গৃহাভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতেছেন, কখনও বা অকারণ হাস্য করিতেছেন, কখনও চেতনাচেতন বস্তুকে তোমার বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আবার কখনও বা কম্পিতাঙ্গী হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠনালুণ্ঠন করিতেছেন।

ভবভূতির 'মালতী-মাধবে' বিরহবেদনায় উন্মত্ত মাধবের অবস্থার বর্ণনা দেখি। মালতীর বিরহে মাধব মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—

দৈবাৎ পশ্যের্জগতিবিচরন্নিচ্ছয়া মৎপ্রিয়াং চেৎ
আশ্বাস্যাদৌ তদনু কথয়ের্মাধবীয়ামবস্থাম্।

আশাতন্তুর্ন চ কথয়ত্যত্যন্তমুচ্ছেদনীয়ঃ
প্রাণত্রাণং কথমপি করোত্যায়তাক্ষ্যাঃ স একঃ॥

(মালতী-মাধব, ৯।২৬)

—"হে মাহাত্ম্যশালী মেঘ, তুমি ইচ্ছানুসারে জগতে বিচরণকরতঃ দৈববশতঃ আমার প্রিয়া মালতীকে যদি দেখিতে পাও, তবে তাহাকে আগে আশ্বস্ত করিয়া পরে মাধবের অবস্থা বলিবে। কিন্তু তুমি বলিতে বলিতে তাহার আশা-সূত্রটুকুকে একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিও না, কারণ দীর্ঘনয়না মালতীর একমাত্র সেই আশাটুকুই কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করিতেছে।"

বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে, কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে বিরহ-ক্লিষ্টা রাধার এই উন্মাদ দশা দেখা দিয়াছিল। কৃষ্ণ-বিরহে রাধার এই অবস্থাকে 'দিব্যোন্মাদ' বলা হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিকার রূপ গোস্বামী বলেন—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিঃ কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥
উদ্‌ঘূর্ণাচিত্র-জল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ।

উ. ম.—স্থায়ীভাব প্রকরণ ১৯০।১৯১

—'কোনও অনিবার্য্য বৃত্তিবিশেষপ্রাপ্ত মোহনভাবের অদ্‌ভুত ভ্রান্তিসদৃশী স্ফূর্তিরূপা বৈচিত্রীকেই 'দিব্যোন্মাদ' বলে। ইহার উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি অনেক ভেদ আছে। চিত্রজল্পের আবার দশটি ভেদ—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্‌জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প।

ইহার পূর্বে অবশ্য রূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—মোদন ভাব প্রবাসহেতু উদ্‌ভূত বিরহদশায় 'মোহন' নামে কথিত হয়। সংক্ষেপে, প্রিয়তমের সুদূর প্রবাসজনিত বিপ্রলম্ভে মোহনভাব অদ্‌ভুত ভ্রমময়ী বৈচিত্রী দশা লাভ করিলে 'দিব্যোন্মাদ' হয়। শ্রীভাগবতের দশম স্কন্দে উল্লিখিত 'ভ্রমর-গীতা' অংশটুকু দিব্যোন্মাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে বিরহিণী রাধা তথা গোপীদের জীবনে অপূর্ব ভ্রমময়ী বৈচিত্রী দেখা দিয়াছিল।

চৈতন্যজীবনীতে ও গৌরপদাবলীতে শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদের বিবরণ দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে অবস্থানকালে অনেক সময় কৃষ্ণপ্রেমে

বিভোর হইয়া থাকিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত 'ভ্রমরগীতা'র 'দিব্যোন্মাদে'র প্রভাব শ্রীচৈতন্যের জীবনেও দেখা যায়। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য গোপীভাবে ভাবিত হইয়া শিষ্যদের বাঁশের খুঁটি লইয়া মারিতে গিয়াছিলেন। নীলাচল-জীবনে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণবিরহে এই দিব্যোন্মাদ অবস্থায় রাত্রি-দিন বিভোর হইয়া থাকিতেন, তখন আর তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। সর্বদা তাঁহার ভ্রমময়ী চেষ্টা দেখা দিত। শ্রীচৈতন্যের গুরুর গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী জীবনের শেষ ক্ষণে এই 'দিব্যোন্মাদ' দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন কবিগণ লৌকিক প্রেম-কবিতার ভিতর বিরহদশায় নায়ক-নায়িকার উন্মত্ত অবস্থা (বা পাগলামি) বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে 'উন্মাদদশা' বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ ভগবৎ-প্রেমের উন্মাত্ততাকে "দিব্যোন্মাদ" বলিয়াছেন অর্থাৎ কৃষ্ণবিরহে রাধার বা রাধাভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রের প্রেমোন্মত্ততাকে 'দিব্যোন্মাদ' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। স্বর্গীয় বা ভগবৎ-প্রেমের অপূর্ব ভ্রমময়ী চেষ্টাকে 'দিব্যোন্মাদ' বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভগবতের দশমস্কন্দের একটি পদে রাধার দিব্যোন্মাদের অবস্থা দেখি—

মধুপ! কিতববন্ধো মা স্পৃশাংঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিত-মালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদঃ
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্‌॥ শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১০।৪৭।১২

উক্ত শ্লোকের ভাব লইয়া জ্ঞানদাস একটি পদ রচনা করিয়াছেন—

যোই নিকুঞ্জে রাই পরলাপয়ে
সোই নিকুঞ্জ সমাজ।
সুমধুর গুঞ্জনে সব মনরঞ্জনে
মীলল মধুরকর রাজ॥
রাইক চরণ নিয়ড়ে উড়ি যাওত
হেরইতে বিরহিনি রাই।
সখি অবলম্বনে সচকিত লোচনে
বৈঠল চেতন পাই॥
অলি হে না পরশ চরণ হামারি।
কানু অনুরূপ বরণ গুণ বৈছন
ঐছন সবহুঁ তোহারি॥

পুররঙ্গিনিকুচ- কুঙ্কুম রঞ্জিত
কানুকণ্ঠে বনমাল।
তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল
জ্ঞানদাস হিয়ে শাল॥ বৈ. প. পৃ. ৪৪৯

প্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ

কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে পাই, দুষ্মন্ত কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও শকুন্তলা সেই দুষ্মন্তের জন্যই বিরহ-ব্রত ধারণ করিয়াছেন—"বসনে পরিধূসরে বসনা ধৃতৈক-বেণিঃ মম বিরহব্রতং বিভর্তি"—শাকুন্তলে। এখানে দেখি শকুন্তলা প্রেমের জন্যই—কোন বাহ্যিক সুখের জন্য নয় কিংবা প্রেমের প্রতিদানের আশায় নয়— দুষ্মন্তকেই চাহিতেছেন। এবং দুষ্মন্তের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ভবভূতির সীতাও এইরূপ কথা বলিয়াছেন, যদিও সীতা জানেন স্বামী রামচন্দ্র তাঁহাকে অন্যায়ভাবে ত্যাগ করিয়াছেন। সীতা রাজ্যসুখ চাহেন নাই, প্রেমের প্রতিদানও চাহেন নাই, প্রেমে রামচন্দ্রকে পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন। এবং তিনিও রামচন্দ্রের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন। শকুন্তলা সীতা প্রভৃতির এই প্রেম-নিষ্ঠা কোন বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে না। প্রিয়তমের কাছ হইতে কোন প্রতিদান পাইবার আশা যেখানে নাই, প্রেমের প্রগাঢ়তা সেইখানেই বেশী। প্রেম যেখানে আদান-প্রদানের প্রত্যাশা করে, প্রেম সেখানে ব্যবসায়ের সামগ্রী, বণিক্-বৃত্তি মাত্র। ইহাই লৌকিক প্রেমের চরম সীমা বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে লৌকিক প্রেমের চরম আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রিয়তম সহস্র অপরাধ করিলেও প্রেয়সী রমণী বলিতেছেন—

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি তুমি অবসর মত বাসিও
আমি নিশিদিন হেথা বসে আছি তোমার যখন মনে পড়ে আসিও।
তুমি চিরদিন মধুপবনে চির বিকশিত বন ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া তুমি নিজ সুখ স্রোতে ভাসিয়ো।
গান—রবীন্দ্রনাথ॥

ভক্তকবি গোবিন্দদাস ঠিক এইরূপই বলিয়াছেন। দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার অবস্থা বলিতেছেন। রাধাও কৃষ্ণের সমস্ত অপরাধ ও নিষ্ঠুরতা ক্ষমা করিয়াছেন।

নন্দ নন্দন নিচয় নিরখলু
নিঠুর নাগর জাতি।
নারি নিলাজ লেহ নিরমিত
নাহ নামে মিলাতি॥

(গোবিন্দদাস—বৈ. প. পৃ. ৬৫০

"—হে নন্দ-নন্দন (কৃষ্ণ), নিশ্চয় করিয়া বুঝিলাম পুরুষ জাতি নিষ্ঠুর, নারী লজ্জাহীন প্রেমের দ্বারা গঠিত, কারণ যে-নায়ক পরিত্যাগ করিয়াছে নারী তাহাকেই আবার কামনা করে।"

বাঙ্গালা লোক-সাহিত্যের মধ্যেও এই ধরণের প্রেম-নিষ্ঠা দেখিতে পাই। 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' ও 'মৈমনসিংহ-গীতিকার' (প্রেম-গীতিকার) কাঞ্চনমালা, চন্দ্রাবতী, মলুয়া প্রভৃতি নায়িকার প্রেম, শকুন্তলা ও সীতার প্রেমের আদর্শকে স্মরণ করাইয়া দেয়, আবার বাঙ্গালা দেশের মাটিতে জলে আকাশে বাতাসে যে প্রেমের ছবি ছড়াইয়া ছিল তাহাই যেন রাধার মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল।

"বাংলাদেশের বুকে যুগে যুগে যে সকল নারী প্রেমের সাধনা করিয়াছে তাহাদের সহিত রাধার একটি সজাতীয়ত্ব রহিয়াছে, বাংলাদেশের রাধা অনেক স্থানে 'অবলা অখলা' বাঙালী ঘরের মেয়ে বা কুলবধূ হইয়া উঠিয়াছে।"

লৌকিক জগতের প্রেমের এই বস্তুভারহীন বিরহ অবস্থা হইতে যাত্রা করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ অতি সহজেই অলৌকিক জগতের রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমে গিয়া পৌছিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ মর্ত্যভূমি হইতে যাত্রা করিয়া স্বর্গে গিয়া পৌছিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্ত ভাগবত-প্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহার রচিত শিক্ষাষ্টকের একটি পদে। রূপ গোস্বামী পদ্মাবলীতেও পদটি "শ্রীরাধায়া বিলাপঃ" বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদটি এই—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিণষ্টু মা- মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

(শ্রীচৈতন্তদেবোক্ত শিক্ষাষ্টক ৮)

(পদ্মাবলী ৩৪১)

—তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ পদদাসীই করুন অথবা আমাকে পদ-দলিত করুন, দর্শন না দিয়া মর্মান্তিক দুঃখে নিক্ষেপ করুন অথবা

সেই বহুবল্লভ যেমনই বিধান করুন, তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহই নহে'। কৃষ্ণপ্রেমে রাধার কোন সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি নাই। মানবীয় প্রেমের বেদনা রাধা-প্রেমের মধ্যেও মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা এই স্বাদ পাই। এই পদটির ভাব লইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ একটি পদ লিখিয়াছেন—

আমি কৃষ্ণদাসী তিঁহো রসসুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ
কিবা না দেন দর্শন জরেন আমার তনুমন
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥ —চৈঃ চঃ ৩।২৩

চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিতেছেন এবং জন্ম-জন্মান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার প্রাণনাথ হন এই প্রার্থনা করিতেছেন—

চণ্ডীদাস— বন্ধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
একুলে ওকুলে মোর কেবা আছে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায়॥
আঁখির নিমেষে যদি নাহি দেখি
তবে যে পরাণে মরি। (বৈ. প. পৃ. ৭১)
চণ্ডীদাসে কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

জ্ঞানদাস—

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।

শ্রীকৃষ্ণে অহেতুকী ভক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নিজেকে একেবারে বিলাইয়া দেওয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের একটি প্রধান অভীপ্‌সা।

গোবিন্দদাসের একটি পদে দেখি, রাধা কৃষ্ণ-বিরহে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, যাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছেদ-যাতনা পাইয়াছেন তাঁহাকেই আবার জন্মান্তরে 'প্রিয়তম' বলিয়া পাইতে অভিলাষ করিতেছেন,—

মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে রহউ সে পিয়া আমার
বিধি পায়ে মাগো মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুঃখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিলুঁ মুখ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি॥ (বৈ. প. পৃঃ ৬৭৯)

এখানে দেখিতেছি পদকর্তা গোবিন্দদাস সখীভাবে প্রাণের হরিকে আনিতে যাইতেছেন।

সদুক্তিকর্ণামৃতের 'দেবপ্রবাহে' "গোপী-সন্দেশ" নামে কতকগুলি চমৎকার পদ সংগৃহীত হইয়াছে। পদগুলি দ্বাদশ শতাব্দ বা তাহার পূর্বেই রচিত। এইগুলির সহিত পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর ঘনিষ্ট যোগ লক্ষনীয়। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় (দ্বারবতী) চলিয়া গিয়াছেন, রাধা ও গোপীগণ পথিক-দূতের দ্বারা নানাভাবে নিজেদের বিরহ-বেদনা সেখানে কৃষ্ণের নিকট জানাইতেছেন।

নীলকবির একটি পদে আছে—

তে গোবর্ধন-কন্দরাঃ স যমুনাকচ্ছঃ স চেষ্টারসো
ভাণ্ডীরঃ স বনস্পতিঃ সহচরাস্তে তচ্চ গোষ্ঠাঙ্গনম্‌।
কিং তে দ্বারবতী-ভুজঙ্গ হৃদয়ং নায়ান্তি দোষৈরপী-
ত্যব্যাদ্বো হৃদি দুঃসহং ব্রজবধূসংদেশশল্যং হরেঃ॥

সদুক্তিক ১।৬২।১, পদ্যাবলী ৩৭৫

—'গোবর্ধন পর্বতের সেই সকল কন্দর, সেই যমুনার কুল, সেই চেষ্টারস, সেই ভাণ্ডীর বনস্পতি (বটবৃক্ষ), তোমার সেই সহচরকুল, সেই গোষ্ঠের অঙ্গন হে দ্বারবতীভুজঙ্গ (নাগর), সেই সকল কি ভুলেও একবার মনে আসে না?

হরির (কৃষ্ণের) হৃদয়ে ব্রজবধূসংদেশ-রূপ এই দুঃসহ শল্য তোমাদিগকে রক্ষা করুক।'

এই পদটি রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে (৩৭৫) 'অথ ব্রজদেবীনাং সন্দেশঃ' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে অর্থাৎ বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

আর একটি পদে আছে—

পান্থ দ্বারবতীং প্রযাসি যদি হে তদ্দেবকীনন্দনো
বক্তব্যঃ স্মরমোহমন্ত্রবিবশা গোপ্যোঽপি নামোজ্ঝিতাঃ।
এতাঃ কেতক-গর্ভধূলি-পটলৈরালোক্য শূন্যা দিশঃ
কালিন্দী-তটভূময়োঽপি তরবো নায়ান্তি চিন্তাস্পদম্॥
(সদুক্তিক: ১।৬২।২), (পদ্যাবলী ৩৭৪)

—'হে পথিক, যদি তুমি দ্বারবতী যাও তবে দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই কথাটি বলিও, 'স্মরমোহমন্ত্রবিবশা' গোপিনীদের তুমি তো ত্যাগই করিয়াছ, কিন্তু এই যে দিক্‌গুলি কেতকগর্ভধূলি দ্বারা ভরিয়া গিয়াছে ইহাদের দিকে তাকাইয়াও কি সেই সব যমুনাতটভূমি ও সেখানকার বৃক্ষগুলির কথা কখনও তোমার মনে পড়ে না।'

এখানে দেখিতেছি বিরহ-বিধুরা গোপীগণ দ্বারবতীগামী পথিককে ডাকিয়া বলিতেছে। এই পদটি সদুক্তিতে 'কস্যচিৎ' বা গোবর্ধনাচার্যস্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে (৩৭৪) পদটি গোবর্ধনাচার্যের বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পদ্যাবলীতে "অথ ব্রজদেবীনাং সন্দেশঃ" বলিয়া এইটি অলৌকিক কৃষ্ণগোপীপ্রেমের বা ভগবৎ-প্রেমের কবিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পঞ্চতন্ত্রকারের একটি অপূর্ব বিরহের কবিতা আছে। গোপীগণ পথিক দ্বারা কৃষ্ণের নিকট নিজেদের বিরহ-বেদনা নিবেদন করিল, কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া অন্তঃপুরে রমণীবেষ্টিত হইয়াও দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। এই পদটিও পদ্যাবলীতে (৩৭৬) বৈষ্ণব কবিতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

কালিন্দ্যাঃ পুলিনং প্রদোষমরুতো রম্যাঃ শশাঙ্কাংশবঃ
সন্তাপং ন হরন্তু নাম নিতরাং কুর্বন্তি কস্মাৎ পুনঃ।
সন্দিষ্টং ব্রজযোষিতামিহ হরেঃ সংশৃণ্বতোঽন্তঃপুরে
নিঃশ্বাসাঃ প্রসৃতা জয়ন্তি রমণী-সৌভাগ্য-গর্বচ্ছিদঃ॥
পঞ্চতন্ত্রকৃতঃ (সদুক্তিক : ১।৬২।৪), (পদ্যাবলী ৩৭৬)

—'যমুনার তীর, সন্ধ্যার বাতাস, মনোরম চন্দ্রকিরণ প্রভৃতি আমাদের সন্তাপ হরণ না করুক, কিন্তু পুনরায় বর্ধিত করে কেন' ? ব্রজগোপীদের প্রেরিত এই সন্দেশ শুনিয়া অন্তঃপুরে থাকিয়াও হরির (কৃষ্ণের) রমণীদের সর্বনাশকারী যে দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়াছিল তাহাদের জয় হউক।' বীর সরস্বতী কৃত একটি পদে দেখি গোপীগণ মথুরাবাসী কৃষ্ণের নিকট অপরূপভাবে নিজেদের বিরহ-বেদনা পথিক দ্বারা নিবেদন করিতেছে।

মথুরাপথিক মুরারেরুপঃগেয়ং দ্বারি বল্লবীবচনম্।
পুনরপি যমুনাসলিলে কালিয়গরলানলো জ্বলতি ॥

(সদুক্তিক: ১।৬২।৫), (পদ্যাবলী ৩৬৮)

—"হে মথুরাপথিক, মুরারির (কৃষ্ণের) দ্বারে তুমি এই গোপীবচনটি অবশ্যই গাহিয়া শুনাইও, পুনরায় সেই যমুনার জলে কালিয়গরলানল (কালিয়-গরলের ন্যায় বিরহানল) জ্বলিতেছে।" এই পদটি পদ্যাবলীতে (৩৬৮) "অথ ব্রজদেবীনাম্ যথার্থ-সন্দেশঃ" বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, অর্থাৎ গোপীকৃষ্ণকে লইয়া সাধারণ প্রেম-কবিতাই অলৌকিক বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায় পরিণত হইয়াছে।

এই পদটির ভাব অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবকবি গোপাল দাস 'ভুত-বিরহের' একটি পদ রচনা করিয়াছেন।

মধুপুর পন্থিক বিনয় করি তোয়। অব সব বিখ সম ভৈগেল নারি।
মাধবে মিনতি জনায়বি মোয় ॥ গরলে ভরল অঙ্গ অব দুই চারি ॥
কালি দমন করি ঘুচায়ল তাপ। দিনে দিনে যুবতী তনু অবশেষ।
পুনরপি কালিন্দী অনল সন্তাপ ॥ গোপাল দাস দশমি পরবেশ ॥

(বৈ. প. পৃ. ৭৭৫)

দেখা যাইতেছে দ্বাদশ শতাব্দের বা তাহার পূর্বেকার গোপীকৃষ্ণ-প্রেম অবলম্বনে লিখিত সাধারণ প্রেম কবিতাই 'ব্রজদেবীদের প্রেম-গীতিকায়' পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ বৈষ্ণব-কবিতা বা বৈষ্ণব-পদাবলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। আদিতে সাধারণ প্রেম-কবিতার সহিত বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার লৌহ ও স্বর্ণের মত কোন স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য ছিল না। প্রথমে সাধারণ প্রেম-কবিতা ও বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা একই সুরে বাঁধা ছিল, শ্রীচৈতন্যের সময়ে বা তার কিছু পূর্বে প্রেমকবিতাগুলি আলাদা হইয়া যায় এবং লৌকিক নর-নারীর প্রেমকবিতাও অলৌকিক বৈষ্ণব কবিতায় পরিণত হয়। প্রাচীনকালে লিখিত অতি স্থূল মানবীয় প্রেমের কবিতাও বৈষ্ণব প্রেম-গীতিকায় পরিণত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দে লিখিত আনন্দ-বর্ধনকৃত 'ধ্বন্যালোক' নামক অলংকার-গ্রন্থে রাধা-বিরহের একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি পূর্ববর্তী কোন কবির রচনা। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে রাধার প্রগাঢ় বিরহ-বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে এই পদটিতে। পদটি 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' (১।৫৮।৪) কোন অজ্ঞাত কবির রচনা বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। পদ্যাবলীতে (৩৭৩) অপরাজিত কবির নামে পাওয়া যায়। রূপ গোস্বামী এই পদটিকে 'অথ বৃন্দাবনাধীশ্বরী-বিরহ-গীতম্' বলিয়াছেন, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার পদ বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম যে কবি পদটি লিখিয়াছিলেন তিনি সাধারণ নরনারীর প্রেমের মতই রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে কাব্যের উপজীব্য করিয়াছিলেন অর্থাৎ কোন তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবিতাটি লিখেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের তখনও বিকাশ হয় নাই। দেখা যাইতেছে পূর্বতন সাধারণ প্রেম-কবিতাই বৈষ্ণব তত্ত্ব-দৃষ্টির প্রভাবে আস্তে-আস্তে অপার্থিব রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার কবিতায় পরিণত হইয়াছে। পদটি এই—

> যাতে দ্বারবতীং পুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
> কালিন্দীতট-কুঞ্জ-বঞ্জুল-লতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া।
> উদ্‌গীতং গুরুবাষ্পগদ্‌গদ-গলত্তারস্বরং রাধয়া
> যেনান্তর্জল-চারিভির্জলচরৈরুৎকণ্ঠমাকূজিতম্॥ সদুক্তিক ১।৫৮।৪

—"মধুরিপু কৃষ্ণ দ্বারবতী নগরী চলিয়া গেলে তাঁহারই বস্ত্র দেহে জড়াইয়া এবং কালিন্দীতটকুঞ্জের বঞ্জুল লতাগুলিকে জড়াইয়া সোৎকণ্ঠা রাধা এমন গুরুবাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বিগলিত তারস্বরে গান গাহিয়াছিলেন যে তাহাতে যমুনাবক্ষের জলচরগণও উৎকণ্ঠিত হইয়া কূজন আরম্ভ করিয়াছিল।"

তুলনীয়—

> "রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি
> তুয়া ভাবে তরু দেই কোর।"

পদাবলী সাহিত্যে 'বারমাসিয়া, 'বারমাসী' বা 'বারমাস্যা' ও চৌমাসিয়া

কালিদাসের নামে প্রচলিত 'ঋতুসংহার' কবিতায় ছয় ঋতুর বারমাসে প্রকৃতির রূপ ও সেই রূপের আভায় মানুষের সুখ ও সৌমনস্য বর্ণিত হইয়াছে 'ঋতুসংহার' মানে 'ঋতুসুখসংহিতা'। ইহাতে 'বারমাসিয়া' সুখের ফিরিস্তি

দেওয়া হইয়াছে। মনে হয় কালিদাস লোকসাহিত্য হইতে ঋতুসংহারের মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ঋতুসংহারের কোন বিশেষ প্রভাব দেখা যায় না। তবে সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতায় কোন বিশেষ ঋতুকে অবলম্বন করিয়া নায়ক বা নায়িকার সুখদুঃখের ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে।

পুরানো বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতি সাহিত্যে 'বারমাস্যা' বা 'চউমাস্যা' কবিতা দেখি। এইগুলিতে নায়ক-নায়িকার বারমাসের (গোটা বছরের) বা বর্ষার চারিমাসের বিরহবেদনা দৈবাৎ মিলন-সুখের বর্ণনা আছে। এই ধরণের কবিতা বাংলা সাহিত্যে গেয় আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে যেমন মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। আবার রাধাকৃষ্ণ-কথা হইলে পদাবলীর আকারে মিলে। অন্যান্য সাহিত্যে স্বতন্ত্র গাথা কবিতার আকারে মিলিয়াছে নিতান্ত লোক-সাহিত্যের মধ্যে। বারমাসের ব্যাপার হইলে নাম 'বারমাসিয়া' বারমাস্যা বা 'বারমাসী' অথবা 'বারহমাসা' নামে খ্যাত। চারিমাসের বিরহ-দুঃখের বর্ণনা থাকিলে চউমাসিয়া 'চতুর্মাস্যা' নামে অভিহিত হইত। কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের সহিত এই গান-গুলির কিছুটা মিল থাকিলেও 'ঋতুসংহার' কাব্য হইতে এই-গুলি আধুনিক ভাষায় আসে নাই। আসিয়াছে প্রাচীনতর লোক-গীতি হইতে। কালিদাসও হয়তো প্রাচীনতর লোকগীতি হইতে 'ঋতুসংহারের' কল্পনা পাইয়া থাকিবেন।

কালিদাসের 'মেঘদূতকে' বর্ষার চারিমাসের বিরহ-বেদনার গীতিকাব্য বা 'চউমাসার' প্রাচীনতম এবং অপূর্ব নিদর্শন বলা যায়, আবার কাব্যটিকে 'আটমাসী'-ও বলা যায়। কেননা অনাগত চারিমাসের কথা উহ্য রহিয়া গিয়াছে দৌত্য-মিলনের ঔৎসুক্যে। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে মেঘদূতের অনুকরণ আছে কিন্তু কোন দেশীভাষায় প্রাচীন কালে মেঘদূত অনূদিত হয় নাই। সেইজন্যই বলা যায় এই বারমাস্যার পদগুলি সরাসরি সংস্কৃত হইতে আসে নাই। এই চৌমাস্যা বা বারমাস্যার পদে চারিমাসের বা বার মাসের বহিঃপ্রকৃতি নরনারীর বিরহে 'উদ্দীপন বিভাব' হিসাবে কাজ করিয়াছে, অর্থাৎ নরনারীর অন্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়াই যেন পদগুলি রচিত হইয়াছে। 'লোক-গীতি'তে 'বারমাস্যার' পদ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েরই 'বারমাস্যা' বা সারা বছরের বিরহ-বেদনা লইয়া লেখা পদ আছে। কোন কোন পদে বর্ষার চারিমাসের বিরহ-দুঃখ চিত্রিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার বারমাস্যা বা চৌমাসিকার বা ছয়মাসার পদগুলি প্রাচীনতর লোক সাহিত্যের (লৌকিক প্রেমগীতির) প্রভাবের ফলেই রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' ও 'মৈমনসিংহ-গীতিকার' প্রেমকবিতার ভিতর বহু নায়িকার বিরহের 'বারমাস্যা' গীতিকার সন্ধান মেলে। এই সমস্ত নায়িকাও রাধার সঙ্গে সমান কথায় ও সমান সুরে নিজেদের বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণের বিরহের মধ্যে যে আর্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রকৃতির দৃশ্য-সজ্জার উপর নির্ভর করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। প্রকৃতি এখানেও উদ্দীপন বিভাব হিসাবে কাজ করিয়াছে। এই চৌমাসিয়া বা বারমাসিয়ার পদগুলিতে কৃষ্ণের বিরহে রাধার বা রাধার বিরহে কৃষ্ণের বিরহ-বেদনার আকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে—কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে রাধা বড়ায়িকে কৃষ্ণের খোঁজে যাইতে বলিল, বড়ায়ি রাধাকে 'বর্ষার চারিমাস' অপেক্ষা করিতে বলিল। তাহার উত্তরে রাধা একটি চৌমাসিয়া বিরহের গীত গাহিল—

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ॥
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথা।
মোর প্রাণনাথ কাহ্ণাঞি বসে যথা॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বরিষা চারি মাস।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস॥
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে॥
কত না সহিব রে কুসুম-শরজালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সঙ্গে কর মেলা॥

ভাদর মাসে অহোনিশি অন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্ণাঞির মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট যাইবে বুক॥
আশ্বিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী।
তবোঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহখণ্ড)

চৈতন্যোত্তর যুগের কবি গোবিন্দদাস একটি পদে রাধার বারমাস্যা লিখিয়াছেন। কবি অগ্রহায়ণ মাস হইতে সুরু করিয়া কাত্তিক মাস পর্যন্ত এই এক বছরের রাধার বিরহ-ব্যথা বর্ণনা করিয়াছেন।

আঘন মাস রাস রস সায়র
নায়র মথুরা গেল।
পুররঙ্গিণিগণ পূরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল ॥
আওব পৌষ তুষার সমীরণ
হিমকর হিম অনিবার।
নাগরি কোরে ভোরি রঁহু নাগর
করব কোন পরকার ॥ ইত্যাদি
(গোবিন্দদাস) (পদকল্পতরু, ১৮১৪)

গৌর-পদাবলীতে-ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর 'বারমাস্যা' দেখিতে পাই। রাধার 'বারমাস্যা'র অনুসরণে চৈতন্যদেবের বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বারমাসের বিরহ-দুঃখ চিত্রিত হইয়াছে। কবি শচীনন্দন দাস বারটি পদে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দ্বাদশ মাসিক বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহ পহিল মাঘক মাহ। জিনি কনক কেশর দাম।
সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ ॥ পঁহু গৌর সুন্দর ধাম ॥ ইত্যাদি

চৈতন্যোত্তর যুগের কবি সিংহভূপতি রাধার চউমাসিয়া বা বর্ষাকালোচিত বিরহ চিত্রিত করিয়াছেন।

মোর বন বন শোর শুনত
বাঢ়ত মনমথপীড়।
প্রথম ছার আষাঢ় আওল
অবঁহু গগন গভীর ॥
দিবস রয়নী আ রি সখি কৈছে
মোহন বিনে যাওয়ে।
আওয়ে শাঙন বরিখে ভাঙন
থন শোহায়ন বারি।
পঞ্চশর শর ছুটত রে কৈছে
জীয়ে বিরহিনী নারি ॥
আওয়ে ভাদো বেগর মাধো
কাকো কহি ইহ দুখ।

নিভরে ভর ভর ডাকে ডাহুকি
ছুটত মদন কন্দুক ॥
অছু হ আশিন গগন ভা-খিন
ঘনন ঘন ঘন রোল।
সিংহ ভূপতি ভনয়ে ঐছন
চতুর মাসিক বোল ॥

(বৈ. প. পৃ. ১৮৩)

সুনাইর বারমাস্যা

লৌকিক প্রেম-গীতিকাতে নায়িকার 'বারমাসী' দেখি। "মৈমনসিংহ-গীতিকার"[১] "দেওয়ান ভাবনা" পালাটি কবি চন্দ্রাবলী লিখিত। নায়ক মাধব পিতাকে আনিতে বিদেশে গেলে নায়িকা সুনাই দূতীর নিকট বারমাসের দুঃখ-বেদনা নিবেদন করিতেছেন।

আষাঢ় মাস গেল দূতী এইনা আশার আশে।
কোথায় গিয়া পরাণের বন্ধু রইলা বৈদেশে ॥
শায়ন মাসেতে দূতী পুজিলা মনসা।
সেইতে না পূরিল গো আমার মনের আশা ॥
ভাদ্র মাসেতে দূতী গাছে পাকল তাল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দূতীরে সুনাইর গেল যৌবন কাল ॥
আশ্বিন মাসেতে দূতী দুর্গাপূজা দেশে।
না আইলা প্রাণের বন্ধু দুর্গামায় পূজিতে ॥
কাতিক মাসেতে দূতী শুকায় নদীর পানি।
আসিবে পরাণের বন্ধু মনে অনুমানি ॥ ইত্যাদি

মলুয়ার বারমাসী

লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত 'মৈমনসিংহ-গীতিকার' 'মলুয়া' পালাটিতে নায়িকা মলুয়ার বারমাসের দুঃখের কথা পাই। পঞ্চভাই তাঁহাদের মায়ের নিকট ফিরিয়া মলুয়ার দুঃখ বর্ণনা করিতেছেন। পতি বিনোদ বিদেশে গেলে মলুয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছিলেন।

---

১ দীনেশচন্দ্র সেন, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশিত

সুতা কাটে ধান ভানে শাশড়ীরে লইয়া।
এই মতে দিন কাটে দুঃখু যে পাইয়া॥
মাঘ ফাল্গুন গেল মলুয়ার ভাবিয়া চিন্তিয়া।
চৈত্র বৈশাখ গেল আশায় রহিয়া॥
জ্যৈষ্ঠ মাস আম পাকে কাউয়ায় করে রাও।
কোন বা দেশে আছে বন্ধু নাহি জানে তাও॥ ইত্যাদি

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

মনসামঙ্গলে বারমাসী

বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়ে' মনসার 'বারমাস্যা' দেখি। মনসা বেহুলার নিকট তাঁহার বারমাসের দুঃখের কাহিনী বলিতেছেন। চাঁদের ব্যবহারে মনসা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

বিপ্রদাস কবি পদ্মাপদ সেবি
বারোমাস্য কথা কয়॥

নর হৈয়া মন্দ বলে চাঁদো দুষ্টপাপ
শুনলো বেহুলা তোরে কহি দুঃখ তাপ।
বৈশাখে আমারে পূজে সনকা বান্যানি
ভাঙিয়া আমার ঘট বলে মন্দ বাণী।
জ্যৈষ্ঠে আমারে লোক করে অভিষেক

সর্বক্ষণ মন্দ বলে সহিব কতেক।
নীরস সকল রামা মঞ্জরিত শাখী
চুত পূজ পনস সুত সম্ভ্রমে লোক সুখী
শালি রূপ হইয়া গেনু চাঁদো বিদ্যামান
নাথরা কাটিয়া হরি লৈনু মহাজ্ঞান।

ইত্যাদি

বিপ্রদাসের 'মনসা বিজয়',
শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত ও এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৫৩)

চণ্ডীমঙ্গলে 'খুল্লনার বারমাসী'

দ্বিজ মাধবাচার্য্যের 'চণ্ডীমঙ্গলে' খুল্লনার বারমাসী বর্ণিত হইয়াছে। খুল্লনা স্বামী ধনপতির নিকট তাঁহার বারমাসের দুঃখের কথা নিবেদন করিতেছেন।

খুল্লনায় বলে প্রভু যদি দেও মন।
বার মাসের যত দুঃখ করি নিবেদন॥
বার মাসের যত দুঃখ খুল্লনা পায় বনে।
কহিতে সে সব কথা পাজর বিন্ধে ঘুণে॥

মাধবীতে জনমে মোর কষ্টের অঙ্কুর।
সতিনীর হাতে লাঘব করাইলা প্রচুর।
কাড়িয়া লইল সত্তা অঙ্গের আভরণ।
পরিবারে দিল মোরে ভগন বসন॥

ইত্যাদি

দ্বাদশ অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা মিলন-লীলা

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নরনারীর মিলন লইয়া বহু প্রেম-গীতিকা রচিত হইয়াছে। 'গাথাসপ্তশতী', 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', অমরুশতক প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে নরনারীর 'সম্ভোগ' লইয়া লিখিত বহু বিচিত্র কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। বলিতে হয় সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রেম-গীতিকায় মিলনরসেরই প্রাধান্য। এইজন্য প্রাচীন ভারতীয় কবিদের দেহ-সম্ভোগের বা 'ভোগের কবি' বলা হয়। প্রাচীন সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে প্রথমে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের চারিটি ভাগ আলোচনা করিবার পর সম্ভোগ পর্যায় আলোচনা করা হইয়াছে।

সম্ভোগ শৃঙ্গারের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বিশ্বনাথ বলেন—

"দর্শন-স্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাসিনৌ।
যত্রানুরক্তাবন্যোন্যং সম্ভোগোঽয়মুদাহৃতঃ॥

সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩।১৯৭)

—পরস্পর অনুরক্ত বিলাসী এবং বিলাসিনীর যে দর্শন-স্পর্শনাদি রূপ সুখানুভূতি তাহাই অলংকারশাস্ত্রে সম্ভোগ-শৃঙ্গার নামে অভিহিত হয়। চুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদি ভেদে সম্ভোগ শৃঙ্গার অনন্ত প্রকার হইলেও পণ্ডিতগণ ইহাকে একপ্রকার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু, জলকেলি, বনবিহার, চন্দনাদির অনুলেপন প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। চুম্বন আলিঙ্গনাদি দেহভোগজনিত উল্লাসকে সম্ভোগ বলা যাইতে পারে।

সেই সম্ভোগ শৃঙ্গার একই প্রকার হইলেও পূর্বরাগাদির পরে হওয়ায় উহা চারি প্রকার। পূর্বরাগের পরবর্তী, মানের পরবর্তী, প্রবাসের পরবর্তী ও করুণ-বিপ্রলম্ভের পরবর্তী।

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের নিবিড় মিলনরস চিত্রিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ লৌকিক নায়িকার শরীর-লাবণ্য বর্ণনার মতই শ্রীরাধার শরীর-লাবণ্য বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের সম্ভোগ বর্ণনা মর্ত্যরসেই ভরপুর। বৈষ্ণব অলংকারশাস্ত্রকার রূপগোস্বামী লৌকিক অলংকারশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়াই সম্ভোগ শৃঙ্গারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। রূপ গোস্বামী সম্ভোগের

সূক্ষ্ম বিভাগের কল্পনা করিয়াছেন। এইখানেই রূপ গোস্বামীর কৃতিত্ব। রূপ গোস্বামী বিপ্রলম্ভের পরেই সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'উজ্জ্বল-নীলমণি'তে বলেন—

"দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্যতে॥"

(উঃ মঃ শৃঙ্গার ভেদ প্রঃ ১৫।১৮৮)

—নায়ক ও নায়িকার (পরস্পর বিষয় ও আশ্রয়ের) দর্শন, আলিঙ্গন, সম্ভাষণ ও স্পর্শাদির পরস্পর সুখতাৎপর্যমূলক নিষেবণ, তাহার দ্বারা উল্লাসপ্রাপ্ত ভাবই 'সম্ভোগ' বলিয়া কথিত হয়।

এখানেও দেখা যাইতেছে দেহসম্ভোগ-জনিত উল্লাসকেই সম্ভোগ বলা হইয়াছে। ইহাকেই বৈষ্ণবগণের মতে রাধাকৃষ্ণের মিলন-লীলা বলা হইয়াছে।

বৈষ্ণবদের মতে সম্ভোগ দুই প্রকার—মুখ্য সম্ভোগ ও গৌণ সম্ভোগ। জাগ্রত অবস্থায় মুখ্য সম্ভোগ আবার চারি প্রকার,—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। আবার এই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগাদির নানারকম উপবিভাগ কল্পিত হইয়াছে।

গৌণ সম্ভোগের অর্থ স্বপ্ন-সংভোগ—'স্বপ্নে প্রাপ্তিবিশেষোঽস্য হরের্গৌণ ইতীর্যতে'[১]—"স্বপ্নবিষয়ে হরির (কৃষ্ণের) প্রাপ্তি বিশেষকে গৌণ সম্ভোগ বলে।" ইহারও সাধারণ ও বিশেষ দুই শ্রেণী আছে এবং মুখ্য সম্ভোগের মত চারিটি উপবিভাগও কল্পিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে 'ভাব-সম্মেলনের' পদ দেখা যায়। 'ভাব-সম্মেলনে' রাধাকৃষ্ণের প্রকৃত মিলন হয় নাই—শ্রীরাধা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের কল্পনা করিতেছেন। এই পদগুলিও গৌণ সম্ভোগের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে॥

অমরুর একটি কবিতা সম্ভোগ শৃঙ্গারের উদাহরণ হিসাবে 'সাহিত্য-দর্পণে' উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি এই—

শূন্যং বাসগৃহং বিলোক্য শয়নাদুত্থায় কিঞ্চিচ্ছনৈ-
র্নিদ্রাব্যাজমুপাগতস্য সুচিরং নির্বর্ণ্য পত্যুর্মুখম্।
বিস্রব্ধং পরিচুম্ব্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং
লজ্জানম্রমুখী প্রিয়েণ হসতা বালা চিরং চুম্বিতা॥৭৪

(সাঃ দঃ প্রথম পরিচ্ছেদ ১।৫)

১। উঃ মঃ শৃঙ্গারভেদ প্রঃ (১২।১১০)

—"বাসগৃহ নির্জন হইলে অতি সন্তর্পণে শয্যা হইতে উঠিয়া কপট নিদ্রায় অভিভূত পতির মুখ দেখিবার পর চুম্বন করিলে কপোলে রোমাঞ্চ ফুটিতে দেখিয়া যখন নববধূর মুখ লজ্জায় আনত হইল, তখন পতি হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাহাকে চুম্বন করিল।" এখানে সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার হইয়াছে।

রূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগের পর মিলনে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার মুখ-চুম্বন অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পদটি উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কপটচটুলিত-ভ্রুবঃ সমন্তা- দনুজরিপুরচুম্বদম্বুজাক্ষ্যাঃ
মুখশশিনঃ রভসাদ্বিধূয়মানম্। কমলমিবানিলকম্পি চঞ্চরীকঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রঃ ১৫।২৪৯)

—বায়ুভরে কম্পিত কমলকে ভ্রমর যেরূপ চুম্বন করে তদ্রূপ পদ্মপলাশ-লোচনা এবং অন্তরে সন্তোষ হইলেও বাহ্য বামোদয়ে চঞ্চল ভ্রূবিশিষ্টা রাধার ইতস্ততঃ সঞ্চাল্যমান মুখচন্দ্রকে কৃষ্ণ চুম্বন করিলেন।

'সাহিত্য-দর্পণে' গোপীকৃষ্ণ সম্পর্কীয় একটি প্রেম-কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে দেখি স্বয়ংদূতিকা গোপী কৃষ্ণকে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে এবং কৃষ্ণ তাহাকে আলিঙ্গন দানে সন্তুষ্ট করিতেছেন।

স্বামী মুগ্ধতরো বনং ঘনমিদং বালাহমেকাকিনী
ক্ষৌণীমাবৃণুতে তমালমলিনচ্ছায়া তমঃসন্ততিঃ।
তন্মে সুন্দর ! মুঞ্চ কৃষ্ণ ! সহসা বর্ত্মে'তি গোপ্যা গিরঃ
শ্রুত্বা তাং পরিরভ্য মন্মথকলাসক্তো হরিঃ পাতু বঃ॥

(সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ ৩।২২০) (পদ্যাবলী—২৫০)

—আমার স্বামী অতি নির্বোধ, এই বন অত্যন্ত নিবিড়, আমিও একাকিনী। আবার তমাল বৃক্ষের ন্যায় মলিন অন্ধকাররাশি পৃথিবীকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব হে কৃষ্ণ, হে সুন্দর, আমার গৃহগমনের পথ ছাড়িয়া দাও। গোপীর এই কথা শুনিয়া তাহাকে আলিঙ্গনরত মন্মথকলাসক্ত হরি তোমাদের রক্ষা করুন।

গোপী-কৃষ্ণকে লইয়া লিখিত এই সাধারণ প্রেম-কবিতাটিকে রূপ গোস্বামী 'তত্র রাধা-বাক্যম্' বলিয়া পদ্যাবলীতে (২৫০) উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ বৈষ্ণব-প্রেমগীতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবি বিদ্যাপতি এই কবিতার ভাব লইয়া একটি পদ রচনা করিয়াছেন।

"কুঞ্জভবন সঁ চলিভেলি লে
রোকলি গিরিধারী।
একহিঁ নগর বসু মাধব হে
জনু কর বটবারী॥
ছাড়ু কহ্নাইয়া মোর আঁচর হে
ফাটত নব সারী।
অপজস হোএত জগ ভরি হে
জনু করিঅ উঘারী॥
সঙ্গক সখি আগুআইলি রে
হম একসরী নারী।
দামিনি আয় তুলাইলি হে
এক রাতি অন্ধারী॥
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল হে
সুনু গুনমতি নারী।
হরিক সঙ্গে কিছু ডর নহিঁ হে
তুহে পরম গমারী॥

(বৈ. প. পৃ. ৯৪)

—"কুঞ্জ ভবন হইতে চলিয়া যাইতেছিলাম, গিরিধারী (পথে) আটকাইলে। হে মাধব, একই নগরে বাস কর, যেন বাটপাড়ি (বাটোয়ারী) করিও না। কানাই, আমার আঁচল ছাড়, নূতন শাড়ি ফাটিতেছে, ছিড়িয়া যাইতেছে। জগৎ ভরিয়া অপযশ হইবে—যেন বিবস্ত্রা করিও না (অথবা উদ্ঘাটিত অর্থাৎ লোকমাঝে গুপ্তপ্রেম জানাজানি করিও না)। সঙ্গের সখী আগাইয়া গেল, আমি একেশ্বরী (একাকিনী) নারী। একে রাত্রি অন্ধকার, দামিনী আরও অন্ধকার বাড়াইয়া দিল। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন —হে গুণবতি রমণি, শোন, হরির সঙ্গে কোন ভয় নাই, তুমি পরম গমারী (গ্রাম্য অর্থাৎ বুদ্ধিহীনা)।"

ইহার সহিত গোবিন্দদাসের রাধা-কৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলার পদটির তুলনা করা যাইতে পারে।

রাধাবদন হেরি কানু আনন্দ।
জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দ॥
কতহুঁ মনোরথ কৌশল কতরি
রাধাকানু কুসুমশর সমরি॥
পুলকে পুরল তনু হৃদয় উলাস।
নয়ন ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস॥
দুহুঁ অতি বিদগধ অতুলন লেহা।
রস আবেশে বিছুরল নিজ দেহা॥
হার টুটল পরিরম্ভণ বেলি।
মৃগমদ চন্দন সব দূরে গেলি॥
খসল কুসুম কেশ দুহুঁ অতি ভোর।
নীলমণি কাঞ্চনজড়িত উজোর॥
গোবিন্দদাস কহয়ে রাধা কান।
শোভে দশবাণ জিনিয়া পাঁচবাণ॥

বৈ. প. পৃ. ৫৯৬

গাহাসত্তসঈর একটি পদে নায়কের মিলনসুখ চিত্রিত হইয়াছে। এখানে মানের পর মিলনের বর্ণনা দেখি।

"ভরিমো সে সঅণপরম্মুহীঅ বিঅলন্তমাণপসরাএ।
কইঅবসুত্তুব্বত্তণথণ-কলসপ্পেল্লণ-সুহেল্লিং॥" গাহা ৪।৬৮

—প্রথমে শয়ন-পরাঙ্মুখী হইলেও (পরে) মানভার বিগলিত হইলে সেই (নায়িকা) কপটনিদ্রা অবলম্বন করিয়া পার্শ্বপরিবর্তন দ্বারা স্তনকলসের ঘনাবমর্দজনিত যে সুখকেলির উৎপাদন করিয়াছে তাহা স্মরণ করিতেছি।

সদুক্তিকর্ণামৃতে 'বিকট-নিতম্বা' কবির একটি পদে আছে, নায়িকা তাহার সখীর নিকট তাহাদের মিলন-সুখ বর্ণনা করিতেছে—

কান্তে তল্পমুপাগতে বিগলিতা নীবী স্বয়ং বন্ধনাদ্
বাসশ্চ শ্লথমেখলাগুণধৃতং কিঞ্চিন্নিতম্বে স্থিতম্।
এতাবৎ সখি বেদ্মি কেবলমহো তস্যাঙ্গসঙ্গে পুনঃ
কোঽসৌ কাস্মি রতং চ কীদৃশমিতি স্বল্পাপি মে ন স্মৃতিঃ॥
বিকটনিতম্বায়াঃ, সদুক্তিক ২।১৪০।১

—"কান্ত শয্যায় আসিলে নীবী বন্ধন হইতে বিচ্যুত হইল, বসন মেখলা রজ্জু হইতে শিথিল হইয়া নিতম্বে পতিত হইল, আমি এইটুকুমাত্রই জানি, তাহার সহিত আসঙ্গ রতিতে সে নায়ক কে এবং আমিই বা কে, কেমনই বা রত হইল এইসব আমার কিছুই স্মরণে নাই।" উক্ত পদটির সহিত বিদ্যাপতির এই পদটির তুলনা করা যায়—

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
জোই কয়ল সোই নাগররাজ॥
পহিল বয়স মঝু নহি রতিরঙ্গ।
দূতি মিলায়ল কামুক সঙ্গ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ মতি তাহে করু ঝাঁপ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রসকেলি॥
হঠ করি নাহ কয়ল জত কাজ।
সো কি কহব ইহ সখিনিসমাজ॥
জানসি তব কাহে করসি পুছারি।
সো ধনি জো থির তাহি নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহ ন কর তরাস।
ঐসন হোয়ল পহিল বিলাস॥
বৈ. প. পৃ. ৯৬, পদকল্পতরু ২৩৭

গাহাসত্তসঈর একটি পদে নববধূর সহিত মিলনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

পুচ্ছিজ্জন্তী ণ ভণই গহিআ পপ্ফুরই চুম্বিআ রুঅই।
তুহিণ্কা ণববহুআ কআবরাহেণ উবঊঢ়া॥ গাহা ৭।৯৭

—কৃতাপরাধ (নববরদ্বারা) আলিঙ্গিত হইয়া নির্বাক্ নববধূ জিজ্ঞাসিত

হইলে উত্তর দেয় না, (হাত দিয়া) ধরিলে কাঁপিতে থাকে এবং চুম্বিত হইলে রোদন করিতে থাকে।

ইহার সহিত গোবিন্দদাসের রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনের চিত্রটির তুলনা করা যায়।

ধরি সখি আঁচরে ভই উপচঙ্ক।
বৈঠে না বৈঠয়ে হরি পরিয়ঙ্ক॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রসঅভিলাষে আগোরল নাহ॥
লুবুধল মাধব মুগধিনি নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।
হেরইতে বয়ন নয়ন জল খলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপ।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ॥
শুতলি ভীত পুতলী সম গোরি।
চীত নলিনী অলি রহই আগোরি॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম।
রূপকি কূপে মগন ভেল কাম॥

বৈ. প. পৃ. ৫৮৫, পদকল্পতরু ১০০

সদুক্তিতে উদ্ধৃত কেশট কবির একটি পদ আছে, (এক সখী অন্য এক সখীর নিকট বলিতেছে)।

মা গর্ব্বমুদ্বহ কপোলতলে চকাস্তি।
কান্তস্বহস্ত-লিখিতা মম মঞ্জরীতি।
অন্যাপি কিং ন সখি ভাজনমীদৃশীনাং
বৈরী ন চেদ্‌ভ বতি বেপথুরন্তরায়ঃ॥

কেশটস্য (সদুক্তিকঃ) ২।১৪০।৫, পদ্যাবলী ৩০২, সা. দ. (৩।১১৯)

—আমার গণ্ডদেশে কান্তের স্বহস্তপ্রদত্ত মঞ্জরী শোভা পাইতেছে এই বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিও না, বৈরী বেপথু যদি অন্তরায় না হয়, তাহা হইলে অপরা কেহ এই সৌভাগ্যের ভাজন হইতে পারে।

মানবীয় প্রেমের এই কবিতাটিকে রূপগোস্বামী 'রাধাসখীং প্রতি চন্দ্রাবলী-সখ্যাঃ সাসূয়বাক্যমিদম্‌" বলিয়া (পদ্যাবলীতে ৩০২) স্থান দিয়াছেন। দামোদর কবির রচিত (পদ্যাবলীতে) এই পদটিতে 'কান্ত' স্থলে 'কৃষ্ণ' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। সাধারণ প্রেমগীতিকা বৈষ্ণব প্রেমগীতিকা রূপে গৃহীত হইয়াছে।

সদুক্তিকর্ণামৃতে গোসোক কবির একটি পদে নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ চিত্র দেখি।

অঙ্গানি শ্লথনিঃসহানি নয়নে মুগ্ধালসে বিভ্রম-
শ্বাসোৎকম্পিতকোমলস্তনমুরঃ সায়াসহৃপ্তে ভ্রুবৌ।

কিং চান্দোলন-কৌতুক-ব্যাপরতাবাস্যেষু বাম-ভ্রুবাং
স্বেদাম্ভঃ-স্নাপিতাকুলালক-লতেষ্বাবাসিতো মন্মথঃ ॥

সদুক্তি ২।১৩৩।৩ (গোসোকস্য)

—'(সম্ভোগে) অঙ্গগুলি শ্লথ ও নিঃসহায়, নয়নদ্বয় মুগ্ধ ও অলস, বিভ্রম ও শ্বাসহেতু কম্পিত কোমলস্তন-সমন্বিত বক্ষোদেশ, ভ্রূদুইটি আয়াসম্লপ্ত, আন্দোলনহেতু কৌতুকযুক্ত মুখের স্বেদজল-স্নাপিত আলোল অলকাবলীতে মন্মথ বাস করিতেছে।'

গাহাসত্তসঈর একটি পদে সম্ভোগ-শ্রান্ত নায়ক-নায়িকার অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে।

খিন্নস্স উরে পইণো ঠবেই গিম্হাবরণ্‌হ-রমিঅস্স।
ওলং গলন্ত-কুসুমং ণ্‌হাণসুঅন্ধং চিউরভারং ॥ গা স. ৩।৯৯

—"গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণ সময়ে রমণকারী খিন্ন পতির বক্ষঃস্থলের উপর (প্রিয়তমা) তাহার আর্দ্র, গলিতপুষ্প ও স্নানসুগন্ধ কেশভার স্থাপিত করিতেছে।"

বৈষ্ণব পদেও দেখা যায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মিলনলীলার পর অনুরূপ আচরণ করিতেছেন।

জয়দেবের রাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে মিলনসুখ অনুভব করিয়াছেন তাহারই বর্ণনা করিতেছেন—

প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরলম্।
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃত-জঘনদুকূলম্ ॥
কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্।
কৃত-পরিরম্ভণচুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ ॥ (বৈ. প. পৃ. ৭)

—প্রথম সমাগম সময়ে লজ্জিতা দেখিয়া যিনি অতি পটুতার সহিত অনুকূল শত চাটুবচন প্রয়োগ করেন এবং আমাকে মৃদুমধুর হাস্যের সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া আমার জঘন বসন শিথিল করিয়া দেন। আমি কিশলয় শয্যায় শয়ন করিলে যিনি আমার বক্ষঃস্থলে দীর্ঘকাল শয়ন করিয়া থাকেন এবং আমি আলিঙ্গন-পূর্বক চুম্বন করিলে যিনি প্রত্যালিঙ্গনপূর্বক আমার অধরসুধা পান করেন।

কবি বিদ্যাপতি প্রাচীন কবিদের রীতি অনুসরণ করিয়া নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন।

সখি হে কি কহব বচন না ফুর।
স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে
কিয়ে অতি নিকট কি দূর॥
তড়িত লতাতলে তিমির সম্ভায়ল
আঁতরে স্বরধুনি ধারা।
তরল তিমির শশি স্থর গরাসল
চৌদিগে খসি পড়ু তারা॥
অম্বর খসল ধরাধর উলটল।
ধরণি ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরিগণ করু রোলে॥
প্রলয় পয়োধিজলে জনু ঝাপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ (বিদ্যাপতি)

বৈ. প. পৃ. ৯৭

নৌক্রীড়া বা নৌকাখণ্ড

প্রাচীন সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যে নৌকালীলার কথা দেখিতে পাই। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলে'র একটি পদে নৌব্যসনী কৃষ্ণের উল্লেখ দেখি।

অরেরে বাহিহি কাহ্ন নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি।
তঁই ইথি ণঈহি সন্তার দেই
যো চাহসি সো লেহি॥

—"ওরে রে কৃষ্ণ, তুমি নৌকা বাহিবে ডগমগ (নৌকার টলমলানি) ছাড়িয়া দাও, আমাদের দুর্গতি দিও না, তুমি এই নদী পার করিয়া দিয়া যাহা চাও তাহাই লও।"

কবি বিদ্যাপতি এই পদটির ভাব লইয়া নৌকাবিলাসের একটি পদ রচনা করিয়াছেন। রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছে—

তুঅ গুণ গৌরব সীল সোভাব।
সেহে লএ চঢ়লিহু তোহরী নাব॥
হঠ ন করিঅ কহ্নু কর মোহি পার।
সব তহ বড় থিক পর উপকার॥
আইলি সখি সবে সাথে হমার।
সে সবে ভেলি নিকহি বিধি পার॥
হমরা ভেলি কহ্নু তোহরেও আস।
জে অঁগিরিঅ তান হোইঅ উদাস॥
ভল মন্দ জানি করিঅ পরিণাম।
জস অপজস দুই রহ গএ ঠাম॥
হমে অবলা কত কহব অনেক।
আইতি পড়লে বুঝিঅ বিবেক॥
তোঁহে পর নাগর হমে পর নারি।
কাঁপ হৃদয় তুঅ প্রকৃতি বিচারি॥
ভণই বিদ্যাপতি গাবে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
ঈ রস সকল সে পাবে॥'

বৈ. প. পৃ ১১৩

উক্ত পদটিকে আদর্শ ধরিয়া বহু বৈষ্ণব কবি রাধা-কৃষ্ণের নৌলীলার বহু পদ রচনা করিয়াছেন। নৌকা-লীলা ও দানলীলার কথা কোন প্রাচীন পুরাণে দেখা যায় না। পরবর্তীকালের অপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যে ও প্রাদেশিক ভাষায় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার দানখণ্ডের ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলায় এই দুইটি বিশিষ্ট ঘটনা হিসাবে স্থান পাইয়াছে।

তুঃ উদ্ধবদাস—মুখরার সঙ্গে রাই সখীগণ সঙ্গে।
যমুনা সাঁতার দেখি ভাবে মনে মনে॥
রাই কহে যাহা চাও তাহা আমরা দিব।
কাণ্ডারী কহয়ে হিয়ার রতন লইব॥ (বৈ. প. ৫১১ পৃ.)

কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলে' লিখিয়াছেন—
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অতএব কহি কিছু হরিবংশমতে॥

কিন্তু প্রচলিত হরিবংশে 'দানখণ্ড' ও 'নৌকাখণ্ডে'র কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

নৌকাখণ্ডের বিষয়টি হইতেছে এই—ব্রজের গোপিকাগণ যমুনা নদী পার হইয়া মথুরা যাইতে ইচ্ছা করিলেন, কৃষ্ণ নৌকায় করিয়া গোপীদের যমুনা পার করিয়া দিবেন বলিলেন এবং তাহার বদলে রাধার প্রেম প্রার্থনা করিলেন। রাধা প্রথমে অসম্মত হইলেন কিন্তু নৌকা যখন মাঝ নদীতে তখন কৃষ্ণ গোপীদের ভয় দেখাইলেন, এই অবস্থায় কোন উপায় না পাইয়া রাধা কৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

'প্রাকৃত-পৈঙ্গলে'র একটি পদে নৌকা -লীলার উল্লেখ দেখা যায়। পদটি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতে নৌকালীলা সম্বন্ধে তেরটি কবিতা পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে পাঁচটি রূপ গোস্বামীর নিজের রচনা, বাকীগুলি অন্যান্য কবির রচনা। নিম্নে দুইটি কবিতা উদ্ধৃত হইল।

রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলীতে' জগদানন্দরায়ের একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটিতে দেখা যায় পারগামী গোপিকাগণ নৌব্যসনী কৃষ্ণকে বলিতেছে।

জীর্ণা তরিঃ সরীদতীবগভীর-নীরা বালা বয়ং সকলমিত্থমনর্থহেতুঃ।
নিস্তার-বীজমিদমেব কৃশোদরীনাং যন্মাধব ত্বমসি কর্ণধারঃ॥

পদ্যাবলী ২৭১

—'তরী জীর্ণ, নদীতে গভীর নীর, আমরা বালিকা—এই সকল বিপদের কথা। তবে আমরা অবলা আমাদের নিস্তারের একটু ক্ষীণ আশা এই যে মাধব, তুমিই এখন কর্ণধার হইয়াছ।'

পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত মুকুন্দ ভট্টাচার্য্যের পদে দেখি গোপীগণ কৃষ্ণের ব্যবহারে যেন অসন্তুষ্ট হইয়াই খেদ প্রকাশ করিতেছে।

ইদমুদ্দিশ্য বয়স্যাঃ স্বসমীহিতদৈবতং নমত।
যমুনৈব জানুদঘ্নী ভবতু ন বা নাবিকোঽস্ত্বপরঃ॥ পদ্যাবলী ১৭৬

—হে সখীগণ, এই প্রার্থনা করিয়া তোমাদের নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতাদের নমস্কার কর, যমুনা যেন হাঁটুজল হয় কিংবা অপর কেহ নাবিক হউক।'

কোন অজ্ঞাতনামা কবির একটি পদ পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রাধিকা কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে।

বাচা তবৈব যদুনন্দন গব্যভারো
হারোঽপি বারিণি ময়া সহসা বিকীর্ণঃ।
দূরীকৃতং চ কুচয়োরনয়োর্দুকূলং
কূলং কলিন্দ-দুহিতুর্ন তথাপ্যদূরম্॥ পদ্যাবলী ২৭৩

—'হে যদুনন্দন, তোমার কথায় গব্যভার এবং হারও সহসা আমি জলে নিক্ষেপ করিলাম, পয়োধরের বস্ত্রও দূরে ফেলিয়া দিলাম, তথাপি যমুনানদীর কূল দূরেই রহিল।'

এই শ্লোকটির ভাব বিস্তার করিয়া গোবিন্দদাস একটি পদ রচনা করিয়াছেন। রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

ও নব নাবিক শ্যামরু চন্দ।
কৈছনে তোহারি হৃদয়-অনুবন্ধ॥
তুয়া বোলে গোরস যমুনহি ঢার।
ফারলু কাঁচলি ভারলু হার॥
কর অবসর নাহি সিঞ্চইতে নীর।
অতিথণে অবহু না পাওলুঁ তীর॥
হাম নিরস তুহুঁ হাসি উতরোল।
কেহ জীউ তেজই কেহ হরি বোল॥
এতদিনে কুলবতীর কুলে পড়ু বাজ।
চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ॥
উঠহ কুলে পারে যো তুঁহু মাগ।
কাহু সঞে মাগি ধরব তুয়া আগ॥
গোবিন্দদাস কহে সময়ক কাজ।
নাবিক বেতন নাবক মাঝ॥

পদকল্পতরু ১৪২২, বৈ. প. পৃ. ৬৩৭

ইহার সহিত উদ্ধবদাসের নৌকাবিলাসের পদটির তুলনা করিতে পারি।

মুখরার সঙ্গে রাই সখীগণ সঙ্গে।
যমুনা সাঁতার দেখি ভাবে মনে মনে॥
ডাক দিয়া বলে গ্যায়্যা নৌকা আন ঘাটে।
আমরা হইব পার বেলা সব টুটে॥
দেখিয়া নাগররাজ জীর্ণ তরি লৈয়া।
হাসিয়া কহয়ে কথা কাণ্ডারী হইয়া॥
কি দিবে আমারে কহ কতেক বেতন।
একে একে পার করিব যত জন॥
রাই কহে যাহা চাও তাহা আমরা দিব।
কাণ্ডারী কহয়ে হিয়ার রতন লইব॥

সখী সঞে নৌকায় চড়িল বিনোদিনী।
তরঙ্গ বাড়িল তায় জীর্ণ তরিখানি॥
তরঙ্গের রঙ্গে নৌকা ডুবু ডুবু করে।
হেরি সব সহচরী কাঁপয়ে অন্তরে॥
তরঙ্গ দেখিয়া থরহরি কাঁপে রাই॥
কোলে করি বায় নৌকা কাণ্ডারী কানাই॥
রাই কোলে করি নাগর হরষিত চিতে।
এ পার হইল নৌকা দেখিতে দেখিতে॥
দুহুঁ অঙ্গ পরশিতে দুহুঁ প্রেমে ভাসে।
নৌকা বিলাস কহে উদ্ধব দাসে॥

বৈ. প পৃ. ৫১১

হিন্দী কবি সুরদাস (১৫০০ খ্রীঃ) এই আখ্যানটিকে অবলম্বন করিয়া কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় লিখিত বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে, মাধবচর্য্যের শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলে এবং শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গলে এই কাহিনীর উল্লেখ দেখা যায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের বহু বৈষ্ণব কবি এই বিষয়টি লইয়া পদ রচনা করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামী ভাগবতের টীকায় দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন—"শ্রীজয়দেব-চণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি-লীলাপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।"

দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কাহিনী আদিরসাত্মক ও খুব জনপ্রিয়। নৌলীলা মুখ্য সম্ভোগের মধ্যে পড়ে।

বলরাম দাসের নৌকাবিলাসের পদ—

তোমরা কে বট ধনি পরিচয় দেহ আগে জানি।
এ হেন বিনোদ সাজে কোথা যাবে কোন কাজে
বল বল বলগো তা শুনি॥
কমল বদনখানি চরণ কমল জিনি
কমল-লোচনী কমলিনী।
জীবন যৌবন ভরা তাহাতে মাথে পসরা
হাঁটিয়া এসেছ ধন্য মানি

এনা বেশে কিবা আশে যাইবা কাহার বাসে
বিজয় করিয়া বিনোদিনী।
মোর ভাগ্যে হেন হবে নায়ে পদ পরশিবে
বিশ্রাম করিবা তুমি ধনি ॥
তোমরা ডাকিছ সুখে তরণী পড়েছে পাকে
আপনা সারিয়া পাছে আনি।
সুপ্রভাত হইল নিশি দিবসে উদয় শশী
বলরাম দাসে কহে বাণী ॥ বৈ. প. পৃ. ৭৫০

জ্ঞানদাসের একটি পদে রাধা-কৃষ্ণের নৌবিলাস চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকুল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥
দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যাম রায়।
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চড়িনু কেন নায়।
ন্যায়ার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে ॥
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হইয়া থাক দেখি
এখনি না ভাবহ বিষাদ ॥

বৈ. প. পৃ. ৪০৭, পদকল্পতরু ১৪১১

দানলীলা

দানলীলা বা দানখণ্ডের কাহিনী ভাগবতে পাওয়া যায় না। দানখণ্ডের কাহিনীটি আদিরসাত্মক। দানলীলার কাহিনীটি নিম্নরূপ,—কৃষ্ণ রাধার প্রেমে

পড়িয়াছেন, কিন্তু রাধা ভীরু বা অসম্মত। রাধার সঙ্গে দেখা করিতে না পারিয়া কৃষ্ণ মথুরার পথে (কোন মতে গোবর্ধনের পথে) অপেক্ষা করিতেছিলেন। গোপীদের সহিত রাধিকা দধিদুগ্ধ লইয়া মথুরার হাটে (বা উৎসব উপলক্ষে গব্যভার লইয়া গোর্ধন পর্বতে) যাইতেছিলেন। কৃষ্ণ দানী সাজিয়া বা কর সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী সাজিয়া গোপিকাদের নিকট কর চাহিলেন। কৃষ্ণ রাধার সহিত আদিরসাত্মক বাগ্‌বিতণ্ডা জুড়িয়া দিলেন। শেষে রাধা কৃষ্ণের প্রস্তাবে খানিকটা অনিচ্ছায় দেহদানে স্বীকৃত হইলেন। মনে হয় মূলে কাহিনীটি আদিরসাত্মক ছিল না। কৃষ্ণ ও তাঁহার রাখাল সখারা দধি দুগ্ধ খাইবার জন্যই গোপীদের আটক করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস মনে হয় এই ঘটনাটি জানিতেন।

দানলীলা সম্বন্ধে প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থে, অলংকার শাস্ত্রে বা পুরাণে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অর্বাচীন কালে সংস্কৃতে রচিত দানলীলা-বিষয়ক দুই একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওরা যায়। এই লীলা লইয়া রূপ গোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী', রঘুনাথ গোস্বামীর 'দানকেলি-চিন্তামণি' রচিত হইয়াছে। মাধব ভট্ট দানলীলা কাব্য রচনা করেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে দানলীলার উল্লেখ পাই। পরবর্তী যুগের বহু বৈষ্ণব কবি এই লীলা অবলম্বন করিয়া বহু পদ রচনা করিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দানখণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে একটি পদ উদ্ধৃত হইল।

সিশের সিন্দুর তোর নামে। আজি পড়িলা মোর হাথে॥
মাথার কেশ সুবেশে॥ মুঠি এক মাঝা বাএ হালে।
আহ্মাকে না চিহ্নসি তোহ্মি। তা দেখি মুণিমন টলে॥
সব গোপীরঞ্জন কাহ্নাঞি॥ ডাকর ডালিম দুঈ কুচে।
দান আহ্মার পরমাণে। এ রাধা ল। নান্দসুত কাহ্নাঞিকে রুচে॥
না কর মনে আন ভানে॥ সুঝি যাহা মোর সব দানে।
ঘৃত দুধ লঁআঁ তোঁএ যাসী। নহে দেহ আলিঙ্গন দানে॥
ধাঁআ ধাঁআ মথুরা পালাসী॥ রাধা মোর না কর নিরাশে।
আহ্মা ছাড়ী জাইবি কোণ পথে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দানখণ্ড

কবি বিদ্যাপতির দানখণ্ডের পদে দেখি কৃষ্ণ রাধার রূপসৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া দান মাগিতেছে।

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল ত্রিভুবন বিজয়ী মালা॥
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনয় কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী শ্রীযুত খঞ্জন খেলা॥
নাভিবিবর সঞে লোমলতাবলি ভুজগি নিসাস পিয়াসা।
নাসা খগপতিচঞ্চু ভরম ভয়ে কুচগিরি সন্ধি নিবাসা॥
তিন বানে মদন জিতল তিন ভুবনে অবধি রহল দউ বানে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন সোঁপল তোহারি নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নাগর ইহ রস কে পায় জান।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন লছিমা দেই পরমান॥

(বিদ্যাপতি) বৈ. প. পৃ. ১১৫

বংশীবদনের পদ—

হেদে লো বিনোদিনি
এ পথে কেমতে যাবে তুমি।
শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি॥
এ ভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধূলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রমভরে আউলাইল কবরী॥
অমূল্য রতন সাথে গোঙারের ভয় পথে
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী
তিলআধ না যাও ছাড়িয়া॥
মথুরা অনেক পথ তেজ অন্য মনোরথ
মোর কাছে বৈস বিনোদিনী।
বংশীবদনে কয় এই সে উচিত হয়
শ্যাম সঙ্গে কর বিকিকিনি॥ বৈ. প. পৃ. ২৬৩

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথেরও একটি কবিতা তুলনা করা যায়—

এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি
কোমল করুণ ক্লান্ত কায়।
কোথা কোন রাজপুরে যাবে আরো কতদূরে
কিসের দুরূহ দুরাশায়।
সমুখে দেখত চাহি পথের যে সীমা নাহি
তপ্তবালু অগ্নিবান হানে।
পসারিণী কথা রাখো দূর পথে যেয়োনাক
ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে।

—(পসারিনী। কল্পনা)

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় "তাঁহার সম্পাদিত 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীতে' দান-লীলা সম্বন্ধে একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ক যাসি দানীত্যপি নৈব পশ্যসি
দৃগঞ্চলেনাপি গজেন্দ্রগামিনি।
কিমঞ্চলেনাপিহিতং কিশোরি মে
তদা কলয়াশু করঃ প্রদীয়তাম্॥"

ষোঃ শঃ পদাবলী সাহিত্য পৃঃ ৪৬৬

—'হে গজেন্দ্রগামিনী, কোথায় যাইতেছ, সামান্য একটু দৃষ্টি প্রদান করিয়া কি 'দানী'কে দেখিতে পাইতেছ না? হে কিশোরী, তোমার অঞ্চলে কি লুকাইতেছ দেখাও, শীঘ্র কর প্রদান কর।"

এই কবিতাটির ভাব লইয়া কবি অনন্ত একটি বৈষ্ণব পদ লিখিয়াছেন।

আহির রমনী যত এতেক শুনিয়া তবে
চালাঞা বাহির পথ হাসিয়া বোলায় সভে
আপনে যাইছে আন ছলে। কিবা দান কহ দেখি কান॥
বাহু নাড়া দিয়া যাও পুন হাসি কহে দানী
দানী পানে নাহি চাও শুন অহে বিনোদিনী
এত না গরব কার বলে॥ অল্প নিব তোহারি পিরীতে।

হেদে লো কিশোরি গোরি আমার দানের রীতি
শুনহ বচন মোরি শুন শুন রসবতি
তোর দান না করিব আন। তাহা তুমি না পারিবে দিতে॥

পদামৃতসমুদ্র ২৫৮ পৃঃ

ভাব-সম্মেলন বা ভাবোল্লাস

মাথুর বা প্রবাসের পর রাধাকৃষ্ণের যে মিলন তাহাকে ভাব-সম্মেলন বলে। ইহা বাস্তব মিলন নহে, শ্রীরাধার ভাব (কল্প) জগতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন। শ্রীকৃষ্ণ মহান কর্তব্যের আহ্বানে বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, কেননা, পুরুষের জীবনে প্রেমের চেয়ে কর্তব্য বড়। বৃন্দাবনে ছিল শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলা আর এখন মথুরায় ঐশ্বর্যলীলা। এদিকে কৃষ্ণ-বিরহে রাধার জীবনে সীমাহীন দুঃখ, তাঁহার জীবন একেবারে শূন্য হইয়া গেল, হাহাকারই তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল। প্রেম চলিয়া গেলে নারীর জীবনে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ আর কোনদিন বৃন্দাবনে পদার্পণ করেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ এই নিষ্ঠুরতার মধ্যেই রাধা-কৃষ্ণ-লীলা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহারা ভাব-সম্মেলন বা ভাবোল্লাস নামে এক অভিনব পর্য্যায়ের পরিকল্পনা করিয়াছেন। শ্রীরাধা বিরহ-বিকারের আবেশে কল্পনা করিতেছেন যেন শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং উভয়ের পুনর্মিলন হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাধা মনে করিতেছেন—কৃষ্ণ যখন আসিবেন কিভাবে তাঁহাকে নিজের দেহের দ্বারা অভ্যর্থনা করিবেন, কিভাবে প্রিয়ের নিকট অভিমান প্রকাশ করিবেন। আবার যখন ভাবরাজ্যে মিলন হইল তখন রাধার মনে হইল তাঁহার জীবন ও যৌবন সফল হইয়াছে। সমস্ত ব্রজবাসীর যেন তাহাতে উল্লাস হইয়াছে।

এই ভাব-সম্মেলন বা ভাবোল্লাস গৌণ সম্ভোগের অন্তর্গত। কেননা, ইহাতে প্রকৃত মিলন হয় নাই। বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের ভাবরাজ্যের যে মিলন বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যেন বাস্তব মিলনের মতই আন্তরিক হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সহিত স্বপ্ন-মিলনের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। আর, ভাব-সম্মেলন কিন্তু দিবাস্বপ্ন বা জাগ্রত স্বপ্ন নয়। শ্রীরাধা বিরহ-বিকারের আতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনকে সত্য বলিয়াই ভাবিতেছেন। রাধার চিন্তায় কোন ফাঁকি ছিল না। বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের এই কল্পমিলনকে

জাগ্রত মিলনের ন্যায় অর্থাৎ মুখ্য সম্ভোগের মতই আন্তরিকতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সহিত রাধার আর কোন দিন মিলন হয় নাই।

বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরুর' চতুর্থ শাখার দ্বাদশ পল্লবে ধৃত পদসমূহকে 'ভাবোল্লাসের' পদ বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র 'উজ্জ্বলনীলমণিতে' এই পর্য্যায়ের কোন পদ নাই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৫।৭৫) ও উজ্জ্বলনীলমণিতে (১৩।১০৪) কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার প্রতি সখীদের স্নেহাতিশয্যকে ভাবোল্লাস বলা হইয়াছে। রূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে কৃষ্ণের কিয়দ্দূর প্রবাস হইতে প্রত্যাগমনকে 'আগতি' বলেন, 'লৌকিক-ব্যবহারেণ স্যাদাগমনমাগতিঃ' (উঃ মঃ ১৫।১৯৯)।—প্রকট লীলানুসারে আগমনকে রসশাস্ত্রে 'আগতি' বলে। রূপ গোস্বামী মথুরা হইতে কৃষ্ণের ব্রজে আগমনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কিন্তু 'অথ সংপ্রয়োগঃ' (উঃ মঃ ১৫।২২২) এই বাক্যের দ্বারা প্রবাস নামক বিপ্রলম্ভের পরে রাধাকৃষ্ণের রহোবিলাস, নখদন্তক্ষত ও চুম্বনাদি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা মনোরম নহে বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন। 'বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা সুখম্। ন তথা সংপ্রয়োগেন স্যাদেবং রসিকা বিদুঃ।' (উঃ মঃ ১৫।২৫৩)—'পরস্পর লীলা-বিলাসে রসিকগণের যে জাতীয় সুখ হয়, সংপ্রয়োগে কিন্তু তজ্জাতীয় সুখাস্বাদন হয় না, রসবেত্তাগণ এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।'

প্রাচীন সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যে 'ভাব-সম্মেলনের' কোন পদ দেখা যায় না। সুদূর প্রবাসের পর নায়ক-নায়িকার মিলনসূচক বহু পদ পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত পদে নায়কের বিদেশ হইতে আগমনে নায়িকার হৃদয়োল্লাসও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত পদ কিন্তু মুখ্য সম্ভোগের অন্তর্গত। নায়ক-নায়িকার স্বপ্ন-মিলনের কথা পূর্বেই বলিয়াছি কিন্তু ভাবরাজ্যে মিলনের কথা সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেম-কাব্যগুলি মিলন-মূলক হইত, বিয়োগান্ত কাব্য দেখা যায় না। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশ আছে যে প্রেম-কাব্যের শেষে নায়ক-নায়িকার মিলন দেখাইতে হইবে। বৈষ্ণব প্রেমগীতিকায় মনে হয় প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব অলক্ষিতে পড়িয়াছে। আবার, যুগলের (রাধা-কৃষ্ণের) উপাসনাও বৈষ্ণবদের একটি আদর্শ, তাই বৈষ্ণব কবিগণ কল্পরাজ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধন করাইয়াছেন। পালাকীর্তন বা রসকীর্তনে দেখি কীর্তনীয়াগণ যে কোন পালার শেষে রাধা-

কৃষ্ণের মিলনের সম্ভবনা না থাকিলেও 'ঝুমুর' গাহিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধন করাইয়াছেন। ভক্ত-শ্রোতৃবর্গ রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলনের লীলারস অন্তরে আস্বাদ করিতে করিতে ঘরে ফিরিতেন।

বহুদিন পর প্রবাসী প্রিয় ফিরিয়া আসিলে প্রেয়সী কিভাবে মঙ্গলানুষ্ঠানের দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করিবে তাহারই বর্ণনা দেখি 'গাহাসত্তসঈ'র একটি পদে।

> রথাপইণ্ণণঅণুপ্পলা তুমং সা পড়িচ্ছএ এন্তং।
> দার-নিহিএহিঁ বি মঙ্গলকলসেহিঁ ব থণেহিঁ॥ গাহাসত্তসঈ ২।৪০

—'রাজপথের দিকে নয়ন-পদ্ম বিস্তারিত রাখিয়া সেই রমণী তাহার কুচদ্বয়কে মঙ্গল কলসের ন্যায় দ্বারদেশে নিহিত রাখিয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।'

ইহার ঠিক অনুরূপ একটি শ্লোক ত্রিবিক্রমভট্ট রচিত বলিয়া 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি'তে উল্লিখিত হইয়াছে।

> কিঞ্চিৎকম্পিত-পাণিকঙ্কণরবৈঃ পৃষ্ঠং নমু স্বাগতং
> ব্রীড়ানম্রমুখাব্জয়া চরণয়োর্ন্যস্তে চ নেত্রোৎপলে।
> দ্বারস্থ-স্তনযুগমঙ্গলঘটে দত্তঃ প্রবেশো হৃদি
> স্বামিন্ কিং ন তবাতিথেঃ সমুচিতং সখ্যানয়ানুষ্ঠিতম্॥
>
> (শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি ৩৫৩০)

—"হে স্বামিন্, ঈষৎ কম্পিত হস্তস্থিত কঙ্কণের শব্দের দ্বারা স্বাগত সম্ভাষণ করা হইয়াছে, লজ্জানম্রমুখপদ্মের দ্বারা নয়নোৎপল দুইটি চরণদ্বয়ে ন্যস্ত করা হইয়াছে, দ্বারস্থিত দুইটি মঙ্গলঘটের তুল্য স্তনদ্বয়যুক্তহৃদয়ে প্রবেশ প্রদত্ত হইয়াছে, অতিথি তোমার জন্য আমার এই সখী কি না অনুষ্ঠান করিয়াছে।"

এখানে দেখি নায়ক বহুদিন পর প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে নায়িকা সখীহস্তে তাহার দেহের দ্বারা সাদর অভ্যর্থনা করিতেছে।

অমরুশতকের একটি পদেও ঠিক এই ভাবই দেখি। নায়ক ফিরিয়া আসিলে নায়িকা নিজ দেহের দ্বারা তাহার সম্বর্ধনা করিতেছে।

> দীর্ঘা চন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ
> পুষ্পানাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ।
> দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরযুগেনার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা
> স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্॥ (অমরুক : ৪০)

—'(সেই রমণী), দৃষ্টির দ্বারা প্রবেশ পথে লম্বিত বন্দনা মালিকা রচনা করিয়াছে, নীলপদ্মের দ্বারা নয়; তাহার স্মিতহাস্যের দ্বারা পুষ্পবিকীরণ করিয়াছে, কুন্দ, যুথি ও অপর ফুলের দ্বারা নয়; স্বেদস্রাবী কুচদ্বয়ের দ্বারা তোমার অর্ঘ্য রচনা করিয়াছে, কলসের জলের দ্বারা নয়; —সেই তন্বী নিজের অঙ্গসমূহের দ্বারা গৃহপ্রবেশকারী প্রিয়তমের মাঙ্গল্য রচনা করিয়াছে।'

এখানে দেখি নায়কের আগমনে নায়িকা উল্লাস প্রকাশ করিতেছে এবং নিজের দেহের দ্বারা তাহার (নায়কের) মাঙ্গল্য রচনা করিতেছে।

'সাহিত্য-দর্পণে একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও দেখি প্রিয়তমের আগমনে নায়িকা হৃদয়ের উল্লাস ব্যক্ত করিতেছে এবং দ্বারে অবস্থান করিয়া তাহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছে।

অত্যুন্নত-স্তনযুগা তরলায়তাক্ষী দ্বারি স্থিতা তদুপায়নমহোৎসবায়।
সা পূর্ণকুম্ভনবনীরজতোরণ-স্রক্‌সম্ভারমঙ্গল-যত্নকৃতং বিধত্তে॥

(সাহিত্য-দর্পণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪।১৫))

—'(নায়ক প্রবাস হইতে ফিরিয়াছে শুনিয়া) অত্যুন্নত-স্তনযুক্তা চঞ্চলাক্ষী সেই (রমণী) দ্বারে অবস্থান করিয়া তাহার (নায়কের) গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে মহোৎসবের জন্য পূর্ণকুম্ভ, নবপদ্ম ও তোরণমালা প্রভৃতি মঙ্গল সমারম্ভের প্রযত্ন করিতেছে।' এখানে নায়িকার অত্যুন্নত স্তনযুগলকে পূর্ণকুম্ভ এবং চঞ্চল অক্ষিকে নবপদ্ম রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখি শ্রীরাধা মনে মনে কল্পনা করিতেছেন যেন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছেন। এখন কিভাবে তাহার অভ্যর্থনা করিবেন? তাঁহার দেহের অঙ্গগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের মহোৎসবের জন্য নিয়োজিত করিবেন।

বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির রাধা বলিতেছেন—

পিয়া জব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহুঁ করব নিজ দেহে॥
বেদিয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদি বনাওব হম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলি রোপব হম গরুআ নিতম্বে।
আমপল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্পে॥
দিসি দিসি আনব কামিনি ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আস।
দুই এক পলকে মিলব তুঅ পাস॥

(বৈ. প. পৃ. ১২৯) (পদকল্পতরু ১৭৭৩)

বিদ্যাপতির আর একটি পদে আছে শ্রীরাধা বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিলে শ্রীরাধা সর্বোপচারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন।

যব হরি আয়ব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তূর॥
রসাবেশে ধায়ব কামিনি ঠাট।
চৌদিকে বেঢ়ব চাঁদকি হাট॥
আলিপন দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥
সহকার পল্লব চুচুক দেব।
মাধব সেবি মনোরথ নেব॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পরতেক।
লোচন নীরে করব অভিষেক॥
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়াকর আগে।
ভণই বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥

(পদকল্পতরু, ১৯৭২)

চণ্ডীদাসের একটি পদে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে ফিরিয়া আসিলে শ্রীরাধা কিভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন।

আইস বন্ধু আইস আধ আঁচরে বৈস
নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়া আঁখি॥
বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণে
সেখানে রাখিয়া থোব॥
কাল কেশের মাঝে তোমারে রাখিব
পুরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে তাহা প্রবোধিব
পরিয়াছি কাল পাঠের জাদ॥
নহে ত স্নেহের নিগড় করিয়া
বাঁধব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে লউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ॥ (পদকল্পতরু ১৯৮৭)

গোবিন্দদাসের একটি পদেও এই ভাব দেখি—

উলসিত মঝু হিয়া অজু আওব পিয়া
দৈবে কহল শুভবাণী।

শুভসূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত
অতয়ে নিচয় করি মানি ॥
শুন সজনি আজু মোর শুভদিন কেল।
সুখ সম্পদ বিহি আনি মিলায়ব
ঐছন মতিগতি ভেল ॥
মঙ্গল কলস পর দেই নব পল্লব
রোপহ ঠামহি ঠাম।
গ্রহ গণক আনি করহ বিভূষিত
তুরিতে মিলয় জনু শ্যাম ॥
হারিদ দাড়িম কাজর দরপণ
দধি ঘৃত রতন প্রদীপে।
সুবরণ ভাজন লাজহি ভরি ভরি
রাখহ নয়ন সমীপে।
নব নব রঙ্গিণি দেউ হুলাহুলি
বসন ভূষণ করু শোভা।
প্রাণ প্রাণ হরি নিজ ঘরে আওব
গোবিন্দদাস মনলোভা ॥ (বৈ. প. পৃ. ৬৫৪)

গাহাসত্তসঙ্গর একটি পদে পাই, বাম অক্ষি স্ফুরণে নায়িকা নায়কের প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন আশা করিতেছে। স্ত্রীলোকের বাম অক্ষি-স্ফুরণ শুভসূচক ইহা লোক-প্রসিদ্ধি।

ফুরিএ বামচ্ছি তুএ জই এহিই সো পিওজ্জ তা সুইরং।
সংমীলিঅ দাহিণঅং তুই অবি এহং পলোইস্‌সং ॥ গাহা ২।৩৭

—হে বামনয়ন, তুমি স্ফুরিত হইলে যদি সেই প্রিয় আজই প্রবাস হইতে আগমন করে, তাহা হইলে আমি আমার দক্ষিণ নয়ন নিমীলিত রাখিয়া তোমার দ্বারাই তাহাকে বহুক্ষণ দেখিব।

বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখি শ্রীরাধা ভাবিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই প্রবাস হইতে আসিবেন, তাহার শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহু নাচিতেছে। বৈষ্ণব কবিগণও লোক-সংস্কৃতির এই লক্ষণটিকে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলায় কাজে লাগাইয়াছেন। কবি কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণ কাব্যে বলিয়াছেন রামচন্দ্র সীতাহরণের সময় কতকগুলি অশুভ লক্ষণ দেখিয়াছিলেন।

শুভ লক্ষণ দেখিয়া 'ইষ্টলাভ' এবং অশুভ লক্ষণ দেখিয়া 'অনিষ্টলাভ' লোকবিশ্বা[স] বা লোকসংস্কার।

বংশীদাসের একটি পদে শ্রীরাধার ভাবোল্লাস বর্ণনা করা হইয়াছে! পদটিতে লোক-প্রসিদ্ধ শুভসূচক নানা প্রকার লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। শ্রীরাধা ভাবিতেছেন এই সকল শুভ লক্ষণ বৃথা যাইবে না, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় আসিবেন।

বামভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে
হৃদয়ে উঠিছে সুখ।
প্রভাতে স্বপন প্রতীত বচন
দেখিলুঁ পিয়ার মুখ॥
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে
দুজনায় একই কথা।
বন্ধু আসিবার নাম সোধাইতে
নাগিনী নাচায় মাথা॥
ভ্রমর কোকিল শবদ করয়ে
শুনিতে সাধয়ে চিত।
রুরু মৃগগণে করয়ে মিলনে
যৈছন পুরব নীত॥
খঞ্জন আসিয়া কমলে বৈসয়ে
সারী শুক করে গান।
বংশী কহয়ে এসব লক্ষণ
কভু না হইবে আন॥

পদকল্পতরু ২৯৭৯, বৈ. প. পৃ. ২৫[.]

জ্ঞানদাসের একটি পদে দেখি রাধা শুভচিহ্ন দেখিয়া কৃষ্ণের আগমনের আশা করিতেছেন।

আজু অবধি দিন ভেলা। বাম নয়ন করু পন্দ।
কাক নিয়ড়ে কহি গেলা॥ সঘনে খসয়ে নিবিবন্ধ॥
আজুক প্রাতর সময়ে। এ লখন বিফল না যাব।
বাম বাহু সঘনে কাঁপয়ে॥ মাধব নিজ গৃহে আব॥
খঞ্জন কমলিনি সঙ্গ। মনরথ কহে শুকসারি।
পুলকে পুরয়ে সব অঙ্গ॥ জ্ঞানদাস সুবিচারি॥

বৈ. পু. পৃ. ৪৫৩

'সাহিত্য-দর্পণের' তৃতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত একটি পদে প্রবাস-প্রত্যাগত নায়কের সহিত নায়িকার মিলন বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া নায়ক নায়িকাকে কুশলাদি প্রশ্ন করিতেছে। নায়কের প্রশ্নের ভাষা 'সংস্কৃত' এবং নায়িকার উত্তরের ভাষা 'প্রাকৃত'। শ্লোকটি বিশ্বনাথের পিতার রচিত।

> ক্ষেমং তে নন্থ পক্ষ্মলাক্ষি কিসঅং খেমং মহঙ্কং দিঢ়ং
> এতাদৃক্ কৃশতা কুতস্তুহ পুণো পুট্‌ঠং সরীরং জদো।
> কেনাহং পৃথুলঃ প্রিয়ে পণইণীদেহসস্ সম্মীলণা
> ত্বত্তঃ স্বভ্রুন কাপি মে জঈ ইদং খেমং কুদো পুচ্ছসি। সা. দ. ৩।১৯৯

—"হে পক্ষ্মলাক্ষি, তোমার মঙ্গল ত?" "আমার শরীর যে এত ক্ষীণ হইয়াছে ইহাই আমার মঙ্গল।" "কি কারণে তোমার শরীর এত শীর্ণ হইয়াছে?" "যেহেতু তোমার শরীর পুষ্ট হইয়াছে?" 'কি কারণে আমি স্থূল হইয়াছি'? 'নিশ্চয় কোন প্রণয়িনীর সঙ্গ পাইয়াছিলে।' "তুমি ভিন্ন আমার অন্য প্রণয়িনী নাই।" "তাহাই যদি সত্য হয় তবে কেন তুমি আমার কুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে?"

বৈষ্ণবাচার্য রূপ গোস্বামীর একটি গীতে আছে, শ্রীরাধিকা বিরহ-বিকারের আতিশয্যে স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন কৃষ্ণ মথুরা হইতে গোকুলে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

রাজপুরাদ্ গোকুলমুপযাতম্।	পরম-মহোৎসব ঘূর্ণিত-ঘোষম্।
প্রমদোন্নাদিত-জননী-তাতম্॥	নয়নেঙ্গিত-কৃত-মৎপরিতোষম্॥
স্বপ্নে সখি পুনরদ্য মুকুন্দম্।	নব-গুঞ্জাবলি-কৃত-পরভাগম্।
অলোকয়মবতংসিত-কুন্দম্॥	প্রবল-সনাতন-সুহৃদনুরাগম্॥

শ্রীরূপের গীতাবলী (বৈ. প. পৃ. ১২৭)

—"সখি! আমি আজ আবার মুকুন্দকে স্বপ্নে দেখিলাম। তাঁহার কর্ণে কুন্দফুলের অলংকার। তিনি রাজপুরী (মথুরা) হইতে যেন গোকুলে আসিয়াছেন। তাঁহার পিতামাতা আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। গোপগণ মহোৎসবে নাচিতেছেন। তিনি তখন অপাঙ্গদৃষ্টির দ্বারা আমার সন্তোষ বিধান করিলেন। তাঁহার প্রবল সনাতন বন্ধুবাৎসল্য দেখিলাম বা সনাতনের প্রতি তাঁহার প্রবল স্নেহ দেখিলাম।"

বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই রীতিতে পদ রচনা করা হইয়াছে। শ্রীরাধা ভাবিতেছেন যেন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছেন এবং রাধা কৃষ্ণকে কুশল প্রশ্নাদি করিতেছেন। রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥

চণ্ডীদাস—(বৈ. প. পৃ. ৭১)

'সাহিত্য-দর্পণে' উদ্ধৃত একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে প্রবাস-প্রত্যাগত নায়ককে দেখিয়া নায়িকার বিভিন্ন প্রকার হৃদয়ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। নায়িকার দূতী নায়ককে বলিতেছে—

দূরং সমাগমবতি ত্বয়ি জীবনাথে
ভিন্না মনোভবশরেণ তপস্বিনী সা।
উত্তিষ্ঠতি স্বপিতি বাসগৃহং তদীয়-
মায়াতি যাতি হসতি শ্বসিতি ক্ষণেন॥

(সাহিত্যদর্পণ, দশম পরিচ্ছেদ ১০।৬৭)

—"প্রাণেশ্বর তোমাকে দূরে আসিতে দেখিয়া সেই দুঃখিনী (রমণী) পীড়িত হইয়া কখনও উঠিতেছে, কখনও বা শুইতেছে আবার তাহার বাসগৃহে আসিতেছে, আবার যাইতেছে, কখনও বা হাসিতেছে, আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।"

পদটিতে নায়কের আগমনে নায়িকার হৃদয়োল্লাস ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার সহিত বিদ্যাপতির একটি পদের তুলনা করা যায়। কৃষ্ণকে ফিরিয়া পাইয়া রাধার হৃদয়োল্লাস ব্যক্ত হইয়াছে পদটিতে।

সেই সে পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাঁহা লাগি মদন দহনে জরি গেলুঁ॥
কি কহব রে সখী আনন্দ ওর।
এবে হাম জানলুঁ পিয়া বড় ধন॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই!
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই।

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল ॥
নির্ধন বলিয়া পিয়ার না কৈলুঁ যতন।
শীতের উড়নি পিয়া গিরীষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি ॥

(পদকল্পতরু, ১৯৯৫), (বৈ. প. পৃ. ১২৯)

বৈষ্ণব পদাবলীর একটি পদে আছে, কৃষ্ণের আগমনে রাধা সব বিরহজ্বালা ভুলিয়া গিয়াছেন।

চিরদিন ছিল বিহি মোহে প্রতিকূল।
পিয়া পরসাদে ভেল অনুকূল ॥
অছল দারুণ বিরহে বিভোর।
ভূরিতে আসিয়া পিয়া মোহে নিল কোর ॥
তৃষিত চাতক জনি নব ঘন মেলি।
ভুখল চকোর চাঁদে জনু করু কেলি ॥
জনু বনজানকে দগধ পরাণ।
ঐছন হোয়ল অমিয়া সিনান ॥

(পদকল্পতরু, ১৯৯৮)

বিদ্যাপতির রাধা মথুরা প্রত্যাগত কৃষ্ণকে দেখিয়া আপন মনেই বলিতেছেন—কোকিল, মলয়পবন, চন্দ্র প্রভৃতি যাহা আমাকে বিরহে দুঃখ দিয়াছে, এখন প্রিয়মিলনে তাহাই সুখদায়ক অর্থাৎ গুণ হইয়াছে।

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন জৌবন সফল করি মানলুঁ
দসদিস ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পঁচবান অব লাখ বান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
অবহন জবহুঁ মোহে পরি হোয়ল
তবহি মানহু নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা ॥

(পদকল্পতরু, ১০০৬) (বৈ. প. পৃ. ১৩০)

বিদ্যাপতির রাধিকাও বলিতেছেন, 'হরি (কৃষ্ণ) নিকট আসাতে আমার সমস্ত দুঃখের কারণগুলিই সুখ হইয়া দাঁড়াইল।

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল।
হরি মুখ হেরইতে সব দূর গেল ॥
যতহুঁ আছল মোর হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল হরি পরসাদ ॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরক পানে বিরহ দূর গেল ॥
ভনহি বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔখদে না রহ বেয়াধি।

বৈ. প. পৃ. ১৩০

সদুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গার-প্রবাহে ধৃত একটি পদে নায়কের সহিত বহুদিন পর সমাগমে নায়িকার দেহমনের অবস্থান্তর দেখিতে পাই। পদটীতে লৌকিক নরনারীর কথা বলা হইয়াছে। কবির উল্লেখ নাই।

আনন্দোদ্‌গম-বাষ্পপূরপিহিতং চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতুং
বাহূ সীদত এব কম্পবিধুরৌ শক্তৌ ন কণ্ঠগ্রহে।
বাণী সাধ্বসগদ্‌গদাক্ষরপদা সংক্ষোভলোলং মনো
যৎ সত্যং বল্লভসঙ্গমোঽপি সুচিরাদাদৌ বিয়োগায়তে॥

(সদুক্তিক: ২। ১৩২। ১), (পদ্যাবলী ৩৮০)

—"আনন্দোদ্‌গত বাষ্পের দ্বারা চক্ষু আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, কম্পবিধুর বিকল বাহু দুইটি কণ্ঠগ্রহণে সক্ষম হইতেছে না, বাণী সম্ভ্রমহেতু গদ্‌গদাক্ষরপদা, সংক্ষোভ-হেতু মন চঞ্চল, সত্য সত্যই বহুদিন পরে জাত বল্লভ-সঙ্গমও বিয়োগের ন্যায়ই হইল।"

রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে (৩৮০) উক্ত কবিতাটি বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। পদ্যাবলীতে কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইলে কুরুক্ষেত্রে 'শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরী-চেষ্টিতম্' বলিয়া শুভ্রকবির এই পদটি উদ্ধৃত। লৌকিক প্রেমকবিতার সহিত বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার কোন স্বরূপ-বিলক্ষণ দেখা যায় না।

এই পদের অনুরূপ পদ দেখিতে পাই গোবিন্দদাসের নবোঢ়ারসোদ্‌গারের একটি পদে—

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপি।
করইতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপি॥
দূর কর এ সখি সো পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ॥
চেতন না রহ চুম্বনবেরি।
কো জানে কৈছে রভস রসকেলি॥
সো ধনি মানি সুরত অধিদেবী
তাকর চরণকমল পয়ে সেবি॥
কামুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভবি আপ পরহু সমুঝাব॥
তবহুঁ জগত ভরি অকিরিতি এহ।
রাধামাধব অবিচল লেহ।
এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ।
গোবিন্দদাস কহ না ভাঙ্গে বিবাদ॥

বৈ. প. পৃ. ৫৮৭

ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকের একটি পদে দেখি বহুদিন পর প্রিয় রামচন্দ্রের স্পর্শে সীতার হৃদয়ের উল্লাস প্রকাশিত হইয়াছে। সীতার স্বেদযুক্ত,

রোমাঞ্চিত এবং কম্পিত দেহকে মরুৎ-আন্দোলিত নববর্ষায় সিক্ত স্ফুটকোরক কদম্বশাখার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

সস্বেদ-রোমাঞ্চিত-কম্পিতাঙ্গী মরুন্নবাম্ভঃ-প্রবিধূতসিক্তা।
জাতা প্রিয়স্পর্শসুখেন বৎসা। কদম্বযষ্টিঃ স্ফুট-কোরকেব॥
(উত্তররামচরিত ৩।৪২)

—সীতা (বৎসা) মরুৎ-আন্দোলিত নববর্ষায় সিক্ত স্ফুটকদম্বশাখার মত স্পর্শসুখে স্বেদযুক্তা, রোমাঞ্চিতা ও কম্পিতাঙ্গী হইলেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবোল্লাসের পদগুলির মধ্যে এই সুরই ধ্বনিত হইয়াছে দেখা যায়। বলরামদাসের একটি পদে বিরহের পর রাধাকৃষ্ণের মিলন-রসের বর্ণনা দেখি।

বলরামদাস—

যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি রাই। দুঁহু বিবরণ কাঁপয়ে অবিরাম॥
ত্বরিতহিঁ নাগর মীলল যাই॥ আনন্দ লোরহি সভ বহি যায়।
হেরইতে বিরহিণি চমকিত ভেল। বয়ন বয়ন দুহুঁ হিয়ায় হিয়ায়॥
শ্যামর ধনি নিজ কোর পর লেল॥ দূরে গেও যতহুঁ বিরহ হুতাশ।
পুলকিত সব তনু ঝর ঝর ঘাম। কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস॥
(বৈ. প পৃ. ৭৫৯)

রাসলীলা

রাসলীলা রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার একটি বিশিষ্ট ঘটনা। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্দের রাসপঞ্চাধ্যায়ে কৃষ্ণ-গোপীদের রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে রাসলীলার অনুরূপ হল্লীষক নৃত্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুরাণগুলিতে রাধার কোন স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না তবে একজন প্রধানা গোপীর কথা পাওয়া যায়। অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভাগবতের ভিতরেই রাধাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। জয়দেব গোস্বামী রাধা ও গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে রাসলীলার বর্ণনা পাই তাহা শারদ রাস আর জয়দেবের গীতগোবিন্দে পাই বাসন্তী রাসের বর্ণনা। এই রাস হইতেছে একপ্রকার নৃত্য; শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টীকায় রাসের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন।

"অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেন ভ্রমতাং নৃত্য-বিনোদো রাসো নাম"—'নারী ও পুরুষ পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া গান করিতে করিতে ও মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্যানন্দ সম্ভোগ করে, উহাকে বলা হয় 'রাস'।[১] রূপ গোস্বামী ইহাকে 'হল্লীষ' রাস বলিয়াছেন, চক্রাকারে নৃত্যের নাম 'রাস' বা হল্লীষক'। সনাতন ও জীব গোস্বামীও রাসের অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন।

বর্তমান যুগেও আদিবাসীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের হাত ধরাধরি করিয়া মণ্ডলাকারে গান গাহিতে গাহিতে এক প্রকার নৃত্য দেখা যায়। স্ত্রী-পুরুষের মিলিত নৃত্য প্রায় সব জাতিরই লোক-সংস্কৃতির একটি প্রধান দিক।

লোক-প্রচলিত গোপীকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণ কাহিনীতে গোপীদের সহিত কৃষ্ণের নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। হাল-সংগৃহীত গাহাসত্তসঈতে গোপীদের সহিত কৃষ্ণের নৃত্যের কথা দেখা যায়।

ণচ্চণ-সলাহণনিহেণ পাসপরিসংঠিআ ণিউণ-গোবী।
সরিস-গোবীআণ চুম্বই করোল-পড়িমাগঅং কহ্ণং॥ গা. স. ২।১৪

—'নৃত্য-প্রশংসার ছলে পার্শ্বগতা কোন নিপুণা গোপী সদৃশ গোপীদের গণ্ডদেশে প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণকে চুম্বন করিতেছে।' গোপীদের নৃত্যসমাবেশে কৃষ্ণও উপস্থিত ছিলেন।

অপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যে রাসের উল্লেখ পাই। ভট্টনারায়ণের 'বেণী-সংহার' নাটকের (খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে লিখিত) নান্দী শ্লোকে যমুনাপুলিনে রাসের সময়ে কেলিকুপিতা অশ্রুকলুষা রাধিকা এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের অনুনয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
তৎপাদপ্রতিমা-নিবেশিত-পদস্যোদ্ভূত-রোমোদ্গতে-
রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতা-দৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ॥ (বেণী-সংহার)

পদ্যাবলী—১৬৪

১। দাক্ষিণ দেশে 'কুরবইকুটটু' নামে এক প্রকার নৃত্যের প্রচলন আছে; ইহাতে রাস নৃত্যের ন্যায়ই স্ত্রীলোকগণ পরস্পরের হাত ধরিয়া নৃত্য করে। প্রসিদ্ধি আছে যে কৃষ্ণ একবার তাঁহার অগ্রজ বলরাম এবং প্রেয়সী নাপ্পিনাইকে লইয়া এই কুরবইকুটটু নৃত্য করিয়াছিলেন।

'—যমুনার তীরে রাস, কেলিকোপে কুপিত হইয়া রাধা রাসক্রীড়ার প্রতি আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে চলিলেন, কৃষ্ণও তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন, তখন রাধিকার চরণচিহ্নে স্বীয় চরণ নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহার কলেবর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি রাধিকার অনুনয় করিতে লাগিলেন, রাধিকাও প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণের দিকে ফিরিলেন। কৃষ্ণের সাফল্যমণ্ডিত এই অনুনয় তোমাদিগকে (অভিনেতৃবর্গকে) সন্তুষ্টি দ্বারা পরিপুষ্ট করুক।'

রূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে (১৬৪) 'অথ ব্রজদেবীনামুত্তরম্' বলিয়া বেণীসংহারের এই শ্লোকটিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৃষ্ণ রাস-উৎসবে সমাগত গোপবধূদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের উক্তি-স্বরূপ এই শ্লোকটি সংগৃহীত হইয়াছে। ভট্টনারায়ণের এই কবিতাটিতে রাধা-কৃষ্ণের উল্লেখ থাকিলেও মানবীয় প্রেমের সুরই ধ্বনিত হইয়াছে।

শ্রীভাগবতে রাসের বর্ণনায় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ দুইজন গোপবধূর মধ্যস্থলে থাকিয়া রাসলীলা করিতেছেন।

রাসোৎসবঃ সংবৃত্তো
গোপী-মণ্ডল-মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেন কৃষ্ণেন
তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥

প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং
কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥
যং মন্যেরন্॥
নভস্তাবদ্বিমানশতসংকুলম্॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।৩,৪

—'গোপী-মণ্ডল-শোভিত রাসলীলা প্রবৃত্ত হইল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া প্রতি দুইজন গোপীর মধ্যবর্তী হইলেন, প্রত্যেক গোপীই মনে করিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই নিকটে আছেন।'

'হরিবংশে' রাসনৃত্যের এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়।

"চক্রুর্হসন্ত্যশ্চ তথৈব রাসং
তদ্দেশভাষাকৃতিবেষযুক্তম্।
সহস্ততালং ললিতং সলীলং
বরাঙ্গনা মঙ্গলসম্ভৃতাঙ্গাঃ॥"

—"সুন্দরী মেয়েরা মঙ্গলবস্ত্রাভরণে ভূষিত হইয়া সে দেশের ভাষায় উপযুক্ত বেশভূষা করিয়া হাসিতে হাসিতে ললিতভঙ্গিতে হাতে তাল দিতে দিতে রাস (নৃত্য) করিল।"

রূপ গোস্বামী শ্রীভাগবতকে অনুসরণ করিয়া রাসলীলার বর্ণনা করিয়াছেন।

মণ্ডিত-হল্লীষক-মণ্ডলাম্ মুহুরান্দোলিত-রত্নবলয়ম্।
নটয়ন্ রাধাংচলকুণ্ডলাম্॥ সনয়ন-বলয়ং করকিশলয়ম্।
নিখিল-কলা-সম্পদি পরিচয়ী। গতিভঙ্গিভিরবশীকৃত-শশী।
প্রিয়সখি পশ্য নটতি মুরজয়ী॥ স্থগিত-সনাতন-শঙ্কর-বশী॥

বৈ. প. পৃ. ১৮৩

—হে প্রিয়সখি, দেখ দেখ যাঁহার দ্বারা শ্রীরাসমণ্ডলের শোভা বর্ধিত হইয়াছে, চঞ্চলকুণ্ডলধারিণী সেই শ্রীরাধাকে নাচাইয়া অখিলকলাগুরু মুরারি আজ নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার রত্নকঙ্কণ পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইতেছে। তাঁহার কর-পল্লব, তালে তালে সঞ্চালিত হইতেছে। তাঁহার নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া চাঁদ অলস হইয়া পড়িয়াছে এবং সনাতন মহেশ্বর স্তব্ধ হইয়াছেন (পক্ষে সনাতন কবি)।

কৃষ্ণও রাধিকার সহিত নাচিতেছেন এবং বাঁশী বাজাইয়া গান করিতেছেন।

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবং চান্তরেণ অঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলী-মধ্যগো বেণুনা সংজগে দেবকীনন্দনঃ॥"

—"এক একটি রমণী, আবার এক একটি কৃষ্ণ, এক একটি কৃষ্ণ, আবার এক একটি গোপী। এইভাবে মণ্ডলী রচনা করিয়া তার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দেবকী-নন্দন বাঁশীতে গান করিতে লাগিলেন।"

শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলার কথা আছে, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে মাধুর্য্যলীলাই বর্ণনীয় বিষয়। এই জন্য শ্রীরাধামোহন ঠাকুর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'অস্য ব্রজাঙ্গনা-মধ্যগত্বম্ অলাতমিব দর্শনং চক্রভ্রম-ন্যায়েন নৃত্যবিশেষ-কৌশলেন ইতি বোধ্যং ন তু ঐশ্বর্য্যেন।' অর্থাৎ এই যে, যত গোপী, তত কৃষ্ণ—ইহা নৃত্যকৌশলে প্রতিভাত হইয়াছিল মাত্র। বস্তুত কৃষ্ণ একমাত্রই ছিলেন।[১]

মূলতঃ শ্রীমদ্ভাগবতকে অনুসরণ করিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ ব্রজগোপীদের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই রাসলীলা মুখ্য সম্ভোগের অন্তর্গত।

---

১ তু—কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।২০

শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি এই—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১০।২৯।১

—"সেই শরৎকালের রাত্রি-সমূহে মল্লিকাকুসুম বিকসিত হইয়াছে দেখিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া গোপীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শরৎকালের রাত্রিতে রাস সংঘটিত হইয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাসের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা বসন্তকালে হইয়াছিল।

বৈষ্ণব কবি রূপ গোস্বামী "পদ্যাবলীতে" রাস সম্বন্ধে কয়েকটি পদ সংকলিত করিয়াছেন। এখানে পুরুষোত্তমদেবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

গোপীজনালিঙ্গিত-মধ্যভাগং কলেবরে প্রস্ফুট-রোমবৃন্দং
বেণুং ধমন্তং ভৃশলোলনেত্রম্। নমামি কৃষ্ণং জগদেককন্দম্॥"

পদ্যাবলী ২৯৩

—"গোপবধূগণের দ্বারা যাঁর মধ্যভাগ আলিঙ্গিত, যিনি বেণুবাদনকারী ও চঞ্চলনেত্রশালী, যাঁর শরীরে রোমাঞ্চ উদ্‌গত হইয়াছে, জগতের একমাত্র (আশ্রয়) সেই কৃষ্ণকে প্রণাম করি।"[১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিয়াছেন।

রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার।
শ্রীরাধা-ললিতাসঙ্গে রাস-বিলাস।
মন্মথ-মন্মথ রূপে যাঁহার প্রকাশ॥

চৈ. চ. আদিলীলা॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ (১।৫)

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বর-ধরঃ স্রগ্‌বী সাক্ষান্মথ-মন্মথঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩২।২

---

১ দ্রঃ—তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥ ভাঃ ১০।৩৩।৩

—তাঁদের (গোপীদের মধ্যে) আবির্ভূত হইলেন কৃষ্ণ মদনেরও মনোহর রূপে, তাঁর মুখ-কমলে মৃদু হাসি, অঙ্গে পীতবসন, গলায় বনমালা।"

শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য তাঁহার ভাগবতের অনুবাদে সুললিত ভাষায় রাসের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাগবত-পাঠ শুনিয়া শ্রীচৈতন্য খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

রাসলীলার কাহিনীটি এইরূপ—

শারদ পূর্ণিমা রাত্রি। বৃন্দাবন মল্লিকাদি ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত রাসনৃত্য আস্বাদ করিবার জন্য বংশী-ধ্বনি করিলেন। গোপীগণ পতিপুত্র ঘর সংসার ছাড়িয়া প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিয়া রাত্রিতে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মদনক্লিষ্টা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিল। তাহার পর রাসনৃত্য আরম্ভ হইল। গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম পরীক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ একজন প্রধানা গোপীকে (পদাবলীর মতে রাধাকে) লইয়া রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইলেন। গোপীগণ বিরহবিলাপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের খোঁজ করিতে লাগিলেন। তাহার পর পদচিহ্ন দেখিয়া বৃন্দাবনের কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণকে আবিষ্কার করিলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেকে অনুনয়-বিনয় করার পর আবার রাসনৃত্য আরম্ভ হইল।

কবি গোবিন্দদাসের একটি পদে রাসলীলার প্রারম্ভ অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। পদটিতে ভাগবতের অনুসরণ দেখা যায়।

শরদচন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লি মালতী যুথি
মত্তমধুকর ভোরণী।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত চোরনী॥
শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহি মনহি আপনা সোঁপি

বিছুরি গেহ নিজহু দেহ
এক নয়নে কাজর রেহ
বাহে রঞ্জিত মঞ্জির একু
এক কুণ্ডল ডোলনী॥
শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধায়ত যুবতীবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনী॥
ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি
কেহ কাহুক পথ না হেরি

তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কলরোলনী।
ঐছন মিলল গোকুল চন্দ
গোবিন্দদাস বোলনী॥

বৈ. প. পৃ. ৬৩৭, পদকল্পতরু ১২৫৫

বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসকে অনুসরণ করিয়া তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথও 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন।

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনি আও আও লো।
অঙ্গে চারু নীল বাস
হৃদয়ে প্রণয় কুসুমরাশ
হরিণ নেত্রে বিমল হাস
কুঞ্জ বনমে আও লো।
ঢালে কুসুম সুরভ ভার
ঢালে বিহগ সুরবসার
ঢালে ইন্দু অমৃত ধার
বিমল রজত ভাতি রে।

—'ভানুসিংহের পদাবলী'

তারপর গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীভাগবতকে অনুসরণ করিয়া গোপীদের লইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডল রচনার কথা বলিতেছেন গোপীরা গান করিতেছেন আর মণ্ডলাকারে নাচিতেছেন।

তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥ ভাঃ ১০।৩৩।৭*

—"হৈম (স্বর্ণবর্ণ) মণিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মরকত মণির মত গোপীদের মধ্যে ভগবান্ দেবকীসুত সেখানে (রাসমণ্ডলে) অতিশয় শোভিত হইলেন।"

গোবিন্দদাস—

কাঞ্চণ মণিগণে জনু নিরমায়ল
রমণীমণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহা মরকতসম
শ্যামরু নটবর রাজ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাস বিহার।
থির বিজুরি সঞে চঞ্চল জলধর
রস বরিখয়ে অনিবার॥
কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহুঁ কত কত চান্দে।
কনক লতায়ে তমালহুঁ কত কত
দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে॥

কত কত পদুমিনি পঞ্চম গায়ত
মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ।
মধুকর মেলি কত পদুমিনী গায়ত
মুগধল গোবিন্দদাস॥

বৈ. প. পৃ. ৬৩৮, পদকল্পতরু ১২৫৮

শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছিলেন এবং সেই সঙ্গে গোপীদের অলংকার-ধ্বনি শোনা যাইতেছিল। তাহাতে রাস-মণ্ডলে একটি তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছিল।

(বেণুনা সংজগৌ দেবকী-নন্দনঃ)।
বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ ঘোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাস-মণ্ডলে॥ ভাগবত, ১০॥৩২।৭

ভাল বাজে বলয়া নূপুরমণিকিঙ্কিণী করকঙ্কণা।
নাগর সঙ্গে নাচত কত যুথে যুথে অঙ্গনা॥ (রাধামোহন ঠাকুর)
চৌদিকে চারু অঙ্গনা বেড়িয়া রঙ্গিনী কত গায়নী।
ক্রত্তা থৈয়া থৈয়া বোলনী॥
তার মাঝে বিরাজে শ্যাম পরম সুঘড় শিরোমণি।
বাজে কিঙ্কিণী কিনি কিন বোলনী॥ (রাধামোহন ঠাকুর)

গোবিন্দদাসের একটি পদে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় রাসমিলন বর্ণিত হইয়াছে।

তবে সব গোপীগণ মণ্ডলী করি। নবরঙ্গিনী রাধা রসময় শ্যাম।
শ্যামের বামে দাঁড়াইল নবীন কিশোরী॥ চৌদিকে গোপী সব অতি অনুপাম॥
দুহুঁ অঙ্গ পরশিতে দুহুঁ ভেল ভোর। অপরূপ রাধা-কানু-বিলাস।
আজুক আনন্দ কো করু তর। আনন্দে নিরখই গোবিন্দদাস।

পদকর্তা গোবিন্দদাস দূর হইতে "রাধা-কানু-বিলাস" আস্বাদ করিতেছেন।

বসন্ত লীলা

জয়দেব তাঁহার 'গীতগোবিন্দে' বাসন্তী রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকে রাধাকৃষ্ণের বসন্তলীলা-ও বলা যায়।

ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতি-জনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥ বৈ. প. পৃ. ৪

—সখি, কোমল-মলয়পবন মনোহর লবঙ্গলতাসংসর্গে মধুময় হইয়াছে। অলিগুঞ্জন মিশ্রিত কোকিল-কূজনে কুঞ্জকুটীর মুখরিত হইতেছে। বিরহিগণের পক্ষে দুঃখদায়ক এই সরস বসন্তে শ্রীহরি ব্রজবধূগণের সঙ্গে বিহার ও নৃত্য করিতেছেন।

বিদ্যাপতির একটি পদে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বসন্তলীলা দেখা যায়।

বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেমে বিভোর॥
নব বৃন্দাবন নবীন লতাগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
নবীন রসাল মুকুলে মধুমাতিয়ে
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত্ত মাতায়ই
নব রসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ নবীন নবনাগরী
মীলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥

জ্ঞানদাসের বসন্তলীলার পদ পাওয়া যায়—

আওত রে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাইকানু গুণবন্ত॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদন-মহোৎসব পিকুকুল রাব॥
দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
শীত ভীত রহু শীখর কোরথ॥
মলয়জ পবন সহিতে ভেল মীত।
নিরখি নিশাকর যুবজন হীত॥
সরোবরে সরসিজ শ্যামর নেহা।
জ্ঞানদাস কহে রস নিরবাহা॥

বৈ. প. পৃ. ৪৪৩

প্রাচীন সাহিত্যে যে মদনোৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়, যুবক-যুবতীরা পরস্পরের গায়ে আবির, কুঙ্কুম প্রভৃতি নিক্ষেপ করিত।

সকলে মিলিয়া নৃত্যগীতে যোগ দিত। আধুনিক যুগেও বসন্ত পূর্ণিমায় এই উৎসব দেখা যায়। ইহাকে হোরি বা হোলি বা দোল বলে।

রূপ গোস্বামীর একটি পদে হোরি-লীলার বর্ণনা দেখা যায়

বিহরতি সহ রাধিকয়া রঙ্গী।
মধু-মধুরে বৃন্দাবন-রোধসি।
হরিরিহ হর্ষ-তরঙ্গী॥
বিকিরতি যন্ত্রে- রিতমঘবৈরিনি
রাধা কুঙ্কুম-পঙ্কম্।
দয়িতাময়মপি সিঞ্চতি মৃগমদ-
রসরাশিভিরবিশঙ্কম্॥
ক্ষিপতি মিথো-যুব- মিথুনমিদং নব-
মরুণতরং পটবাসম্।
জিতমিতি জিত-মিতি মুহুরভিজল্পতি
কল্পয়দতনুবিলাসম্॥
সুবলো রণয়তি ঘনকরতালীং
জিত-বানিতি বনমালী।
ললিতা বদতি সনাতন-বল্লভ-
মজয়ত পশ্য মমালী॥" বৈ. প. পৃ. ১৮৫

—বসন্ত ঋতুর আগমনে মধুর বৃন্দাবনে যমুনাতটে কৌতুকপর শ্রীকৃষ্ণ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতেছেন। শ্রীরাধিকা পিচকারী দ্বারা কুঙ্কুমপঙ্ক অঘারি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিঃশঙ্ক হইয়া মৃগমদচূর্ণমিশ্রিত বারি প্রেয়সীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ই পরস্পর রক্তবর্ণ পটবাস অর্থাৎ আবির এবং কুঙ্কুম প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কন্দর্প বিভ্রম প্রকাশ করিয়া 'আমার জয়' ইহাই মুহুর্মুহুঃ বলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জয় হইয়াছে বলিয়া সুবল করতালি বাজাইতেছেন এবং ললিতা বলিতেছে আমার সখী রাধিকা পরম শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর প্রিয়তমকে জয় করিয়াছেন দেখ।

এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারায় রচিত একটি বসন্তলীলার কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হোলো উতলা।
বুকের পরে দোলেরে তার পরাণ পুতলা॥
আনন্দেরি ছবি দোলে দিগন্তেরি কোলে কোলে।
গান দুলিছে, নীল আকাশের হৃদয় উথলা॥
আমার দুটি নয়ন নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায় কে গো দুলিছে
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি
দুলিয়ে দিল জনমভরা ব্যথা অতলা। —রবীন্দ্রনাথ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উপসংহার

বৈষ্ণব পদাবলী ধর্ম-সাহিত্য, বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনের রসভাষ্য। ধর্মকে বাদ দিয়া এ সাহিত্যের আলোচনা চলে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে এক কথায় প্রেমধর্ম বলা হয়। রাধা-কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলাই বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য বিষয়। ভাব-বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার আস্বাদন ও কীর্তনই বৈষ্ণবদের সাধ্যসার। রাধাকৃষ্ণের এই অপার্থিব প্রণয়লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবিগণ মানুষী প্রেমকেই অবলম্বন করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে বৈষ্ণব পদাবলীতে একটি মাত্র চিত্র দেখিতে পাই তাহা হইল বিরহিণী রাধার চিত্র। সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয় শ্রীরাধা একদিনেই 'কৃষ্ণৈকতাৎপর্যময়ী' 'মহাভাবে' পরিণত হন নাই। অর্থাৎ মানবী রাধাই ক্রমে ক্রমে 'মহাভাবময়ী শ্রীরাধাঠাকুরাণী'তে উপনীত হইয়াছেন। রাধাপ্রেমের কাঠামোটি পূর্বতন সংস্কৃত-প্রাকৃতে রচিত দেহাশ্রয়ী মানবী প্রেমের সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রাকৃত নায়কনায়িকার প্রেম-বর্ণনায় পূর্বকালীয় কবিগণ প্রেমের যত প্রকার অবস্থা কল্পনা করিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনার বেলাতেও বৈষ্ণব কবিগণও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। রূপগোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যাত 'মধুর বা 'উজ্জ্বল' রস পূর্বতন সংস্কৃত আলংকারিকদের আদিরসের নির্যাসমাত্র। প্রাচীনদের শৃঙ্গাররস বা আদিরস বৈষ্ণবদের সর্বশেষ রস বা সর্বশ্রেষ্ঠ মধুর রস। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের বিভিন্ন অবস্থার দৃষ্টান্ত দিবার জন্য রূপগোস্বামী 'পদ্যাবলী' সংকলন করেন। কালিদাস, অমরু, ভবভূতি প্রভৃতি কবিদের কাব্য হইতে পার্থিবপ্রেম-কবিতা গ্রহণ করিয়া রূপগোস্বামী রাধা-প্রেমের কবিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' প্রভৃতিতে ধৃত মর্তপ্রেমের কবিতাকেও রাধাপ্রেমের কবিতা বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত কবিতাকে 'বৈষ্ণব-কবিতা' বলায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে প্রাচীন কবিতাই বৈষ্ণব কবিতায় পরিণত হইয়াছে এবং প্রাচীন ধারাই বৈষ্ণব কবিতায় হুবহু চলিয়া আসিয়াছে। অন্যত্র এই-গুলির বিশদ আলোচনা করিয়াছি। এখানে দুই-একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া

দেখাইতেছি যে প্রাচীন মর্ত্যরসের কবিতাই বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছে। যেমন, অমরুশতকের একটি কবিতা--

ভবতু বিদিতং ছদ্মালাপেরলং প্রিয় গম্যতাং
তনুরপি ন তে দোষোঽস্মাকং বিধিস্তু পরাঙ্‌মুখঃ।
তব যদি তথাভূতং প্রেম প্রপন্নমিমাং দশাং
প্রকৃতিচপলে কা নঃ পীড়া গতে হতজীবিতে॥ (সদুক্তিক ২।৪৭।৩),
(অমরুক—২৮), (পদ্যাবলী—২২৩)

—'সব জানা গেল, হে প্রিয়, ছলনাবাক্যের প্রয়োজন কি? তুমি এখন যাও। তোমার এতটুকুও দোষ নাই, বিধাতাই আমার প্রতি পরাঙ্‌মুখ। তোমার সেই রকম প্রেমই যদি এই রকম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে স্বভাবচঞ্চল এই পোড়া প্রাণ তোমার জন্য চলিয়া গেলেও আমার কোন দুঃখ নাই।' অমরুর এই কবিতায় লৌকিক মানিনী নায়িকার কৃতাপরাধ নায়কের প্রতি খেদোক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটি নিছক বাস্তব প্রেমের কবিতা, ইহাতে কাব্যরস ছাড়া আর কোন অতিরিক্ত তত্ত্বের কথা নাই।

বাস্তব প্রেমের এই কবিতাটিকে রূপগোস্বামী তাঁহার 'পদ্যাবলী'তে (২২৩) 'অথ মানিনী' শিরোনামায় রাধাপ্রেমের কবিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীরাধা যেন সাধারণ নায়িকার মতই মানিনী হইয়া কৃতাপরাধ শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছেন, অর্থাৎ বাস্তব প্রেমকবিতাই বৈষ্ণব তত্ত্বদৃষ্টির প্রভাবে অলৌকিক রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। মানবী নায়িকাই নায়িকাশিরোমণি শ্রীরাধায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। এখানে প্রাচীন প্রেম-কবিতার ধারাই সমানে চলিয়া আসিয়াছে। কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। আবার,—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥
(—কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়, অসতীব্রজ্যা ৫০৮),
(সদুক্তিক। ২।১২।৩), (পদ্যাবলী ৩৮৩)

—"যে আমার কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিল সেই (আজ) আমার বর, সেইতো মধুমাসের রজনী। সেইতো ধূলিকদম্বের বনের বাতাস প্রস্ফুটিত

মালতী ফুলের সৌরভে আরো সুরভিত হইয়া উঠিয়াছে। আমিও সে-ই, তবু রেবা নদীর তীরে বেতসতরুতলে যে মিলন হইয়াছিল তার জন্য আজও আমার মন আকুল হইয়া উঠিয়াছে।"(১)

সঙ্গীতধর্মী এর কবিতাটি 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ের' অসতী-ব্রজ্যায় (৫০৮) সংকলিত হইয়াছে। এটি কোন অজ্ঞাতনামা কবি বা মহিলাকবি শীলা ভট্টারিকার নামে প্রচলিত। পদটিতে কুমারীর অসামাজিক প্রেম বর্ণিত হইয়াছে। সদুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গার-প্রবাহের 'অসতী' শিরোনামায় কোন অজ্ঞাতনামা কবির নামেও এই পদটি সংকলিত হইয়াছে। মম্মটের 'কাব্য-প্রকাশে' (১।৪) এবং বিশ্বনাথের 'সাহিত্য-দর্পণেও (১।২০) পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। ইহাতে দেখি, সখীর নিকট নায়িকা তাহার প্রাগ্‌বৈবাহিক প্রেমের মাধুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিতেছে। পদে পরপুরুষের সহিত প্রেমের উল্লাস ব্যক্ত হইয়াছে। বিবাহের পূর্বে প্রেমের যে মাদকতা, উন্মাদনা ও মোহময় আবেশ ছিল, বিবাহের পর তাহা যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই শ্লোকটি সর্বত্রই মানবীয় প্রেমের কবিতা বলিয়াই উদ্ধৃত হইয়াছে। রূপ গোস্বামী কিন্তু উক্ত পদটিকে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া পদ্যাবলীতে (৩৮২) সংকলিত করিয়াছেন। কবিতাটিতে শ্রীরাধা কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিয়াও বৃন্দাবনের প্রেমলীলা আবেগের সহিত স্মরণ করিতেছেন, 'অথ তত্রৈব সখীং প্রতি রাধাবচনম্'। ইহার পরই রূপ গোস্বামী এই শ্লোকের ভাবযুক্ত আর একটি স্বরচিত শ্লোক যোজনা করিয়াছেন।

প্রভুমুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোঁসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থশ্লোক করিল তথাই॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১ম পরিচ্ছেদ)

উভয় কবিতার ভাব অনুরূপ। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় রূপ গোস্বামী প্রথম কবিতাটিকে কোন কন্‌টেক্সে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরূপের কবিতাটি এই—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চম-জুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি॥(২) (পদ্যাবলী ৩৮৭)

(১) চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ।
(২) পদ্যাবলী (৩৮৩) ডঃ এস্, কে, দে সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ।

"—সখি, কুরুক্ষেত্রে যাঁর সঙ্গে মিলিত হইলাম, সে-ই আমার দয়িত কৃষ্ণ। আমিও সেই রাধা। আমাদের মিলন সুখও সেই। তবু যমুনাপুলিনের সেই বনের যে মুরলীর পঞ্চমস্বরের সুমধুর স্বরলহরী জাগিয়া উঠিত তারই জন্ম আমার মন আকুল হইয়া উঠিয়াছে।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে দুইটি শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়াছেন(১)। 'যঃ কৌমারহরঃ' ইত্যাদিকে শ্রীচৈতন্য গূঢরসব্যঞ্জক বলিয়া আস্বাদ করিয়াছিলেন এবং এক স্বরূপ দামোদর ভিন্ন কেহই ইহার প্রকৃত মর্ম জানে না।

"এই শ্লোকের অর্থ জানে একল স্বরূপ" (চৈঃ চঃ মধ্য ১ম পরিচ্ছেদ)। কবিরাজ গোস্বামীর মতে ব্রজের পরকীয়া প্রেমই শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের আদর্শ। "পরকীয়া প্রেমে অতি রসের উল্লাস। ব্রজবিনা অন্যত্র নাহি তার বাস"॥ (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

তাছাড়া, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ব্রজের মাধুর্য্যলীলাই শ্রেষ্ঠ, মথুরায় এবং কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলা গৌণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নেতা জীব গোস্বামী এই কবিতাটি গূঢভাবপ্রকাশক বলিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলাই ব্যক্ত হইয়াছে, যদি বা কোথাও ঐশ্বর্য্যলীলা আসিয়াছে, তাহা কেবল মাধুর্য্যের পরিপুষ্টির জন্যই। সেই জন্যই রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্যের নিকট এই কবিতাটি এত প্রিয়, ইহাতে তাঁহার প্রেমধর্মের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। রূপ গোস্বামী সেই তাৎপর্যে সাধারণ অসতী নায়িকার এই কবিতাটিকে বৈষ্ণব-সংগ্রহগ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের হৃদয়মনের অনুমোদনের ফলেই নিতান্ত আদিরসাত্মক মর্ত্যরসের কবিতা অলৌকিক রাধা-প্রেমের কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই প্রাচীন প্রেম-কবিতার ধারাই অনুসৃত হইয়াছে, তবে তাহাকে তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে। 'প্রাকৃত নায়িকার উক্তি' এই কবিতাটি শ্রীচৈতন্য যে প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলায় শ্রীরাধিকার স্থানই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে আর শ্রীকৃষ্ণ যেন গৌণ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের পূর্বে সংস্কৃত কবিতায় ব্রজপ্রেমী বলিতে কৃষ্ণই, (রাধা বা গোপীরা নয়)। রাধা বা গোপীরা কৃষ্ণের প্রেমের পাত্র, উপলক্ষ মাত্র। একটি প্রাচীন সংস্কৃত কবিতায় এই ভাবটির সাক্ষাৎ মেলে। ইহাতে মথুরা-প্রবাসী কৃষ্ণ ব্রজ

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ।

হইতে আগত কোন সুহৃদকে কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। এই শ্লোকটিতে কৃষ্ণ ব্রজের নির্জন প্রেমলীলাস্থলীর স্মৃতি রোমন্থন করিতেছেন, যে লীলা কেবল রাধার সঙ্গে নয়, বহু কান্তার সঙ্গেও।

তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবা॥

(কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়, অসতী ব্রজ্যা, ৫০১, ধ্বন্যালোক ২।৫)

—'ভদ্র, গোপবধূদের সেই বিলাসের অনুকূল, রাধার গোপনতার সাক্ষী, যমুনাতীরের লতাকুঞ্জগুলির কুশল ত? প্রেমলীলার শয্যারচনা-ব্যবস্থার জন্য ছেদনের প্রয়োজন না থাকায় বোধ হয় সে লতাপল্লব সব বিবর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়িবার মত হইয়াছে।'

শ্রীচৈতন্যের জন্যই বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধা প্রেমলীলার মুখ্যপাত্র বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আরও পরবর্তী যুগে রাধার মাহাত্ম্য এতদূর বাড়িয়া গেল যে শ্রীকৃষ্ণকে 'রাধাবল্লভ' বা 'রাধানাথ' বা 'রাধারমণ' বলিয়া অভিহিত করা হইতে লাগিল।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকারগণ প্রধানত বিশ্বনাথের 'সাহিত্য-দর্পণ' অনুসরণ করিয়া শ্রীরাধার পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, মাথুর (বিরহ) প্রভৃতির সংজ্ঞা দিয়াছেন। সংস্কৃত আলংকারিকগণ সাধারণ নায়িকার প্রেমের যত প্রকার অবস্থা কল্পনা করিয়াছেন, শ্রীরাধার প্রেমেরও সেই সেই অবস্থা বর্ণিত হইতে দেখা যায়। অন্যত্র আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সংস্কৃত-প্রাকৃত কবিতা উদ্ধৃত করিয়া শৃঙ্গার রসের প্রতিটি বিভাগের উদাহরণ দিয়াছি এবং বৈষ্ণব পদাবলী হইতে পদচয়ন করিয়া ঐগুলির সহিত সাদৃশ্য দেখাইয়াছি। প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের শৃঙ্গাররস কিভাবে বৈষ্ণবদের মধুররসে বা ভক্তি-রসে পরিণত হইয়াছে তাহারও বিশদ আলোচনা করিয়াছি। লৌকিক শৃঙ্গাররসের স্থায়ী ভাব 'রতি'র অর্থ 'কৃষ্ণ-রতিতে' সম্প্রসারিত করিয়া রূপ গোস্বামী শৃঙ্গার-রসকে মধুর-ভক্তিরসে পরিণত করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলার বর্ণনার সূত্রেরও তিনি নির্দেশ দিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যলীলার সূত্রটি আরও স্পষ্ট করিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের নির্দেশিত পথেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে প্রাকৃত প্রেম কোন সময়েই অস্বীকৃত নয়, বরং প্রাকৃত প্রেমই স্বর্গীয় দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। মর্ত্যরসের বহু প্রাচীন কবিতা প্রেমভক্তি-রসের কবিতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আবার, প্রাচীন সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহ-গুলিতে দেহকেন্দ্রিক প্রেমের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেইগুলির ভাব অবলম্বন করিয়াও বহু 'বৈষ্ণব পদ' রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ মাটির পৃথিবী হইতেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। যেমন, অমরুশতকের এই কবিতাটি। ইহাতে লৌকিক মানিনী নায়িকার প্রতি সখীর অনুযোগ ব্যক্ত হইয়াছে—

অনালোচ্য প্রেম্নঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ-
স্ত্বয়াকাণ্ডে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ।
সমাকৃষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্ভাসুরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদমলমধুনারণ্য-রুদিতৈঃ॥ সদুক্তিকঃ ২।৪২।১

—"হে সরলে, তুমি প্রেমের পরিণতি কি হইতে পারে না ভাবিয়া, বন্ধুদের উপদেশ না মানিয়া প্রিয়কান্তের উপর মান করিয়াছ কেন, এই জ্বলন্তশিখা বিরহাগ্নির অঙ্গার তুমি নিজের হাতে ধরিয়া রাখিয়াছ। অতএব বৃথা এখন এই অরণ্যে রোদন।"

এই কবিতাটির ভাব অলম্বন করিয়া কবি গোবিন্দদাস একটি বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় সংস্কৃত কবিতার ভাব আরো ভালোভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

গোবিন্দদাসের পদটিও (রাধার প্রতি সখীর উক্তি)—

শুনইতে কানু মুরলীরবমাধুরী শ্রবণে নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলুঁ তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরী তৈখনে কহল মো তোয়।
ভরমহি তা সঞে নেহ বাড়াওলি জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপ লালসে কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাবণি জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যামজলদরস আশে।
সো অব নয়ন নীর দেই সিঞ্চহ কহতহি গোবিন্দদাসে[১]

(১) পদকল্পতরু ৪৫৫.

—"কানুর মধুর মুরলী ধ্বনি শুনিতে গেলে তোমার কান বুজিয়াছিলাম, তাহার রূপ দেখিতে গেলে তোমার চোখ ঢাকিয়াছিলাম। তখন মিথ্যা আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলে। সুন্দরী, আমি তোমাকে তখনই বলিয়াছিলাম, ভুল করিয়া উহার সঙ্গে প্রেম করিলে, কাঁদিয়া জন্ম কাটাইতে হইবে। গুণ পরখ না করিয়া শুধু পরপুরুষের রূপ-লালসায় কেন নিজের দেহ সমর্পণ করিলে? এইতো তোমার রূপ-লাবণ্য দিন দিন খোয়াইতেছ, জীবনেই সন্দেহ হইতেছে। যে প্রেমতরু তুমি হৃদয়ে রোপন করিলে শ্যাম-জলধরের প্রত্যাশায়, সে এখন নয়ননীর দিয়া সেচন কর। গোবিন্দদাস স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে।" পদটিতে ভক্তকবি গোবিন্দদাস গাঢ় প্রেমভক্তিরসের সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মর্ত্যপ্রেমের ভাব অবলম্বন করিয়া একটি উৎকৃষ্ট 'বৈষ্ণব পদ' রচনা করিয়াছেন। পদটিতে মর্ত্যপ্রেমের ও অধ্যাত্মপ্রেমের সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই মিশ্ররূপের জন্যই পদটি আরও মনোরম হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী যুগের কবিদের পদগুলিতে গাঢ় ভক্তিরসের সাক্ষাৎ বেশী পাওয়া যায়। চৈতন্য-পূর্বযুগের পদাবলীতে যেন মর্ত্যরসের প্রাধান্যই বেশী।

বলিতে গেলে, জয়দেব ও বিদ্যাপতির অনুসরণেই বাঙ্গালা পদাবলীর জন্ম। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' বাস্তব দেহধর্মী প্রেমই যেন বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং প্রাকৃত প্রেমের বিচিত্র বিলাস-কলাও প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য একথাও তিনি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহার গান 'রাধা-মাধবের' অপ্রাকৃত প্রেমলীলার জয়গান ও লীলা-আস্বাদন অর্থাৎ বৈষ্ণব পদাবলী—

"রাধা-মাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ।"(১)

এইখানে কেবল 'মদনধর্মোৎসব' নহে, ইহা হরির ধর্মোৎসবও। রাধাকৃষ্ণের এই মধুরলীলা বর্ণনায় কবি জয়দেব মানুষী প্রেমকে অবলম্বন করিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনের যে চিত্রটি আঁকিয়াছেন তাহাতে বাস্তব দেহধর্মের দিকটাই বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে।

জয়দেবের পদ—

প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকূলম্।
মৃদুমধুরস্মিত-ভাষিতয়া শিথিলীকৃত-জঘন-দুকূলম্।

---

(১) তুঃ—হরিচরণ-শরণ-জয়দেবকবিভারতী।
বসতি হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী। গীতগোবিন্দ ৭।১০

কিশলয়-শয়ন-নিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্।
কৃতপরিরম্ভণচুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধর-পানম্॥ ইত্যাদি
—জয়দেব-(শ্রীগীতগোবিন্দ), (বৈঃ পঃ পৃঃ ৭)

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীতে আদিরসাত্মক বাস্তব প্রেমের তীব্র প্রকাশ দেখা যায়।

বিদ্যাপতির পদ—

সজনী ভল কয়ে পেউন ন ভেল। মেঘ মালা সঞে তড়িতলতা জনু
হিরদয়ে সেল দঈ গেল॥
আধ আঁচর খসি আধ বদন হাসি আধহি নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি তবহুঁরি দগধে অনঙ্গ॥ (বৈঃ পঃ
পৃষ্ঠা ৭৭)

আবার—সজনী অপুরুব পেখল রামা। কনয়লতা অবলম্বনে উঅল
হরিনহীন হিমধামা॥" (বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৯)

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে একদিকে যেমন রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলা প্রকাশ পাইয়াছে আর একদিকে বাস্তব নরনারীর জীবনচেতনাও প্রকাশিত হইয়াছে। উভয়ে মিলিয়া একটি মিশ্ররূপের সৃষ্টি হইয়াছে।

দুইটি নয়ান মদনের বাণ দেখিতে পরানে হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায়া ধরমে পরাণ সহিত টানে॥
চণ্ডীদাস—(বৈ. প. পৃ ৪৫)

চৈতন্য-পর-যুগের পদাবলীতেও লৌকিক প্রেম ও অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা উভয়েরই প্রকাশ দেখা যায়।

জ্ঞানদাসের পদেও দেহ-কামনার কথা দেখা যায়। গাঢ় ভক্তিরসও তাঁহার পদাবলীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জ্ঞানদাস—

ছলে দরশায়ল উরজক ওর।
আপনি নেহারি হেরল মোহে থোর॥
বিহসি দশন আধ দরশন দেল।
ভুজে ভুজ বান্ধি অলপ চলি গেল॥
কি কহব রে সখি নারি সুজান॥
তোড়ল কানড় কুসুম উঘারি॥
বসনক ওর ঝাঁপল তব গোরি।
লীলাকমলে মুখ রোপলি থোরি॥
বৈদগধি বিবিধ পসারল যেহ।
কোন মুগধ তাহে ধরু নিজ দেহ॥

হরখে বরখে কত মনমথবাণ ॥ ধনি ধনি তাক যাক ইহ নারি।
দূরহি মোহে পুন পালটি নেহারি। জ্ঞানদাস কহ ধনি জনা চারি ॥
(বৈ. প. পৃ. ৬৯৭)

ভক্ত কবি গোবিন্দদাসের পদসমূহে গাঢ় ভক্তিরস পরিস্ফুট হইয়াছে তবু তাঁর পদে মর্ত্যরসের প্রকাশ দেখা যায়। এই মিশ্ররূপের জন্য তাঁর পদাবলী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-মণ্ডন
অধরে মিলায়ত শ্যাম-মনোহর
চীত চোরায়নি হাস।
আজু নব শ্যাম বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু যূথ শত সেবিত
লাবণি বরণি না যাই ॥
কবরি বকুলফুলে আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি
কিঙ্কিণি রণরণি বোল ॥
পদপঙ্কজ পর মণিময় নূপুর
রণঝন খঞ্জন ভাষ।
মদনমুকুর জনু নখমণি দরপণ
নীছনি গোবিন্দদাস ॥ (পদকল্পতরু ১০৫৫)

বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনায় মর্ত্যপ্রেমকেই অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু মর্ত্যপ্রেম বর্ণনাই তাঁহাদের জীবনের অভীপ্সা নহে। বাস্তব মাটির এই প্রেমকে বৈষ্ণব তত্ত্বদৃষ্টির সাহায্যে বিশুদ্ধ করিয়া স্বর্গীয় প্রেমভক্তি-রসে পরিণত করিয়াছেন। 'কাম' হইতেই প্রেমের জন্ম, পঙ্ক হইতেই পঙ্কজের উদ্ভব। চৈতন্যপর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে একটা বিশেষ ধরণের ধর্মীয় কৃত্যাকেন্দ্রিক সাধনভজন প্রণালীর প্রভাব দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নরনারীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন শুষ্ক যতিধর্ম নহে। কবিগণ প্রাকৃত ভূমি হইতে যাত্রা করিয়া অপ্রাকৃত ভাববৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ বলেন, 'বৈষ্ণব পদাবলীর পশ্চাৎপটে কেবল নিত্যবৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরীর সত্তা বিরাজ করিতেছে', তবু কবিগণ

যেভাবে রাধাকৃষ্ণের তীব্র বিরহ-বেদনা এবং নিবিড় মিলনরস ও নিসর্গ সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে 'ভাববৃন্দাবন'কে ক্ষণকালের জন্যও মর্ত্যভূমিতে টানিয়া আনে। 'মহাভাবময়ী' রাধিকার প্রেমের আবেগ-আর্তি মানবী নায়িকাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই মর্ত্যের রসের আস্বাদ পাওয়া যায় বলিয়াই বৈষ্ণব পদাবলী অবৈষ্ণবের কাছেও এত প্রিয়। এইখানেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের আবেদন। পুরানো বাঙ্গালায় 'সাহিত্য' বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা বৈষ্ণব পদসাহিত্য।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করিবার সময় সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ হইতে লৌকিক প্রেমের বহু কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে আদিরসাত্মক ঐসব শ্লোকগুলি অবলম্বন করিয়া বহু বৈষ্ণব পদও রচিত হইয়াছে। সেগুলির পাশাপাশি বৈষ্ণবপদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে বৈষ্ণব কবির হাতে ঐগুলির কি কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন বস্তুই বৈষ্ণব কবিগণের হাতে নূতন সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার উপযোগী করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ পুরাতনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রেমকবিতার আদর্শে গড়া নূতন কবিতা আরো মনোরম ও হৃদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহট্ঠের প্রেম-কবিতাগুলি এক একটি রসসমৃদ্ধ নিটোল মানবীয় প্রেম-কবিতা। সঙ্গীত-ধর্মী এই কবিতাসমূহের বাগ্-নির্মিতি ও ভাবানৈপুণ্য অপূর্ব। বৈষ্ণব গীতিকবিতার চিত্রকল্পে ও অলংকারে এই সমস্ত প্রকীর্ণ কবিতার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর বাক্‌শিল্প পূর্বতন সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতার সূত্রেই লব্ধ।

ভারতবর্ষের প্রকৃতির সহিত ভারতবর্ষের প্রেমের একটি যোগ আছে। পৃথিবীর ঋতুপরিবর্তনের একটি প্রধান কাজ নরনারীর হৃদয়ে প্রেম জাগানো। তাই দেখিতে পাই ভারতবর্ষের বর্ষা ঋতুর সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রেমের একটা অচ্ছেদ্য নিবিড় যোগ রহিয়াছে। সেই যোগের সুবিচিত্র ও সুমধুর প্রকাশ মহাকবি কালিদাসের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত একটানা চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের সার্থক বিরহের কবিতা তাই বর্ষার কবিতা। বৈষ্ণব কবিতাতেও (পদাবলীতে) তাহাই দেখিতে পাই। কালিদাস একটি গোটা বর্ষার কাব্য 'মেঘদূত' লিখিলেন। 'মেঘদূত' তো নরনারীর বিরহের কবিতা। অবশ্য তাহার আগে আদিকবি বাল্মীকি-ও বর্ষার কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার

পর সংস্কৃত-প্রাকৃতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ষার কবিতার সন্ধান মেলে। সেগুলিতেও বিরহের কথাই বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের বর্ষার কবিতাগুলিতেও রাধাকৃষ্ণের বিরহ-বেদনা চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ঋতুকে লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার বর্ষার কবিতাগুলিতে নিখিল নরনারীর বিরহবেদনা যেন অপরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এইখানেই আমরা প্রাচীন ও নবীনের সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর যোগসূত্র খুঁজিয়া পাইতেছি।

বর্ষাপ্রকৃতিও বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের 'উদ্দীপন বিভাবে'র কাজ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখি বর্ষাঋতুতেই যেন শ্রীরাধার বিরহ-বেদনা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। (বর্ষাকালোচিত -বিরহ)।

বৈষ্ণব পদাবলীর বর্ষা অভিসারের পদগুলিও অপূর্ব্ব। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা ও ব্যাপকতা যেন আরো বেশী। কবি বর্ষা অভিসারের পদও রচনা করিয়াছেন। যেমন,—

১। ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায় সে কথা আজি যেন বলা যায়
বিজুলি থেকে থেকে চমকায় এমন ঘনঘোর বরিষায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে

—বর্ষার দিনে; মানসী

২। সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ ধারা। চেয়ে থাকি সে শূন্যে অন্যমনে
অন্ধ বিভাবরী সঙ্গ পরশহারা॥ হেথায় বিরহিনীর অশ্রু
হরণ করিছে ঐ তারা।

—প্রকৃতি; -গীতবিতান

৩। মেঘের পরে মেঘ জমেছে কাজের দিনে নানা কাজে
আঁধার করে আসে থাকি নানা কাজের মাঝে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখ আজ আমি যে বসে আছি
একা দ্বারের পাশে। তোমারি আশ্বাসে।

—গীতাঞ্জলি ১৬

কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বর্ষার কবিতাগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই কালিদাসের মেঘদূতে 'প্রিয়াবিরহ', বৈষ্ণব পদসাহিত্যে 'প্রিয়বিরহ' আর রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতায় নিখিল নরনারীর বিরহ।

প্রাচীন-প্রেমকবিতার সহিত বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার যেমন গভীর মিল দেখা যায়, তেমনি বৈষ্ণবগীতিকার সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতারও বেশ মিল দেখি। রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের রচনা 'ভানুসিংহের পদাবলী' বৈষ্ণব পদাবলীর ছায়ামাত্র। কিছু দৃষ্টান্ত দিতেছি—

১। গোবিন্দদাস—

অম্বর ভরি নবনীরদ ঝাঁপ
কত শত কোটি শবদে জিউ কাঁপ।
তাঁহি দিঠি জারত বিজুরিক জ্বালা
ইথে জনি মন্দির ছোড়বি বালা।
ঐছন কুঞ্জে একলি বনমালি
অন্তর জর জর পন্থ নেহারি।
(বৈ. প. পৃ. ৬১৮)

১। রবীন্দ্রনাথ—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
—গীতাঞ্জলী।

২। রামানন্দ বসু—

প্রাণনাথ আজু কি হইল
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল।
মৃগমদ চন্দন বেশ গেয় দূর
নয়নের কাজর গেল সিথার সিন্দুর।
(পদকল্পতরু ৬৫৯)

২। রবীন্দ্রনাথ—

আমি আকুল কবরী আবরি
কেমনে যাইব কাজে।
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে।
শরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে।

৩। চণ্ডীদাস—

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার কোনে তিতিছে বঁধুয়া
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥ (বৈ. প. পৃ. ৫২)

৩। রবীন্দ্রনাথ—

তুমি পার হয়ে এসেছ মরু
নাই যে সেথায় ছায়া-তরু
পথের দুঃখ দিলেম তোমায় গো
এমন ভাগ্যহত। —গীতিমাল্য।

৪। কবিশেখর—

ও সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
(বৈ. প. পৃ. ৩২২)

৪। রবীন্দ্রনাথ—

এ ভরা ভাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহ ব্যথায়॥

৫। গোবিন্দদাস—

সুন্দরি কত সমুঝায়ব তোয়,
পায়লি রতন যতন করি তেজলি
অব পুন সাধসি মোয়।
কত কত গোপ সুনাগরী পরিহরি
যব তুয়া মন্দিরে কান।
তব তুহুঁ মান পরম ধন পাইলি
না হেরল কমল বয়ান॥
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব
না বুঝলি আপন কাজ।
না জানিয়ে কোন কলাবতী মন্দিরে
অব রহ নাগর রাজ॥
যাহে বিনু পল এক রহই না পারই
তাহে কি হেন ব্যবহার।
গোবিন্দদাস কহ অব ধনি সমুঝলি
পুন হেন না করির আর॥

৫। রবীন্দ্রনাথ—

বিদায় করেছ যারে নয়নের জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।
আজি মধু সমীরণে
নিশীথে কুসুম বনে
তারে কি পড়েছে মনে বকুল তলে,
সেই দিন তো মধুনিশি
প্রাণে দিয়াছিল মিশি
মুকুলিত দশদিশি কুসুম-দলে।
দুটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানি
যদি ঐ মালাখানি পরাতে গলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।

৬। যদুনন্দন—

রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায়
যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব
তনু
প্রতি তনু শীতল করিয়া॥ (বৈ. প. পৃ. ২১৪)

৬। রবীন্দ্রনাথ—

এখনো তারে চোখে দেখিনি
শুধু বাঁশি শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে
ফেলেছি।
—গীতবিতান।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভাবধারার অনুসরণে কোন কোন কবিতা লিখিয়াছেন—

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ যা কিছু আছিল মোর,
যত শোভা যত গান যত প্রাণ, জাগরণ ঘুমঘোর।
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,
জীবন-কুঞ্জে অভিসার নিশা আজি কি হয়েছে ভোর।
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা

আন নব রূপ আন নব শোভা
নূতন করিয়া লহ আর বার চির পুরাতন মোরে
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ডোরে।

—জীবন দেবতা—চিত্রা

আজকাল আমাদের সাহিত্যে মানুষের কথাই দেখিতে পাই, দেবতার কথা একেবারে গৌণ। ইহাই নবযুগের একটি প্রধান লক্ষণ। মানুষের মহিমা আজ সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। আধুনিক গীতি-কবিতায় কবির একান্ত ব্যক্তিগত আশা-আকাংক্ষা ও সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশাই প্রকাশিত। মানুষ আজ মুক্ত, চারিদিকে মানবতারই জয়ধ্বনি। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের কথায় বলিতে হয়—

শুনহ মানুষ ভাই,—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই॥

আধুনিক কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও বলিয়াছেন—

শুনহ মানুষ ভাই,—
সবার উপরে মানুষ সত্য,
স্রষ্টা আছে বা নাই। (দুঃখবাদী)

অথবা, গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্।

—নজরুল (সাম্যবাদী)

এই নবযুগের সূচনা বৈষ্ণব পদাবলীতেই লক্ষ্য করি। এই দিক থেকে দেখিলে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের সহিত আধুনিক গীতিকবিতার সংযোগ সহজেই নজরে পড়ে। বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হইবার পূর্বে ছড়াগান, ব্রতকথা ও দেবতার আখ্যায়িকা বা রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্য মশগুল ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখি, শুধু রাধাকৃষ্ণের লীলা লইয়াই পদ রচনা হইল না, শ্রীচৈতন্যের জীবন-কাহিনী ও তাঁহার প্রধান প্রধান পারিষদদের মাহাত্ম্য বিষয়েও গীতিকবিতা রচিত হইল। পরে সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তদেরও জীবনী-গ্রন্থ রচিত হইতে থাকিল। মানুষই কাব্যের বিষয়ীভূত হইল। দেবলীলা ছাড়া অন্য বিষয়ে, বিশেষ করিয়া জীবিত মানুষ লইয়া কাব্য রচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে কেন, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করিল।

এখন উহা উন্নত সাহিত্যের বিষয়-মর্যাদা লাভ করিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বৈষ্ণব-তত্ত্বদর্শনেও শ্রীভগবানের মানুষী লীলাকেই সর্বোত্তম বলা হইয়াছে— 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ' (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী)।

"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।

—শ্রীকৃষ্ণবিজয় (মালাধর বসু)

"কৃষ্ণের যতক খেলা সর্বোত্তম নর-লীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশে বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥" (চৈ. চ. মধ্যলীলা ২১ পরিচ্ছেদ)

এইগুলি হইতে তত্ত্বকথা বাদ দিলে তো মানুষের কথাই থাকিয়া যায়। বলরাম দাসের কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদে যশোদার মাতৃহৃদয়ের যে আশংকা ও স্নেহাতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মানবরসের সন্ধান মিলে।

বলরাম দাস—

হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে।
দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে॥ (বৈ. প. পৃ. ১২৭)

আবার, "আমার শপতি লাগে না ধাইয়ো ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।"—যাদবেন্দ্র (বৈ. প. পৃ. ৯৫১)

শাক্ত-পদাবলীর 'আগমনী' সঙ্গীতে বাঙ্গালী ঘরের মা মেনকা ও কন্যা উমার সুখ-দুঃখই যেন প্রকাশিত হইয়াছে।

"আঁধার করে ঘরের আলো
সত্য কি চললি উমা।"
"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা বুঝি আমার কেঁদেছে।"

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' দেখি ঈশ্বরী পাটনীর জীবনের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাংক্ষা চিত্রিত হইয়াছে—

প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥

আবার দেখি—দেবতা শিবের গায়ে মানব-শিশু ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে—

'ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া'।

দেবতাদের চেয়ে মানুষ যেন বড় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্রের ভিতর যে নবযুগের সন্ধান পাইলাম, তাহাই আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা ও টপ্পাওয়ালাদের সঙ্গীত ও কবিতার মধ্য দিয়া। এই সকল কবিগণের রচিত কতকগুলি রাধাকৃষ্ণলীলার প্রেমসঙ্গীত, কিছু শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী-সঙ্গীত ও কিছু শুদ্ধ প্রেমসঙ্গীত ও কবিতা পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যের সহিত উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য প্রভাবে রচিত আধুনিক সাহিত্যের প্রকৃত যোগসূত্র স্থাপিত হইল এই সব কবিদের রচিত সঙ্গীত ও কবিতার মধ্য দিয়া।

এই যুগের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমগীতিকাগুলির ভিতরে সুখে-দুঃখে-মিলনে-বিরহে মধুর হইয়া দেখা দিয়াছে নরনারীর রক্ত-মাংসের মূর্তি। 'রাধাকৃষ্ণ' এখানে মুখোস মাত্র। এই সকল কবির বর্ণিত প্রেম একেবারে সাধারণ বাস্তব মানুষের প্রেম, কবিদের মন সাধারণ মানুষের মন। বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত এইখানেই তফাৎ। যেমন,

"ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি নে" ॥

আবার— 'নয়নের দোষ কেন
মনেরে বুঝায়ে বল নয়নের দোষ কেন,
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মনমিলন' ॥

এইখানে দেখিতেছি রাধাকৃষ্ণের পরিবর্তে বাঙ্গালা সাহিত্যে নরনারীর মহিমময়ী যুগলমূর্তির প্রতিষ্ঠা হইল। মানবীয় সুরের জন্যই এই যুগের ধর্মসঙ্গীত-গুলি এত মধুর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ভিতর দেখি মানুষের সাহিত্যের বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ মানুষ। জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ ক্ষুদ্র ব্যাপার-গুলিও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। দিন দিন বাঙ্গালা সাহিত্যে মানুষের কথাই মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। উনবিংশ শতাব্দে আমরা ধর্মকে জীবন ও সাহিত্য হইতে বাদ দিই নাই, কিন্তু নবযুগের ধর্ম মানবধর্ম—এখন মানুষের কাজ-করবার মানুষের সঙ্গে, দেবতার সঙ্গে

নহে। তাই আজ মানুষই স্বীয় গুণে দেবতার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সাহিত্যে এখন মানুষেরই জয়গান। বৈষ্ণব-গীতিকায় বাঙ্গালীর যে লিরিক প্রতিভা দেখা দিয়াছিল তাহাই খাত বদলাইয়া আধুনিক গীতিকবিতায় পর্যবসিত হইয়াছে। তবে যুগের প্রভাবে আধুনিক গীতিকবিতা হইতে গীতাংশটুকু খসিয়া পড়িয়াছে। তবু দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতাকে সুরে-তালে গাওয়া হয়।

আধুনিক গীতি-কবিতার যে মানবীয় আবেগ ও চিত্রকলা লক্ষ্য করি, বৈষ্ণব-পদকারগণের অনেকের পদেও তাহার সূচনা দেখা যায়। বৈষ্ণব-পদকারগণের মধ্যে জ্ঞানদাসের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। জ্ঞানদাসের পদে আমরা আধুনিক মানুষের প্রাণের কথা শুনিতে পাই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি যেন নিখিল মানবের দেশকালাতীত বেদনাকেই প্রকাশিত করিয়াছেন। আবেগে তিনি মানবিক, চিত্রকল্পে তিনি আধুনিক। এখানে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

জ্ঞানদাস—

১। শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥

সই, কিবা সে পীরিতি তার।
জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে
কি দিয়া শোধিব ধার॥

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হৈয়া
তখন সে দিগে ধায়॥ (বৈ. প. পৃ. ৪০০)

২। রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে। (বৈ. প. পৃ ৪০০)

৩। দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে॥ (বৈ. প. পৃ. ৩৮২)

বংশীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবির প্রেম-প্রকাশের রীতি যেন আধুনিক যুগের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে।

হেন রূপ কবহুঁ না দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই সেই অঙ্গ হইতে মুঞি
ফিরাইয়া লইতে নারি আঁখি॥ —বংশীদাস

দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঙ্গে করতহি খেলি॥
—গোবিন্দদাস (বৈ. প. পৃ ৫৮০)

জীবন চাহি যৌবন বড়ো রঙ্গ।
তবে যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ॥
—বাঙ্গালী বিদ্যাপতি (বৈ. প. পৃ. ৮৬)

এই সব পদের ভাব ও ভাষা, চিত্রপ্রতীক ও আবেগ এবং সরস মর্তচেতনা আধুনিক মনোভাবের পরিচায়ক। জ্ঞানদাসের পদে মধ্যযুগীয় সংস্কারের সঙ্গে কিছু কিছু আধুনিক মনোভাবও স্থান পাইয়াছিল, আধুনিক কালের মনের সঙ্গে তাহার সংযোগ স্বীকার করিতে হয়।

মানুষকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম অনেকখানি সাহায্য করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য যে প্রেমধর্ম প্রচার করিলেন, তাহাতে বর্তমান কাল ও জীবিত মানুষ সর্বপ্রথম স্বমহিমায় দেখা দিল। আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কল্পনার অতীত হইতে বাস্তব বর্তমান কালে ঘুরাইয়া আনিয়া শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালীর চিন্তাধারা আধুনিকতার দিকে ফিরাইয়া দিলেন। তিনি ছোট-বড় সকল মানুষের আধ্যাত্মিক অধিকার স্বীকার করিলেন।

প্রসঙ্গত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের নাম করিতে হয়। তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মনুষ্য-চরিত্রগুলি ভালোতে-মন্দতে, সুখে-দুঃখে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কাহিনীকাব্যে চরিত্র-চিত্রণ তো আধুনিক যুগের সাহিত্যের লক্ষণ। তাঁহার

সৃষ্ট মানবচরিত্রে তিনি যে সহানুভূতি, বাস্তব জ্ঞান ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখা যায় না। দেব-চরিত্রগুলিও মনুষ্য ধর্মের দ্বারা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক যুগে জন্মাইলে কবি একজন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার হইতে পারিতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দেও বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা অব্যাহত ছিল। বিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে কোন কোন কবি বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে পদ-রচনা করিয়াছেন। এখনো প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কেহ কেহ দুই একটি পদ ব্রজবুলিতে রচনা করেন। জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় এইরূপ তিনটি পদ রচনা করিয়া তাঁহার সংকলিত "গৌরপদ-তরঙ্গিনীতে" যোজনা করিয়াছেন। এই সমস্ত পদ কিন্তু ঠিক 'বৈষ্ণব পদাবলী' হইয়া উঠে নাই। 'রাধা', 'কৃষ্ণ', 'বৃন্দাবন' ইত্যাদির নাম দিয়া এবং কোথাও বা ব্রজবুলির অক্ষম অনুকরণ করিয়া আধুনিক প্রেম কবিতাই লেখা হইয়াছে। পদাবলীর ভক্তির সুর এইগুলিতে আশা করা যায় না। মানবীয় রসই ইহার মুখ্য কথা। এইরূপে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুশীলনের দ্বারা আধুনিক লিরিক কবিতা পুরানো গীতি-কবিতার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াছে। পুরানো গীতিকাবিতার ধারা অখণ্ডভাবে খাত বদলাইয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দের শেষভাগে বাঙ্গালা সাহিত্যের কয়েকজন দিক্‌পাল বৈষ্ণব পদাবলীর চর্চা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী বিদ্রোহী কবি মধুসূদন বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য রচনা করেন। ধর্মের কথা বাদ দিলেও বৈষ্ণব কবিতার অভিনব সৌকুমার্য্য, চমৎকারিত্ব ও লোকোত্তর রমণীয়তা রসিক চিত্তকে সহজেই মুগ্ধ করে। তাই আধুনিক কবিগণও বৈষ্ণব কবিতার অনন্যসাধারণ রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণই বাঙ্গালীকে সর্বপ্রথম আদিরসের মাধুর্য্য আস্বাদ করিতে শিখাইয়াছিলেন। মধুসূদনের 'রাধা' কিন্তু 'প্রাকৃত' রমণীই হইয়া উঠিয়াছেন। তবু ব্রজাঙ্গনার ভিতরে বৈষ্ণব পদাবলীর খানিকটা সুর শোনা যায়। ব্রজাঙ্গনার রাধা প্রথম হইতেই বিরহিণী।. কিছুটা উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্যামের বাঁশীর শব্দ শুনিয়া পাগলিনী রাধা সখীকে বলিতেছে—

ওই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন রে মুরারির বাঁশী।
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কানে আমি শ্যামদাসী॥

আবার—

কে ও বাজাইছে বাঁশী সজনি মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ বনে ?
নিবার উহারে, শুনি ও ধ্বনি দ্বিগুণ আগুন জ্বলে গো মনে।
ও আগুনে কেন আহুতিদান ? অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ।

মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনায় কালিদাসের মেঘদূতের প্রভাব দেখা যায়। রাধা পবন-দূতকে পথের সকল প্রলোভনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

দেখি তোমা পীরিতির ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী,
মজো না বিভ্রমে তার তুমি হে রাধার দূত
হের না হের না, দেখ, কুসুম যুবতী ;
কিনিতে তোমার মন দিবে সে সৌরভধন
অবহেলি সে ছলনা যেও আশুগতি।

যিনি জয়দেবের পদাবলীকে 'মদনধর্ম-মহোৎসব' বলিয়াছিলেন সেই বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহার উপন্যাসের নায়িকা বা ভিখারিণীর মুখে দুই চারিটি বৈষ্ণব কবিতা বসাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে বোঝা যায় বৈষ্ণব পদাবলীর সৌন্দর্য্যে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বৈষ্ণব কবিতাগুলি কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব পদাবলী হইয়া উঠে নাই। কাব্যের প্রয়োজনেই এগুলির সৃষ্টি। এই বৈষ্ণব কবিতাগুলির মধ্যে দুই একটি সত্যই সুন্দর হইয়াছে। যেমন 'মৃণালিনী' উপন্যাসে গিরিজায়ার গান—

মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী শ্যামবিলাসিনী রে।
কহলো নাগরি গেহ পরিহরি কাহে বিবাগিনী রে॥
বৃন্দাবন ধন গোপিনীমোহন কাহে তু তেয়াগী রে।
দেশ দেশ পর সো শ্যাম সুন্দর ফিরে তুয়া লাগি রে॥
বিকচনলিনে যমুনাপুলিনে বহুত পিয়াসা রে।
চন্দ্রমাশালিনী যা মধুযামিনী না মিটিল আশা রে॥
সা নিশা সমরি কহ লো সুন্দরি কাঁহা মিলে দেখা রে।
শুনি যাওয়ে চলি বাজায়ি মুরলী বনে বনে একা রে॥

লক্ষ্য করিবার বিষয় পদটিতে বৈষ্ণব পদাবলীর মত 'ভণিতা' নাই।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হেমচন্দ্রও বৈষ্ণব কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। তাঁহার 'ব্রজবালক' কবিতাটি ভালো হইয়াছে।

সুচারু সুন্দর বিনোদ রায় কে সাজাল তোমা হেন শোভায়,
নয়ন বঙ্কিম কিবা সুঠাম চারু গ্রীবাভঙ্গি ঈষৎ বাম,
ভালে ভুরুযুগ আকর্ণটান অপাঙ্গভঙ্গীতে চমকে প্রাণ,
মোহন মুরতি চিকণ কালা, রূপের ছটায় জগ উজলা।
... ...
বনফুল মালা গলায় সাজে চলিতে চরণে নূপুর বাজে,
নটবর বেশ রসিক রাজ সদাই বিহরে নিকুঞ্জ মাঝ।

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষামাধুর্য্য, ছন্দের ঝংকার ও তাহার অপরূপ রস-বৈচিত্র্য তরুণ রবীন্দ্রনাথের হৃদয় উন্মথিত করিয়া দিয়াছিল। কাব্যের প্রেরণাতেই সৃষ্টি হইয়াছে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। 'ভানুসিংহ ঠাকুর' রবীন্দ্রনাথের মুখোস মাত্র, তেমনি তাঁহার পদাবলীও বৈষ্ণব পদাবলীর ছায়া। 'ভানু' শব্দটির অর্থ 'রবি' আর 'ঠাকুর' উপাধিটিও বিদ্যাপতি ঠাকুরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পরিণত কালের রচনার উপর বৈষ্ণব পদাবলীর ও বৈষ্ণব ভাবধারার যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে কিন্তু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই সেগুলি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের সে পরিপাক-শক্তি ছিল-না। 'ব্রজবুলি' ভাষার ধ্বনি ও ছন্দ রবীন্দ্রনাথের রচনাতে ঠিকমত প্রকাশিত হইয়াছে।

ভানুসিংহ ঠাকুরের দুইটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

১। হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে
কণ্ঠে বিমলিন মালা,
বিরহ বিষে দহি বহি গেল রয়নী
নাহি নাহি আওল কালা।
বুঝনু বুঝনু সখি বিফল বিফল সব
বিফল এ পীরিতি লেহা,
বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন
বিফল রে মঝু দেহা।

২। শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর
বিরহ সাথি করি সজনী রাধা
রজনী করতহি ভোর।
একলি নিরল বিরল পর ৰৌত
নিরখিত যমুনার পানে
বরখত অশ্রু বচন নাহি নিকসত
পরাণ যেহ না মানে।
গহন তিমির নিশি ঝিল্লি মুখর দিশি
শূন্য কদম তরু মূলে
ভূমি শয়ন পর আকুল কুন্তল
কাঁদয় আপন ভুলে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতাগুলির প্রভাবের কথা আলোচনা করিয়াছি। অবহট্‌ঠে যে ছড়া ও গানময় রচনা প্রচলিত ছিল সেগুলিরও প্রভাব বৈষ্ণব পদাবলীর উপর পড়িয়াছে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদের রচনার প্রধান আদর্শ ছিল বিদ্যাপতির বা বিদ্যাপতি-গোষ্ঠীর গান। বিদ্যাপতির ভগ্নমৈথিলের প্রভাবে বাঙ্গালায় ব্রজবুলির সৃষ্টি হইল। ব্রজবুলিতেই বৈষ্ণব পদ বেশী লেখা হইয়াছে। প্রথম হইতেই বৈষ্ণব-গীতিকায় প্রধানত বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি ব্যবহৃত হইতেছিল। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলির মিশ্রণও দেখা যায়। ব্রজবুলি রচনার মাঝে মাঝে দুই চারিটা ব্রজভাখা (পশ্চিমা হিন্দীর উপভাষা) শব্দও পাওয়া যায়. এবং তাহা হইতে বাঙ্গলা পদেও আসিয়া গিয়াছে। হিন্দী শব্দগুলি মৈথিলের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। বৃন্দাবন-প্রবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় ব্রজভাখার (ব্রজভাষা) শব্দ ঢুকিয়া গিয়াছে, বৃন্দাবন প্রচলিত দুই চারিটি ফারসী শব্দও আসিয়া গিয়াছে, বৈষ্ণব-গীতিকায় ফারসী শব্দ বিশেষ দেখা যায় না। বিখ্যাত দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বৃন্দাবনে বসিয়া পদ-রচনা করেন ও পদ-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করায় বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের রচনায় সহজেই হিন্দী শব্দ আসিয়া গিয়াছে। ব্রজভাখার কয়েকটি শব্দ এখানে উল্লেখ করিতেছি। যেমন, ঐছে, কৈছে, তৈছে, যৈছে, যোই, কোই, ইহাঁ, কাঁহা, তাহাঁ, যাহাঁ, অবহি কাহে, বাত ইত্যাদি।

ব্রজবাসী বৈষ্ণবদের রচিত ব্রজভাষায় লেখা পদও দুই চারিটি পাওয়া যায়। পদকারগণ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া বৃন্দাবনে বসবাসকারী বাঙ্গালী কিংবা স্থানীয় ব্রজভাষাভাষী বৈষ্ণব হইতে পারেন। পরবর্তীকালে ব্রজবুলি পদে ব্রজভাষার প্রভাব দেখা যায়। দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

আগরওয়ালী—

(শ্রীরাধার গৌরব)—

দেখ দেখ প্রীতম প্যারিক সোহাগে।
স্বহস্তে বীড় শ্যাম দেত
খণ্ডিত আধ আপ লেত
পৌছত পট পীত পীক
অতিশয় অনুরাগে॥

নিরখত বদনারবিন্দ
পলকন নাহি লাগে।
কুঞ্জমে রস পুঞ্জ কেলি
পান পাওয়ে চহকি খেলি

কাঞ্চনী রাধা কালা কান
ভাঁতি ভাঁতি রাখত মান
দুহুঁ শ্রীমুখ তাম্বুল পাই
আগরওয়ালী ভাগে ॥

(বৈঃ পঃ পৃঃ ১০৬২)

—দেখ, প্রিয়তম কৃষ্ণ পিয়ারী রাধাকে সোহাগ করিতেছেন দেখ। শ্যাম নিজের তাম্বুল লইয়া শ্রীরাধার মুখে দিয়া (তাঁহার মুখ হইতে দশন খণ্ডিত) অর্ধাংশ নিজে লইতেছেন। অতিশয় অনুরাগে শ্রীরাধার নিক্ষিপ্ত পিক (চর্বিত তাম্বুলের থুৎকার) নিজের পীত বসনে মুছিয়া লইতেছেন। স্বর্ণপ্রতিমা রাধা, কালবর্ণ কানাই পলে পলে সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার মান রাখিতেছেন। এবং অপলকে রাধার বদনারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতেছেন। কুঞ্জে পুঞ্জীভূত রসকেলি। রাধা কৃষ্ণের হস্ত হইতে পান পাইয়া চমকিত হইয়া ক্রীড়ায় মাতিয়াছেন। দুই জনের মুখের উচ্ছিষ্ট তাম্বুল পাইয়া (পাছে অন্য কেহ অংশ চায় এই ভয়ে) আগরওয়ালী পলাইতেছেন।

কৃষ্ণকান্ততনয়া— (ঝুলন লীলা)

ঝুলত ব্রজরাজ-কুঙর
রঙ্গন হিঁডোরে।
সঘনে পবন বহই মন্দ
বরিখত বারি বুন্দ বুন্দ
পীত পটমে লপট পিয়ারি
জীক করত কোরে ॥

হংস সারস কীর মোর
কোয়েলাগণ করত শোর
ভ্রমরা-গণ গুঞ্জ গুঞ্জ
বোলত চৌ-ওরে।
সুঘড় করত তাল-মান
গাও সব তরুণি গান
কৃষ্ণকান্ততনয়া চিএ
হোয়ে সুখমে ভোরে ॥

(বৈঃ পঃ পৃঃ ১০৯৭)

বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির মত হিন্দী বৈষ্ণব কবি সুরদাসও শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনা করিতেছেন।

আবত হী যমুনা ভরে পানী।
শ্যাম বরণ কাহু কো ঢোটা নিরখি বদন ঘর গঈ ভুলানী ॥
উন মো তন মৈঁ উন তন চিতয়ো তবহী তে উন হাথ বিকান।
উর ধকধকী টকটকী লাগী তনু ব্যাকুল মুখ ফুরত ন বাণী ॥

—যমুনায় জল ভরিতে আসিয়াছিলাম। শ্যামবর্ণ কাহার ছেলে, মুখখানি দেখিয়া ঘর ভুলিয়া গেলাম। সে আমার সর্ব তনুতে, সমস্ত তনু ভাবাইয়া তুলিল—

সেই হইতে তাহার হাতে গেলাম বিকাইয়া, আমার বুক ধকধকী—আঁখি স্থির—তনু ব্যাকুল—মুখে ফুরে না বাণী।—(শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ. ৩২৫)

হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণ-লীলায় নিজেরা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ সখীর অনুগভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে হিন্দী কবিগণের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

আগেই দেখাইয়াছি যে পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতাগুলি বৈষ্ণব প্রেম-গীতিকার প্রাগ্‌রূপ হিসাবে বা আদর্শ হিসাবে কাজ করিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব গীতিকাগুলি প্রাচীনের অক্ষম অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি নয়। এই গানগুলি বৈষ্ণব কবির স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি। ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ এক একজন প্রতিভাধর শিল্পী ছিলেন। পূর্বকালীয় কবিদের প্রাচীন বাণী নূতন প্রকাশভঙ্গি এবং নব বৈষ্ণব ভক্তিরসের দ্বারা নূতন রূপে রূপায়িত হইয়াছে। এই নূতন ভঙ্গিমার জন্যই পুরাতন সাধারণ প্রেম-কথাই অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে। 'বাণী নবত্বমায়াতি পূর্বার্থান্বয়বত্যপি'[1] (পূর্বতন কবিদের প্রাচীন বাণীও নূতন ভঙ্গিমার আভরণে নবীনত্ব লাভ করে)। রসের মূর্তি গড়ার শিল্পীর যদি অভাব না হয় তবে নূতন কাব্যসৃষ্টিরও অসদ্‌ভাব হয় না। —'ন কাব্যার্থ-বিরামোঽস্তি যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ'[2]—। ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ এমন কতকগুলি প্রেমগীতিকা রচনা করিয়াছেন যাহাদের সহিত পূর্বতন প্রেমকবিতার মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রেমের এত বিচিত্র অপরূপ সূক্ষ্ম কল্পনা পূর্বতন কবিদের রচনায় দেখা যায় নাই। আমরা আগেই একটা মানবীয় প্রেমকবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে ভক্ত কবি গোবিন্দদাসের হাতে ঐ কবিতাটির ভাব কত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল যে বৈষ্ণব ভক্তিরসের দ্বারা মণ্ডিত হইয়া মনোরম হইয়াছে তাহা নয়, প্রকাশভঙ্গির গুণেও কবিতাটি আরো 'সহৃদয়-হৃদয়সংবেদ্য' হইয়া উঠিয়াছে। নিছক সাহিত্যের দৃষ্টিতে দেখিলেও বলা যায়, প্রাচীন প্রেমগীতিকার কাঠামোকে বৈষ্ণব কবিগণ অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব প্রেমগীতিকার বিষয়বস্তু সংকীর্ণ। একই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া সকলকেই পদ-রচনা করিতে হইয়াছে। তাই কবিগণ নানা উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। বৈচিত্র্যের অভাববশতঃ

---

১ ধ্বন্যালোক ৪।২ ২ ধ্বন্যালোক ৪।৬

বৈষ্ণব কবিদের প্রেমগীতিকাগুলি অনেক সময় একঘেয়ে হইয়া উঠিয়ছে। আবার প্রতিভা না থাকিলেও বৈষ্ণব ভক্ত মহাজনদের অনেকে বৈষ্ণব পদরচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সেইসব রচনা বড় গতানুগতিক ও কাব্য-গুণহীন আবর্জনায় পরিণত হইয়াছে। বৈষ্ণব ভক্তের নিকট সেগুলির মূল্য ও মর্যাদা অস্বীকার করা হইতেছে না। তবু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে যদি প্রকৃত কাব্যগুণসমৃদ্ধ রচনা কিছু থাকে, তবে তাহা হইতেছে বৈষ্ণব পদাবলী। আধুনিক অবৈষ্ণব পাঠকেরা বৈষ্ণব পদাবলীর সেই সাহিত্য-গুণের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব তত্ত্বকে বাদ দিয়া তো এ সাহিত্যের প্রকৃত আস্বাদন সম্ভব নয়। সেইজন্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর আস্বাদনে অসুবিধা দেখা যায়। কেবল সাহিত্য-ধর্মের জ্ঞান থাকিলেই যে কোন সাহিত্য-শিল্পকে বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যকে ভালোভাবে জানা যায় না। যে কোন সাহিত্যকে সত্যকার আস্বাদ করিতে হইলে—তাহার জন্ম-রহস্য, বিশিষ্ট সমাজ ও ধর্ম এবং জলবায়ু সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা দরকার। সাহিত্য-শিল্পে দেশকালের আবেষ্টনী যে কতখানি প্রধান এবং অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতে পারে, তাহা বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ করিলে জানা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যকে ভালভাবে আস্বাদ করিতে হইলে বৈষ্ণব ধর্ম, তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতাও বৈষ্ণব পদাবলীর আস্বাদনে অঙ্গহানি ঘটায়। এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। প্রয়োজনবোধে কোন কোন স্থলে প্রাচীন পদ বা বৈষ্ণব পদের পুনরুল্লেখ করিতে হইয়াছে। বক্তব্যটি পরিস্ফুট করিতে গিয়াই এই ধরণের পুনরুক্তি হইয়া গিয়াছে।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত-অবহট্‌ঠে লিখিত পূর্বতন প্রেমকবিতার সহিত আমরা পরবর্তীকালের রাধা-প্রেমের অসংখ্য কবিতার তুলনা করিয়া দেখাইলাম যে বৈষ্ণব কবিগণ ভারতীয় সাধারণ কাব্য-ধারা, কবিরীতি ও কবিপ্রসিদ্ধিকেই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বলা চলে বৈষ্ণব প্রেমকবিতার পশ্চাৎপটে রহিয়াছে সাধারণ পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা।

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট

গ্রন্থ-নির্ঘণ্ট

---

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

২ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

ষ

স

ইংরাজী নির্ঘণ্ট